বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে গানের বিষয়বৈচিত্র্য ও সুরশৈলী

পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

এ. বি. এম. রেজাউল রিপন

রেজিঃ নংঃ ১৮৫/২০১৬-২০১৭ (পুনঃ)

সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মহসিনা আক্তার খানম

সহযোগী অধ্যাপক

সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উৎসর্গ

আমার বাবা

মো. রহিজ উদ্দিন মৃধা

মা

বেগম রাবেয়া রহিজ

বড় ভাই

এ. এস. এম. মোস্তাফিজুর রহমান

আমার সকল শক্তি ও প্রেরণা

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের আদি নির্দশন চর্যাপদ বা চর্যাগীতি। সর্বাধিক গ্রাহ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এটি ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। যার মাধ্যমে বাংলা গানের উন্মেষ ঘটেছিল। এ থেকে অনুমেয় হয় যে, গানের ভেতর দিয়েই বাঙালির সৃজনশীলতার প্রকাশ এবং আত্মপ্রত্যয় গড়ে উঠেছে। এবং একথা অমুলক নয় যে, তারই ধারাবাহিকতায় চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাসে সবাক যুগে বিশেষত এদেশে গান হয়ে উঠে দর্শকের নিকট বিনোদনের আকর্ষণীয় বিষয়। তৈরি হয় বাংলা গানের বিস্তৃত পরিসর এবং সূচনা হয় বাংলা গানের বিশেষ ধারা সিনেমার গান বা চলচ্চিত্রে গান (প্লে-ব্যাকগীতি বা নেপথ্য কণ্ঠসংগীত)। গানের কথার যেমন আলাদা শক্তি রয়েছে তেমনি সুরেরও রয়েছে বিশেষ ক্ষমতা। যথোপযুক্ত কথা এবং সুরে গান হয়ে ওঠে হৃদয়গ্রাহী। সংগীতের ক্ষমতা এখানেই এবং শ্রোতার অন্তরে তা স্থায়ী আসন তৈরি করে। চলচ্চিত্রের গানেরও রয়েছে বিশেষ ক্ষমতা এবং এর অন্তরালে রয়েছে সুরের ধরন, গায়কি। এই গানের বা সুরে যৌগিকতার প্রকাশ থাকলেও এর মৌলিকতার দিকটিও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। গানের নাটকীয়তা বা সিকোয়েন্স তৈরির বিষয়টি সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কোন একটি সিকোয়েন্সকে কেন্দ্র করে রচিত গানগুলোর কথা বলা যায়, বিশেষ করে প্রেম সংক্রান্ত–নায়ক বা নায়িকার দৃষ্টি আকর্ষণমূলক গান অথবা বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের গানের কথা বলা যায়। এছাড়া রোমান্টিকতার সীমাহীন প্রকাশতো রয়েছেই। প্রায় গানই কোনো না কোনো বিষয় বা চরিত্রকে ঘিরে আবর্তিত। কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অথবা বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ কিংবা নায়ক-নায়িকার প্রেম-বিরহ না বলা কথা প্রকাশের অন্যতম ইশারা বা ইঙ্গিত হিসেবে বেশ গুরুত্ববহ। যে কথা বা ভাব সংলাপে প্রকাশ করা কঠিন, সে ভাব প্রকাশের অন্যতম বাহন হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখে এর গান। এ সকল কারণে খুব সহজেই আলাদা করা যায় এই গানকে। সুতরাং সকল দিক বিবেচনায় এর মৌলিকত্বকে অস্বীকার করা যায় না। মূলধারা চলচ্চিত্রের বাইরে বিভিন্ন ধারা সূচিত হলেও অনেক সমালোচনা আলোচনার পরেও আজ অবধি গান ব্যতীত এদেশে চলচ্চিত্র কল্পনাতীত। অপরিহার্য এই বিষয়টি বাংলা গানের একটি বিশেষ ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েও তা যথোপযুক্ততার ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ। সারা পৃথিবীতে চলচ্চিত্র বা সিনেমার গান বিশেষভাবে জনপ্রিয়। চলচ্চিত্রে গানের বদৌলতে বাংলা গানের ভাণ্ডার হয়েছে সুবিশাল, সুবিস্তৃত। গানে এসেছে বিচিত্রতা। এমন একটি জনপ্রিয় বিষয়ের তেমন কোন গবেষণা বা গ্রন্থ রচিত হয়নি এমনকি ব্যবহার ও উপযোগিতা নিয়ে নানাবিধ প্রশ্নের উদ্রেক হলেও তা গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়নি। অথচ এখন পর্যন্ত চলচ্চিত্রের গান বিশেষভাবে প্রতিনিধিত্ব করছে। এক্ষেত্রে হিন্দি চলচ্চিত্রের গানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

একসময় বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালায় সংযোজিত হয়েছিল ছায়াছবি গানের অনুষ্ঠান 'ছায়াছন্দ' এ অনুষ্ঠান দেখার জন্যে ভিড় হতো গ্রামের যে সব বাড়িতে টেলিভিশন আছে সে সব বাড়ির আঙ্গিনায়। রেডিওতে প্রচারিত অনুষ্ঠানেও যুক্ত হলো ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান 'ছায়াবাণী'। চেনা জানা গানগুলোর সঙ্গে যোগ হলো নতুন গানের। অভিনয়শিল্পীদের অভিনয়ে পরিবেশিত গানগুলো দৃশ্যায়নের মধ্য দিয়ে কল্পনার নানামাত্রিকতার বিস্তার এবং দর্শক প্রিয়তা লাভ করে। এই গানের জনপ্রিয়তার কারণসমূহ সংক্ষেপে এভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে–এক. নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি লাভ। দুই. দৃশ্যায়নের মাধ্যমে পরিচিত-অপরিচিত গানের ভিন্ন উপস্থাপন এবং তৃতীয়ত.

কল্পনার আশ্রয়ে সাজানো বিশেষ বিনোদন যেন নিজের জীবনেরই সুপ্ত বাসনার রূপায়ণ। এছাড়াও জনপ্রিয়তার আরেকটি অন্যতম কারণ হলো এই গানের বিষয় এবং সুর। সুরের রয়েছে নানা ধরন, পদ্ধতি বা গায়কি, যা দিয়ে সহজেই এ গানকে চেনা যায়। ফলে গবেষণায় গানের বিষয় এবং সুর প্রাধান্য পেয়েছে।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক উত্থান-পতন, ধর্মীয়, সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রভাবে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। তদুপরি কাহিনির প্রয়োজন কিংবা উপস্থাপনার নানা কৌশল অবলম্বনে অথবা কোন বিষয়কে ইশারা-ইঙ্গিতে কিংবা শৈল্পিক উপস্থাপনার জন্য গান ব্যবহারের রীতি বা প্রচলন গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ব্যবসায়িক দিকটিকেও উপেক্ষা করা যায় না। বাঙালি জীবনবোধ, চিরায়ত গ্রাম বংলার নারী-পুরুষের প্রেম, বিরহ-বেদনা, অভিমান, পারিবারিক জীবন-সংসারে, আহলাদ, সুখ-দুখ, আনন্দ-বেদনা, সংগ্রাম, কলহ বিবাদ, বিচ্ছেদ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, রাজনৈতিক বিষয় আশয় ইত্যাদির রূপ নির্ণয়ে গান তার বিচিত্র সমারোহে উপস্থাপিত; বিষয়বৈভবে সমৃদ্ধ। ফলে স্বাভাবিকভাবে উক্ত বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে গানের বিষয়বৈচিত্র্য ও সুরশৈলী’ শীর্ষক গবেষণার শিরোনামে বাংলাদেশ শব্দটি ব্যবহৃত হলেও স্বাধীনতা পূর্বকালের চলচ্চিত্র এবং তার গান একইভাবে আলোচনায় এসেছে। স্বাধীনতার পূর্বে এদেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গ। তবে তা বর্তমান বাংলাদেশকেই বোঝানোর প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজি ভাষাকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র অধ্যয়নের একাডেমিক সংজ্ঞা অনুযায়ী ফিল্ম হলো প্রযুক্তি (সেলুলয়েড ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তুলে তার সম্পাদনা মুদ্রণ ইত্যাদি) মুভি হলো এর বাণিজ্য ও বিনোদন আর সিনেমা হলো নন্দনতত্ত্ব বা এস্থেটিকস্ তবে আমাদের দেশে সিনেমা শব্দটিই মুভি যা বোঝায় সে হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কখনো বা এন্টারটেইনমেন্ট হিসেবে (ফিলিম অপভ্রংশরূপে ব্যবহৃত হয় দর্শকের মুখে) মুভি শব্দটি এখনো খুব বেশি চালু হয়ে ওঠেনি। সিনেমা, ছবি, বই, এগুলো লোকমুখে বেশি ব্যবহৃত হয়। আর চলচ্চিত্র, ছায়াছবি ইত্যাদি শব্দগুলো লেখায় বেশি ব্যবহৃত হয়। গবেষণার শিরোনামে চলচ্চিত্র শব্দটি রাখা হয়েছে কিন্তু বাকি প্রতিশব্দগুলোও আলোচনার প্রয়োজনে ঘুরে ফিরে এসেছে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসবিদরা সর্বসম্মতিক্রমে আব্দুল জব্বার খানের *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬) চলচ্চিত্রটিকে বাংলাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যদিও এই ভূ-খণ্ডে বা এই মানুষের তৈরি চলচ্চিত্রিক অন্য নিদর্শন ইতোপূর্বে ছিল। নির্বাক প্রামাণ্যচিত্র কিংবা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। এই সব বিবেচনায়, গবেষণার বিষয় যেহেতু গানের বিষয় ও সুর, সে কারণে প্রথম পূর্ণাঙ্গ সবাক চলচ্চিত্র *মুখ ও মুখোশ* থেকেই গবেষণা কর্মটি সূচনা লাভ করেছে এবং পরিসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে (১৯৫৬-১৯৮৯) সাল পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে, গবেষণায় মূলধারার চলচ্চিত্রের গান বিষয়ক আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। বিকল্পধারা কিংবা স্বাধীনধারা নামে পরিচিত যে চলচ্চিত্র এর গান নিয়ে কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। উল্লেখ্য যে, গবেষণার নির্ধারিত পরিসীমার মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সংখ্যা ১০৬৬ টি (এক হাজার ছেষট্টি)। তন্মধ্যে ৫৩ টি ছিল উর্দু ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্র। গবেষণায় বাংলা ভাষার চলচ্চিত্র রাখা হয়েছে এবং নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহের মধ্যে নির্বাচিত ১০২টি (একশত দুইটি) চলচ্চিত্র এবং এর উল্লেখযোগ্য বিষয়ভিত্তিক ২৬০টি (দুইশত ষাটটি) গানের প্রয়োগভাবনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ৩০ টি নির্বাচিত বিষয়সহ মোট ২৬ টি পর্বে বিষয়বৈচিত্র্য অধ্যায়টি

আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত সময় সীমার বাইরে অন্যান্য চলচ্চিত্রের আলোচনাও স্থান পেয়েছে।

গবেষণায় বিষয়ভিত্তিক চলচ্চিত্র এবং তার গান নির্বাচনে যে সব বিষয়ের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রথমত. আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রের পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক চলচ্চিত্র এবং তার ব্যবহৃত গান। প্রসঙ্গত, তখন পর্যন্ত এদেশে কোন পুরস্কার চালু হয়নি। ঐ উৎসবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হয় ১৯৫৯ সালে উর্দু ভাষার চলচ্চিত্র *জাগো হুয়া সাভেরা*-এর মাধ্যমে। এছাড়া গবেষণার উল্লেখিত সময়ের মধ্যে এ উৎসবে প্রদর্শিত হয় বাংলা ভাষায় নির্মিত *সূর্যস্নান*, *সুতরাং*, *নবাব সিরাজদ্দৌলা*, *আয়না ও অবশিষ্ট*, *আবির্ভাব*। এছাড়া বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস) পুরস্কার ১৯৭২-এ এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হয়। দ্বিতীয়ত. এমন অনেক চলচ্চিত্র রয়েছে যা পুরস্কার পায়নি কিংবা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। তবে তার ব্যবহৃত গান বিষয়ের দিক থেকে তুলনীয় কিংবা সুরের দিক থেকে শিল্পমানসম্পন্ন। এমনতর দাবীর মুখে সে সব চলচ্চিত্র এবং তার ব্যবহৃত গান আলোচনায় এসেছে। তৃতীয়ত. সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে সুরকার ও সংগীত পরিচালক এবং মাঠ পর্যায়ে সাধারণ দর্শক-শ্রোতার নিকট হতে। চতুর্থত. এক সময়ের একমাত্র জনপ্রিয় প্রচার মাধ্যম রেডিওতে দর্শকের অনুরোধে প্রচারিত চলচ্চিত্রের গানগুলোকে গবেষণায় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে। পঞ্চম. এছাড়া সিডি-ডিভিডি'র স্বল্পতা রয়েছে অনেক। বাজারে কেবল জনপ্রিয় ছবিগুলো পাওয়া যায়। যে সব ছবির গান বা কাহিনি কিংবা অভিনেতা-অভিনেত্রীর কারণে বেশ জনপ্রিয়; সেই সব ছবির গান গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে। স্মর্তব্য যে, সব গান জনপ্রিয় নয় কিন্তু বিষয়বৈভবের দিক থেকে তা বিবেচ্য সুতরাং গবেষণার লক্ষ্য পূরণে এ ভাবনাটির দায়ও এড়ানো যায় না।

সর্বোপরি ইউটিউবে থাকা ছবি কিংবা গানগুলোর তথ্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি রয়েছে তা সংশ্লিষ্ট মহলের প্রায় সকলের জানা। তবে তা যাচাই-বাছাইপূর্বক ব্যবহার করা হয়েছে। তা না হলে ত্রুটিপূর্ণ তথ্য থেকে আশঙ্কামুক্ত হওয়া যায় না। তবে যে সব ছবির গায়ে টাইটেল লেখা রয়েছে এবং তা দেখে নিশ্চিত হওয়া গেছে বেকলমাত্র সেই সব তথ্য উক্ত গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও গান নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরও যে সব বিষয়গুলো বিবেচিত হয়েছে। তা হলো: এক. বিভিন্ন গ্রন্থ, দৈনিক পত্রিকায় যে সব গান জনপ্রিয় বলে উল্লেখিত। চলচ্চিত্র ইতিহাসকার অনুপম হায়াতের গ্রন্থ, পত্রিকার প্রবন্ধ। আবদুল্লাহ জেয়াদের লেখা গ্রন্থ ও পত্রিকার লেখা। দুই. বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক ও কণ্ঠশিল্পী প্রমুখের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে। বিশিষ্ট সুরকার, সংগীত পরিচালক আজাদ রহমান, সুরকার আলী হোসেন, আলম খান, বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী খুরশীদ আলম প্রমুখের পরামর্শে।

গান বাঙালির আগাগোড়াই ছিল জীবনের সহজ বিনোদনের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে। কিন্তু গানের প্রতি দারুণ ভালোবাসা সত্ত্বেও এই গান বাঙালি লিখে রাখেননি। লিখে না রাখা কিংবা বিস্মৃতির গহবরে নিমজ্জিত হবার ঘটনা বাঙালির ইতিহাসে বিরল কিছু নয়। এ সম্পর্কে 'দু'শো বছরেরও বেশি আগে বাংলা নাটকের প্রথম লেখক লেবেদেফ বাঙালিদের চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে, বাঙালিরা ভালোবাসে গান আর ভাঁড়ামি। কিন্তু গানের প্রতি ভালোবাসা সত্ত্বেও প্রাচীন কালের বাংলা গানের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের ইতিহাস বাঙালিরা লিখে রাখেননি। তার প্রমাণ

এদেশের চলচ্চিত্র সংরক্ষণের ইতিহাসেও সত্য হয়ে ধরা দেয়। কারণ চলচ্চিত্র সংরক্ষণের বিষয়টি সরকারি মহলের নজরে এসেছে অনেক পরে অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ' প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলেও সত্যি যে, ইতোমধ্যে অনেক চলচ্চিত্র নষ্ট কিংবা হারিয়ে গেছে। ফলে এ বিষয়টির প্রতি প্রবল আগ্রহ অনুভব করলেও তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহকালীন প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। নানা সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আবার এ কথাও সত্যি যে, কিছুটা হলেও এ সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটিয়েছে 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ' এবং 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইন্সটিটিউট'। ইতোমধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে চলচ্চিত্র বিষয়ে বেশ কয়েকটি গবেষণা গ্রন্থ, জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে এবং এই ঋণ সর্বাগ্রে স্বীকার্য। চলচ্চিত্রে গানের অন্যতম দিক হলো এর বিষয় এবং সুর, গায়কি। এ বিষয়ক কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলচ্চিত্র বিষয়ক পড়ালেখা তদুপরি গবেষণা শুরু হয়েছে এবং ক্রমশ এ বিষয়ে সকলের আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটি অবশ্য আশার সঞ্চার করে।

গবেষণাকর্ম পদ্ধতির ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পদ্ধতি (Descriptive Method), ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method), তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method), পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Observation Method) ও ক্ষেত্র সমীক্ষা পদ্ধতি (Field Study Method) ইত্যাদি পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে নিজস্ব মত, বিশ্লেষণ। তথ্যসূত্র সন্নিবিষ্ট করার ক্ষেত্রে শিকাগো পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং এই পদ্ধতির অন্ত্যটীকা বা (Endnotes)-এর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজনের ক্ষেত্রে ছয়টি অধায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে অভিসন্দর্ভটি। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে চলচ্চিত্রে সংগীতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, চলচ্চিত্রে গান বা প্লেব্যাকগীতি এবং কখন থেকে কিভাবে এর সূচনা হলো তার একটি রূপ-রেখা। চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার ও উপযোগিতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এবং বিভিন্ন সমালোচনা এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে গানের প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা। চলচ্চিত্রের গান সাধারণত কাহিনি বা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। ফলে দ্বিতীয় অধ্যায়ে চলচ্চিত্রের ধারা বা জাতি বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র এবং বিষয়ের যে সব গান চলচ্চিত্রের বৃহৎ পরিসর জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে, সে সব গানগুলো ব্যবহারের কারণ ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গানের বিষয়বৈচিত্র্যে ৩০ টি নির্বাচিত বিষয়সহ মোট ২৬ টি পর্বে অধ্যায়টি আলোচিত হয়েছে। এতে উঠে এসেছে গ্রামীণ ও লোকজ গানের ধারার মধ্যে যথাক্রমে−প্রেম-বিরহ-বেদনার গান, অভিমানের গান, নায়ক-নায়িকার উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গান, নারী-পুরুষের বাদ-প্রতিবাদের গান, সই-সখীর গান, দোস্ত-বন্ধুর গান, বিবাহ সংক্রান্ত গানের মধ্যে−গায়ে হলুদের গান, বিয়ের গান, বাসর ঘর তৈরির গান, বাসর রাতের গান প্রভৃতি। এছাড়াও রয়েছে ব্যঙ্গাত্মক বা হাস্যরসের গান, সাপুড়ে বা সর্প বিষয়ক গান, বিবেকের গান, আধ্যাত্মিক চেতনা ও আত্মোপলব্দির গান প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, গানের পর্যায়ক্রমিক ব্যবহার যেমন:নায়ক-নায়িকার একাকী, দ্বৈতাভিনয়ে পরিবেশিত প্রেম-বিরহের পর্যায়ভিত্তিক গানের আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে এই জন্য যে, এর মধ্য দিয়ে ফর্মুলাভিত্তিক গান ব্যবহারের চিত্রটির নমুনা পাওয়া যায়। পরিবারের বাইরে আরেকটি মধুর সম্পর্ক সই-সখী এছাড়া গ্রাম বাংলার চিরায়ত সাংস্কৃতিক উপাদান কালের গহবরে যা বিলীন প্রায় যেমন−সিন্দুক, নাকের নোলক ইত্যাদি আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে গানে গানে উপস্থাপিত হয়েছে।

আধুনিক ধারার গানের মধ্যে–রোমান্টিক গান যা প্রয়োগ ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক, রোমান্টিসিজিমের বৈশিষ্ট্যের আলোকে আলোকিত এবং যা প্রেম, বিরহ-বেদনা ইত্যাদি বিষয়ের মধ্য দিয়ে নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আরও রয়েছে অভিমানের গান, একে অপরের (নায়ক-নায়িকার) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ বা মন জয় করার গান, মনোরঞ্জরমূলক গান, পারিবারিক বন্ধনের গান, জীবনমুখী গান, দেশ-মাতৃকার গান প্রভৃতি। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ের গানের মধ্যে–শিক্ষা প্রসারের গান, শিশুকণ্ঠে মুক্তি ও দেশাত্মবোধের গান, আত্মোৎসর্গের গান, কল্পনার চোখে স্বপ্নপূরণের গান, বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের গান, পাশ্চাত্য বা মাইকেল জ্যাকসন প্রভাবিত গান, দ্রোহ ও মৌন প্রতিবাদের গান, সৃষ্টিকর্তার কৃপা লাভ ও নীরবতা ভঙ্গের গান, স্মৃতি বা স্বজনকে ফিরে পাওয়ার গান, স্ট্রিট সং বা পথের গান, মদ্যপায়ীর গান প্রভৃতি প্রয়োগ ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক কখন কিভাবে তা ব্যবহার করা হয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের গান। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র মাধ্যমের গানের ইতিহাসে এটি বিশেষ সংযোজন। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের গান–দেশাত্মবোধক গান, প্রণোদনামুখী গান, জাগরণের গান, বিজয়ের গৌরব বন্দনার গান, ফ্যাসিবাদ ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের গান, আশা জাগানিয়া গান প্রভৃতি গানের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সাথে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে গানের সুরশৈলী এবং তাতে প্রধানত চার ধরনের সুরের সন্ধান পাওয়া গেছে। ১. লোক সুর/গীতিকা বা পালার সুর ২. আধুনিক সুর ৩. রাগ-রাগিণী কিংবা শাস্ত্রীয় সুর এবং ৪. বিদেশি বা পাশ্চাত্য সুর। বর্ণিত এসব সুরের কারণ ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং কখন কিভাবে কি ধরনের সুর ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি আলোচনাও রয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। এদেশের চলচ্চিত্র মাধ্যমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব এবং কিভাবে এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার একটি রূপ পাওয়া পাওয়া যাবে। এছাড়া আলোচিত হয়েছে গানের গায়কি, উল্লেখযোগ্য শিল্পীর গায়কি প্রসঙ্গ, সাধারণ গান ও চলচ্চিত্র গানের মধ্যে গায়কির পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। এছাড়া ভিনদেশি সুর, গায়কি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গায়কি এবং স্বর প্রক্ষেপণের ধরনানুযায়ী গায়কির বিবর্তনের একটি তালিকা নিরূপণ করা হয়েছে সেই সাথে তাল ও ছন্দ এবং বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে চলচ্চিত্রের গানের একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা। এছাড়া আলোচিত হয়েছে গানের বাণী ও সুর, গানে উপমা কিংবা রূপকের ব্যবহার, অনুকরণ প্রবণতা ও অবক্ষয়ের নানাদিক। তুলে ধরা হয়েছে উল্লেখযোগ্য গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালকের অবদান, শিল্পনৈপুণ্যের নানাদিক।। এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক এবং মাঠ পর্যায়ে সাধারণ দর্শক-শ্রোতাদের। পরিশেষে যুক্ত হয়েছে উপসংহার এবং সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি। গবেষণা গ্রন্থে বানানের ক্ষেত্রে ২০১৬ সালে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত আধুনিক বাংলা অভিধানের বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এবং উদ্ধৃতিগুলোতে পূর্বসূরি লেখকদের নিজস্বরীতি রাখা হয়েছে। গবেষণায় তাঁদের মতকে নানা যুক্তিদ্বারা খণ্ডনের চেষ্টা করা হয়েছে।

চলচ্চিত্র বিষয়ে আগ্রহের সূচনা হয়েছিল বোধকরি বোধ হওয়ার পর থেকেই। কারণ আমার ছোট বেলার অধিকাংশ সময় কেটেছে শিল্পসংস্কৃতির বিবিধ শাখায় পদচারণার মধ্য দিয়ে। এ কথাও সত্যি যে, যেদিন থেকে স্কুলের পড়া ফেলে বাবার কড়া শাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে সিনেমা দেখা হতো এবং রাত জেগে রেডিওর গান শোনার প্রতি প্রবল আগ্রহ জন্মেছিল। বোধকরি সেদিন থেকেই গবেষণাকর্মের এই বিষয়টি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। পড়ালেখার জন্য দিনের কোলাহল পরিহার করে অধিকাংশ সময় অধিক মনোসংযোগের আশায় রাতটাকে বেছে নিয়েছিলাম। রাত গভীর হলে পড়া এবং লেখা ভাল হতো। ছবি দেখতে দেখতে কত রাত যে পার হয়ে গেছে তা বোঝানো কঠিন। দুঃখ জনক হলেও সত্যি যে, যখনই ছবি দেখতাম আর অধিকাংশ সময় কাঁদতাম। কারণ প্রায় প্রতিটি ছবি নির্মিত হয়েছে দর্শককে আবেগে আপ্লুত করার জন্য। যদিও এদেশের মানুষ আগাগোড়াই আবেগ প্রবণ। সেটির পরিচয় পরিচালকও রেখেছেন অধিকাংশ চলচ্চিত্রে। *দেবদাস, শুভদা, চন্দ্রনাথ, রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত সুন্দরী, ভাত দে, দুই পয়সার আলতা* প্রভৃতি ছবি দেখে না কেঁদে পারিনি। গবেষণার সময়কালে এ এক বেদনা-মধুর অভিজ্ঞতা যা সত্যিই মনে রাখার মত। এবং এ এক বাঙালি জীবনবোধের গভীরতর উপলব্ধিতে নিজেকে ফিরে পাওয়া।

গভীর শ্রদ্ধার সাথে ঋণ স্বীকার করছি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের নিকট শ্রদ্ধেয় ড. মহসিনা আক্তার খানম (লীনা তাপসী খান)। যাঁর বিশেষ তত্ত্বাবধায়ন এবং অশেষ আন্তরিকতায় আমার গবেষণাকর্মটি সমাপ্তি লাভ করছে। স্মরণ করছি সংগীত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি স্বর্গীয় ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তীকে স্যারকে। যিনি উক্ত বিষয়ে গবেষণা করার ইচ্ছা-প্রকাশে আগ্রহের সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছিলেন। আজকের এই দিনে স্যারের কথা ভীষণ মনে পড়ছে। স্যারের অকাল প্রয়াণে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন শ্রদ্ধেয় রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা আপা। ঐ সময়ে সংগীত বিভাগের একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তিনি। কিন্তু তিনিও বিভাগ পরিবর্তন করায় অপারগতা প্রকাশ করেন। তাঁর প্রতিও রইলো অশেষ কৃতজ্ঞতা। তবে এই ক্রান্তিকাল উত্তরণে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন আমার বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক। সুতরাং এই কৃতজ্ঞতা অমলিন, সবার্গ্রে স্বীকার্য।

গবেষণা সমাপ্তিকালের এই শুভক্ষণে স্মরণ করছি আমার আরেক বিদ্যাপিঠ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নাট্যাচার্য ড. সেলিম আলদীন স্যার এবং তাঁর সহধর্মিনী বেগমজাদী মেহেরুন্নেসা ম্যাডামকে। দুজনই আজ না ফেরার দেশে। এই সময়ে খুব মনে পড়ছে তাঁদের। স্মরণ করছি শ্রদ্ধার সঙ্গে অধ্যাপক ড. আফসার আহমদ, অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমান, অধ্যাপক ড. রশীদ হারুন, অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম, ড. সোমা মুমতাজ, ড. ইউসুফ হাসান অর্ক এবং ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক আহমেদ রেজা স্যারকে। এবং সেই সাথে স্মরণ করছি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ শিক্ষাজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে যাঁদের স্নেহ ভালোবাসা এবং আর্শীবাদ জড়িয়ে আছে তাঁদের।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চলাকালীন সময়ে যাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য এবং অনুপ্রাণিত করেছেন তাদের মধ্যে ড. সাজাহান মিয়া, দর্শন বিভাগ ঢাবি এবং তার সহধর্মিনী রোকেয়া হলের হল সুপার মমতাজ শিরিন আপা। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক স্যার। বন্ধু প্রতীম বড় ভাই ড. সাইম রানা বিভিন্ন সময়ের দুলর্ভ পরামর্শ এবং তাঁর সহধর্মিনী নুরুন্নাহার লিপি ভাবির, উৎসাহ-অনুপ্রেরণার কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। সংগীত বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা স্বরাজ দেব, রেজিস্ট্রারের অফিসের সহকারী রেজিস্ট্রার (শিক্ষা-১) জনাব মোহাম্মদ মোজ্জাম্মেল হক, সেকশন

অফিসার জনাব মো. ইউনুস আলী (শিক্ষা-১), হিসাব পরিচালকের অফিসের সহকারী হিসাব রক্ষক জনাব খন্দকার মঈন উদ্দিন আহমেদসহ আরো অনেকে যাঁরা নানাবিধ দাপ্তরিক কাজে সহায়তা করেছেন তাদের প্রতিও বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সংগীত বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব টুম্পা সমদ্দার, সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দের প্রতি।

বিশেষভাবে ঋণ স্বীকার করছি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সাবেক মহাপরিচালক জনাব ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, কর্মকর্তা জনাব ফকরুল হাসান সোহাগ, সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান, লাইব্রেরিয়ান জনার নজরুল ইসলাম-এর প্রতি। বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি সুরকার, সংগীত পরিচালক ও বাংলা খেয়ালের জনক শ্রদ্ধেয় আজাদ রহমান, সুরকার ও সংগীত পরিচালক আলী হোসেন, বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী, জনাব মো. খুরশীদ আলম, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসকার জনাব অনুপম হায়াৎ প্রমুখ। এঁদের সহযোগিতা ও আন্তরিকতা কোনো দিন শোধ করবার নয়, সর্বাগ্রে স্বীকারযোগ্য। এবং বিভিন্ন সময়ে তথ্য দিয়ে সহায়তা করার জন্য চলচ্চিত্র গবেষক মীর শামছুল আলম বাবু ও আসলাম আহসানকে ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞতার পাশে চির আবদ্ধ–বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, আগারগাঁও। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইন্সটিটিউট, দারুস সালাম রোড, ঢাকা। বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার, আগারগাঁও। নীলুফার ইয়াসমীন স্মৃতি পাঠাগার, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

এই গবেষণার জন্য যাঁদেরকে আমি বিশেষভাবে বঞ্চিত করেছি বিভিন্নভাবে। বিশেষ করে আমার বাবা-মা, তাদের জন্যে সন্তান হিসেবে কিছুই করতে পারিনি কেবল বঞ্চিত ছাড়া। তাঁদের অসীম ত্যাগ, স্নেহ, ভালোবাসায় আমার এ বিশেষ কর্ম অনুপ্রেরণা। ছোট ভাই রাকিব হাসান অনেক আদর পাবার যোগ্যতা রাখে তার জন্য কিছু করা হয়নি। এই অপারগতা বিশেষভাবে পীড়া দেয় আমাকে। এছাড়া অন্যান্য বোনদের প্রতিও আমার একই অনুভূতি। বিশেষভাবে ঋণী হয়ে রবো আজীবন আমার বড় বোন রৌশন শরীফ, বোন জামাই মো. শরীফ উদ্দিন-এর নিকট। যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, অসীম স্নেহ ভালোবাসায় আমার এ গবেষণাকর্মটি সমাপ্তির মুখ দর্শন করছে। আদরের ভাগ্নে রাসেল রাব্বী, গবেষণা চলাকালীন সময়ে বিবিধ বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় দুর্লভ পরামর্শ দিয়ে বিশেষভাবে উপকৃত করেছে এবং ভাগ্নি সামিয়া শরীফ শুচি অনেক কষ্ট সহ্য করেছে এবং প্রতিনিয়ত তাগিদ দিয়েছে কর্মটি সম্পন্ন করার জন্য, তাকে ধন্যবাদ। বড় ভাই এ. এস. এম. মোস্তাফিজুর রহমান যিনি আমার সম্পর্কে কোনদিন কোন কটূক্তি বা নেতিবাচক কোন শব্দ উচ্চারণ করেছেন বলে মনে পড়ে না, কেবল প্রশংসা ব্যতীত। মেজ ভাই এ. টিম. এম. জহির রায়হান, যাঁর কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয় সব মহলে যিনি আমার গুণের কথাই উপস্থাপন করে থাকেন।

এছাড়া যাঁরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে বিভিন্ন সময়ে ডা. শামীমা পলি, ডা. রেজওয়ানা শারমিন, শামসুন্নাহার, তাসলিমা, মিউজিক কম্পোজার ইফতেখার আনোয়ার উপল ভাই, বন্ধু প্রতীম দাদা স্বীকৃতি প্রসাদ বড়ুয়া, বন্ধু হাবিবুর রহমান হাবিব, আমেরিকা প্রবাসী বন্ধু শহীদ মিলন, বন্ধু মাসুকুল হক মুরাদসহ আরো অনেকে। গবেষণা চলাকালে যারা আমার নিত্যদিনের কর্ম কষ্টের সাক্ষী এবং সঙ্গ দিয়ে প্রাণ যুগিয়েছেন বার বার বিশেষত বিকেলের হাঁটার সময় অশোক কুমার দেবনাথ, আরিফুর রহমান মিলন এবং কর্মটি সম্পাদনে আরো যাঁরা বিভিন্নভাবে উৎসাহ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাদের প্রতি চির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এ. বি. এম. রেজাউল রিপন
পিএইচ.ডি.গবেষক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ১-৯

চলচ্চিত্রে সংগীতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

চলচ্চিত্রে গান বা প্লেব্যাকগীতি ৫

চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার ও উপযোগিতা ৬

দ্বিতীয় অধ্যায় ১০-২০

চলচ্চিত্রের ধারা বা জাতি বিচার

সামাজিক চলচ্চিত্র ১০

সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র ১১

লোককাহিনি ও রূপকথাভিত্তিক চলচ্চিত্র ১৫

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ১৬

(ইতিহাস ও গণ-আন্দোলনভিত্তিক চলচ্চিত্র)

মিউজিক্যাল মুভি বা সংগীতনির্ভর চলচ্চিত্র ১৭

শিশুতোষ চলচ্চিত্র ১৮

অ্যাকশনধর্মী সামাজিক চলচ্চিত্র ১৯

পোশাকি বা ফ্যান্টাসি চলচ্চিত্র ১৯

তৃতীয় অধ্যায় ২১-২১৬

চলচ্চিত্রে গানের বিষয়বৈচিত্র্য

এক. লোকজ গান/গীতিকা বা পালার গান ২৮

১. প্রেমের গান ২৯

২. বিরহ-বেদনার গান ৪৪

৩. অভিমানের গান ৫৬

৪. নারী-পুরুষের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গান ৫৮

৫. নারী-পুরুষের বাদ-প্রতিবাদের গান ৬১

৬. সই/সখীদের গান ৬৫

৭. দোস্ত/বন্ধুর গান ৬৯

৮. বিবাহ সংক্রান্ত গান ৭০

ক. গায়ে হলুদের গান ৭০

খ. বিয়ের গান ৭৩

গ. বাসর ঘর তৈরির গান ৭৬

ঘ. বাসর রাতের গান ৭৬

৯. ব্যঙ্গাত্মক বা হাস্যরসের গান ৭৭

১০. সাপুড়ে বা সর্প বিষয়ক গান ৮১

১১. বিবেকের গান ৮৫

১২. আধ্যাত্মিক চেতনা ও আত্মোপলব্দির গান ৯৭

দুই. আধুনিক ধারার গান

১. রোমান্টিক গান ১০১
ক. প্রেম ১০৭
(নারী হৃদয়ের শাশ্বত প্রেমের গান) ১১৬
খ. বিরহ ১৩২
(চিঠি পত্রে বিরহ-বেদনার গান) ১৪০
২. অভিমান ১৪১
৩. একে অপরের (নায়ক-নায়িকার) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ বা মন জয় করার গান ১৪৫
৪. মনোরঞ্জনমূলক গান ১৪৯
ক. আসরকেন্দ্রীক পরিবেশিত মনোরঞ্জনের গান ১৫০
খ. পার্টি বা ক্লাবে পরিবেশিত মনোরঞ্জনের গান ১৫৯
৫. পারিবারিক বন্ধনের গান ১৬৪
ক. মাতৃত্ববোধের গান ১৬৭
খ. মাতৃভক্তি ও মাতৃবন্দনার গান ১৭২
গ. পারিবারিক বিচ্ছেদের গান ১৮০
৬. জীবনমুখী গান ১৮২
৭. দেশ-মাতৃকার গান ১৮৪
ক. স্বাধীনতার গান ১৮৪
খ. দেশাত্ববোধক গান ১৮৬
গ. ভাষার গান বা প্রভাতফেরির গান ১৮৭
ঘ. মুক্তির গান ১৮৭
ঙ. বিদ্রোহী চেতনার গান ১৮৮
চ. কৃষক বিদ্রোহের গান ১৮৯

অন্যান্য বিষয়ের গান ১৯০-২১০

১. শিক্ষা প্রসারের গান
২. শিশুকণ্ঠে মুক্তি ও দেশাত্ববোধের গান ১৯২
৩. আত্মোৎসর্গের গান ১৯৫
৪. কল্পনার চোখে স্বপ্নপূরণের গান ১৯৬
৫. বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের গান ১৯৭
৬. পাশ্চত্য বা মাইকেল জ্যাকসন প্রভাবিত গান ২০০
৭. দ্রোহ ও মৌন প্রতিবাদের গান ২০০
৮. সৃষ্টিকর্তার কৃপা লাভ ও নীরবতা ভঙ্গের গান ২০১
৯. স্মৃতি বা স্বজনকে ফিরে পাওয়ার গান ২০৬
১০. স্ট্রিট সং বা পথের গান ২০৭
১১. মদ্যপায়ীর গান ২১০

চতুর্থ অধ্যায় **২১৭-২৩০**

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের গান

১. দেশাত্মবোধক গান ২২০

২. প্রণোদনামুখী গান ২২২

৩. জাগরণের গান
২২৪

৪. বিজয়ের গৌরব বন্দনার গান ২২৪

৫. ফ্যাসিবাদ ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের গান ২২৭

৬. আশা জাগানিয়া গান ২২৮

পঞ্চম অধ্যায় **২৩১-২৬৮**

চলচ্চিত্রে গানের সুরশৈলী

গ্রামীণ বা লোক সুর/গীতিকা বা পালার সুর ২৩৪

(আধুনিক উপস্থাপনায় লোক সুরের গান) ২৩৭

আধুনিক সুর ২৩৯

শাস্ত্রীয় কিংবা রাগ-রাগিণী সুর ২৪২

বিদেশি বা পাশ্চাত্য সুর ২৪৪

গায়কি ২৪৫

উল্লেখযোগ্য শিল্পীর গায়কি প্রসঙ্গ ২৪৭

সাধারণ গান ও চলচ্চিত্র গানের মধ্যে গায়কির পার্থক্য ২৫৫

ভিনদেশী সুর, গায়কি প্রসঙ্গ ২৫৬

সুর, গায়কি বিবর্তনের তালিকা ২৫৮

তাল ও ছন্দ ২৬৪

বাদ্যযন্ত্র ২৬৫

ষষ্ঠ অধ্যায় **২৬৯-২৯৫**

চলচ্চিত্রের গান : একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

গানের বাণী ও সুর ২৭৪

গানে উপমা কিংবা রূপকের ব্যবহার ২৭৬

গানে অনুকরণ প্রবণতা ও অবক্ষয় ২৭৭

উল্লেখযোগ্য গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালকের উল্লেখযোগ্য গান প্রসঙ্গ এবং সাক্ষাৎকার ২৭৮/২৮৬

সামাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের চলচ্চিত্র এবং এর গান শোনার অভিজ্ঞতামূলক সাক্ষাৎকার ২৯০

উপসংহার **২৯৬-২৯৮**

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি **২৯৯-৩০৫**

অ্যাবস্ট্রাক্ট

পিএইচ.ডি.গবেষণার শিরোনাম: **বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে গানের বিষয়বৈচিত্র্য ও সুরশৈলী**

নানাবিধ শিল্প সমাহারে চলচ্চিত্র মাধ্যমের প্রকাশ। অনেকগুলো শিল্পের মধ্যে সংগীত হলো চলচ্চিত্রের অপরিহার্য একটি অংশ। সংগীতে রয়েছে তিনটি দিক এক. আবহসংগীত বা ইফেক্ট মিউজিক দুই. ব্যাক গ্রাউন্ড মিউজিক বা নেপথ্যসংগীত তিন. এবং কণ্ঠসংগীত বা এর গান। চলচ্চিত্রের সবাক যুগের প্রথম অর্থাৎ গান সংযোগের সূচনালগ্ন থেকে বহুসংখ্যক গান ব্যবহার ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। প্রয়োজনের চেয়ে দর্শকের চাহিদা পূরণই ছিল এর অন্যতম কারণ। এবং এর ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ধারার চলচ্চিত্র নির্মিত হলেও গান ছাড়া এদেশে চলচ্চিত্র কল্পনাতীত। দর্শক দেখতে খুব বেশি আগ্রহবোধ করে না বললেই চলে। ফলে চলচ্চিত্রে গান আজ অবধি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এবং তা সারা পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করছে। বিশেষত হিন্দি চলচ্চিত্রের দিকে তাকালে তা স্পষ্ট হয়। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, জনপ্রিয় এমন একটি বিষয়ের তেমন কোনো গবেষণা নেই বা এর প্রয়োজনীয়তা, প্রয়োগ ও সীমা এ বিষয়টিও প্রায় সকলের অগোচরে রয়ে গেছে। প্রয়োগ বাহুল্যজনিত কারণে নানাবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন তদুপরি অস্তিত্ব সংকটেও পড়েছে এই গান।

ফলত সব দিক বিবেচনায় উক্ত বিষয়ে গবেষণা করার তাড়না অনুভূত হয় এবং তা বিশেষভাবে দাবী রাখেও বটে। উপরোক্ত বিষয় নির্ণয়ের লক্ষ্যে গবেষণায় বর্ণিত হয়েছে চলচ্চিত্রে সংগীতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, চলচ্চিত্রে গান বা প্লেব্যাকগীতি এবং কখন থেকে কিভাবে এর সূচনা হলো তার একটি রূপ। তদুপরি চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার ও উপযোগিতার প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা। চলচ্চিত্রের ধারা বা জাতি বিশ্লেষণপূর্বক উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র এবং এর যে সব গান চলচ্চিত্রের বৃহৎ পরিসর জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে, সে সব গানগুলো ব্যবহারের কারণ ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গানের বিষয়বৈচিত্র্যে ৩০ টি নির্বাচিত বিষয়সহ মোট ২৬ টি পর্বে অধ্যায়টি আলোচিত হয়েছে। এতে উঠে এসেছে গ্রামীণ ও লোকজ গানের ধারার মধ্যে যথাক্রমে–প্রেম-বিরহ-বেদনার গান, অভিমানের গান, নায়ক-নায়িকার উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গান, নারী-পুরুষের বাদ-প্রতিবাদের গান, সই-সখীর গান, দোস্ত-বন্ধুর গান, বিবাহ সংক্রান্ত গান–গায়ে হলুদের গান, বিয়ের গান, বাসর ঘর তৈরির গান, বাসর রাতের গান, ব্যঙ্গাত্মক বা হাস্যরসের গান, সাপুড়ে বা সর্প বিষয়ক গান, বিবেকের গান, আধ্যাত্মিক চেতনা ও আত্মোপলব্দির গান প্রভৃতি।

আধুনিক ধারার গানের মধ্যে–রোমান্টিক গান; প্রয়োগ ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক, রোমান্টিসিজিমের বৈশিষ্ট্যের আলোকে আলোকিত এবং যা প্রেম, বিরহ-বেদনা ইত্যাদি বিষয়ের মধ্য দিয়ে নানাভাবে উপস্থাপিত তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আরও রয়েছে অভিমানের গান, একে অপরের (নায়ক-নায়িকার) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ বা মন জয় করার গান, মনোরঞ্জরমূলক গান (আসরকেন্দ্রীক এবং পার্টি বা ক্লাবে পরিবেশিত গান), পারিবারিক বন্ধনের গান, জীবনমুখী গান, দেশ-মাতৃকার গান, এছাড়া অন্যান্য বিষয়ের গানের মধ্যে–শিক্ষা প্রসারের গান, শিশুকণ্ঠে মুক্তি ও দেশাত্ববোধের গান, আত্মোৎসর্গের গান, কল্পনার চোখে স্বপ্নপূরণের গান, বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের গান পাশ্চাত্য বা মাইকেল জ্যাকসন প্রভাবিত গান, দ্রোহ ও মৌন প্রতিবাদের গান, সৃষ্টিকর্তার কৃপা লাভ ও নীরবতা ভঙ্গের গান, স্মৃতি বা স্বজনকে ফিরে পাওয়ার গান, স্ট্রিট সং বা পথের গান মদ্যপায়ীর গান প্রভৃতি প্রয়োগ ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক কখন কিভাবে তা ব্যবহার করা হয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত

আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বর্ণিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের গান–যা দেশাত্মবোধক গান, প্রণোদনামুখী গান, জাগরণের গান, বিজয়ের গৌরব বন্দনার গান, ফ্যাসিবাদ ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের গান, আশা জাগানিয়া গান প্রভৃতি গানের মধ্য দিয়ে বিস্তার লাভ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সাথে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে, সে সম্পর্কে একটি আলোচনা রয়েছে।

শৈলী বলতে সাধারণত রীতি-নীতি, প্রচলন, কায়দা, বিধি বিধান, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ইত্যাদিকে বোঝায়। চলচ্চিত্রে গানের সুরশৈলী নির্ণয় করতে গিয়ে নির্ণিত হয়েছে দীর্ঘকালের ঋদ্ধ প্রচলিত বিবিধ সুরধারা যার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের গান নানা মাত্রিকতায় প্রবাহিত। প্রধানত চার ধরনের সুরের সন্ধান পাওয়া যায়–লোক সুর/গীতিকা বা পালার সুর, আধুনিক সুর, শাস্ত্রীয় বা রাগরাগিণী সুর এবং বিদেশি বা পাশ্চাত্য সুর। বর্ণিত এসব সুরের কারণ ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং কখন কিভাবে কি ধরনের সুর ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি আলোচনাও রয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। সময়ের সাথে সাথে সুর, গায়কির পরিবর্তন, সংযোজন-বিয়োজন ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় আশয়ও উঠে এসেছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ অর্থাৎ কিভাবে এদেশের চলচ্চিত্রের গানকে প্রভাবিত করেছে, প্রসঙ্গক্রমে তার আলোচনাও এসেছে। এছাড়া আলোচিত হয়েছে গানের গায়কি, উল্লেখযোগ্য শিল্পীর গায়কি প্রসঙ্গ, সাধারণ গান ও চলচ্চিত্র গানের গায়কির মধ্যে পার্থক্য, ভিনদেশি সুর, গায়কি, রাগ-রাগিণী, ভাব-রসের ব্যবহার, সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের শেষে গায়কি, স্বরপ্রক্ষেপণ ইত্যাদির বিষয় সমূহের মাধ্যমে বিবর্তনের একটি তালিকা নিরূপণ করা হয়েছে। সর্বোপরি তাল ও ছন্দ এবং বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে গানের বাণী ও সুর, গানে উপমা কিংবা রূপকের ব্যবহার, অনুকরণ প্রবণতা ও অবক্ষয়ের নানাদিক। উল্লেখযোগ্য গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালকের শিল্পনৈপুণ্য, অবদান বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালকবৃন্দের। এছাড়া রয়েছে মাঠ পর্যায়ে সাধারণ দর্শক-শ্রোতাদের সাক্ষাৎকার।

একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, বর্ণিত বিষয়ের গান দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত বিষয় আশয়কে ঘিরে যেমন উপস্থাপিত। তেমনি এর সুর বাংলার প্রচলিত লোকঐতিহ্যিক বিবিধ সুরধারা যেমন-ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি, বারমাসী, কীর্তন, শ্যামাসংগীত, মুর্শিদী, কর্মসংগীত, যাত্রা, গীতিকা, পদাবলী, পুথি, মঙ্গলগীত, বিয়ের গীত, মেয়েলি গীত, বিচ্ছেদী, বাউল গান ইত্যাদি থেকে উপাদান সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহৃত। এবং বিচিত্রতার সমাবেশে উপস্থাপিত। উল্লেখ্য যে, চলচ্চিত্রে গানের বৃহৎ পরিসর জুড়ে প্রেম-বিরহ-বেদনা, অভিমান প্রভৃতি বিস্তার লাভ করেছে। নর-নারীর প্রেম ভালবাসায় রোমান্টিকতার প্রকাশ ঘটেছে–'তোমারে লেগেছে এত যে ভালো' (রাজধানীর বুকে-১৯৬০), আয়নাতে ঐ মুখ দেখবে যখন' (নাচের পুতুল-১৯৭১), 'গানের খাতায় স্বরলিপি লিখে'(স্বরলিপি-১৯৭০) প্রভৃতি গানে। গ্রামীণ এবং লোকজ কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্রে প্রেমের বহিঃপ্রকাশও ঘটেছে নানাভাবে–'পরানে দোলা দিল এ কোন ভ্রমরা'(সুতরা-১৯৬৪), 'গুনগুন গান গাহিয়া নীল ভ্রমরা যায়'(সুজন সখী-১৯৭৫) প্রভৃতি গানে। গানের ভাষায় ছিল নানাবিধ ইশারা ইঙ্গিত। সময়ের সাথে সাথে আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে বিশেষত আশির দশকের মাঝামাঝিতে প্রেমের প্রকাশ ভঙ্গিমায় আসে পরিবর্তন। ইশারা বা ইঙ্গিতের পরিবর্তে হালকা কথা এবং চটুল সুরে গান রচনার প্রবণতা গড়ে ওঠে। যেমন: 'আইলো দারুণ ফাগুনরে লাগলো মনে আগুন রে একা একা ভালো লাগেনা' (চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা-১৯৮৪) অথবা 'আমি একদিন তোমায় না দেখিলে তোমার মুখের কথা শুনিলে পরান আমার রয়না পরানে' (নয়নের আলো-১৯৮৪) প্রভৃতি গান।

ক্রমশ নগরায়ণ এবং জীবন-জীবিকার কঠিন সংগ্রামে প্রিয় স্ত্রীকে রেখে দূর-দূরান্তে পাড়ি জমানোর নজির রয়েছে বহুকাল থেকে এবং বর্তমান সময়েও তা অব্যহত। এতে একাকী নারীর অন্তর জুড়ে বেদনা ঘনীভূত হয় তার রূপ নির্ণিত হয়েছে এভাবে–'বিদেশ গিয়া বন্ধু তুমি আমায় ভুইল না' (উজানভাটি-১৯৮২) এবং নারীর ন্যায় পুরুষেরও পরান কান্দে তার প্রিয় স্ত্রীর জন্য তার স্বরূপ নির্ণয়ে–'ওরে নীল দরিয়া আমায় দেরে দে ছাড়িয়া'(সারেং বৌ-১৯৭৮) প্রভৃতি গান ব্যবহৃত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এক সময় একান্নবর্তী বা যৌথ পরিবার কাঠামোর সংস্কৃতিতে আঘাত হানে। তা রোধকল্পে গান তার নানা পরিসর নিয়ে হাজির হয়। সমাজ ও পারিবারিক জীবনের আনন্দ-বেদনার কথকতার প্রকাশ প্রচলন গড়ে ওঠে। এই গান পারিবারিক জীবন-সংসারে নানা সম্পর্ককে ঘিরে নানা বন্ধনে আবর্তিত। তারমধ্যে অন্যতম হলো 'মা' পরিবারের শীর্ষে যার অবস্থান। মা-বাবাকে ঘিরে যেমন বংশ বিস্তার তদ্রুপ গানেও বিশেষত মাকে ঘিরে নানা গান পরিবেশিত হতে থাকে। 'মায়ের মত আপন কেহ নাই'(দিন যায় কথা থাকে-১৯৭৯), 'মাগো তোর চরণ তলে বেহেশত আমার'(মতিমহল-১৯৭৭) প্রভৃতি। এছাড়া নারীর মাতৃত্ববোধ, মাতৃবন্দনা, বিবাহ বিচ্ছেদ, শাশ্বত প্রেম ইত্যাদিরও প্রকাশ রয়েছে নানা মাত্রিকতায়। মাতৃত্ববোধের আকাঙক্ষায়–'একটা দোলনা যদি কাছে পেতাম'(এখনই সময়-১৯৮০), অথবা 'নজর লাগব বলে কপালে টিপ দিয়া দিলাম মাগো'(লাল কাজল-১৯৮২) প্রভৃতি।

সহায় সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে স্বার্থপরতা, পারিবারিক কলহ বিবাদের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে বিবেক বর্জিত হওয়ার ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে সমাজে। ফলত বিবেকবোধ প্রতিষ্ঠায়, আশার সঞ্চারণে, আধ্যাত্মিক চেতনা প্রভৃতির লক্ষ্যে বিবেকের গান ব্যবহৃত হয়েছে–'ঢেউ উঠছে সাগরে রে, ক্যামনে পাড়ি ধরি রে'(রূপবান-১৯৬৫), 'তোর চোখ থেকে তুই অন্ধ কেন, ডাকিস অবেলায়, খাঁচার পাখি বাঁধন কেটে যায়'(অবাঞ্ছিত-১৯৬৯), 'পৃথিবী তোমার কোমল মাটিতে কেন এতো সংঘাত' (দীপ নেভে নাই-১৯৭০) 'মায়ায় গড়া এই সংসারে কেই আসে যায়রে ফিরে মিছে কেন কাঁদিসরে নদীর কিনারায়'(বেদের মেয়ে জোস্না-১৯৮৯)। পরবর্তীতে এই গান আত্মোপলব্ধির উন্নয়নে রচিত হতে থাকে–'এই পৃথিবীর পান্থশালায় গাইতে গেলে গান' (*যোগ বিয়োগ*-১৯৭০),'সবাই বলে বয়স বাড়ে আমি বলি কমেরে'(ফকির মজনু শাহ-১৯৭৮), 'ভবের এই খেলা ঘরে খেলে সব পুতুল খেলা, জানি না এমন খেলা ভাঙ্গে কখন কে জানে'(ঝিনুক মালা-১৯৮৫) প্রভৃতি।

কাহিনির সূত্রধরে চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর পরিস্থিতি তুলে ধরার প্রয়াসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান ব্যবহৃত হয়েছে। সুভাষ দত্ত পরিচালিত *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* (১৯৭২) চলচ্চিত্রে দেখা যায় 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' গানটি বেতারে প্রচারিত হয় এবং মুক্তিযোদ্ধারা তা কান পেতে শোনে। এই গান প্রচারের পরপরই শুরু হয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ যা যুদ্ধজয়ের লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস এবং শক্তি জোগাতে অপরিসীম ভূমিকা রাখে। যুদ্ধপরবর্তী দেশে পুরুষ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও নারীর পরিচয় কি হবে? যারা সম্ভ্রম দিয়ে, জীবন বাজি রেখে নানাবিধ ছলনার আশ্রয়ে পাকিস্তানিদের জন্য মরণ ফাঁদ তৈরি করেছিল যার সাধ্য মত। যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণকারী ১১জন মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে চাষী নজরুল ইসলাম নির্মাণ করেন *ওরা ১১ জন* (১৯৭২) চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিতে তারই মীমাংসিত রূপ প্রতিফলিত হয়। যুদ্ধ শেষে স্বাধীন দেশের সমাজে ধর্ষিত নারীদের পরিণতি কি হবে। চলচ্চিত্রের শেষে পরিচালক এমনই এক প্রশ্নের মুখাপেক্ষী করে দর্শক শ্রোতাদের। এ এক মহাকাব্যিক ব্যাখ্যার উপস্থাপন যেন।

চলচ্চিত্রে দেখা যায় মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন দেশে পৌঁছেছেন এবং পাকিস্তানি বাঙ্কার থেকে ধর্ষিত মেয়েরা একে একে বেরিয়ে আসছে। লং শটের মাধ্যমে তা দেখানো হয়। মুক্তিযোদ্ধা খসরুর প্রেমিকা শীলা (নূতন) পাকিস্তানিদের হাতে লাঞ্ছিতা হয়। তার প্রাণ খসরুর কোলে এসে ঝরে পড়ে। প্রিয়জনের নিথর দেহ দু'হাতে কোলে তুলে যখন খসরু সম্মুখ পানে দুঃখ ভারাক্রান্ত শরীরে অগ্রসরমান, তখন বাংলার আকাশ বাতাস গভীর বেদনায় যেন অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে বিজয়ের আনন্দ এরং গৌরববোধ অনুভূত হয় যেন প্রবলভাবে–'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে, বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলব না।' গানটি পরিবেশনার মাধ্যমে।

জমিদার বা ধনিক শ্রেণির বিনোদন মাধ্যম ছিল আসরকেন্দ্রীক পরিবেশিত বাইজির গান ফলে তার চিত্র রূপায়ণে ব্যবহৃত হয়েছে–'বেদরদী তুমি রসিকের কদর জানো না, 'মিনতিরে পায় ঢালো প্রেম জানো না'(নবার সিরাজদ্দৌলা-১৯৬৭) 'মন তুমি কেড়ে নিলে এ কি বিষম দায়রে' (অবাঞ্ছিত-১৯৬৯) অথবা 'আমি বাজুবন্ধ হলাম না ঝুমকা চুরি হলাম না' (শুভদা-১৯৮৬) প্রভৃতি। তবে ধীরে ধীরে আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে এই গান ক্রমশ রূপ বদল করে পার্টি বা ক্লাবে স্থান করে করে নেয়। হারমোনিয়াম, তবলার বদলে পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র গিটার, কিবোর্ড ড্রামস ইত্যাদির সহযোগে গান পরিবেশিত হতে দেখা যায়। গানের ভাষা এবং সুরে ইশারা বা ইঙ্গিতের পরিবর্তে খোলামেলা কথা এবং যৌন আবেদন কিংবা নিছক বিনোদনই যেন মূল উদ্দেশ্য হয়ে ধরা দেয়–'ও ডার্লি ফুল তো ঝরে যাবে, দিনতো চলে যাবে, মিছে কেন ভাবনা, তুমিও তো থাকবে না, (মাসুদ রানা-১৯৭৪) অথবা 'টাকার খেলা বড় খেলা রূপের খেলা খোলামেলা' (সত্য মিথ্যা-১৯৮৯) প্রভৃতি গানে। আইটেম সং নাম ধারণ করে এই গানের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে অশ্লীতার প্রবেশ ঘটে। ধীরে ধীরে বিনোদন মাধ্যমের দুয়ার প্রসার এবং প্রতিযোগিতার বাজারে এদেশের চলচ্চিত্র টিকে থাকতে না পারায় একশ্রেণির অসাধু প্রযোজক, পরিচালক দর্শককে হলমুখী করতে গানে অশ্লীল কথা, চটুল সুরের আশ্রয় নেয়। রচিত হয় অশ্লীল যৌন আবেদনে ভরপুর গান। ফলে গান তার অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয় চলচ্চিত্রের এই কালো অধ্যায়। এক্ষেত্রে ভিনদেশি সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এবং তাতে আমার নিজস্ব সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ধরে রাখার অন্যতম প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়। (ঢাকা'৮৬-১৯৮৮) চলচ্চিত্রের গানটিতে চিরায়ত বাঙালি হৃদয়ের গভীর আর্তি ধ্বনিত হয় এভাবেই–'আউল বাউল লালনের দেশে, মাইকেল জ্যাকশন আইলোরে...আমার সাধের দোতারা কান্দেরে।'

গানের প্রয়োগ ভাবনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রথম দিকে বিবিধ বিষয়ের গান দেখা গেলেও ধীরে ধীরে তা ফর্মুলাভিত্তিক ব্যবহারে পরিণত হয়। ফলে ফর্মুলাভিত্তিক চলচ্চিত্রের কাহিনি বা গল্পের সাথে সাথে গানের বিষয় কিংবা ব্যবহারও একই দিকে ধাবিত হয়। একটি দুটি প্রেমের গান, বিরহ-বেদনা অথবা অভিমানের গান এবং মনোরঞ্জনমূলক গান বা আইটেম সং ইত্যাদি দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হতে দেখা যায়। বিবেকের গান সই কিংবা সখীর, পারিবারিক বন্ধনের গান ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের গান ক্রমশ লোপ পেতে থাকে। বিবেকবাধ জাগ্রত করার প্রয়াসে যাত্রাপালার বিবেকের গানও বিশেষ স্থান তৈরি করেছিল কিন্তু ক্রমশ এই গান উপস্থাপনা ভঙ্গিমায় পরিবর্তন এবং রূপ বদল করে অনেকটা আত্মোপলব্ধির দিকে যাত্রা করে। এবং তা বিবেকের গানেরই অনুরূপ বলা যায়।

চলচ্চিত্রের বিষয় কিংবা কাহিনি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিষয়ের প্রভাবে গড়ে ওঠে। তাই কখনো মনের তাগিদে কখনো অস্তিত্ব সংকটের নিরসনকল্পে, টিকে থাকার লড়াইয়ের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে আবার কখনো ব্যবসায়িক সাফল্য লাভের আশায় প্রচলিত জনপ্রিয় উপাদানও

চলচ্চিত্রের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কারণ চলচ্চিত্র নির্মাণের পেছনে শিল্পের তাগিদ থাকলেও ব্যবসায়িক দিকটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারণ এখানে বড় অংকের অর্থ লগ্নির প্রয়োজন হয় যা শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়িক দিকে গড়ায়। তাই চলচ্চিত্রের কাহিনি, গানের বিষয়, সুর ইত্যাদি নির্বাচন এবং রচনার ক্ষেত্রেও উক্ত বিষয়ের প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে ভিনদেশি কিংবা ওপার বাংলার চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় কাহিনি বা বিষয় কিংবা গান এদেশের চলচ্চিত্র প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেনি। এমনকি ফর্মূলাভিত্তিক গান প্রয়োগ ভাবনা থেকে বের হতে পারেনি। সেই সাথে গানে অনুকরণ প্রবণতা ও অক্ষয়ের নানাদিক লক্ষ করা যায়। যে কারণে প্রচুর সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে এদেশের চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী-কলাকুশলী প্রমূখ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে।

এই ভূ-খণ্ডের মানুষ সূচনা লগ্ন থেকেই নানাবিধ রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দু'শো বছরের বৃটিশ শাসনের অবসান হয় এরপর শুরু হয় পাকিস্তানি শাসন। ১৯৫২ সালে ভাষার জন্য প্রাণ দেয়ার এক মর্মান্তিক ইতিহাস রচনা করে এই পাকহানাদার বাহিনী। এর পরও ক্ষান্ত হয়নি পাকিস্তানি চক্রান্ত। নয় মাস আত্মক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে এদেশ স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই দীর্ঘ সময়ের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ফলে নানা বিষয়ে বঞ্চিত হয়েছে এ দেশের মানুষ, শিক্ষা-দীক্ষা অভাবে ধর্মীয় কুসংস্কারে জড়িয়ে পড়েছে। তার প্রভাব পড়েছে শিল্প-সংস্কৃতিতেও। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ কলকাতায় ১৯৩৫ সালে *ভাগ্যচক্র* চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্লেব্যাকগীতি শুরু হয়েছে আর আমাদের এই বঙ্গে *মুখ ও মুখোশ* সবাক চলচ্চিত্র শুরু হয় ১৯৫৬ সালে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের কথা তো অনেক পরে পশ্চিমবঙ্গ থেকেও এদেশ অনেক পিছিয়ে।

তবুও নানা প্রতিবন্ধকতার ভেতর দিয়ে নির্মিত হয়েছে এদেশের চলচ্চিত্র। ফলে কারিগরি দক্ষতার অভাব তো আছেই সাথে বিভিন্ন রকমের অসংগতি রয়েছে চলচ্চিত্র নির্মাণ কলায়। আবার সেগুলোকে চলচ্চিত্রের মধুর ভুল বলেও আখ্যায়িত করা যেতে পারে। শিল্পের সমালোচনায় হয়তো এ ধরনের ব্যাক্যালাপের কোন সুযোগ নেই কিন্তু বাস্তবিক অর্থে এর একটা আবেগ মূল্য থাকা উচিত বলে মনে হয়। চলচ্চিত্র হলো প্রযুক্তি নির্ভর একটি গণমাধ্যম। যার পুরোটাই ধারণ করা হয় প্রযুক্তির এক অভিনব কৌশলে। কারিগরি বিবেচনায় উন্নত বিশ্বের চলচ্চিত্রের পাশে আমাদের চলচ্চিত্র হয়তো পরিপুষ্ট নয়। কিন্তু এই চলচ্চিত্রশিল্প এদেশের মানুষের কাছে সান্ত্বনা এবং আর্শীবাদ। কারণ যে দেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে অস্তিত্ব সংকটে সংগ্রামরত; সে দেশের মানুষের শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে ভাবনার অবকাশ কোথায়? এ ভাবনা এক আশ্চর্য ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার নানা রকমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা শিল্পের অন্যতম অনুপ্রেরণা বা উৎস এ কথাও স্মরণযোগ্য। গানের বিষয় এবং সুরকে সামনে রেখে গবেষণায় বেশ কটি বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। চিরায়ত বাঙালির সমাজ ও পারিবারিক জীবন চিত্রের বাস্তবতা যদিও কখনো বা কল্পনার আশ্রয়ে নির্মিত। তবে তাতে ইতিহাস, রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক দর্শনও বিদ্যমান। সর্বোপরি, চলচ্চিত্র নির্মাতা, সুরকার ও সংগীত পরিচালক, নিবেদিত সংগীতশিল্পী, চলচ্চিত্রানুরাগী, গবেষক এবং পাঠকদের যদি কল্যাণে আসে তবেই গবেষণা কর্মটির শ্রম সার্থক।

এ. বি. এম. রেজাউল রিপন
পিএইচ.ডি. গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৮৫/২০১৬-২০১৭ (পুনঃ)
তারিখ: ২৯ মে ২০১৯
সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম অধ্যায়
চলচ্চিত্রে সংগীতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

শিল্পকলার প্রভাবশালী বিনোদন মাধ্যম এবং শিক্ষার অন্যতম উপকরণ হিসেবে চলচ্চিত্রের পরিচিতি বা খ্যাতি রয়েছে। এক প্রকার দৃশ্যমান শিল্পমাধ্যম। চলমান চিত্র তথা 'মোশন পিকচার' থেকে চলচ্চিত্র শব্দটি এসেছে। বস্তু জগতের চলমান ছবি ক্যামেরার মাধ্যমে ধারণ করে বা এনিমিশনের মাধ্যমে কাল্পনিক জগৎ তৈরী করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। এর সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে সাংস্কৃতিক উপাদান। কারিগরী ও প্রযুক্তিনির্ভর হলেও অনেকগুলো শিল্প-সাহিত্য, চিত্রনাট্য, সংগীত, নৃত্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, সংলাপ, ক্যামেরা, লাইট, মেকআপ, ইত্যাদি ধারণ করে চলচ্চিত্র বিকশিত এবং স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। অনেকগুলো শিল্পের মধ্যে সংগীত হলো চলচ্চিত্রের অপরিহার্য একটি অংশ।

চলচ্চিত্র সংগীতে রয়েছে তিনটি দিক এক. আবহসংগীত বা ইফেক্ট মিউজিক দুই. ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বা নেপথ্যসংগীত তিন. এবং কণ্ঠসংগীত বা এর গান। চলচ্চিত্রের শরীরে যে বিষয়টি প্রায় সারাক্ষণ জুড়ে থাকে তা হলো এর আবহসংগীত এবং সিকোয়েন্স মিউজিক। দর্শক মন এক ধরনের আবেশে ডুবে থাকে। অ্যাকশনধর্মী ছবিতে দর্শকের মনে টান টান উত্তেজনা এবং অপলক দৃষ্টি তৈরিতেও সহযোগিতা করে এই সিকোয়েন্স মিউজিক। অপর দিকে চলচ্চিত্রের গতিময়তার সৌন্দর্য বিকাশেও অনন্য ভূমিকা রাখে এর গীতিময়তা। নায়ক-নায়িকার কল্পনা, প্রেমের অঙ্কুরোদগম, বিকাশ, মধুর সঙ্গ, বিরহ-বেদনা অথবা চলচ্চিত্রের মূল বক্তব্য এসবই সংলাপের চেয়ে গানের মাধ্যমেই বেশি প্রকাশিত হয়ে থাকে।

চলচ্চিত্রে সংগীতের উন্মেষ ও বিকাশ

১৮৯৫ সালে ফ্রান্সের লুমিয়ের ব্রাদার্স তাদের নির্বাক ছবির সঙ্গে পিয়ানুর সুর বাজানোর ব্যবস্থা করেন। প্রজেক্টরের বিকট শব্দকে আড়াল করতে এই সংগীত খুব সফল ভূমিকা পালন করে। বস্তুত চলচ্চিত্রে সংগীতের ব্যবহার তখন থেকেই শুরু। নির্বাক যুগে অবশ্য গান ব্যবহার করার সুবিধে ছিল না। তখন কেবলমাত্র নাটকীয় মুহূর্তগুলো তুলে ধরার জন্য বা সাধারণ দৃশ্যের এক ঘেয়েমি দূর করার জন্য অর্কেস্ট্রা ব্যবহার হতো। এ অর্কেস্ট্রা সিনেমা হলের মাইনে করা দল নিয়ে গঠিত। এই রীতি তখন বেশ চালু হয়। গ্রিফিথ এই পদ্ধতি থেকে বের হয়ে একটি নতুন উপায় খুঁজে পেলেন। তিনি বিটোফেন-মোৎসার্ট প্রমুখ সুর বাজিয়ে শ্রোতাদের আকর্ষণের চেষ্টা করলেন।[১] পরে চার্লি চ্যাপলিন ও অন্যান্য চলচ্চিত্রকার উপযুক্ত আবহসংগীত সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তবে নির্বাক যুগের সবচেয়ে ব্যবহৃত *বেটেলশিপ পটেমকিন* (১৯২৫) ছবির আবহসংগীতই বেশি সমাদৃত হয়।

ছবির সঙ্গে কোথায় কোন দৃশ্যে কি সুর সংযোজন করতে হবে তারা ছাপানো স্টাফ নোটেশন অর্থাৎ স্বরলিপি পাঠাতো। ছবি চলাকালীন সময়ে এই স্বরলিপি দেখে বাদ্যযন্ত্রীরা প্রয়োজনানুযায়ী সুর সৃষ্টি করতো। মজার বিষয় হলো একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হলে কিংবা একই সুর বাজানোর প্রয়োজন হলে তা আর এক রকম হতো না। প্রখ্যাত সুরকার ও গায়ক আবদুল আহাদের ভাষায়–

> কলকাতায় মাত্র চারটে হলে বিদেশী স্বরলিপি বাজাবার মতো দক্ষ অর্কেস্ট্রা ছিল। এগুলো হচ্ছে গ্লোব, ম্যাডান ও এলবিয়ান-সবাক যুগে যার নাম হয়েছিল এল ফিনস্টোন। এ হলেই বাংলাদেশে প্রথম সবাক ছবি দেখানো হয়। এ চারটে হলেই আমি নির্বাক ছবি দেখেছি এবং এঁদের অর্কেস্ট্রা শুনেছি। বিশেষ করে মনে

> আছে ম্যাডানের কথা। সেখানে আধুনিক ইউনিভক্সের মতো একটা বিরাট যন্ত্র ছিল যা থেকে অনেক যন্ত্রের ধ্বনি সৃষ্টি করা সম্ভব হতো।[২]

আরও জানা তাঁর লেখা থেকে এই অনামা অর্কেস্ট্রা দলের কল্যাণেই বাংলার নির্বাক ছবি দূর্গাদাস ও পেশেন্স, কুপার অভিনীত *কপালকুন্ডলা*, সবিতা দেবী অভিনীত *ভাগ্যলক্ষী*, দূর্গাদাসের *চোরকাঁটা*, ইত্যাদি ছবি অসাধারণ আবেদনে দর্শক মনে চির স্মরণীয় হয়ে আছে।[৩] কলকাতায় নির্বাক যুগের ইংরেজি ছবির অধিকাংশ দর্শকই ছিল ব্রিটিশ সৈন্য। তাদের জন্য পর্দার পাশে একজন গায়ক এবং পিয়ানো বাদক ছিল। পিয়ানো তার মর্জিমাফিক সুর তুলত। গায়ক গাইত সে সময়ের জনপ্রিয় গান। এছাড়া শ্রোতাদের কাছ থেকে জনপ্রিয় গানের অনুরোধ আসতো এবং তা জানা থাকলে গায়ক গাইত। ফলে ছবি এক হলেও গান পাল্টে যেত। অর্থাৎ সেখানে ছবি এবং গানের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠার কোনো প্রশ্নই ছিল না।[৪]

চলচ্চিত্রের সবাক যুগ

১৯২৭ সালে সবাক চলচ্চিত্র চালু হলে আমেরিকায় ওয়ার্নার ব্রাদার্স চলচ্চিত্রে সংগীত যোগ করলেন। প্রথম সবাক ছবি *দ্য জ্যাজ সিঙ্গার*-এ এ্যাল জনসনই চলচ্চিত্রের প্রথম কণ্ঠশিল্পী। ওয়ার্নার ব্রাদার্স (ইংরেজি Warner Brothers বা Warner Bros.) আমেরিকার হলিউডে অবস্থিত পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বিনোদন কোম্পানি। আমেরিকার অঙ্গরাজ্য হলিউডের বারব্যাংক নামক স্থানে এর সদর দপ্তর। টাইম ওয়ার্নার গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান। কার্টুন, মুভি, এনিমেটেড মুভি প্রভৃতি এরা নির্মাণ করে। *দ্য জ্যাজ সিঙ্গার* (১৯২৭) ওয়ার্নার ব্রাদার্স নির্মিত প্রথম সংগীত যোগকৃত চলচ্চিত্র। কণ্ঠশিল্পী এল জনসন। সবাক চলচ্চিত্রের পথপ্রদর্শক, বিনোদন জগতে বিপ্লবী পরিবর্তন আনার জন্যে চলচ্চিত্র প্রযোজনাটি পুরস্কার লাভ করে।[৫]

Picture- 1: Jazz Singer (1927) Movie, Theatrical release poster

Directed by: Alan Crosland, Produced by: Darryl F. Zanuck, Screenplay by: Alfred A. Cohn, Based on *The Jazz Singer*, by Samson Raphaelson, Starring: Al Jolson, May McAvoy,Warner Oland,Yossele Rosenblatt Music by: Louis Silvers, Cinematography: Hal Mohr, Edited by: Harold McCordProduction company: Warner Bros. Pictures,The Vitaphone Corporation, Distributed by: Warner Bros. Pictures, Release date: October 6, 1927, running time: 89 minutes, 96 minutes *(with Overture and Exit Music),* Country: United States, Language: Englis. Budget: $422,000 Box office : $2.6 million (gross rental)

Movie: Jazz Singer (1927) Al Jolson
In sciene of a song 'Dirty Hands, Dirty Face'

'Jazz Singer movie songs are mentioned bellow:

1. "My Gal Sal" (music and lyrics by Paul Dresser; dubbed by unknown singer with Bobby Gordon onscreen)
2. "Waiting for the Robert E. Lee" (music by Lewis F. Muir and lyrics by L. Wolfe Gilbert; dubbed by unknown singer with Bobby Gordon onscreen)
3. "Yussel, Yussel" (music by Samuel Steinberg and lyrics by Nellie Casman, 1923); heard as background music as Jolson walks through his ghetto neighborhood.
4. "Kol Nidre" (traditional; dubbed by Joseph Diskay with Warner Oland onscreen; sung also by Al Jolson)
5. "Dirty Hands, Dirty Face" (music by James V. Monaco and lyrics by Edgar Leslie and Grant Clarke; sung by Al Jolson)
6. "Toot, Toot, Tootsie (Goo' Bye)" (music and lyrics by Gus Kahn, Ernie Erdman, and Dan Russo [title orthography and songwriting credits per original sheet music cover; some other sources do not mention Russo and some also name either or both Ted Fio Rito and Robert A. King]; sung by Al Jolson)
7. "Kaddish" (traditional; sung by Cantor Yossele Rosenblatt)
8. "Blue Skies" (music and lyrics by Irving Berlin; sung by Al Jolson)
9. "Mother of Mine, I Still Have You" (music by Louis Silvers and lyrics by Grant Clarke [Jolson also credited by some sources]; sung by Al Jolson)
10. "My Mammy" (music by Walter Donaldson and lyrics by Sam M. Lewis and Joe Young; sung by Al Jolson)[6]

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম সবাক হিন্দি চলচ্চিত্র *আলম আরা* (১৯৩১)। এটি ভারতের মুম্বই (তৎকালীন বোম্বাই) শহরের ম্যাজেস্টিক সিনেমাতে ১৯৩১ সালের ১৪ই মার্চ মুক্তি পায়। *আলম আরা* শব্দের অর্থ হলো পৃথিবীর আলো (উর্দু ভাষায়)। এটি পরিচালনা করে আরদেশির ইরানি। তিনি সমকালীন সবাক চলচ্চিত্রের সাথে একরকম প্রতিযোগিতা করে এটি সম্পন্ন করেন। চলচ্চিত্রটিতে সংগীত দেন ফিরোজশাহ এম. মিস্ত্রি এবং বি. ইরানি। এ চলচ্চিত্রের গানসমূহ:

১. দে দে খোদা কে নাম পে পেয়ারে
২. বাদলা দিলওয়া এগা ইয়া রাব তু সিতাম গারো সে
৩. রুঠা হে আসমা গুম হো গেয়া মাহতাব
৪. তেরি কাতিল নিগাহো নে মারা
৫. দে দিল কো আরাম আয়ে সাকি গুলফাম
৬. ভার ভার কে জাম পিলা জা সাগার কে চালানেওলা
৭. দারাস বিনা মারে হে তারসা নেইনা পেয়ারে

আলম আরা (১৯৩১) চলচ্চিত্রের পোস্টার

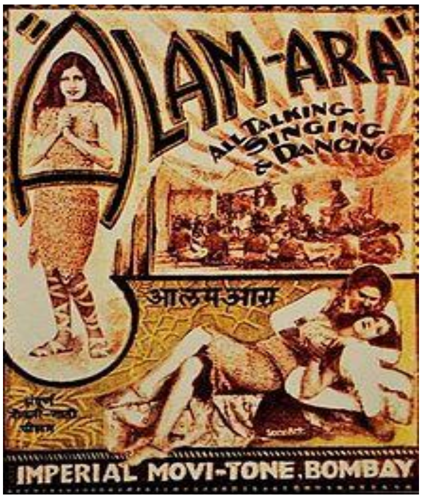

আলম আরা (১৯৩১) চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য

আলম আরা চলচ্চিত্র এবং এর সংগীত তৎকালীন সময়ে ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। বিশেষ করে 'দে দে খোদা কে নাম পে পেয়ারে' গান ছিল ঐ সময়কার বেশ জনপ্রিয় গান। এটি ভারতীয় সিনেমার প্রথম গান এবং গেয়েছিলেন অভিনেতা ওয়াজির মোহাম্মদ খান। যিনি চলচ্চিত্রে ফকিরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। শুটিং-এর সময় গানটি সরাসরি একটি হারমোনিয়াম এবং তবলা বাজিয়ে ধারণ করা হয়েছিল। চলচ্চিত্রটিতে গান বেশি এবং সংলাপ কম ছিল বলে জানা যায়।[৭]

কলকাতায় নির্মিত প্রথম সবাক কাহিনিচিত্র অমর চৌধুরী পরিচালিত *জামাই ষষ্ঠী* মুক্তি পায় **১৯৩১** খ্রিস্টাব্দের **১১** এপ্রিল। এবং জানা যায় একই বছর তৎকালীন পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) প্রথম পূর্ণাঙ্গ নির্বাক বাংলা চলচ্চিত্র *দ্যা লাস্ট কিস্* প্রদর্শিত হয়।[৮] *জামাই ষষ্ঠী* চলচ্চিত্রে সংগীত থাকলেও গান ছিল না। সেক্ষেত্রে সংগীত পরিচালক স্বয়ং চলমান ছবির সঙ্গে গান গেয়ে দর্শকের গানের চাহিদা পূরণ করেছিলেন।[৯] **১৯৩১** সালে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *জোরবরাত*-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার রূপায়ণ 'কে নিবি গো কিনে আমায়' গানটি ব্যবহৃত হয়। গানটির দৃশ্যধারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে গীতিকার ও গায়ক হীরেন বসুর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়–

> স্যুটিং চলেছে *জোরবরাত* ছবির (স্বল্পদৈর্ঘ্য)। জানালার ধারে রাখা বিরাট অর্গান, নায়ক জয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায় পাশের বাড়িতে কানন দেবীর উদ্দেশ্যে গেয়ে চলেছেন : 'কে নিবিগো কিনে আমায়'। নায়িকাও সে গান শুনছেন কান পেতে। দুটি ক্যামেরা কাজ করে চলেছে ফ্লোরে। প্রথমটায় রয়েছেন ইটালিয়ান

> ক্যামেরাম্যান মার্কনি আর অন্যটিতে যতীন দাস। স্টুডিওর অন্য দিকটিতে মাইক ঝুলছে। সংগীত পরিচালক হিসেবে আমি গেয়ে চলেছি 'কে নিবি গো।' একটি সুপরিচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সুর সংযোজন করা হয়েছে। বলা ভাল দ্বৈত পর্যায়ে গানটি গৃহীত হয়েছে। ক্যামেরা নিচ্ছে নায়ক জয় নারায়ণ বাবুর ঠোঁটের ওঠানামাটুকু আর সাউন্ডে উঠেছে আমার কণ্ঠস্বর। পর্দার দর্শকরা দেখবেন নায়ক গাইছেন। এই ভাবে সূচনা হলো বাংলা সিনেমার গান এবং তার সঙ্গে প্লেব্যাক উদ্ভাবনীর প্রথম সোপান।[৪]

হীরেন বসুর এই স্মৃতিচারণ থেকে বাংলা চলচ্চিত্রে প্রথম রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহারের কথা জানা যায়। বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম গীতিকার তিনি।

সবাক ছবির প্রথম যুগে বাঙালির বিনোদনের প্রায় সবকটি মাধ্যমই ছিল গান প্রধান। সব ক্ষেত্রেই সংগীতের একটা প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। সুতরাং এই পটভূমিকায় সবাক চলচ্চিত্রে গানের বহুল ব্যবহার এক রকম অনিবার্য ছিল। গানের চাহিদা মেটাতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের গাইতে হতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে চরিত্রানুযায়ী শিল্পী নির্বাচন সহজসাধ্য ছিলনা। কারণ গান না জানা কোন অভিনয়শিল্পী কোন চরিত্রের উপযোগী হলেও শুধু গান না জানার জন্য তাকে ঐ ভূমিকায় না দিয়ে অন্য একজন গান জানা অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া হতো। সবাক ছবির প্রথম দিকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মুখে সংলাপ ও গান শোনা গেলেও নেপথ্যসংগীত বা প্লেব্যাক তখনও চালু হয়নি। ১৯৩৫ সালে *ভাগ্যচক্র* চলচ্চিত্রে প্রথম প্লেব্যাক চালু হয়। এই সময় থেকেই গান ও অভিনয় দুটি পৃথক ধারায় বিভক্ত হয়। এর আগে অভিনয় ও গান অভিন্ন ছিল। [১০]

বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ডে আব্দুল জব্বার খানের *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬) প্রথম সবাক চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রে দুটো গানের ব্যবহার রয়েছে। একটি হলো : মাহবুবা হাসনাতের নেপথ্যকণ্ঠে পিয়ারী বেগমের অভিনয়ে–'মনের বনে দোলা লাগে আসলো দখিন হাওয়া, হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর হলো ফিরে পাওয়া' এবং দ্বিতীয়তটি : আবদুল আলীমের নেপথ্যকণ্ঠে জনৈক মাঝির অভিনয়ে পরিবেশিত–'আমি ভিন গেরামের নাইয়া, বাণিজ্যেরই লাইগা ফিরি, সোনার তরি বাইয়া'। বাংলাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথম দুটি গান।

চলচ্চিত্রে গান বা প্লেব্যাকগীতি

চলচ্চিত্রে কাহিনির প্রয়োজনে গান বেজে ওঠার রীতির প্রচলন রয়েছে। বাস্তব জীবনে এভাবে কেউ অভ্যস্ত নয়। মানুষের অন্তরঙ্গে অনেক কথা থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনে তা প্রকাশ করা যায় না। এই প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে শিল্পের উন্মেষ ঘটেছে। এবং এই কারণে যুগ যুগ ধরে শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শিখেছে মানুষ। চলচ্চিত্র শিল্পকলার অন্যতম একটি মাধ্যম এবং ব্যবহৃত গানও একই ভূমিকায় অবতীর্ণ। বিশেষ অলঙ্করণ সমৃদ্ধ, কোন একটি চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়ে থাকে, প্রকৃত অর্থে দর্শকের মনের ইচ্ছাকেই চরিতার্থ করে এই গান বা প্লেব্যাকগীতি।

সাধারণত অর্থে চলচ্চিত্রের কাহিনি বা বিষয় কিংবা চরিত্রের জন্য বিশেষভাবে রচিত এবং পরিবেশিত গানকে চলচ্চিত্রের গান বলা যায়। চলচ্চিত্রে নায়ক-নায়িকা কিংবা অন্য যে কোন অভিনীত চরিত্রের অভিনয়ে পরিবেশিত ঠোঁটে ঠোঁট মেলানো গান। ইংরেজিতে লিপসিং বলা হয়ে থাকে। এর মধ্য দিয়ে প্লেব্যাকগীতি (আক্ষরিক অর্থে নেপথ্যনাট্যগীতি) বা নেপথ্যসংগীতের সূচনা হয়। এই গানকে বাংলা

গানের আরেকটি ধারা হিসেবে অভিহিত করা যায়। চলচ্চিত্রের সবাক যুগে এই ধারার উন্মেষ ঘটে। তখন থেকে গান শুধু শ্রবণ ইন্দ্রীয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং তা দৃশ্যগত ইন্দ্রিয়গ্রাহীর অন্যতম বিষয় হয়ে ওঠে।

চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার ও উপযোগিতা

নির্বাক যুগে চলচ্চিত্রে সংগীত সংযোজন সম্ভব ছিল না। ফলে সংগীত ব্যবহার করা হতো চলচ্চিত্র প্রদর্শন করার সময়। সংগীত ছাড়া নির্বাক চলচ্চিত্র পাথরের মতো অচল দেখাতো। সংগীত বলতে আবহসংগীতের দিকটাই লক্ষণীয়। কলকাতায় বাংলা চলচ্চিত্র চলাকালীন সময়ে উপস্থিত দর্শককে গান গেয়ে জাগিয়ে রাখতে হতো।[১১] বিদেশে সবাক চলচ্চিত্রের যুগ ছিল ভিন্ন কারণ মিউজিক্যাল ফিল্ম নামে তাদের একটি চলচ্চিত্রের ধারাই ছিল এবং নাটক নির্ভর চলচ্চিত্রে গান প্রায় ব্যবহৃত হতো না, আবহসংগীতের ইশারা ব্যতীত। কিন্তু বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ডে চলচ্চিত্র নির্মাতারা যে কোন ধরনের চলচ্চিত্রের সঙ্গে জুড়ে দিলেন গান। প্রয়োজন না থাকলেও গান ছাড়া চলচ্চিত্রের কল্পনা প্রায় ভুলেই গেলেন। এখনো এদেশে গান ছাড়া চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রায় অসম্ভব। প্রখ্যাত সুরকার ও গায়ক আবদুল আহাদ-এর ভাষায়–

> এদেশের মানুষ গানের মায়ায় লালিত। যাত্রা, কবিগান, পালা গান ও পালাকীর্তন তার সঙ্গী ছিল রাতের পর রাত। হাটে-ঘাটে-মাঠে-বন্দরে-বাজারে কাজের ফাঁকে অবসরের বিরতিতে এদেশের লোক আশ্রয় করেছে গানকে। তার ক্লান্তি বিনোদনের জন্যে দূর গায়ে দীর্ঘ পথ কমিয়ে আনার জন্যে এবং অন্তরের তাগিদে গান এদেশের মানুষের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই এদেশের ছবিতে গান তার আসর জমালো রাজকীয় চালে একচেটিয়াভাবে।[১২]

চলচ্চিত্র সংগীতের ইতিহাস থেকে জানা যায় বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থেকে এর ব্যবহার বিশেষত আবহসংগীতের ক্ষেত্রে। তবে এ কথাও স্বীকার্য যে, এদেশের মানুষ সুরের মায়ায় আপ্লুত কিংবা গান ব্যবহারে যৌক্তিকতার প্রশ্নে উদাসীন তবে বেশ কিছু উদ্দেশ্য পূরণার্থে গান তার অবস্থান তৈরি করতে বিশেষভাবে সমর্থ হয়েছে, এমনকি উপযোগিতাও লক্ষণীয়।

গানের উপযোগিতা নিয়ে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী শ্যামল গুপ্ত বলেন–'...কখনো এমন একটা নাট্য মুহুর্ত আসে, যে শুধু সংলাপ বা ঘটনার উপস্থাপনায় ছায়াচিত্রের নাটককে এগিয়ে নিয়ে যেতে অসুবিধে হচ্ছে বা নায়ক-নায়িকার তাৎক্ষণিক মানসিকতা দর্শক সাধারণকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন অনুভব করা যাচ্ছে–এ সমস্যা সমাধান করে গান।'[১৩] এ সম্পর্কে বিশিষ্ট গীতিকার ও চলচ্চিত্র পরিচালক গাজী মাজহারুল আনোয়ার বলেন–'চলচ্চিত্রের গল্প টেনে নিতে গানের প্রয়োজন। দীর্ঘ সময় ধরে গল্প দেখতে দেখতে দর্শক যখন ঝিমিয়ে পড়ে তখন বিনোদনের জন্য গানের আগমন ঘটে। গল্প ও সিকোয়েন্সের প্রয়োজনেই গানের আয়োজন হয়।'[১৪]

এ সম্পর্কে গীতিকার মুন্সী ওয়াদুদের মন্তব্য-'গানের ভেতর দিয়েই আমাদের বিকাশ। চলচ্চিত্রের গান অত্যাবশ্যকভাবেই প্রয়োজন।[১৫] এবং গানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল বলেন–

> আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের বিশেষত্ব হলো, আমরা সবকিছুর মধ্যে সুর খুঁজি। এমনকি কান্নার মাঝেও আমরা এক ধরনের সুরের ধারণা পাই।... তবে ফিল্মে বিষয়টি হলো, এমন অনেক কিছু আছে যা মানুষ মুখে বললে সহজে বোঝে না। আমরা যখন মনের কথা বইয়ের ভাষায় বলি তার যে প্রতিফলন হয় সেই কথাটিই সুর করে বললে তা মাত্রাধিক হয়। চলচ্চিত্রে সংগীতের প্রয়োজন এ কারণেই যে, কথা ও সুরের সমন্বয়ে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। [১৬]

সবাক যুগের সূচনালগ্ন থেকে চলচ্চিত্রে গান কারণে অকারণে অনিবার্য হয়ে উঠায় এর প্রয়োগ প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনাসহ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। গানের বিশেষ এই ধারাকে পরিশীলিত রূপে দেখতে চেয়েছে চলচ্চিত্রানুরাগী, সংগীতজ্ঞ। কিন্তু অসাধু চলচ্চিত্র প্রযোজক, নির্মাতা দ্বারা চলচ্চিত্রের গান বিভিন্ন সময়ে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। অনেক চলচ্চিত্রানুরাগী, সংগীত পরিচালক, চলচ্চিত্র গবেষক, নির্মাতা এ বিষয় নিয়ে বিস্তর আলোচনা সমালোচনা করলেও অনেক ক্ষেত্রে তা ফলপ্রসূ হয়নি। বর্তমান সময়ের চলচ্চিত্রের গানের প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তীব্র সমালোচনা রয়েছে। কোন ধরনের যৌক্তিক কারণ ছাড়াই অধিক গান ব্যবহারের বিষয়টি যেমন লক্ষণীয় তেমনি গানের বাণী, শব্দ চয়ন, সুর নকল ইত্যাদি ক্ষেত্রেও রয়েছে নানাবিধ প্রশ্ন। চলচ্চিত্রে গানের প্রয়োগ এবং উপযোগিতা নিয়ে উৎপল সরকার বলেন–

> একটি বিশেষ দৃশ্যে গানের ব্যবহার কতখানি প্রয়োজন সেটা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। শুধু গান শোনাবার ইচ্ছে থাকলে রেকর্ড বাজিয়ে শোনাতে আপত্তি কোথায়? কিন্তু ছবির কাহিনি ও তার বিশেষ দৃশ্যের চাহিদা অনুযায়ী সেই গানকে লাগাতে পারার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে পরিচালকের রসবোধের পরিচয়। এর সঠিক কোন ব্যাকরণ নেই। আছে শিল্পীর সূক্ষ্ম অনুভূতি আর পরিমিত বোধ।...'সিনেমাই গান শুধু লাগালেই তা উত্তীর্ণ হবে তার কোনো মানে নেই। প্রথমত গান হবে অর্থবহ শব্দ চয়নে রচিত-গীত, দ্বিতীয়ত সুন্দর সুর এবং তৃতীয়ত পরিবেশ, চরিত্র এবং দৃশ্যের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োগ। [১৭]

চলচ্চিত্র পরিচালক আলমগীর কবিরও সংগীত প্রয়োগ নিয়ে ব্যাপক ভাবনা চিন্তা করেছেন। তিনি বলেছেন–

> সংগীত প্রধান চলচ্চিত্রে গান কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যায় এমনকি সংলাপের কাজও করে । কিন্তু গানের এই ব্যবহার যদি চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে না হয় যদি তা স্বাভাবিকভাবে না এসে চমক দেবার প্রবণতা থেকে উদ্ভূত হয়; দর্শকদের শ্রেফ রিলিফ দেবার প্রয়াসে গানের যদি অবাঞ্ছিত প্রয়োগ হয় তবে কাহিনী থমকে গিয়ে গানই প্রাধান্য পায়, চলচ্চিত্র তার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়। কিন্তু তাই বলে এ কথা ধ্রুব সত্য নয় যে প্লেব্যাকগীতি চলচ্চিত্রের ভাষায় অন্যতম শত্রু।[১৮]

মিউজিকোলস্টি ড. সাইম রানা বলেন–

> এটা স্বীকার করতে হবে যে ভারতীয় এবং বাংলাদেশের চলচ্চিত্রগুলোতে গানের প্রাধান্য বেশি। এই দিকটি পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে নেতিবাচক অর্থে ভাবা হয়। কিন্তু এদেশের চলচ্চিত্রের এটাই স্বাতন্ত্র। তাছাড়া বাঙালি জীবন যাপনের প্রতিটি অধ্যায়ে গান আছে। সুখে-দুঃখে, প্রেম-বিরহে, জন্ম গ্রহণে প্রার্থনা, পূজায়-সব খানেই সুর। আবার এদেশের চলচ্চিত্রে কাহিনিগুলো এদেশের সেই সংগীতাশ্রয়ী গল্প গাথা নিয়ে নির্মিত হয়ে এসেছে। যেমন *রূপবান* কিংবা *সুজন সখী* এই ধরনের চলচ্চিত্র গান বাদে নির্মাণ করা কি উচিত? যদি বলি *পিয়ানো টিচার* বা *সিন্ডারেলা*, *কারম্যান*, অথবা অপেরাধর্মী চলচ্চিত্র সেই বিষয়ের সংগীত ছাড়া কি নির্মাণ করা সম্ভব? অর্থাৎ এ কথাই বলতে চাইছি যে, এদেশের চলচ্চিত্রে যৌক্তিক কারণে গানের ব্যবহার থাকবে। তবে তা যেন অতিরঞ্জিত কিংবা বিষয় বহির্ভূত যেন না হয়ে ওঠে।[১৯]

চলচ্চিত্রের গান বা প্লেব্যাকগীতি যদিও ধীরে ধীরে বাংলা গানের একটি বিশেষ ধারা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে এ কথাও সত্যি যে, গান ব্যবহারের যৌক্তিকতা নিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন তৈরি হয়েছে কিন্তু অদ্যাবধি চলচ্চিত্রে গান তার অস্তিত্ব সংকটাপূর্ণ পরিস্থিতি অতিক্রম করতে পারেনি। প্রতিনিয়ত গানের প্রয়োগ প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নানাবিধ আলোচনা সমালোচনা রয়েছে। প্রচলিত ধারার চলচ্চিত্রসমূহে গান ব্যবহারের উপযোগিতা নিম্নরূপভাবে উল্লেখ করা যায়–

১. কোন একটি বিষয় বা কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।
২. কাহিনি বা বিষয়ের সূত্র ধরে বিশেষ কোন চরিত্রের (নায়ক কিংবা নায়িকার) মনের ভাব প্রকশের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে।
৩. বিশেষ কোন সিকোয়েন্স বা দৃশ্যকে আরো প্রাণবন্ত কিংবা অর্থপূর্ণ করার অন্যতম কৌশল অবলম্বনে।
৪. বিনোদনের ভিন্ন উপায় কিংবা দর্শকের মনে একঘেয়েমি ভাব দূর করার জন্য।
৫. সাধারণ চল বা প্রচলন থেকে।
৬. ব্যবসায়িক সাফল্য লাভের আশায় ।
৭. কৌতুক অভিনেতা-অভিনেত্রীর মাধ্যমে সাময়িক বিনোদন তৈরির প্রচেষ্টা।
৮. চলচ্চিত্রের বিশেষ কোন দৃশ্যের বৈরি পরিবেশকে অনুকূলে ফিরিয়ে আনার জন্য।
৯. অপরাধী কোন চরিত্রের মনুষ্যত্ব বা বিবেকবোধকে জাগ্রত করার জন্য।
১০. কাহিনিতে বর্ণিত বিশেষ কোন উদ্দেশ্য হাসিল করার নিমিত্তে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. সত্যজিৎ রায়, *বিষয় চলচ্চিত্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট, কোলকাতা, ১৯৮২, পৃ.৬২।
২. চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত-আবদুল আহাদ, *চিত্রালী* বার্ষিক সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৬২, পৃ. ২২।
৩. প্রাগুপ্ত, পৃ. ২২।
৪. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫৮।
৫. (https://bn.wikipedia.org/wiki/ ওয়ার্নার_ব্রস.) (২৭/১২/২০১৮)
৬. (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Jazz_Singer#Songs) (২৩/০৪/২০১৯)
৭. (*https://bn.wikipedia.org/wiki/আলম_আরা*) (২৭/১২/২০১৮)
৮. আসলাম আহসান, *বাংলাদেশের সিনেমার স্মরণীয় গান*, প্রথমা ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৩১।
৯. অতনু চক্রবর্তী, সিনেমার সঙ্গী সংগীত, *চলচ্চিত্রে সংগীতের প্রয়োগ*, উৎপল সরকার (সম্পা.), প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৫৮।
১০. প্রবীর সেনগুপ্ত, *বাংলার গান বাংলা গান*, ড. অরুণ কুমার (সম্পা.) পুস্তক বিপণি, ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ১৬৩।
১১. এই শিল্পীদের মধ্যে ক্ষীরোদ মুখোপাধ্যায় এবং অনাথনাথ বসুর কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এবং এদের মধ্যে অনাথনাথ বসু একই সঙ্গে পুরুষ ও মহিলা কণ্ঠে গান গাইতে পারার কারণে 'লাইভ ডুয়েট' গানে তাঁর কদর ছিল বেশি। (চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত-আবদুল আহাদ, *চিত্রালী* বার্ষিক সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৬২, পৃ.২২।)
১২. প্রাগুপ্ত, পৃ.২২।
১৩. তপন বাগচী, *চলচ্চিত্রের গানে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২৬।
১৪. আলাউদ্দীন মাজিদ, প্রাণ নেই, মান নেই চলচ্চিত্রের গানে, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৫ এপ্রিল ২০১৭।

১৫. রুখসানা করিম (কানন), *বিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, ২০১৭,পৃ. ১৮৫।

১৬. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৮২।

১৭. অতনু চক্রবর্তী, সিনেমার সঙ্গী সংগীত, *চলচ্চিত্রে সংগীতের প্রয়োগ*, উৎপল সরকার (সম্পা.), প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১১, (সংগীতের প্রয়োগ কথামুখ, উৎপল সরকার)

১৮. তপন বাগচী, *চলচ্চিত্রের গানে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২৬।

১৯. সাক্ষাৎকার গ্রহণ তারিখঃ ১৮/০৩/২০১৬, ঢাকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চলচ্চিত্রের বিষয়ভিত্তিক ধারা বা জাতি বিচার

চলচ্চিত্রে গানের বিষয়বৈচিত্র্য প্রাথমিকভাবে অনেকাংশে চলচ্চিত্রের বিষয় বা কাহিনির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং চলচ্চিত্রের গানের বিষয়বৈচিত্র্যের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের বিষয়ভিত্তিক ধারা বা জাতি বিচার বিষয়টিও গুরুত্ববহ। গবেষণার সময় সীমার মধ্যে অর্থাৎ সবাক যুগের (১৯৫৬-১৯৮৯) মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সংখ্যা মোট ১০৬৬টি। তারমধ্যে উর্দু ভাষার চলচ্চিত্র ৫৩ টি। এবং উল্লেখিত সময়ে নির্মিত অধিকাংশ চলচ্চিত্র পারিবারিক, সামাজিক, সাহিত্যনির্ভর, লোককাহিনি ও রূপকথাভিত্তিক, ইতিহাস ও গণ-আন্দোলনভিত্তিক, মিউজিক্যাল মুভি বা সংগীতনির্ভর, শিশুতোষ, অ্যাকশনধর্মী, পোশাকি বা ফ্যান্টাসি চলচ্চিত্র প্রভৃতি। স্বাধীনতাত্তোরকালে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নামে একটি বিশেষ ধারার সূচনা হয়। এর সাথে সংযোজন হয় মারপিট বা সহিংসতামূলক ফর্মুলাভিত্তিক এক ধরনের চলচ্চিত্র। এর সূচনা লাভ করে *রংবাজ* (১৯৭৩) নামক চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে। উল্লেখিত সময়কালে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হলেও নিম্নলিখিত বিষয়ের চলচ্চিত্র বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। উল্লেখযোগ্য বাংলা ভাষার চলচ্চিত্রসমূহকে বিষয়ভিত্তিক ধারা বা জাতি বিচারের ক্ষেত্রে নিম্নরূপভাবে উল্লেখ করা যায়।

সামাজিক চলচ্চিত্র
সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র
লোককাহিনি ও রূপকথাভিত্তিক চলচ্চিত্র
ইতিহাস ও গণ-আন্দোলনভিত্তিক চলচ্চিত্র
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র
মিউজিক্যাল মুভি বা সংগীতনির্ভর চলচ্চিত্র
শিশুতোষ চলচ্চিত্র
অ্যাকশনধর্মী সামাজিক চলচ্চিত্র
পোশাকি বা ফ্যান্টাসি চলচ্চিত্র

সামাজিক চলচ্চিত্র

সমাজ-জীবনের নানা বিষয় আশয় নিয়ে সাহিত্যের শাখা-প্রশাখা বেড়ে ওঠে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে সাহিত্যভিত্তিক এবং সামাজিক চলচ্চিত্র এই দুইয়ের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না। কারণ সাহিত্যের মধ্য দিয়েই চলচ্চিত্রায়ণ। তাছাড়া সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত বিষয়। গবেষক ও শিক্ষক আহমেদ আমিনুল ইসলামের ভাষায়–

> এদেশের অধিকাংশ চলচ্চিত্রকেই কোনো না কোনোভাবে সামাজিক চলচ্চিত্রের অভিধায় নির্মাতারা বিজ্ঞাপনের বিচিত্রভাষায় প্রচার করে থাকেন। সংখ্যাগত হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্বকালে যেমন স্বাধীনতা লাভের পরেও তেমনি চলচ্চিত্রের পরিমাণগত বিবেচনায় এই রীতির চলচ্চিত্র সকল শ্রেণীর চেয়ে বেশি।...সমাজ বিশ্লেষক বা সমাজতত্ত্ববিদরা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সামাজিক স্বরূপ অন্বেষণ করতে গিয়ে রীতিমত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। স্বাধীনতাপূর্বকালে নির্মিত এদেশের সামাজিক নামধেয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে সমালোচক এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন: বাংলা এবং উর্দু ভাষায় নির্মিত অধিকাংশ চলচ্চিত্রই সামাজিক

> হিসাবে বিবেচিত। কিন্তু চলচ্চিত্রে বিধৃত এই সমাজ আসলে কোন সমাজ, কোথায় তার অবস্থান এসব প্রশ্নে কোন সঠিক সদুত্তর নাই। আবার, নির্দ্বিধায় এও বলা যায় বাংলাদেশের সমাজের চিহ্নমাত্র সেখানে দেখা যায় না।[১]

বাংলাদেশের সবাক যুগের প্রথম চলচ্চিত্র আবদুল জব্বার খানের *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬) চলচ্চিত্র এটি পরিচালক কর্তৃক রচিত সামাজিক ঘটনা নির্ভর 'ডাকাত' নাটক অবলম্বনে নির্মিত। সামাজিক এবং সাহিত্যের চলচ্চিত্র দুটোর বিষয়ভিত্তিক শ্রেণি বিভাজন খুব একটা আলাদা বিষয় মনে হয় না। তবে সব ঘটনার তো সাহিত্যে রূপদান হয় না। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে অথবা যে সব সাহিত্যকর্ম ইতোমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং জনপ্রিয় সেই বিবেচনায় শ্রেণি বিভাজনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে আলাদা করা অমুলক নয়। তবে সাধারণভাবে চলমান ঘটনাপ্রবাহকে উপজীব্য করে নির্মিত চলচ্চিত্রকে সামাজিক চলচ্চিত্র বলে অভিহিত করা যায়। এর মধ্যে সুভাষ দত্ত পরিচালিত *সুতরাং* (১৯৬৪), *আবির্ভাব* (১৯৬৮), নারায়ণ ঘোষ মিতার *এতটুকু আশা* (১৯৬৮), খান আতাউর রহমানের *জোয়ার ভাটা* (১৯৬৯), নারায়ণ ঘোষ মিতার *নীল আকাশের নীচে* (১৯৬৯), কামাল আহমেদের *অবাঞ্ছিত* (১৯৬৯), এহতেশামের *পীচ ঢালা পথ* (১৯৭০), নজরুল ইসলামের *দর্পচূর্ণ* (১৯৭০), *স্বরলিপি* (১৯৭০), অশোক ঘোষের *নাচের পুতুল* (১৯৭১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা উত্তরকালে নির্মিত সামাজিক ও পারিবারিক কাহিনিনির্ভর চলচ্চিত্রের সংখ্যা কম নয়। যদিও এর সমাজ-জীবনের সঙ্গে কতটা সম্পর্ক তৈরি করতে পেরেছে তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে প্রশ্ন রয়েছে। তবে মুস্তাফা মেহ্‌মুদ পরিচালিত *মানুষের মন* (১৯৭২), কামাল আহমেদ পরিচালিত *অশ্রু দিয়ে লেখা* (১৯৭২) আনোয়ার আশরাফের *গান গেয়ে পরিচয়* (১৯৭২) কাজী জহিরের *অবুঝ মান* (১৯৭২), দিলীপ বিশ্বাসের *সমাধি* (১৯৭৬), প্রমোদকার গোষ্ঠীর *দিন যায় কথা থাকে* (১৯৭৯), আমজাদ হোসেনের *সুন্দরী* (১৯৭৯), আজিজুর রহমানের *অশিক্ষিত* (১৯৭৯), রাজু সিরাজের *আরাধনা* (১৯৭৯),সাইফুল আজম কাশেমের *ঘর সংসার* (১৯৭৯) *বৌরানী* (১৯৮০), আমজাদ হোসেনের *জন্ম থেকে জ্বলছি* (১৯৮১) ও *দুই পয়সার আলতা* (১৯৮২), কামাল আহমেদের *রজনীগন্ধা* (১৯৮২), মোস্তফা আনোয়ারের *আঁখি মিলন* (১৯৮৩), সাইফুল আজম কাশেমের *ধনদৌলত* (১৯৮৩) বেলাল আহমেদের *নয়নের আলো* (১৯৮৪), আমজাদ হোসেনের *ভাত দে* (১৯৮৪), আলমগীর কবিরের *মহানায়ক* (১৯৮৪), আলমগীরের *নিষ্পাপ* (১৯৮৬), আবদুল্লাহ আল মামুনের *দুই জীবন* (১৯৮৮), মইনুল হোসেনের *যোগাযোগ* (১৯৮৮), এ জে মিন্টুর *সত্য মিথ্যা* (১৯৮৯), কামাল আহমেদের *ব্যথার দান* (১৯৮৯), সুভাষ দত্তের *সহধর্মিনী* (১৯৮৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শে নির্মিত দারাশিকোর *ফকির মজনু শাহ* (১৯৭৮), মোহাম্মদ মহীউদ্দিনের *বড় ভালো লোক ছিল* (১৯৮২) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র।

সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র

শিল্পকলার নানান শাখার সঙ্গে চলচ্চিত্রের সংযোগ, বিনিময় ও মিথস্ক্রিয়া হয়ে থাকে অবিরল। যেমন সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত, নৃত্য, আলোকচিত্র ইত্যাদি। এ সকল শিল্পের মধ্যে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সবচেয়ে বড় বন্ধন হলো সাহিত্যের। সাহিত্যের চিত্রায়ণ দিয়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের যাত্রারম্ভ। এরপরে বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় এবং কালজয়ী গল্প, উপন্যাস নিয়ে নির্মিত হয়েছে অসংখ্য চলচ্চিত্র। ১৯৬২ সালে আলাউদ্দিন আল আজাদের *সূর্যস্নান-এর* চলচ্চিত্রায়ণ করেন সালাহ্‌উদ্দিন, আমজাদ হোসেনের *ধারাপাতের* চলচ্চিত্রায়ণ করেন সালাহউদ্দিন ১৯৬৩ সালে, হুমায়ূন কবীরের *নদী ও নারী* উপন্যাসের ১৯৬৫ সালে চলচ্চিত্রায়ণ করেন সাদেক খান, সৈয়দ শামসুল হক ও

আনিসুজ্জামানের *আয়না ও অবশিষ্ট* ১৯৬৭ সালে চলচ্চিত্রায়ণ করেন সুভাষ দত্ত, শচীন্দ্রনাথ সেন রচিত *নবাব সিরাজদ্দৌলা* নাটকের ১৯৬৭ সালে চলচ্চিত্রায়ণ *করেন* খান আতাউর রহমান। ১৯৬৯ সালে কামাল আহমেদ, আকবর হোসেনের *অবাঞ্ছিত'র* চলচ্চিত্রায়ণ করেন। এছাড়াও বিশ্বখ্যাত গল্প ও উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণও হয়েছে এদেশে। উইলিয়াম শেক্সপীয়ার রচিত 'কমেডি অব এররস', চলচ্চিত্র *'ফির ফিলেঙ্গে হাম দোনো'* (১৯৬৫) পরিচালনা করেছেন সৈয়দ শামসুল হক, ডস্টোয়া ভোয়সকির 'ইডিয়ট' চলচ্চিত্র *বেগানা* (১৯৬৬) পরিচালনায় এস এম পারভেজ।[২] সাহিত্যভিত্তিক চলচ্চিত্র নিম্নরূপ একটি তালিকার মাধ্যমে দেখানো হলো:[৩]

ক্রম	উপন্যাস/গল্প	লেখক	চলচ্চিত্র	পরিচালক	মুক্তিকাল
১.	ডাকাত	আব্দুল জব্বার খান	মুখ ও মুখোশ	আব্দুল জব্বার খান	১৯৫৬
২.	পদ্মা নদীর মাঝি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	জাগো হুয়া সাভেরা	এ জে কারদার	১৯৫৯
৩.	সূর্য স্নান	ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ	সূর্য স্নান	সালাহউদ্দিন	১৯৬২
৪.	ধারাপাত	আমজাদ হোসেন	ধারাপাত	সালাহউদ্দিন	১৯৬৩
৫.	জানাজানি	আলি মনসুর	জানাজানি	আলী মনসুর	১৯৬৫
৬.	নদী ও নারী	ড. হুমায়ূন কবীর	নদী ও নারী	সাদেক খান	১৯৬৫
৭.	কমেডি অব এররস	উইলিয়াম শেক্সপীয়ার	ফির ফিলেঙ্গে হাম দোনো	সৈয়দ শামসুল হক	১৯৬৫
৮.	ইডিয়ট	ডস্টোয়া ভোয়সকি	বেগানা	এস এম পারভেজ	১৯৬৬
৯.	কাগজের নৌকা	রোমানা আফাজ	কাগজের নৌকা	বশীর হোসেন	১৯৬৬
১০.	আনোয়ারা	মোহাম্মদ নজিবর রহমান	আনোয়ারা	জহির রায়হান	১৯৬৭
১১.	আয়না ও অবশিষ্ট	সৈয়দ শামসুল হক ও ড. আনিসুজ্জামান	আয়না ও অবশিষ্ট	সুভাষ দত্ত	১৯৬৭
১২.	নয়ন তারা	মুনীর চৌধুরী	নয়ন তারা	কাজী জহির	১৯৬৭
১৩.	নবাব সিরাজদ্দৌলা	শচীন্দ্রনাথ সেন	নবাব সিরাজদ্দৌলা	খান আতাউর রহমান	১৯৬৭
১৪.	আগুন নিয়ে খেলা	শৈলেশ দে	আগুন নিয়ে খেলা	মোস্তফা মেহমুদ	১৯৬৭
১৫.	মোমের আলো	রোমেনা আফাজ	মোমের আলো	বশীর হোসেন	১৯৬৮
১৬.	অবাঞ্ছিত	আকবর হোসেন	অবাঞ্ছিত	কামাল আহমেদ	১৯৬৯
১৭.	বেদের মেয়ে	জসীম উদ্দীন	বেদের মেয়ে	নূরুল হক বাচ্চু	১৯৬৯
১৮.	শহর থেকে দূরে	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	জোয়ার ভাটা	খান আতাউর রহমান	১৯৬৯
১৯.	মায়ার সংসার	রোমেনা আফাজ	মায়ার সংসার	মোস্তফা মেহমুদ	১৯৬৯
২০.	বৈকুন্ঠের উইল	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	আপন পর	বশীর হোসেন	১৯৭০
২১.	পদ্মগোখরা	কাজী নজরুল ইসলাম	সুখ দুঃখ	খান আতাউর রহমান	১৯৭১
২২.	গাঁয়ের বধূ	আলি কওসার	গাঁয়ের বধূ	আলি কওসার	১৯৭১

স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় এবং কালজয়ী গল্প, উপন্যাস নিয়ে নির্মিত হয়েছে অসংখ্য চলচ্চিত্র। এ সময়ে জনপ্রিয় কালজয়ী সাহিত্যের মধ্যে অদ্বৈতমল্লবর্মনের *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৭৩) চলচ্চিত্রায়ণ করেন ঋত্বিক ঘটক। (বাংলাদেশ ভারতের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত) ১৯৭৮ সালে আব্দুল্লাহ আল মামুন শহীদুল্লাহ কায়সারের উপন্যাস *সারেং বৌ*-এর চলচ্চিত্রায়ণ করেন। আমজাদ হোসেনের ধ্রুপদী এখন ট্রেনে উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ করেন ঔপন্যাসিক নিজে *গোলাপী এখন ট্রেনে* (১৯৭৮) নামে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস *দেবদাস* (১৯৮২), *চন্দ্রনাথ* (১৯৮৪), *শুভদা* (১৯৮৬) প্রভৃতির, চলচিত্রায়ণ করেন চাষী নজরুল ইসলাম, রাজ্জাক পরিচালিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চাপা ডাঙ্গার বউ* (১৯৮৬), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্রায়ণ করেন বুলবুল আহমেদ *রাজলক্ষী শ্রীকান্ত* (১৯৮৭) নামে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *বিরাজ বৌ* (১৯৮৮)-এর চলচ্চিত্রায়ণ করেন মহিউদ্দীন ফারুক এবং *ব্যথার দান* (১৯৮৯) পরিচালনা করেন কামাল আহমেদ। নিম্নে তার একটি সারণি দেয়া হলো:

১.	কান্তিধারা	সুবোধ ঘোষ	নিজেরে হারায়ে খুঁজি	রুহুল আমিন	১৯৭২
২.	অবুঝ মন	সৈয়দ শামসুল হক	অবুঝ মন	কাজী জহির	১৯৭২
৩.	ঘর মন জানালা	দিলারা হাসেম	বলাকা মন	সুভাষ দত্ত	১৯৭৩
৪.	বধূ	নিহাররঞ্জন গুপ্ত	ঝড়ের পাখি	সি বি জামান	১৯৭৩
৫.	তিতাস একটি নদীর নাম	অদ্বৈতমল্লবর্মন	তিতাস একটি নদীর নাম	ঋত্বিক ঘটক	১৯৭৩
৬.	আবার তোরা মানুষ হ	আমজাদ হোসেন	আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান	১৯৭৩
৭.	বধূ মাতা কন্যা	আলী কওসার	বধূ মাতা কন্যা	আলি কওসার	১৯৭৩
৮.	ক্ষুধা	বিধায়ক ভট্টাচার্য্য	ত্রিরত্ন	প্রমোদকর	১৯৭৪
৯.	মাসুদ রানা	কাজী আনোয়ার হোসেন	মাসুদ রানা	মাসুদ পারভেজ	১৯৭৪
১০.	ভাই বোন	আলি কওসার	ভাই বোন	আলি কওসার	১৯৭৪
১১.	আজান	ওবায়েদ-উল হক	উত্তরণ	ফজলুল হক	১৯৭৫
১২.	নিরক্ষর স্বর্গে	আমজাদ হোসেন	নয়নমণি	আমজাদ হোসেন	১৯৭৬
১৩.	পালঙ্ক	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	পালঙ্ক	রাজেন তরফদার	১৯৭৬
১৪.	দস্যু বনহুর	রোমেনা আফাজ	দস্যু বনহুর	শামসুদ্দিন টগর	১৯৭৬
১৫.	পদ্ম গোখরা	কাজী নজরুল ইসলাম	মায়ার বাঁধন	মুস্তাফিজ	১৯৭৬
১৬.	কুয়াশা	কাজী আনোয়ার হোসেন	কুয়াশা	আজিজুর রহমান	১৯৭৭
১৭.	তেইশ নম্বর তৈলচিত্র	ড.আলাউদ্দিন আল আজাদ	বসুন্ধরা	সুভাষ দত্ত	১৯৭৭
১৮.	ধ্রুপদী এখন ট্রেনে	আমজাদ হোসেন	গোলাপী এখন ট্রেনে	আমজাদ হোসেন	১৯৭৮
১৯.	গলির ধারের ছেলেটি	ড.আশরাফ সিদ্দিকী	ডুমুরের ফুল	সুভাষ দত্ত	১৯৭৮
২০.	মায়ামৃগ	নিহাররঞ্জন গুপ্ত	অগ্নিশিখা	আজিজুর রহমান	১৯৭৮

২১.	সারেং বৌ	শহীদুল্লাহ কায়সার	সারেং বৌ	আবদুল্লাহ আল মামুন	১৯৭৮
২২.	মধুমিতা	রোমেনা আফাজ	মধুমিতা	মোস্তফ মেহমুদ	১৯৭৮
২৩.	লৌহ কপাট	জরাসন্দ	দিন যায় কথা থাকে	প্রমোদকর	১৯৭৯
২৪.	সূর্যদীঘল বাড়ী	আবু ইসহাক	সূর্যদীঘল বাড়ী	মসিহ উদ্দিন শাকের ও শেখ নেয়ামত আলী	১৯৭৯
২৫.	কন্যা কুমারী	আব্দুর রাজ্জাক	স্মৃতি তুমি বেদনা	দিলীপ বিশ্বাস	১৯৮০
২৬.	নিজের সঙ্গে দেখা	প্রফুল রায়	ভালো মানুষ	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৮০
২৭.	সেনাপতি	আব্দুল্লাহ আল মামুন	এখনই সময়	আবদুল্লাহ আল মামুন	১৯৮০
২৮.	গাংচিল	জ্যাক লন্ডন	গাংচিল	রুহুল আমিন	১৯৮০
২৯.	কসাই	আমজাদ হোসেন		আমজাদ হোসেন	১৯৮০
৩০.	এমিলি এন্ড দি ডিটেকটিভ	এরিখ কাস্টনার	এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী	বাদল রহমান	১৯৮০
৩১.	স্বামী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	স্বামী	অধ্যাপক নূরুল আলম	১৯৮১
৩২.	এক লায়লা হাজার দেওয়ানা	কিষণ চন্দ্র	ঝুমকা	আলমগীর কুমকুম	১৯৮১
৩৩.	দেবদাস	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	দেবদাস	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৮১
৩৪.	মেঘ বিজলী বাদল	আকবর হোসেন	মেঘ বিজলী বাদল	কাজী নূরুল হক	১৯৮৩
৩৫.	লালুভুলু	নিহাররঞ্জন গুপ্ত	লালুভুলু	কামা ল আহমেদ	১৯৮৩
৩৬.	পারস্য প্রেম উপাখ্যান	দৌলত উজির রাহরাম খাঁ	লাইলী মজনু	ইবনে মিজান	১৯৮৩
৩৭.	রামের সুমতি	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	রামের সুমতি	শহিদুল আমিন	১৯৮৪
৩৮.	রাজবাড়ী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রাজবাড়ী	কাজী হায়াৎ	১৯৮৪
৩৯.	চন্দ্রনাথ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	চন্দ্রনাথ	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৮৪
৪০.	শুভরাত্রি	শৈলেশ দে	শুভরাত্রি	সি বি জামান	১৯৮৫
৪১.	বৈকুণ্ঠের উইল	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সৎভাই	রাজ্জাক	১৯৮৫
৪২.	ফুলেশ্বরী	নাজমুল আলম	ফুলেশ্বরী	আজিজুর রহমান	১৯৮৫
৪৩.	রাধাকৃষ্ণ	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	রাধাকৃষ্ণ	মতিন রহমান	১৯৮৫
৪৪.	পরিণীতা	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পরিণীতা	আলমগীর কবির	১৯৮৬
৪৫.	চাঁপা ডাঙ্গার বৌ	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	চাঁপা ডাঙ্গার বৌ	রাজ্জাক	১৯৮৬
৪৬.	শুভদা	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শুভদা	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৮৬
৪৭.	দেবী চৌধুরানী	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মান সম্মান	এ জে মিন্টু	১৯৮৬
৪৮.	পরশ পাথর	প্রফুল্ল রায়	পরশ পাথর	খান আতাউর রহমান	১৯৮৭
৪৯.	শ্রীকান্ত	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত	বুলবুল আহমেদ	১৯৮৭
৫০.	লাইসেন্স	সাদত হাসান মন্টো	মহানগর	আজিজুর রহমান	১৯৮৯

৫১.	বিরাজ বৌ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বিরাজ বৌ	মহিউদ্দিন ফারুক	১৯৮৯
৫২.	ব্যথার দান	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ব্যথার দান	কামাল আহমেদ	১৯৮৯

সারণির বেশির ভাগ সাহিত্যকর্মগুলো পূর্বে থেকেই স্বীয় সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ এবং পাঠকের কাছে সুপরিচিত। ফলে প্রযোজক, পরিচালক চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এবং নির্মিত হয়েছে প্রায় অর্ধশতাধিকেরও বেশি চলচ্চিত্র।[৪] চলচ্চিত্রায়ণের মাধ্যমে পাঠক যেমন তার পরিচিত সাহিত্যকর্মগুলোকে ভিন্নরূপে পেয়েছে তেমনি চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত গানগুলোর কারণে পাঠক-দর্শক সিনেমা হলমুখী হতে আরও আগ্রহ বোধ করেছেন।

লোককাহিনি ও রূপকথাভিত্তিক চলচ্চিত্র

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় শাখা হলো লোককাহিনি। লোককথা বা রূপকথাভিত্তিক চলচ্চিত্রের মধ্যে সালাহ্উদ্দিন আহমেদ পরিচালিত *রূপবান* (১৯৬৫), জহির রায়হানের *বেহুলা* (১৯৬৬), ইবনে মিজানের *রাখাল বন্ধু* (১৯৬৮), সৈয়দ আউয়ালের *গুনাইবিবি* (১৯৬৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। লোককাহিনি বা রূপকথাভিত্তিক চলচ্চিত্র নিম্নরূপ তালিকার মাধ্যমে তা দেখানো হলো:[৫]

ক্রম	চলচ্চিত্র	পরিচালক	মুক্তিকাল
১.	রূপবান	সালাহউদ্দিন আহমেদ	১৯৬৫
২.	একালের রূপবান	ইবনে মিজান	১৯৬৫
৩.	রহিম বাদশা ও রূপবান	সফদর আলী ভূঁইয়া	১৯৯৬
৪.	আবার বনবাসে রূপবান	ইবনে মিজান	১৯৯৬
৫.	গুনাইবিবি	সৈয়দ আউয়াল	১৯৯৬
৬.	মহুয়া	আলী মনসুর	১৯৬৬
৭.	বেহুলা	জহির রায়হান	১৯৬৬
৮.	আপন দুলাল	নজরুল ইসলাম	১৯৬৬
৯.	জরিনা সুন্দরী	ইবনে মিজান	১৯৬৬
১০.	কাঞ্চন মালা	সফদর আলী ভূঁইয়া	১৯৬৭
১১.	সাইফুলমূলক বদিউজ্জামান	আজিজুর রহমান	১৯৬৭
১২.	মধুমালা	আজিজুর রহমান	১৯৬৮

১৩.	রাখাল বন্ধু	ইবনে মিজান	১৯৬৮
১৪.	সাত ভাই চম্পা	খান আতাউর রহমান	১৯৬৮
১৫.	সুয়োরানী দুয়োরানী	রহিম নওয়াজ	১৯৬৮
১৬.	কুঁচবরণ কন্যা	নূরল হক বাচ্চু	১৯৬৮
১৭.	গাজী কালু চম্পাবতী	মহীউদ্দিন	১৯৬৮
১৮.	পাতালপুরীর রাজকন্যা	ইবনে মিজান	১৯৬৯
১৯.	বেদের মেয়ে	নূরল হক বাচ্চু	১৯৬৯
২০.	আমির সওদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরী	ইবনে মিজান	১৯৭০

গ্রাম বাংলার বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয় লোককাহিনিকে উপজীব্য করে স্বাধীনতা উত্তরকালেও নির্মিত হয়েছে অনেক চলচ্চিত্র। তারমধ্যে ফয়েজ চৌধুরীর *মালকা বানু* (১৯৭৪), সফদর আলী ভূঁইয়ার *কাজল রেখা* (১৯৭৬), আজিজুর রহমানের *রঙিন রূপবান* (১৯৮৫), *রঙিন কাঞ্চন মালা* (১৯৮৮), *আলোমতি প্রেম কুমার* (১৯৮৯) প্রভৃতি। লোক পুরানের অন্তর্গত চলচ্চিত্র চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত *বেহুলা লক্ষিন্দর* (১৯৮৮) প্রভৃতি। লোককাহিনির সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় শাখা হলো রূপকথা। এ সময়েও রূপকথার গল্প নিয়ে ব্যাপক সংখ্যক চলচ্চিত্র নির্মাণ লক্ষ করা যায়। যদিও এই ধারা পাকিস্তানি ঔপনিবেশি আমল থেকেই শুরু হয়েছে।[৬] বর্ণিত ধারার চলচ্চিত্রের মধ্যে ইবনে মিজানের *নাগ নাগিনী* (১৯৭৯), শহীদুল আলমের *রাজকুমারী চন্দ্রভান* (১৯৭৯) ও *রূপের রানী চোরের রাজা* (১৯৭৯), এফ কবীর চৌধুরীর *রাজমহল* (১৯৭৯), *শীষনাগ* (১৯৭৯), বিদেশি কাহিনি বিশেষত পারস্যের জনপ্রিয় উপাখ্যানের প্রসঙ্গ নিয়ে এফ কবীর চৌধুরীর *বুল বুল এ বাগদাদ* (১৯৭৯) ও *আলিফ লায়লা* (১৯৮০), ইবনে মিজানের *বাগদাদের চোর* (১৯৮০) শফি বিক্রমপুরীর *আলাদীন আলীবাবা সিন্দাবাদ* (১৯৮১), দৌলত উজির রাহরাম খাঁর *লাইলী মজনুর (১৯৮৩)* চিত্রায়ণ করেন ইবনে মিজান, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পূর্বে নির্মিত অনেক চলচ্চিত্রের পরবর্তীতে রঙিন রূপায়ণ দেখা যায়। যেমন–ইবনে মিজানের *রঙিন রাখাল বন্ধু* (১৯৮৬), মিলন চৌধুরীর *রঙিন সাত ভাই চম্পা* (১৯৮৭), সফিউল আজমের *রঙিন অরুণ বরুণ কিরণ মালা* (১৯৮৮), তোজ্জাম্মেল হক বকুলের *বেদের মেয়ে জোসনা* (১৯৮৯), ইবনে মিজানের *চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা* (১৯৮৪) প্রভৃতি অন্যতম।

ইতিহাস ও গণ-আন্দোলনভিত্তিক চলচ্চিত্র

এছাড়া ইতিহাস ও গণ-আন্দোলনভিত্তিক চলচ্চিত্রের মধ্যে খান আতাউর রহমান পরিচালিত *নবাব সিরাজদ্দৌলা* (১৯৬৮) এবং জহির রায়হানের *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০) চলচ্চিত্রমূহ এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত।[৭]

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত গৌরবময় বিজয় বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে স্মরণীয় অধ্যায়। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা শিল্পমাধ্যমের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সৃষ্টিশীল প্রেরণায় উজ্জীবিত ও ব্যাপৃত হয়েছে। গণযোগাযোগের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম চলচ্চিত্র। যুদ্ধকালীন সময়ে এই মাধ্যমটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। প্রসঙ্গত মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর অবর্ণনীয় বর্বরতা, নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের ফলে এদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট নির্মাতা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময়ে জহির রায়হান এবং অপর কয়েকজন কলাকুশলী নির্মাণ করেন ৪টি প্রামাণ্যচিত্র। জহির রায়হানের *স্টপ জেনোসাইড* (১৯৭১) ও *এ ষ্টেট ইজ বর্ণ* (১৯৭১), আলমগীর কবিরের *লিবারেশন ফাইটার্স* (১৯৭১), বাবুল চৌধুরীর *ইনোসেন্ট মিলিয়নস* (১৯৭১)।[৮] তন্মধ্যে জহির রায়হানের *স্টপ জেনাসাইড* বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিস্থিতি নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারের জন্য ইংরেজিতে অনুবাদ করে জাতিসংঘের কাছে পাঠিয়ে সহযোগিতা কামনা করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দেশে-বিদেশের ব্যাপক সাড়া পায়।

এতবড় অর্জন জীবনের পলে পলে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। কিন্তু স্বাধীন দেশে চলচ্চিত্রে এর প্রতিফলন কতটুকু ঘটেছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে এদেশের চলচ্চিত্রানুরাগী দর্শক কিংবা সংশ্লিষ্ট মহলে।[৯] অধ্যাপক ও গবেষক আহমেদ আমিনুল ইসলামের মতে–'শিল্পমাধ্যমের অন্যান্য শাখার তুলনায় চলচ্চিত্র মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন অদ্যাবধি অনেকটাই অনুজ্জ্বল।'[১০] আবার গবেষক অনুপম হায়াতের মতে ...এদেশের চলচ্চিত্র মাধ্যমে সে আশার রূপায়ণ হয়নি। তবে বিষয়বস্তু বা আঙ্গিকগত শিল্পবিচারে বিশ্ব মানের নান্দনিক উৎকর্ষ সাধিত না হলেও মুক্তিযুদ্ধ নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের একটা প্রয়াস একাত্তর পরবর্তী সময় থেকে অদ্যাবধি এদেশে অব্যাহত রয়েছে।[১১]

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের মধ্যে চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত বাণিজ্যিক ধারায় প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র *ওরা ১১জন* (১৯৭২), সুভাষ দত্ত পরিচালিত *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* (১৯৭২),আলমগীর কবিরের *ধীরে বহে মেঘনা* (১৯৭৩), খান আতাউর রহমানের *আবার তোরা মানুষ হ* (১৯৭৩), নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত *আলোর মিছিল* (১৯৭৪), হারুনুর রশিদ পরিচালিত *মেঘের অনেক রং*,(১৯৭৬), সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়ার *একালের নায়ক* (১৯৭৯), খান খলিলুর রহমানের *জীবন এলো ফিরে* (১৯৮০), শহীদুল হক খানের *কলমীলতা (*১৯৮১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ রয়েছে আবদুস সামাদের *সূর্য গ্রহণ*, মতিন রহমানের *চিৎকার*, এ জে মিন্টুর *বাঁধন হারা*, শহীদুল ইসলাম খোকনের *বিপ্লব, সন্ত্রাস*, *কামন্ডার*, *ঘাতক*, *লাল সবুজ*, দেলোয়ার জাহান ঝন্টুর *বীর সৈনিক*, তারেক মাসুদের, *মাটির ময়না*, গাজী জাহাঙ্গীরের *জীবন সীমান্তে* প্রভৃতি চিত্রে।[১২]

১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে চলচ্চিত্র মাধ্যমসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। তখন বাংলাদেশ ফিল্ম ইন্সটিটিউট ও আর্কাইভ কর্তৃক ফিল্ম এ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সের তরুণছাত্র মোরশেদুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ২৫ মিনিট সময় সীমার স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *আগামী* (১৯৮৪) নির্মাণ করেন। সেন্সর বোর্ডের নানা বাঁধা অতিক্রম করে ছাড়পত্র পেয়ে এই চলচ্চিত্র নয়াদিল্লী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে-১৯৮৫ এ পুরস্কার অর্জন করে রেকর্ড সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে এই চলচ্চিত্রের অনুপ্রেরণায় মূলধারা বা বাণিজ্যিকবৃত্তের বাইরে দেশীয় সমাজ সংস্কৃতি নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে স্বল্পদৈর্ঘ্য ও বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ আন্দোলনের সূচনা হয়। এই প্রেক্ষপটে আগামীর ন্যায় মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে বেশ কয়েকটি স্বপ্লদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

নির্মিত হয়। মোস্তাফা কামালের *প্রত্যাবর্তন* (১৯৮৮), মোরশেদুল ইসলামের *সূচনা*, জামিউল রহমান লেমনের *ছাড়পত্র*, হাবিবুল ইসলাম হাবিবের *বখাটে* (১৯৮৯), খান আখতার হোসেনের *দুরন্ত*, (১৯৮৯), এনায়েত করিম বাবুলের *পতাকা*, দিলদার হোসেনের *একজন মুক্তিযোদ্ধা* (১৯৯০) প্রভৃতি।[১৩]

মিউজিক্যাল মুভি বা সংগীতনির্ভর চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্রে গান বলতে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্রকেই বোঝানো হয়। তবে এ কথা প্রায় সকল ধারা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেননা পাশ্চাত্যের ন্যায় এদেশে আলাদা করে মিউজিক্যাল মুভি নামে কোন সুস্পষ্ট ধারার চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে বিশেষ কতগুলো চলচ্চিত্রসমূহকে মিউজিক্যাল ছবি বলা যেতে পারে যদিও মিউজিক্যাল চলচ্চিত্রের ধারণা ভিন্নতর এবং ব্যাপক। সত্তর দশকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের পাশাপাশি গ্রামীণ পটভূমিতে সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের নানাবিধ ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। লোকজ উপাদান অন্বিষ্ট এসব চলচ্চিত্রে বাংলা গানের বিভিন্ন ধারা বিশেষত লোকসংগীতের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা অবগাহনে আধুনিক উপস্থাপনে উন্নীত। সামাজিক জীবন কাহিনিচিত্র প্রমোদকারের *সুজন সখী* (১৯৭৫), আমজাদ হোসেনের *নয়নমণি* (১৯৭৬), শিবলী সাদিকের *নোলক* (১৯৭৮) প্রভৃতি। এছাড়া সংগীত সাধক বা বাউল জীবনের কাহিনি নিয়ে *প্রাণ সজনী* (১৯৮৩) *নয়নের আলো* (১৯৮৪) *ঝিনুক মালা* (১৯৮৫) প্রভৃতি।

এছাড়া কল্পনা এবং বাস্তবতার মিশেলে রূপকথাধর্মী রাজ কাহিনিনির্ভর চলচ্চিত্র *চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা* (১৯৮৪), গ্রাম বাংলার অত্যন্ত জনপ্রিয় লোককাহিনিচিত্র *বেদের মেয়ে জোস্না* (১৯৮৯), *আলোমতি প্রেম কুমার* (১৯৮৯) প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে বলা যায়। যা সংগীত নির্ভর চলচ্চিত্র হিসেবে অগ্রগণ্য। বর্ণিত এসব চলচ্চিত্রে ৮-১২ টি গানের সন্ধ্যান পাওয়া যায়। লোক গানের আদলে আধুনিক সুর এবং কথার রূপায়ণ ঘটেছে এসব চলচ্চিত্রের গানে। এসবের মধ্যে অনেক চলচ্চিত্র দুই বাংলার অভিনেতা-অভিনেত্রীর অংশগ্রহণে যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত।

শিশুতোষ চলচ্চিত্র

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাসে শিশুদের উপযোগী নির্মিত নির্মল বিনোদনের চলচ্চিত্রের সংখ্যা খুব বেশি নয়। প্রাদেশিক সচিব কফিল উদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল 'পাকিস্তান শিশু চলচ্চিত্র সমিতি।' ১৯৫৮ সালে এই সমিতি এবং বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের সহায়তায় প্রথম শিশুতোষ চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়। সেখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এদেশে শিশুকে প্রধান উপজীব্য করে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের সংবাদ পাওয়া যায়। নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম *সান অব পাকিস্তান* (১৯৬৬) এবং এর পরিচালক ছিলেন ফজলুল হক।[১৪] স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শিশুতোষ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন পরিচালক সুভাষ দত্ত। তিনি ড. আশরাফ সিদ্দিকীর ছোট গল্প 'গলির ধারের ছেলেটি' অবলম্বনে নির্মাণ করেছিলেন কাহিনিচিত্র *ডুমুরের ফুল* (১৯৭৮) এটি বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য শিশুতোষ চলচ্চিত্র।[১৫]

এদেশে শিশুদেরকে প্রধান চরিত্রে কিংবা তাদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হলেও এগুলোকে প্রকৃত শিশুতোষ চলচ্চিত্র হিসেবে গণ্য করেননি অনেকে এবং এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। গবেষক আমিনুল ইসলামের মতে–'নির্মাতা গোষ্ঠীর বাণিজ্য ভাবনা এবং কাহিনির নাটুকেপনায় চলচ্চিত্রগুলো

শিশু বা কিশোর চলচ্চিত্রের নন্দনক্ষেত্রের সীমানা অনেকাংশেই লঙঘন করেছে।'[১৬] কি ধরনের বিষয় ভাবনার উপর শিশুদের চলচ্চিত্র নির্মিত হতে পারে সে সম্পর্কে নাট্যকার ও চলচ্চিত্র পরিচালক আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন: 'শিশু চলচ্চিত্র হবে সেই চলচ্চিত্র যার লক্ষ থাকবে শিশুর বিকাশ, শিশুর আনন্দ, যে ছবি নিয়ে শিশু ভাববে নিজেকে আবিষ্কার করবে ভিন্নভাবে, প্রত্যয়ী হয়ে উঠবে।' বাংলাদেশ শিশু একাডেমিকর্তৃক প্রযোজিত ৪১ টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। এগুলোর দৈর্ঘ্য ১০ মিনিটি থেকে ৭০ মিনিট।[১৭] এগুলোকে অনেকে শিশুতোষ চলচ্চিত্রের মর্যাদা দিতে চান। এরমধ্যে সি বি জামান পরিচালিত *পুরস্কার* (১৯৮৩) অন্যতম। এছাড়া মূলধারা বা বাণিজ্যধারা চলচ্চিত্রের মধ্যে বাদল রহমানের *এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী* (১৯৮০), আজিজুর রহমানের *ছুটির ঘন্টা* (১৯৮০) প্রভৃতি এবং এসব চলচ্চিত্রের গান আলোচনায় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

অ্যাকশনধর্মী সামাজিক চলচ্চিত্র

যে সব চলচ্চিত্রের কাহিনি বা বিষয়বস্তু মারপিট অথবা অ্যাকশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সাধারণ অর্থে সেই সব চলচ্চিত্রসমূহকে অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র বলা যেতে পারে। এই ধারার চলচ্চিত্রের মধ্যে জহিরুল হকের *রংবাজ* (১৯৭৩) বিশেষভাবে উল্লেখ্য এর মাধ্যমে এ রীতির চলচ্চিত্র নির্মাণের ধারা শুরু হয় এদেশে।[১৮] এরপর রুহুল আমীনের *বেঈমান* (১৯৭৪), ইবনে মিজানের *জিঘাংসা* (১৯৭৪), মোহাম্মদ সাইদের *সাধু শয়তান* (১৯৭৫), আজহার ও শেখ আতাউর রহমানের *স্মাগলার* (১৯৭৬), আলমগীর কুমকুমের *গুণ্ডা* (১৯৭৬), দেওয়ান নজরুলের *দোস্ত দুশমন* (১৯৭৭), চাষী নজরুলের *বাজীমাৎ* (১৯৭৮), মমতাজ আজিমের *বদলা* (১৯৭৯), দেওয়ান নজরুলের *ওস্তাদ সাগরেদ* (১৯৮১), মমতাজ আলীর *নালিস* (১৯৮২), রাজ্জাকের *বদনাম* (১৯৮৩), মমতার আলীর *নসীব* (১৯৮৪) ও *উসিলা* (১৯৮৬) প্রভৃতি অন্যতম।

পোশাকি বা ফ্যান্টাসি চলচ্চিত্র

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র মাধ্যমে সত্তর দশকের শেষার্ধে এক ধরনের নির্মাণ প্রবণতা লক্ষ করা যায় যে সব চলচ্চিত্রকে পোশাকি ও ফ্যান্টাসি চলচ্চিত্র বলে অভিহিত করেছেন অনেকে। পোশাক-আশাকের চাকচিক্য নানাবিধ সংঘাত তন্ত্রমন্ত্রের আধিক্য, যাদু বিদ্যার নানা কৌশল আশ্রিত দেশীয় কিংবা ভিনদেশীয় লোককাহিনি তথা কল্পকাহিনির সংমিশ্রণে নির্মিত হয়। যেমন–শফি বিক্রমপুরীর *রাজদুলারী* (১৯৭৮), অশোক ঘোষের *তুফান* (১৯৭৮), ফকরুল হাসান বৈরাগীর *লুটেরা* (১৯৮০), আজিজুর রহমানের *যন্তর মন্তর* (১৯৮২), ইবনে মিজানের *বাহাদুর নওজোয়ান* (১৯৮৭), এ জে মিন্টুর *বিশ্বাস ঘাতক* (১৯৮৮), দারাশিকোর *কালাখুন* (১৯৮৯) প্রভৃতি। এসব চলচ্চিত্র সম্পর্কে অধ্যাপক ও গবেষক আহমেদ আমিনুল ইসলামের মন্তব্য–

> এসব চলচ্চিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে স্থান-কাল, পাত্র-পাত্রী, সংস্কার-সংস্কৃতি, ইতিহাস বা ভৌগোলিকতাকে চূড়ান্তভাবে অস্বীকারের মাধ্যমে পোশাক-আশাকের চাকচিক্য, জৌলুশ, প্রসঙ্গে-অপ্রসঙ্গে মারামারি, সংঘাত-সংঘর্ষ, তন্ত্র-মন্ত্রের প্রাধান্য। উপরন্তু, এর সঙ্গে মাত্রাহীন অশ্লীল নৃত্য-গীতের সংযোজনও একটি লক্ষণীয় বিষয়। উল্লেখ্য, লোককাহিনি, রূপকথা বা আরব্যরজনীর স্থানীয় বা এতদ্দেশীয় কল্পিত ও মনগড়া গল্পের আদলে এসব চলচ্চিত্র নির্মিত।[১৯]

পোশাকি এবং ফ্যান্টাসি চলচ্চিত্রের প্রচারণার নামে নানা কসরতের নৃত্যগীতের পরিবেশনা এবং নারীর শরীর প্রাধান্য পেয়েছে। অনেক সমালোচক এতদ্বিষয়ে নির্মাতাদের ব্যবসায়ীক অর্থাৎ মুনাফা লাভের অন্যতম কৌশল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১১৬-১১৭, উদ্ধৃত।

২. আবদুল্লাহ জেয়াদ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : পাঁচ দশকের ইতিহাস*, জ্যোতি প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২০৭।

৩. প্রাগুপ্ত।

৪. প্রাগুপ্ত।

৫. প্রাগুপ্ত।

৬. আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১২৮।

৭. অনুপম হায়াৎ, *মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২৩। প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৩।

৮. মির্জা তারেকুল কাদের, চলচ্চিত্র মাধ্যম, ইসরাফিল (সম্পা.) *পরিবেশনা শিল্পকলা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৫৯৬।

৯. টীকা : বক্তব্যের সাক্ষ্য মেলে এই তথ্য থেকে-১৯৭২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দেশে প্রায় ২৪০০ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। তন্মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্রের সংখ্যা মাত্র ৩৩। (অনুপম হায়াৎ, *মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪৩।)

১০. আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৪১।

১১. টীকা : বক্তব্যের সাক্ষ্য মেলে চাষী নজরুল ইসলামের *মেঘের পর মেঘ* (২০০৪) হুমায়ুন আহমেদের *শ্যামল ছায়া* তৌকির আহমেদের *জয়যাত্রা*, চাষী নজরুল ইসলামের *ধ্রুব তারা* (২০০৬), মোরশেদুল ইসলামের *খেলাঘর* খিজির হায়াতের *অস্তিত্বে আমার দেশ* (২০০৭), মোস্তাফা সারওয়ার ফারুকীর *স্পার্টাকাস'*৭১ প্রভৃতি নির্মাণের মধ্য দিয়ে। (অনুপম হায়াৎ, *মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪৩-৪৪।)

১২. প্রাগুপ্ত, ২০১১, পৃ. ৪৩।

১৩. প্রাগুপ্ত পৃ. ৪৪-৪৫।

১৪. অনুপম হায়াৎ, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৩৩।

১৫. আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৩১।

১৬. ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিশুর উপস্থাপন*, *শিশুতোষ মনোভঙ্গির নৈতিক ও শৈল্পিক পটভূমি*, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪৭।

১৭. প্রাগুপ্ত পৃ. ৪৬।

১৮. আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১২০, উদ্ধৃত।

১৯. প্রাগুপ্ত পৃ. ১৩৩-১৩৪।

চতুর্থ অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের গান

দীর্ঘ আত্মক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। স্বাধীনদেশে নতুন উদ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণ কাজ শুরু হয়। যুদ্ধ সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস নিয়ে নির্মিত হয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র যা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসে বিশেষ একটি ধারার সংযোজন। এ বিষয়ে চলচ্চিত্রের ধারা বা জাতি বিশ্লেষণের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একটি গভীর যোগসূত্র রয়েছে। ফলত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্রের গান আলোচনার প্রাককালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের আলোচনা আবশ্যক। কারণ নির্মিত এসব চলচ্চিত্রে কাহিনির সূত্রধরে কিংবা যুদ্ধকালীন সময়ের বাস্তব চিত্র তুলে ধরার প্রয়াসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পরিবেশিত গান পরবর্তীতে চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও চলচ্চিত্র

বেতার এবং চলচ্চিত্র উল্লেখযোগ্য দুটি গণমাধ্যম। মুজিবনগর সরকারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ২৫ শে মে ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় সে দিনটি ছিল ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮।[১] বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এই দুটি গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এ সম্পর্কে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা শাহীন সামাদের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়–'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কখনো মোছার নয়। দিনের পর দিন শরণার্থী শিবিরে গান শুনিয়েছি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গান শুনিয়ে উদ্দীপ্ত করেছি শরণার্থী আর মুক্তিযোদ্ধাদের।[২] বেতার এবং চলচ্চিত্র উভয় মাধ্যমের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক দেশ-বিদেশের বিভিন্ন তথ্য, উদ্দীপনামূলক অনুষ্ঠান এবং বাংলার জনগণকে সংগঠিত এবং উৎসাহ করার উদ্দেশ্যে গান প্রচার করত। সাধারণ অর্থে প্রচারিত সেই গানগুলোকেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বা মুক্তিযুদ্ধের গান বলা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে গণসংগীতশিল্পী ফকির আলমগীরের মত বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য–

> মুক্তিযুদ্ধের গান বলতে সাধারণ আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পরিবেশিত গানসমূহকে বুঝালেও মুক্তিযুদ্ধের গানের পরিধির ব্যাপকতা এবং এর পটভূমি কিন্তু সুবিশাল এবং সুগ্রথিত। ইংরেজ দুঃশাসন থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সন থেকে ১৯৭১ এর মধ্যকার ভাষা আন্দোলন, স্বাধীকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতির মধ্য থেকেই এই গান উৎসারিত এর পটভূমিতে রচিত ও গীত হয়েছে। [৩]

যুদ্ধ সময়ের বিভিন্ন দৃশ্য ধারণ করে দেশ-বিদেশে প্রচার করে দেশের পরিস্থিতি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র মাধ্যমও অন্যতম ভূমিক পালন করেছিল। তদ্রুপ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জোগাতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিশেষ করে গান অপরিসীম ভূমিকা রেখেছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পরিবেশিত উল্লেখযোগ্য একটি গানের তালিকা নিম্নরূপ তুলে ধরা হলো–যা বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা,স্মৃতিচারণ ও সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত। [৪]

ক্রম	গানের শিরোনাম	রচয়িতা / অনুবাদক	সুরকার	কণ্ঠশিল্পী
১.	সালাম সালাম হাজার সালাম	ফজল এ খোদা	আবদুল জব্বার	আবদুল জব্বার
২.	জয় বাংলা বাংলার জয়	গাজী মাজহারুল আনোয়ার	আনোয়ার পারভেজ	সমবেত
৩.	শোন একটি মুজিবরের কণ্ঠ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অংশুমান রায়	অংশুমান রায়
৪.	মুজিব বাইয়া যাওরে	মোহাম্মাদ শফি	প্রচলিত	আবদুল জব্বার
৫.	আমার নেতা শেখ মুজিব	হাফিজুর রহমান	হাফিজুর রহমান	
৬.	সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের	মকসুদ আলী সাঁই	মকসুদ আলী সাঁই	
৭.	মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ
৮.	তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ	
৯.	ওরে ও বাঙালিরে	শাহ আলী সরকার	শাহ আলী সরকার	শাহ আলী সরকার
১০.	ও বগিলারে, কেন বা আইলু	হরলাল রায়	রথীন্দ্রনাথ রায়	রথীন্দ্রনাথ রায়
১১.	এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহমুদ	স্বপ্ন রায়
১২.	নোঙ্গর তোলো তোলো	নঈম গওহর	সমর দাস	সমবেত
১৩.	পূব দিগন্তে সূর্য উঠেছে	গোবিন্দ হালদার	সমর দাস	সমর দাস/সমবেত
১৪.	ছোটদের বড়দের সকলের	আলী মহসীন রেজা	রথীন্দ্রনাথ রায়	রথীন্দ্রনাথ রায়
১৫.	বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সমর দাস	
১৬.	সাত কোটি আজ প্রহরী প্রদীপ	সারওয়ার জাহান	সারওয়ার জাহান	
১৭.	রক্তে যদি ফোটে জীবনের ফুল	সৈয়দ শামসুল হক	আজাদ রহমান	
১৮.	মোদের ফসল কেড়ে নিল কে	শাহ আলী সরকার	শাহ আলী সরকার	
১৯.	মুক্ত ভাই ঝম ঝম করে	তোরাপ আলী শাহ্	তোরাপ আলী শাহ্	তোরাপ আলী শাহ্
২০.	জনপথ প্রান্তরে, সাগরের বন্দরে	মুস্তাফিজুর রহমান	আবদুল আজিজ বাচ্চু	
২১.	পথে যেতে যেতে জন্ম হলো	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ
২২.	মুক্তির একই পথ সংগ্রাম	শহীদুল ইসলাম	সুজেয় শ্যাম	
২৩.	এই সূর্যোদয়ের ভোরে এসো			

২৪.	বিজয় নিশান উড়ছে ঐ	শহিদুল ইসলাম	সুজেয় শ্যাম	অজিত রায়
২৫.	সাগর পাড়িতে ঝড় জাগেই যদি			
২৬.	হুশিয়ার হুশিয়ার হুশিয়ার	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ	
২৭.	কেঁদো না কেঁদো না মা			
২৮.	অনেক রক্তে কিনেছি আমরা	টি এইচ শিকদার	আবদুল জব্বার	আবদুল জব্বার
২৯.	অত্যাচারের পাষাণ জ্বালিয়ে দাও			
৩০.	আমি এক বাংলার মুক্তিসেনা			
৩১.	জন্ম আমার ধন্য হলো	নঈম গরহর	আজাদ রহমান	
৩২.	গেরিলা আমরা আমরা গেরিলা	গণেশ ভৌমিক	গণেশ ভৌমিক	
৩৩.	আমার মুক্তিবাহিনী ভাইরা	তোরাপ আলী শাহ্	তোরাপ আলী শাহ্	তোরাপ আলী শাহ্
৩৪.	অবাক পৃথিবী দেখো	নূর আলম সিদ্দিকী		কামরুল হাসান
৩৫.	ওরে আমার দেশের মানিক	শাহ আলী সরকার	শাহ আলী সরকার	
৩৬.	এ ঘর দুর্গ ও ঘর দুর্গ	গীতিনকশা: শাহজাহান ফারুক	সংগীত: সুজেয় শ্যাম	বর্ণনা: আশরাফুল আলম
৩৭.	রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি	আবুল কাসেম সন্দ্বীপ	সুজেয় শ্যাম	
৩৮.	বাংলা থেকে দুশমনদের	সরদার আলাউদ্দিন	সরদার আলাউদ্দিন	
৩৯.	বলো বীর সৈনিক	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ
৪০.	শেখ মুজিবর সত্য যুগের	তোরাপ আলী শাহ্	তোরাপ আলী শাহ্	তোরাপ আলী শাহ্
৪১.	পথের আঁধার আর নাই	লাকী আকন্দ	লাকী আকন্দ	
৪২.	রক্ত চাই (গীতি নক্শা)	সংগীদ: সুজেয় শ্যাম		
৪৩.	সংগ্রাম সংগ্রাম		অনুপ ভট্টাচার্য	
৪৪.	জাগো জাগো ও বাঙালি			
৪৫.	ভেবো না মাগো তোমার ছেলেরা	মোস্তফিজুর রহমান গামা	সমর দাস	
৪৬.	আমরা সবাই মুক্তিবাহিনী	আবদুল হালিম বয়াতি	আবদুল হালিম বয়াতি	হযরত আলী বয়াতি

৪৭.	জনগণ চায়না যারে সে কেমনে থাকতে চায়	আবদুল হালিম বয়াতি	আবদুল হালিম বয়াতি	হযরত আলী বয়াতি
৪৮.	মানুষ হ’ মানুষ হ’	গুরু সদয় দত্ত	গুরু সদয় দত্ত	
৪৯.	যায় যদি য়াক প্রাণ তবু দেব না	আবু হেনা মোস্তফা কামাল	আবু হেনা মোস্তফা কামাল	
৫০.	হেই সামালো হেই সামালো	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	
৫১.	আইলামরে স্মরণে বাংলা মায়ের গড়নে	সলীল চৌধুরী	সলীল চৌধুরী	সরদার আলাউদ্দিন
৫২.	জগতবাসী একবার বাংলাদেশকে যাও দেখিয়ারে	জহির হোসেন	সরদার আলাউদ্দিন	সরদার আলাউদ্দিন
৫৩.	রুখে দাঁড়াও রুখে দাঁড়াও রাখিতে সম্মান	রজ্জব আলী দেওয়ান	সরদার আলাউদ্দিন	সরদার আলাউদ্দিন

সত্তর দশকের চলচ্চিত্রের গতি প্রকৃতিতে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ১৯৭৫ সালের পর থেকে এর গতি ক্রমশ হ্রাস পায়। চলচ্চিত্রে সাধারণত কাহিনি বা বিষয় কিংবা বিশেষ কোন চরিত্রের সূত্র ধরেই গানের প্রয়োগরীতির কথা থাকলেও দৃশ্যত ভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। দর্শককে হলমুখী করার বিশেষ মাধ্যম কিংবা জনপ্রিয়তা লাভের অন্যতম উপাদান হিসেবে ফর্মুলাভিত্তিক গানের প্রয়োগও লক্ষণীয়। তবে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে গান ব্যবহারের চিত্রটি ভিন্নতর বিশেষত যুদ্ধোত্তরকালের চলচ্চিত্রসমূহে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের মধ্যে চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত বাণিজ্যিক ধারায় প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র *ওরা ১১জন* (১৯৭২), সুভাষ দত্ত পরিচালিত *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* (১৯৭২),আলমগীর কবিরের *ধীরে বহে মেঘনা* (১৯৭৩), খান আতাউর রহমানের *আবার তোরা মানুষ হ* (১৯৭৩), নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত *আলোর মিছিল* (১৯৭৪), হারুনুর রশিদ পরিচালিত *মেঘের অনেক রং*,(১৯৭৬), সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়ার *একালের নায়ক* (১৯৭৯), খান খলিলুর রহমানের *জীবন এলো ফিরে*(১৯৮০), শহীদুল হক খানের *কলমীলতা* (১৯৮১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্ণিত প্রতিনিধিত্বশীল চলচ্চিত্রসমূহ পর্যালোচনা করলে নিম্নোরূপ বিষয়ের গানসমূহ পাওয়া যায়–

দেশাত্ববোধক গান
প্রণোদনামুখী গান
জাগরণের গান
বিজয়ের গৌরব বন্দনার গান
ফ্যাসিবাদ ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের গান
আশা জাগানিয়া গান

১. দেশাত্ববোধক গান

বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ড জন্মলগ্ন থেকেই নানা চক্রান্তের শিকার। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পরাশক্তির পতন ঘটে। এদেশের মানুষ তার

জীবনের প্রতিটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করার জন্য গানকে প্রধান অস্ত্র কিংবা অনুপ্রেরণার অন্যতম শক্তি হিসেবে বেছে নিয়েছে। ফলে শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে রচিত এবং পরবর্তীতে তা চলচ্চিত্রেও স্থান করে নিয়েছে। এরমধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত গানটি–

ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকায় মাথা
তোমাতে বিশ্ব মায়ের আঁচল পাতা ॥

চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত *ওরা ১১জন* (১৯৭২) চলচ্চিত্রে গানটি ব্যবহার করা হয়েছে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে। চলচ্চিত্রের শুরুতেই দেখা যায় 'ও আমার দেশের মাটি কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ গানটি আমরা গ্রহণ করেছি'।[৫] যন্ত্রানুষঙ্গে পরিবেশনার মধ্য দিয়ে ছবির টাইটেল প্রদর্শিত হয়। পরবর্তীতে দেখানো হয় একজন যুদ্ধ ফেরত মুক্তিযোদ্ধা তার বিধ্বস্ত দেশকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করছেন। শান্ত স্নিগ্ধ নদীমাতৃক চিরায়ত গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্য ধারণের মধ্য দিয়ে অভিনেতা খসরু'র ভিউ পয়েন্টে নেপথ্যকণ্ঠে পরিবেশিত হয় গানটি।

প্রসঙ্গত, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ রাজত্বের পর বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে শিল্প-সংস্কৃতি গড়ে উঠে। শুরু হয় পাকিস্তানি শাসন এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সেই শোষণের অবসান ঘটায় বীর বাঙালি। বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পূর্ব পাকিস্তানি শাসন আমলে এই অঞ্চলে (বাংলাদেশে) রবীন্দ্র চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বাংলার শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তির কাছে রবীন্দ্রনাথের গল্প, কবিতা, গান, নাটক ইত্যাদি অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল। এই নিষেধাজ্ঞার কারণে নির্মাতারা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহার করার সাহস পেতেন না।[৬]

যুদ্ধকালীন সময়ে মানুষের অনিশ্চিত জীবন যাত্রা অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, চোখের সামনে প্রিয়জনের নির্মম হত্যাকাণ্ড এ সকল কিছু শেষ পর্যন্ত সামগ্রিক শক্তিতে পরিণত হয়। মুক্তিসেনাদের কোন আধুনিক অস্ত্র ছিল না তারা অস্ত্র পরিচালনায় তেমন পারদর্শীও ছিল না। কিন্তু অস্ত্রের ন্যায় সাংস্কৃতিক কর্ম তৎপরতার মাধ্যমে সাহস ও শক্তি যুগিয়েছে বার বার। মুক্তির গান বা মুক্তিযুদ্ধের গান ছিল সেই শক্তি সাহসের অন্যতম হাতিয়ার। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ড, মা বোনদের ভূলুণ্ঠিত সম্ভ্রম, লক্ষ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগ ইত্যাদি নান্দনিকভাবে রূপায়িত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে। সেই সাথে আরো স্মরণীয় যে, কণ্ঠ সৈনিকেরা গান গেয়ে মুক্তিকামি মানুষের মনে যে শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন সে কথাও দৃষ্ট হয় সুভাষ দত্ত পরিচালিত *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* (১৯৭২) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটিতে–

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধকরি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি ॥

গোবিন্দ হালদারের রচনায়, আপেল মাহমুদের সুরে ও কণ্ঠে দেশমাতৃকাকে রক্ষার দাবীতে বাংলার প্রতিটি মানুষকে দেশপ্রেম উজ্জীবিত করতে অসাধারণ ভুমিকা রেখেছিল গানটি। দৃশ্যায়নে দেখা যায়

যুদ্ধাহত উজ্জ্বল, আনোয়ার হোসেন (ছবির চরিত্রে নাম আনু) সহ আরো অন্যান্য যুদ্ধ সৈনিকদের লক্ষ্য করে বলে–'অগো এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিব ক্যাডায়? মইরাতো গেছিলামই এইবার না হয় অগো মাইরা মরুম।' তারপর বেশ কয়েকজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা বেতারে পরিবেশিত 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' গানটি শুনতে থাকে। গানটি শেষ হলে ঘোষক ঘোষণা দেন–আপনারা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনছেন। এরপর বলেন–'বজ্রকণ্ঠ' শুরু হয় শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ–'আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করা হবে।' মুক্তিযুদ্ধে এই ধরনের দেশপ্রেমের উদ্দীপনামূলক গান বার বার শুনিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সাহস জোগাতে এবং এই সাহসকে আরো বাড়িয়ে তুলতে গানের পর পরই শোনানো হতো শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠের ভাষণ।

চিত্র-১ : *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* (১৯৭২) চলচ্চিত্রে 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' গানের একটি স্থিরচিত্রে মুক্তিসেনারা।

মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং শিল্পীদের কণ্ঠে পরিবেশিত উদ্দীপনামূলক গান মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণার অন্যতম শক্তি হিসেবে অবদান রেখেছিল। বক্ষ্যমাণ চলচ্চিত্রেও তা দৃষ্ট হয় মহিমার অনন্য স্মারক হিসেবে এবং উপরোল্লেখিত স্থিরচিত্রটি তারই সাক্ষরবাহী ।

২. প্রণোদনামুখী গান

যে সব গান প্রণোদনা জাগাতে বিশেষভাবে সহায়তা করে সাধারণ অর্থে সেই গানসমূহকে প্রণোদনামুখী গান বলা যায়। চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত *ওরা ১১ জন* চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি যুদ্ধজয়ের অন্যতম প্রেরণা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দৃশ্যায়নে দেখা যায়, যুদ্ধ জয়ের লক্ষ্যে জয় বাংলার জয় বাংলা, তোমার নেতা, আমার নেতা, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব এই শ্লোগান এবং লেখা সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে একটি মিছিল। জয় বাংলা বাংলার জয় গানটি যন্ত্রানুষঙ্গে বাজতে থাকে এবং এর মধ্য দিয়ে শ্লোগান মুখর জনতার স্রোতের সামনে মুজিবের বজ্রকণ্ঠের ভাষণ পরিবেশিত হয়–

চিত্র-২: *ওরা ১১ জন* (১৯৭২) চলচ্চিত্রের একটি স্থিরচিত্রে ভাষণরত শেখ মুজিবুর রহমান।

'তোমাদের আমার উপর বিশ্বাস আছে? কোন এক জনতা বলে ওঠে–আছে, মুজিব ভাষণে বলেন –আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশে মানুষের অধিকার চাই। সাত কোটি মানুষকে দাবাইয়া রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদেরকে দমাতে পারবে না। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্।'[৭]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারণার মাধ্যমে 'জয় বাংলা বাংলার জয়, হবে হবে হবে নিশ্চয়' প্রণোদনামুখী এই গান একাত্তরে যুদ্ধজয়ের চূড়ান্ত শক্তি হিসেবে অপরিসীম ভূমিকা রেখেছিল। ফকরুল আলম পরিচালিত *জয় বাংলা* (১৯৭২) চলচ্চিত্রের জন্য গানটি সমবেত কণ্ঠে ধারণ করা হয়।[৮] বাংলার মুক্তিকামী মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জোগাতে যুদ্ধ জয়ের এক তীব্র শক্তির প্রলম্বিত রূপ প্রতিফলিত হয় গানটিতে। নয়টি অন্তরা বিশিষ্ট বৃহৎ গানের বাণীতে বাংলার হুবহু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের সার্বিক পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে তার যথাযথ অনুধাবন এই গানের বাণীতে লব্ধ হয়–

জয় বাংলা বাংলার জয়
হবে হবে হবে নিশ্চয়
কোটি প্রাণ এক সাথে জেগেছে অন্ধরাতে
নতুন সূর্য উঠার এই তো সময় ॥

গানটির শেষ অন্তরায় দেখা যায় যে, বাঁচার মত বাঁচতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অত্যাচারী শোষকদের আজ কোন মুক্তি নাই। তাদেরকে পরাজিত করাই একমাত্র মুক্তি। যুদ্ধ জয়ের প্রণোদনামুখী গানটি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুর করেছেন আনোয়ার পারভেজ। বিবিসি'র শ্রোতা জরিপে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গানের একটি হিসেবে বিবেচিত। যুদ্ধজয়ের অন্যতম শক্তিরূপে আরেকটি ভিন্ন আবেশের গান আলমগীর কবির পরিচালিত *ধীরে বহে মেঘনা* (১৯৭৩) চলচ্চিত্রে লক্ষ করা যায়। যেখানে বলা হয়েছে–' শান্ত তবুও সুপ্ত সে নয়' সব মহলে এই গানের আবেদন বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। গীতিকার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সুরকার সমর দাস, কণ্ঠশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

কত যে ধীরে বহে মেঘনা
শান্ত তবুও সুপ্ত সে নয়
কাজল জলে অতল তলে
দোলায় আশা জাগে হৃদয় ॥

৩. জাগরণের গান

জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য যে গান অন্যতম শক্তি হিসেবে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে সাধারণভাবে তাকে জাগরণের গান বলা যেতে পারে। নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত *আলোর মিছিল* (১৯৭৪) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি সুন্দর একটি দিন গড়ার প্রত্যয়ে জাগরণের গান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। দেশে চোরাকারবারী, মজুতদার, দুর্নীতিবাজদের সংখ্যা যখন দিনকে দিন বেড়ে চলে তখন এর বিরুদ্ধে একদল যুবক শহীদ (আনোয়ার হোসেন) এবং রানার (রাজ্জাক) নেতৃতে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা আশায় বুক বেঁধে দিন বদলের ডাকে আহবান করে সকলকে। একদল তরুণ দ্বারা পরিচালিত 'মুক্ত বিহঙ্গ' সংগঠনের বার্ষিক উৎসবের আয়োজনে খন্দকার ফারুক আহমেদের নেপথ্যকণ্ঠে এবং রাজ্জাকের অভিনয়ে পরিবেশিত হয় গানটি–

দিন বদলের দিন এসেছে কান পেতে ঐ শোন
ন্যায় অন্যায়ের হিসাব-নিকাশ হবে এবার জেনো ॥
শক্ত আঘাত হানো ॥

গীতিকার মোস্তাফিজুর রহমান, সুরকার সত্য সাহা। আলমগীর কবির পরিচালিত *ধীরে বহে মেঘনা* (১৯৭৩) চলচ্চিত্রে যুদ্ধ জয়ের লক্ষ্যে আহবানের সূত্র ধরে ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নোক্ত গানটিও–

ওরে আয় ঘরে আয়
সাগর ভেঙ্গে বন্যার বেগে আয়
আকাশ রেঙে ঝঞ্ঝার বেগে আয়
সূর্যোদয়ের এই প্রহরে
মুক্তি পাগল ওরে আয় ঘরে
দুর্বার সংগ্রাম দুর্জয় নাম
আঁকে যে ঐ পতাকায় ॥

প্রকৃতির অসীম শক্তির উপমায় ব্যক্ত হয়েছে–'সাগর ভেঙ্গে বন্যার বেগে আয়, আকাশ রেঙ্গে ঝঞ্ঝার মেঘে আয়, সূর্যোদয়ের এই প্রহরে মুক্তি পাগল ওরে আয় ঘরে...।' নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গীতিকার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সুরকার সমর দাস।

৪. বিজয়ের গৌরব বন্দনার গান

বিজয়ের আনন্দ এরং গৌরব বহন করে এমন গানসমূহকে বর্ণিত শিরোনামের গান বলা যায়। যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণকারী ১১জন মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে নির্মিত হয় চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত *ওরা*

১১ *জন* (১৯৭২) চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটিতে বিজয়ের গৌরব বন্দনার বয়ান পরিলক্ষিত হয়। দৃশ্যায়নে দেখা যায় চলচ্চিত্রের শেষে পরিচালক এক প্রশ্নের মুখাপেক্ষী করেন দর্শকশ্রোতাদের। যুদ্ধ শেষে স্বাধীন দেশের সমাজে ধর্ষিত নারীদের পরিণতি কি হবে। এ এক মহাকাব্যিক ব্যাখ্যার উপস্থাপন যেন। মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন দেশে পৌঁছেছেন এবং পাকিস্তানি বাঙ্কার থেকে ধর্ষিত মেয়েরা একে একে বেরিয়ে আসছেন। লং শটের মাধ্যমে তা দেখানো হয়। মুক্তিযোদ্ধা খসরুর প্রেমিকা শীলা (নূতন) পাকিস্তানিদের হাতে লাঞ্ছিতা। তার প্রাণ খসরুর কোলে এসে ঝরে পড়ে। প্রেমিকার নিথর দেহ দু'হাতে কোলে তুলে যখন প্রেমিক খসরু সম্মুখ পানে দুঃখ ভারাক্রান্ত শরীরে অগ্রসরমান, সেই সময়ে বেজে চলে নিম্নোক্ত গান। বাংলার আকাশ বাতাস গভীর বেদনায় যেন অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে–

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা
আমার তোমাদের ভুলব না ॥

চিত্র-৩: *ওরা ১১ জন* (১৯৭২) চলচ্চিত্রে 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে'
গানের একটি স্থিরচিত্রে মুক্তিযোদ্ধার কোলে নির্যাতিতা বীর বীরাঙ্গনানারীর নিথর দেহ (খসরু এবং নূতন)।

অপরদিকে যুদ্ধ জয়ের শেষে রাজ্জাক মিতার (শাবানা) সন্ধান করতে যান ডাক্তার হাসান ইমামের কাছে। উত্তরে ডাক্তার বলেন: 'ও বড় (মিতার) ক্লান্ত। তাছাড়া আমার যতদূর মনে হচ্ছে ও আপনার কাছ থেকে পালাতে চাইছে। রাজ্জাক উত্তরে বলেন: 'কিন্তু কেন' 'এই কেন'র উত্তর আমি হয়তো সহজে দিতে পারব না। তবে এইটুকু বললে হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন। মিতা হানাদারদের হাতে লাঞ্ছিতা, অপমানিতা। শুধু আপনার কাছ থেকে নয়, সে হয়তো জীবনের কাছ থেকেও পালাতে চাইছে।' মুক্তিযুদ্ধে এই রকম শত শত বীরাঙ্গনা রয়েছে যারা নিজের সাথে নিজেই পালিয়ে বেড়াতেন। হয়তো স্বাধীনতার ছেচল্লিশ বছর পরেও এখনো অনেক বীরাঙ্গনা আছেন যারা সমাজ, সংসারে উপেক্ষিত এবং স্বামী-সন্তানের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন প্রতিনিয়ত।[৯] পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যুদ্ধে বিভিন্নভাবে সহায়তাপূর্ণ অংশগ্রহণকারী নারীদের অবদানের স্বীকৃতি বা মূল্যায়ন প্রশ্নবিদ্ধ। চলচ্চিত্র গবেষক কাবেরী গায়েনের ভাষায়–

> একই যুদ্ধে তার প্রেমিক যোদ্ধার মর্যাদায় আসীন, মহিমান্বিত কিন্তু সে মুক্তিযুদ্ধের সকল অভিজ্ঞতা, নির্যাতন এবং আত্মত্যাগ সত্ত্বেও নিজের জন্য কেবল আত্মহত্যার কথাই চিন্তা করতে পারে। তার বেঁচে থাকা তখন

> নির্ভর করে পুরুষ মুক্তিযোদ্ধার মহানুভবতার উপর।'[১০] তবে যুদ্ধে নির্যাতিতা অনেক বীর নারী যারা তাদের স্বীকৃতি কিংবা মূল্যায়নে সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন।[১১]

মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সরকার নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্রের ব্যবস্থাসহ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।[১২] উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিত প্রতীয়মান হয় যে, দেশের জন্যে যারা আত্মত্যাগ করেছেন তাদের শ্রদ্ধার্ঘে নিবেদিত সকল জীবিত এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার প্রতি গৌরবময় বন্দনার স্বরূপ উন্মোচনে গানটি পরিবেশিত হয়। বিশিষ্ট গীতিকার গোবিন্দ হালদারের রচনা, স্বপ্না রায়ের সুরারোপিত ও কণ্ঠের এই গানটি[১৩] বিবিসি'র শ্রোতা জরিপে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গানের একটি হিসেবে বিবেচিত হয়।

চিত্র-৪: *ওরা ১১ জন* (১৯৭২) চলচ্চিত্রে 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে' গানের একটি স্থিরচিত্রে নির্যাতিতা বীর বীরাঙ্গনা নারীরা

একই বিষয়ের আরেকটি গান খান আতাউর রহমানের *আবার তোরা মানুষ হ* (১৯৭৩) চলচ্চিত্রে যুদ্ধোত্তর পরিবেশে কতিপয় তরুণ ছাত্রের বিপথগামীতাকে কেন্দ্র করে ব্যবহৃত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলীতে ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিষিক্ত করা হয় গানটির মাধ্যমে। দেশ প্রেমে নিবেদিত হয়ে যে সকল বাংলার দামাল ছেলেরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এক অশেষ বন্দনা হিসেবে ব্যবহৃত হয় নিম্নোক্ত গানটি। ইতিহাসে সকলের নাম স্থান না পেলেও এ কথা স্বীকার্য যে, দেশের আপামর জনগণ সেদিন যুদ্ধে ঝাপিয়ে না পড়লে পরাধীনতার শেকলে বন্দি থেকে যেতো এদেশের মানুষ। সেদিনের যুদ্ধে নাম না জানা অনেকেই প্রাণ দিয়েছে কিন্তু অনেক লোকের মাঝে হয়তো কারো কারো নাম অব্যক্ত রয়ে যাবে। কিন্তু বিজয়ী বীর মুক্তিসেনাদের চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ কবরে এদেশের মানুষ তারই প্রকাশ গানটিতে–

এক নদী রক্ত পেরিয়ে বাংলার আকাশে
রক্তিম সূর্য আনলে যারা
তোমাদের এই ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না
না না না শোধ হবে না
মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
সাত কোটি মানুষের জীবনের সন্ধান আনলে যারা

সে দানের মহিমা কোনদিন ম্লান হবে না
না না না ম্লান হবে না ॥

দৃশ্যায়নে দেখা যায় মঞ্চের পেছনে লেখা রয়েছে 'তোমাদের এ ঋণ কোনদিন শোধ হবে না।' নিচের লাইনে বঙ্গবাণী মহাবিদ্যালয়। শাহনাজ রহমতুল্লাহ ও সহশিল্পীবৃন্দের নেপথ্যকণ্ঠে ববিতা হারমোনিয়াম বাজিয়ে অন্যান্য অভিনয়শিল্পীদের সহযোগে গানটি পরিবেশন করে। গানটির গীতিকার এবং সুরকার খান আতাউর রহমান।

৫. ফ্যাসিবাদ ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের গান

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কোন গানকে বর্ণিত গানের আওতাভুক্ত করা যায়। নিম্নোক্ত গানটি সে চেতনারই পরিবাহী। অগ্রপথিক ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮) শুধু একটি নাম নয়, বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে সর্বকালের করুণ ইতিহাস যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নিম্নোক্ত গানটিতে। ঐ সময়কালে ক্ষুদিরামকে নিয়ে পীতাম্বর দাস বাউলের লেখা গানটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়।[14] নিম্নোক্ত গানটির অংশ বিশেষ সুভাষ দত্তের *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* (১৯৭২) চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

একবার বিদায় দেমা ঘুরে আসি
ওমা হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারত বাসী ॥

চিত্র-৫: (ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮)

চলচ্চিত্রে দেখা যায় যে, আনোয়ার হোসেন চলচ্চিত্রের কাহিনিতে একজন জনপ্রিয় অভিনেতা। যুদ্ধের সময় ভারতে অবস্থান করে। সাহসিকতার অভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে না বলে ভীষণ মর্মাহত হয়। ক্ষুদিরামের মূর্তির পিড়ির গায়ে 'ফাসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান' লেখাটি থেকে জুম ইন শট হয়। তারপর বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষুদিরামের মূর্তিটি দেখানো হয়। দোতারার টুং টাং সুর-তালে বেজে উঠে উপরোক্ত গানটি সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে। আনোয়ার হোসেনের চোখে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তি, কানে প্রতিধ্বনিত হয় মুজিবের ভাষণ, আরো অনেক বীর, ইতিহাসের আত্মত্যাগী বিভিন্ন মহান ব্যক্তির মূর্তি দেখে তার মনে নানা অভিব্যক্তি তৈরি হয় তা যেন সাহস কিংবা শক্তি সঞ্চয়ের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে। চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত *ওরা*

১১জন (১৯৭২) চলচ্চিত্রে এই গানের ছায়া অবলম্বনে রচিত নিম্লোক্ত গানটিও। গাজী মাজহারুল আনোয়ারের কথায় এবং খোন্দকার নূরুল আলমের সুরে।

আমায় একটি ক্ষুতিরাম দাও বলে কাঁদিসনে আর মা
আমরাতো আছি তোর সাত কোটি সন্তান
জনমের ঋণ মাগো শুধিব রক্ত দিয়ে
যায় যদি যাক প্রাণ
কোরাস ওহো-ও হো

এই গানগুলো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অন্যতম অবদান রেখেছিল যা আজো সমান ভাবে সকলের কাছে সমাদৃত।

৬. আশা জাগানিয়া গান

সাধারণ অর্থে যে গান বেঁচে থাকার অন্যতম অনুপ্রেরণা বা সাহস হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখে সেই গানকে আশা জাগানিয়া গান বলা যায়। নিম্লোক্ত গানটিতে সেই রূপেরই প্রকাশ। *ওরা ১১জন* (১৯৭২) চলচ্চিত্রে দেখা যায় যুদ্ধের সময় ভারতে অবস্থান করে আনোয়ার হোসেন। যখন দেশ স্বাধীন হওয়ার কথা সে জানতে পারে। তখন দেশে ফেরার কথা ভাবতেই তার স্বভাবসুলভ কাপুরুষতা, ভীরুতা প্রভৃতি তাকে ঘিরে ধরে। নিজের ভেতরে নানা দ্বান্দ্বিকতা দানা বেঁধে ওঠে। নিজেকে কোনভাবেই বোঝাতে পারে না। একাকী ঘরে নিজের সাথে নিজের বোঝাপড়ার সংলাপে তা-ই দৃষ্ট হয়। 'কোন মুখে দেশে ফিরে যাবো? কি জবাব দেব আমার ভক্তদের... আমার দেশবাসীর কাছে... এরপর কি আমার জনপ্রিয়তা থাকবে? আনোয়ার হোসেন কি বেঁচে থাকবে?' এ রকম নানা রকম প্রশ্নের উদ্রেক হয় তার মনে। যুদ্ধে কোন ভূমিকা রাখতে না পারার কারণে ব্যর্থতার গ্লানি তাকে মর্মাহত করে প্রতিনিয়ত।

এমন পরিস্থিতিতে নিম্লোক্ত গানটি নতুন করে কিছু করার উদ্যোগ কিংবা অনুপ্রেরণার অন্যতম শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে বেজে উঠে সমবেত কণ্ঠে। গানের মাঝে যুদ্ধাহত সৈনিককে (উজ্জ্বল) দেখানো হয় এবং ঘোষণায় বলা হয়: 'মিত্রবাহিনীর সহায়তায় মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছে।' অর্থাৎ প্রায় সবাই দেশের জন্য কিছুনা কিছু করছে। তুমি শেষ পর্যন্ত কি ভাবলে দেশের জন্যে অনেক তো ভীরুতার পরিচয় দিলে। অভিনেতা আনোয়ার হোসেনের মাধ্যমে সমগ্র দেশের মানুষের দায় যেন তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন পরিচালক। এর সাথে রোমেনার (ববিতা) গলাও ভেসে আসে 'আপনি আমাগো গ্যারামে শ্যুটিং করবার আইছিলেন হেইডাও দেখছি।' এক সময় এই চলচ্চিত্রে দেখা যায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে তৈরি হয় নানা সংকট। এখান থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে পরিচালক নিম্লোক্ত গানের অবতারণা করেন। যে গানে দেশকে নতুনভাবে গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়–

আগুন জ্বালো ব্যর্থতার আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই চাঁদের আলো ॥

বক্ষ্যমাণ বিষয়ে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্রে যে সব গান আলোচনায় ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি তালিকা নিম্নরূপ তুলে ধরা হলো:

ক্রম	গানের শিরোনাম	গীতিকার/সুরকার	কণ্ঠশিল্পী	চলচ্চিত্র/ পরিচালক	বিষয়/মন্তব্য
১	ও আমার দেশের মাটি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান	সমবেত	*ওরা ১১জন* (১৯৭২) চাষী নজরুল ইসলাম	দেশাত্মবোধ
২	জয় বাংলা বাংলার জয়	গাজী মাজহারুল আনোয়ার/ আনোয়ার পারভেজ	বাদ্যযন্ত্রে পরিবেশিত হয়	ঐ	প্রণোদনা
৩	আমায় একটি ক্ষুদিরাম দাও	গাজী মাজহারুল আনোয়ার/খোন্দকার নূরুল আলম	খোন্দকার নূরুল আলম	ঐ	ব্রিটিশবিরোধী ও ক্ষুতিরাম প্রসঙ্গ
৪	এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	গোবিন্দ হালদার/ আপেল মাহমুদ	স্বপ্না রায় ও সহশিল্পীবৃন্দ	ঐ	বিজয়ের গৌরব বন্দনা
৫	মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি	গোবিন্দ হালদার/ আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ	*অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* (১৯৭২) সুভাষ দত্ত	দেশাত্মবোধ
৬	একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি	কথা ও সুর: পীতাম্বর দাস	সাবিনা ইয়াসমিন	ঐ	ব্রিটিশবিরোধী ও ক্ষুতিরাম প্রসঙ্গ
৭	আগুন জ্বালো ব্যর্থতার আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান	সমবেত	ঐ	আশা জাগানিয়া
৮	কত যে ধীরে বহে মেঘনা	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান /সমর দাস	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	*ধীরে বহে মেঘনা* (১৯৭৩) আলমগীর কবির	জাগরণ
৯	এক নদী রক্ত পেরিয়ে বাংলার	খান আতাউর রহমান/ খান আতাউর রহমান	শাহনাজ রমতউল্লাহ ও সহশিল্পীবৃন্দ	*আবার তোরা মানুষ হ* (১৯৭৩) খান আতাউর রহমান	বিজয়ের গৌরব বন্দনা
১০	দিন বদলের দিন এসেছে কান পেতে ঐ শোন	মুস্তাফিজুর রহমান/সত্য সাহা	খন্দকার ফারুক আহমেদ	*আলোর মিছিল* (১৯৭৪) নারায়ণ ঘোষ মিতা	জাগরণ

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. ফকির আলমগীর,*গণসঙ্গীত ও মুক্তিযুদ্ধ*, অনন্যা, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ২০৫।

২. রাসেল মাহমুদ, দিনের পর দিন শরণার্থী শিবিরে গান শুনিয়েছি, মতিউর রহমান (সম্পা.) *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৮ এপ্রিল, ঢাকা, ২০১৫।

৩. ফকির আলমগীর,*গণসঙ্গীত ও মুক্তিযুদ্ধ*, অনন্যা, প্রথমা প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১০ পৃ. ২০৫।

৪. (সাইম রানা, *বাংলাদেশের গণসংগীতের বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২২৮-২২৯/ ফকির আলমগীর, *গণসঙ্গীত ও মুক্তিযুদ্ধ,* অনন্যা, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১০/ https://bn.wikipedia.org/wiki/স্বাধীন_বাংলা_বেতার_কেন্দ্র)

৫. চলচ্চিত্র থেকে সংগৃহিত।

৬. টীকা : এই বক্তব্যের সাক্ষ্য মেলে ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় এফ ডিসি প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭০ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত প্রায় পাঁচশ চলচ্চিত্রের মধ্যে মাত্র দুটি চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহৃত হয়েছে। একটি সালাহ্উদ্দিনের ‘ধারাপাত’(১৯৬৩) এবং অপরটি জহির রায়হানের ‘জীবন থেকে নেয়া’(১৯৭০)। ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’ গানটি ব্যবহৃত হয়েছে উক্ত চলচ্চিত্রে। বর্তমানে এই গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃত। গানটি চলচ্চিত্রের মুখ্য চরিত্র অভিনেতা আনোয়ার হোসেন এবং তার বোনদের কণ্ঠে গীত হয়। (অনুপম হায়াৎ, *রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র,* দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১২৫।)

৭. চলচ্চিত্র থেকে সংগৃহিত।

৮. সুমন চৌধুরী, চলচ্চিত্রের গান, ইসরাফিল শাহীন (সম্পা.) *পরিবেশনা শিল্পকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,* ২০০৭, ঢাকা, পৃ. ১৮৭।

৯. বক্তব্যের সাক্ষ্য মেলে কুমিল্লা চৌদ্দ গ্রামের বীরাঙ্গনা আফিয়া খাতুন খঞ্জনার মেয়ে রোকসানা কথা থেকে সে বলে– “মা ‘মা এখন কতা কয়না কারও লগে। যুদ্ধের পর দাদি মাকে নষ্ট বেটি বইলা বাড়ি থেইক্যা বাইর কইরা দেয়।” (মনসুরা হোসাইন, তাঁরা জাতির স্যালুট পাওয়ার যোগ্য, মতিউর রহমান (সম্পা.) *প্রথম আলো,* ঢাকা, ২২ মার্চ, ২০১৬, পৃ. ১৪।)

১০. ড. কাবেরী গায়েন, মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা ২০১২, পৃ. ৪৩।

১১. বক্তব্যের সাক্ষ্য মেলে সিরাজগঞ্জের বীরাঙ্গনা রাজুবালার কথায়– “মুক্তিযোদ্ধারা বন্দুক দিয়া যুদ্ধ করছে , দ্যাশ স্বাধীন করছে। আমরা নিজের মান দিয়া দ্যাশ স্বাধীন করছি। মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সন্তানরা সম্মান পায়। আমরা পাই না ক্যান? আমরা মানের স্বীকৃতি চাই।” (মনসুরা হোসাইন, তাঁরা জাতির স্যালুট পাওয়ার যোগ্য, মতিউর রহমান (সম্পা.) প্রথম আলো, ঢাকা, ২২ মার্চ, ২০১৬, পৃ. ১৪)

১২. বক্তব্যের সাক্ষ্য মেলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে। মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয় ১৯৭২ সালে। ১৯৭৩ সালে থেকে পুর্নবাসন কেন্দ্রের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন মালেকা খান। তিনি বলেন– “৭২ সাল থেকেই এই নারীদের স্বীকৃতির দাবি তুলেছিলাম। এই নারীরা জাতির কাছ থেকে একটি স্যালুট পাওয়ার যোগ্য। যা হোক অবশেষে সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে সে জন্য সরকারকে ধন্যবাদ।” প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল জামুকায় এক সভায় মুক্তিযোদ্ধাদের নতুন সংজ্ঞায় একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের হাতে নির্যাতনের শিকার নারীদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৪।

১৩. সাইম রানা, *বাংলাদেশের গণসংগীতের বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৭৮।

১৪. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪১।

পঞ্চম অধ্যায়

চলচ্চিত্রে গানের সুরশৈলী

চলচ্চিত্রে সাধারণত প্রেম-ভালবাসা, বিরহ-বেদনা, রাগ-অনুরাগ, মান-অভিমান, বিদ্রোহ, দেশপ্রেম, বিবেক বোধ, পারিবারিক বন্ধন, কিংবা বিশেষ পরিস্থিতি অথবা বক্তব্য প্রকাশে গানের প্রচলন রয়েছে। এই গান দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত বিষয় আশয়কে ঘিরে যেমন উপস্থাপিত। তেমনি এর সুর বাংলার প্রচলিত লোকঐতিহ্যিক বিবিধ সুরধারা যেমন–ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি, বারমাসী, কীর্তন, শ্যামাসংগীত, মুর্শিদী, কর্মসংগীত, যাত্রা, গীতিকা, পদাবলী, পুথি, মঙ্গলগীত, বিয়ের গীত, মেয়েলি গীত, বিচ্ছেদী, বাউল গান ইত্যাদি থেকে উপাদান সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহৃত। এবং নানা বৈচিত্র্যতার সমাবেশে উপস্থাপিত। লোকসুর কখনো মৌলিকত্বমণ্ডিত অবয়বে আবার কখনোবা নিরীক্ষা প্রবণতায় ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কখনো হুবহু গান ও সুরের ব্যবহারও লক্ষণীয়। এ সম্পর্কে সংগীত গবেষক ও শিল্পী সুমন চৌধুরীর পর্যবেক্ষণ প্রণীধানযোগ্য–

> এদেশে গানের উপাদান সংগ্রহের মূল উৎস তিনটি। এক: লোকগীতি, দুই: রাগ সংগীত, তিন: উপমহাদেশের বাইরে এবং অন্যান্য সংগীতের সূত্রে প্রাপ্ত সুর। ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বাউল, কীর্তন, জারি, সারি, মুর্শেদী, মারফতি, দেহতত্ব, তথা নানা বর্ণের লোক সুরকে বিভিন্নভাবে মিশিয়েছে। কখনও নির্ভেজাল রাগ-সংগীতের সাথে, কখনও দাদরা ঠুমরী, গজলের সাথে কখনও বা পাশ্চাত্য সংগীতের নানা রকম ভিনদেশিসুরের সাথে আবার ভাটিয়ালি, মুর্শেদী, মারফতি, বাউল, কীর্তন, অর্থাৎ দেশজ সুরের নানা রং তৈরি করেছেন। সিনেমার গানও এর ব্যতিক্রম নয়।[১]

তবে সাধারণ গান থেকে চলচ্চিত্রের গানের পার্থক্য এখানেই যে, তা হলো এর একটা প্রেক্ষাপট থাকে। যা কাহিনির বিশেষ পরিস্থিতি কিংবা বিষয় অথবা চরিত্রের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। ফলে এই গানের রয়েছে বিশেষ সুরকৌশল, পদ্ধতি যা শিরোনামে শৈলী হিসেবে আখ্যায়িত, যা আবার গায়কির বিশেষ দিক নির্মাণ করে। এ কথা সাধারণত কাহিনি কিংবা চরিত্রের প্রয়োজনে বিশেষভাবে রচিত গানসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদিও পূর্বে প্রতিষ্ঠিত অনেক গান জনপ্রিয়তার সূত্র ধরে পরবর্তীতে চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে চলচ্চিত্রের জন্য রচিত এবং প্রাসঙ্গিক গানগুলোকেই গবেষণায় অধিক প্রাধান্য দেয়া হয়েছে অর্থাৎ যে সব গানের সুরের ধরন বা গায়কি ভিন্ন, যা সহজেই সাধারণ গান থেকে আলাদা এবং যুক্তিযুক্ত। কারণ চলচ্চিত্রে গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর বিষয় এবং গায়কি। ফলে এই গানের ধারণা ব্যাপকতর। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সুরকার, সংগীতশিল্পী, সংগীত পরিচালক এবং বাংলা খেয়ালের জনক আজাদ রহমান বলেন–

> সাধারণ গানটাকেই প্রধান করে চিন্তা করা হয়। কিন্তু চলচ্চিত্রে, যে চরিত্রে গান হচ্ছে যে নায়ক বা নায়িকার কণ্ঠে গান হবে তার চরিত্র তার আবেগ, তার অনুভূতি সবকিছু প্রকাশ করতে হয়। গান বানাতেই হবে ওভাবে এবং সেখানেও চলচ্চিত্রায়ণ কিভাবে হবে সেখানে গানের মাঝে কি দেখানো হবে, কেমন করে তিনি গাইবেন এই সবকিছুই পরিচালকের মনে রাখতে হবে। সেই ভঙ্গি যাতে ব্যবহার করা যায় তার জন্য গানের রিদম, গানের কথা, গানের যন্ত্রানুষঙ্গ সব কিছু কিন্তু সংগীত পরিচালকের চিন্তা করে প্রকাশ করতে হয়। রেকর্ডিংও সেভাবে করতে হবে। গায়ক-গায়িকার সেভাবে গাওয়াতে হবে এবং সর্বোপরি সবকিছু মিলিয়ে দর্শক যেন আনন্দ পায় সেটাই হলো বড় কথা।[২]

অর্থাৎ অনেকগুলো বিষয়সমূহের সমাহার ঘটে এই গানে। ফলে এর রয়েছে আলাদা সুরপদ্ধতি, সুরশৈলী। শৈলী বলতে সাধারণত রীতি-নীতি, প্রচলন, কায়দা, বিধি বিধান, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ইত্যাদিকে বোঝায়। চলচ্চিত্রে গানের সুরশৈলী নির্ণয় করতে গিয়ে নির্ণিত হয়েছে বিবিধ সুরধারা যার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের গান নানা মাত্রিকতায় প্রবাহিত। এসব সুর ব্যবহারের কারণ ও উদ্দেশ্য, কখন কিভাবে তা ব্যবহৃত হয়েছে তার উল্লেখ। এছাড়া গায়কি, সাধারণ গান থেকে চলচ্চিত্রে গানের পার্থক্যের একটি তালিকা নিরূপণ, ভিনদেশি সুর গায়কি, রাগ-রাগিণী, ভাব-রসের ব্যবহার, সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য শিল্পীর গায়কি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবং সময়ের সাথে সাথে সুরের গায়কির পরিবর্তন, সংযোজন-বিয়োজন ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় আশয়ও উঠে এসেছে উক্ত আলোচনায়। এই অধ্যায়ের শেষে তার একটি তালিকাও নিরূপণ করা হয়েছে।

চলচ্চিত্র বিচিত্র বিষয় নিয়ে নির্মিত এবং এসব চলচ্চিত্রের গানও তার বিচিত্র বিষয়বৈভবে সমৃদ্ধ। যেমন–লোকজ গান/গীতিকা বা পালার গান, প্রেমের গান, বিরহের গান, পারিবারিক বন্ধনের গান, মাতৃত্ববোধের গান, মাতৃভক্তি ও মাতৃবন্দনার গান, পারিবারিক বিচ্ছেদের গান, বিবেকের গান, আধ্যাত্মিক চেতনা ও আত্মোপলব্দির গান, আসরকেন্দ্রীক বা মনোরঞ্জনমূলক গান, জীবনমুখী গান, দেশ-মাতৃকার গান, ব্যঙ্গাত্মক বা হাস্যরসের গান, সই/সখীদের গান, দোস্ত/বন্ধুর গান, শিক্ষা প্রসারের গান, শিশুকণ্ঠে মুক্তি ও দেশাত্ববোধের গান, আত্মোৎসর্গের গান, দ্রোহ ও মৌন প্রতিবাদের গান, সৃষ্টিকর্তার কৃপা লাভ ও নীরবতা ভঙ্গের গান, বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের গান, স্মৃতি বা স্বজনকে ফিরে পাওয়ার গান, কল্পনার চোখে স্বপ্নপূরণের গান, পাশ্চাত্য বা মাইকেল জ্যাকসন প্রভাবিত গান, মদ্যপায়ীর গান, স্ট্রিট সং বা পথের গান প্রভৃতি।

এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ এবং চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জাতীয় এবং চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে দেশাত্ববোধক গান, প্রণোদনামুখী গান, জাগরণের গান, বিজয়ের গৌরব বন্দনার গান, ফ্যাসিবাদ ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের গান, আশা জাগানিয়া গান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। যদিও এর অধিকাংশ গান স্বাধীন বাংলা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এবং পরবর্তীতে তা কাহিনির সূত্রধরে চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত। এতদ্বিষয়ে গানের বিষয়বৈচিত্র্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবুও প্রসঙ্গক্রমে আলোচনায় এসেছে। উপরোক্ত আলোচনায় বর্ণিত বিষয়ের গান প্রথমত, গ্রামীণ বা লোকসুর সুর অথবা গীতিকা বা পালার সুর যা লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারায় প্রতিস্থাপিত। দ্বিতীয়ত, কলকাতা এবং পাকিস্তানের সিনেমার গান দ্বারা অনুপ্রাণিত বা শহুরে মানুষের আধুনিক ধ্যান ধারণা প্রসূত সুর। এছাড়া রয়েছে শাস্ত্রীয় ও বিদেশি বা পাশ্চাত্য সুরের প্রভাবে সৃষ্ট গান। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রে এসব গানের সুর প্রধানত চারটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। নিম্নরূপভাবে তা দেখানো হলো–

১. গ্রামীণ বা লোক সুর
২. আধুনিক সুর
৩. শাস্ত্রীয় সুর
৪. বিদেশি বা পাশ্চাত্য সুর

উপরোক্ত চার রকম সুর নানা ধরনের সুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নিম্নরূপভাবে তা বিশ্লেষণ করা যায়।

লোক সুর	শাস্ত্রীয় সুর	আধুনিক সুর	বিদেশি সুর
ভাটিয়ালি	বিভিন্ন রাগ-রাগিণী	বাদ্য ও তালের সংযোজনে	পপ, রক, ফোক
ভাওয়াইয়া	ভিত্তিক বিশেষ ধারার	বিশেষ ধারার গায়কি	ট্র্যাডিশনাল অর্কেস্ট্রা
বাউল	ঠুমরী, গজল গায়কি কৌশল		
কীর্তন			
শ্যামাসংগীত			
প্রভৃতি			

এছাড়া চলচ্চিত্রে গানের চার রকম রূপ পাওয়া যায়। যথাক্রমে–কাহিনিমূলক যা সাধারণত গীতিকা বা পালার গানে তা লক্ষণীয়। যেমন–*রূপবান* (১৯৬৫) চলচ্চিত্রে রূপবানের গানে যে বেদনার কথা প্রকাশিত হয় তার মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান হয়। অথবা *গুনাই বিবি* (১৯৬৬) চলচ্চিত্রে গুনাই চরিত্রের যে বেদনা বা তার প্রকাশ সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বিপ্লব বা বিদ্রোহমূলক–'কারার ঐ লৌহ কপাট' যদিও এটি কাহিনির সূত্রধরে ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষভাবে রচিত নয় অথবা 'দাও দাও দুনিয়ার সব গরীবকে আজ জাগিয়ে দাও' অনুবাদী গান (*জীবন থেকে নেয়া* -১৯৭০) চলচ্চিত্রে। হাস্যরসাত্মক বা ব্যঙ্গধর্মী–কৌতুক অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়ে পরিবেশিত–'মরি হায়রে হায় দুঃখে পরান যায়' (*বেহুলা*-১৯৬৬) চলচ্চিত্রের গানটিতে সে কথাই দৃষ্ট হয়। বিবেকবোধ বা শিক্ষামূলক–মানুষের বিবেকবোধকে জাগ্রত করার জন্য বিশেষ অনুপ্রেরণায় পরিবেশিত হয়েছে এই গান ;কখনো তালে বা বৈতালে লম্বা সুরের টানে ব্যবহৃত।

সুর ব্যবহারের কারণ ও উদ্দেশ্য

উপরোক্ত সুরধারা চলচ্চিত্রের গানে নানা মাত্রিকতায় উপস্থাপিত। সাংগীতিক পরিমণ্ডলে যে বিভিন্ন আঙ্গিকের সুর এসে চলচ্চিত্রের গানে সমন্বিত হয়েছে তার কারণ ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপভাবে পর্যালোচনা করা যায়–

১. লোকসুর/গীতিকা বা পালার সুর

ক. বাংলা সাহিত্যের বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে লোকসাহিত্য। দীর্ঘকাল ধরে গ্রাম বাংলার লোকঐতিহ্যিক জনপ্রিয় বিভিন্ন গীতিকা বা পালার গান এবং তার সুর এদেশের প্রায় প্রতিটি মানুষের কানে লেগে আছে। তারই ধারাবাহিকতায় লোকজ সুরের ব্যবহার অধিক মাত্রায় লক্ষণীয়।

খ. চলচ্চিত্রের অধিকাংশ দর্শক নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির এবং তার বেশিরভাগ গ্রামে বসবাস করে। ফলে তাদের রুচিবোধ, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতির কথা বিবেচনায় লোকসুরকেই অধিক মাত্রায় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

গ. এছাড়া চলচ্চিত্র অত্যন্ত ব্যয় বহুল একটি গণমাধ্যম। ফলে সর্বোপরি ব্যবসায়িক সাফল্য বিশেষভাবে বিবেচিত হয়। লোকমানসে তাই চলচ্চিত্রে গান সহজবোধ্য হয়ে উঠার জন্য

পরিচালক খুব সচেতনভাবে বৃহৎ পরিসরের কথা ভেবে চলচ্চিত্রের কাহিনি বা বিষয়-আশয় নির্বাচন করেন। এবং গানের সুর রচনা করার ক্ষেত্রেও একই ভাবে বিবেচনা করা হয়।

২. আধুনিক সুর

ক. আধুনিক সুর কাঠামোয় কোন ধরনের বাধ্যবাধকতা না থাকায় সুরকার তার রুচিবোধ ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে রচনা করার প্রয়াস পান।

খ. সিনেমা হলে দর্শক এক ধরনের রোমান্টিসিজম নিয়ে বসে থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবে শাস্ত্রীয় আলংকারিক সুর বর্জন করে আধুনিক সুর তাল বা ছন্দকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়।

গ. সব শ্রেণির দর্শকের কথা বিবেচনা করে আধুনিক সুর সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া কলকাতার চলচ্চিত্র যখন এদেশের প্রায় সর্বত্র ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে তখন স্বাভাবিকভাবে তার সুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে এদেশের চলচ্চিত্রের গানের সুর।

৩. রাগ রাগিণী কিংবা শাস্ত্রীয় সুর

ক. প্রতিটি গান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কোন গানই রাগ-রাগিণীর প্রভাব মুক্ত নয়। সেই বিচারে মৌলিক হোক আর মিশ্র হোক কোন সুরই শাস্ত্রীয় সুরের বাইরে নয়। কিছু রাগ-সংগীতের আঙ্গিক বা চরিত্র ব্যতীত।

খ. চলচ্চিত্রে আসরকেন্দ্রীক বা মনোরঞ্জনমূলক গান যা বনেদি বা জমিদার শ্রেণির ব্যক্তিদের বিনোদনের অন্যতম মধ্যম ছিল। ফলে কাহিনির সূত্রধরে পরিবেশ তৈরির প্রয়াস নির্মাণে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে রাগ-সংগীতের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

৪. বিদেশি বা পাশ্চাত্য সুর

ক. চলচ্চিত্র তথ্যপ্রযুক্তির অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি মাধ্যম ফলে সঙ্গত কারণেই বিদেশি সুরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বিভিন্ন সমালোচকের মতে বিদেশি বাদ্যযন্ত্র আমদানি করার সাথে সাথে সুরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। এছাড়া চরিত্রানুযায়ী গানের সুর এবং গায়কি নির্বাচিত হয়। ফলে এরই ধারাবাহিকতায় বিদেশি বাদ্যযন্ত্রের সাথে সাথে তার সুরও ঢুকে পড়েছে।

খ. দর্শককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করার জন্যে নতুনত্বের মডেল হিসেবে বিদেশি সুরকে ধারণ করা হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর কথা ভেবে চলচ্চিত্র পরিচালক সেই মান দণ্ডের কাছে নিজের কর্মকে দাঁড় করানোর জন্যও এই সুর ব্যবহার করতে আগ্রহবোধ করেছেন।

মুক্তিপ্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রে গানের বিষয়, অভিনীত চরিত্র এবং প্রয়োগ ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক সুরশৈলী বা সুরের ধরন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

১. গ্রামীণ বা লোক সুর/গীতিকা বা পালার সুর

চলচ্চিত্রে গানের সুরের মধ্যে লোকসুর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ এবং মিশ্ররূপে পাওয়া যায় তার উল্লেখযোগ্য আঙ্গিক ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বাউল, কীর্তন আঞ্চলিক ও মিশ্রসুর প্রভৃতি। গ্রাম বাংলার জনপ্রিয়

যাত্রাপালা–*রূপবান, বেহুলা, গুনাই বিবি, মালকা বানু* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ফলে লোকগানের প্রভাবে চলচ্চিত্রের গান পরিপুষ্ট বললেও ভুল হবে না। রূপবানের সীমাহীন দুঃখ বেদনার কথকতা গানে গানে ব্যক্ত হয়েছে। ব্যবহৃত হয়েছে অনেকগুলো গান যার প্রায় প্রতিটি গান একই সুরে গীত–'কিসের লেখা কিসের পড়া গো/ও দাইমা কিছুই ভালো লাগে না/আমার দাইমা দাইমা গো' অথবা 'বাড়িরও না দক্ষিণ পাশে গো/ও দাই মা কিসের বাদ্য বাজে গো/আমার দাইমা দাইমা গো' প্রভৃতি। গানের স্বরবিন্যাস নিম্নরূপঃ

স স গ া | গ ম প া
প ম গ র | গ ম গ া
া া গ প | প া া প
ধ ণ ধ প | ম প া ধ

বেহুলা (১৯৬৬) চলচ্চিত্রে বাউল গান, বিয়ের গান, চিরায়ত গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যিক বিষয়গুলোকে তুলে আনা হয়েছে তা লোক সুরের আদলে। এছাড়া যমুনা, কলসি, রসের সাগর, রঙ্গ প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে, রাধা কৃষ্ণের প্রেমকাহিনির উল্লেখ রয়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠানের নানা পর্যায়ের গান–বাসর রাতের গান, বর-কনের হলুদ অনুষ্ঠানের গান, সাপের মন্ত্র পাঠ প্রভৃতি যা লোকবিশ্বাসের অন্তর্গত। এসবই লোক সুরে এবং লোকাঙ্গিকে রচিত ও পরিবেশিত। গ্রাম বাংলার জনপ্রিয় লোকপালা ফয়েজ চৌধুরী পরিচালিত *মালকা বানু*-১৯৭৪ চলচ্চিত্রে–'মালকা বানুর দেশে রে বিয়ার বাদ্য আল্লাহ বাজে রে।' গানটি বিয়ের আনন্দ উৎসবের বিশেষ অনুষঙ্গ হিসেবে পরিচিত এবং চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত।

বিরহী মনের রূপ প্রতিমূর্তিত হয়েছে–'বিধি বইসা নিরলে' (*আসিয়া*-১৯৬০) গানে এবং কর্মসংগীতের প্রয়োগ রয়েছে–'ধান বানি আমি নারী ওড়ুম কি গাইনে' আবার লোক মানসের বিশ্বাস বা লোক জীবনের স্বরূপ নির্ণয়ে–'দ্যাওয়ায় করছে মেঘ মেঘালি' এবং গ্রামাঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ রূপায়ণে সহজ সরল কথা মালায় পরিবেশিত হয়েছে–'আইলোরে আইলোরে সর্বনাশী ঢল' (*যে নদী মরুপথে*-১৯৬১) প্রভৃতি। আবার আঞ্জুমান আরা বেগম এবং নাজমুল হুদার দ্বৈতকণ্ঠে পরিবেশিত–'অভিমান করো না তুমি কি গো বুঝ না' (*হারানো দিন*-১৯৬১) গানটিকে নিরীক্ষাধর্মী গান বলা যায়। কারণ গানটির প্রথম দুই চরণে চলতি ভাষার রূপ স্পষ্ট কিন্তু তৃতীয় চরণে আঞ্চলিকতার প্রকাশ ঘটেছে–'যার লাইগা মুই কাইন্দা মরিরে সে জন বুঝে না, মনের দুঃখে মরলাম আমি মন যে পাইলাম না।' গানগুলোতে রাগ সুরের প্রয়োগ থাকলেও মূলত তা লোকসংগীতের বিভিন্ন আঙ্গিকেরই পরীক্ষামূলক সংযোজন বলা যেতে পারে।

ভাটিয়ালি

গ্রাম বাংলা তথা লোকগানের অত্যন্ত জনপ্রিয় ধারা ভাটিয়ালি, এ গানের বিষয় লৌকিক ও আধ্যাত্মিক প্রেম। অনন্ত আকাশ, অন্তহীন বিষণ্ন নিঃসঙ্গতাই ভাটিয়ালি গানের মূল বৈশিষ্ট্য।[৩] এই গানের সুর নদীর প্রবহমানতার মতই সরল এবং তা সরল রৈখিকভাবে গীত হয়। এই সুরের ব্যবহার রয়েছে অনেক গানে তারমধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য–'আমি ভিন গেরামের নাইয়া, বাণিজ্যের লাইগা ফিরি সোনার তরী বাইয়া' (*মুখ ও মুখোশ*-১৯৫৬) এটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে গানের ইতিহাসে

প্রথম লোকসুরের গান যা মাঝি চরিত্রের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়েছে। *রূপবান* (১৯৬৫) চলচ্চিত্রে আধ্যাত্মিক অর্থ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে–'ঢেউ উঠছে সাগরে, ক্যামনে পাড়ি ধরিরে।' এটিও জনৈক মাঝির অভিনয়ে পরিবেশিত হয়েছে বিবেকের গান হিসেবে। একইভাবে *সিরাজদ্দৌলা* (১৯৬৭) চলচ্চিত্রে কাজী নজরুল ইসলামের ভাটিয়ালি আঙ্গিকের গান–'এ কুল ভাঙ্গে ও কূল গড়ে, এইতো নদীর খেলা' প্রভৃতি।

ভাওয়াইয়া

লোকসংগীতের জনপ্রিয় আরেকটি ধারা ভাওয়াইয়া। অঞ্চলগতভাবে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত। নর-নারীর, প্রেম-বাসনা, মিলনাকাঙ্ক্ষা, বিরহ-যাতনা ইত্যাদি অবলম্বন করে অধিকাংশ গান রচিত। তবে আধ্যাত্মিক ভাবনা ব্যতীত নয়। সুরেও স্বাতন্ত্র রয়েছে, সুরের উৎস বিষয় ও তার পরিবেশ। এ গানের প্রধান বাদ্যযন্ত্র দোতরা।'[৪] চলচ্চিত্রে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়, যদিও এ গানটি পূর্বে থেকেই জনপ্রিয় এবং বহুল পরিচিত। 'ও কি গাড়িয়াল ভাই, কত রব আমি পন্থের পানে চাইয়ারে।'(*বাল্যবন্ধু*-১৯৬৮)চলচ্চিত্রে কাহিনির সূত্রধরে তা ব্যবহৃত হয়েছে। এবং বিখ্যাত ভাওয়াইয়া গান– 'ও কি ও বন্ধু কাজল ভ্রমরারে' এই গানের সুরের আদলে *সুজন সখী* (১৯৭৯) চলচ্চিত্রে–'ও কি ও নিদয়া বিধিবাম হইলরে।'[১] গানটি তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া–'ও মোর সোনার বন্ধুরে, প্রাণের বন্ধুরে ও মোর নোলকটা বানিয়া দে' গানটি *নোলক* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্যামা সংগীত

শ্যামা সংগীতের প্রয়োগ রয়েছে (*চাপা ডাঙ্গার বউ*-১৯৮৬) চলচ্চিত্রে–'মা আমার সাধ না মিটিল আশা ফুরিল সকলই ফুরিয়ে যায় মা।' যদিও গানটি ওপার বাংলায় অনেক আগে থেকেই বহুল জনপ্রিয়। চলচ্চিত্র পরিচালকের চাহিদানুযায়ী কিংবা সুরকার, সংগীত পরিচালকের বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার অংশ হিসেবে বাংলা গানের বিবিধ ধারার প্রয়োগ লক্ষ করা গেছে। তার দৃষ্টান্ত হিসেবে (*সারেং বৌ*-১৯৭৮) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটি–

হিরামতি হিরামতি ও হিরামতি
আমি যামু সুধারাম কন্যা মতি
তোমার লাইগা আনমু কি
পুতির মালা আনমু কি

পুতির মালা কালা সুতায় লাল
পুতির মালা ধলা সুতায় নীল
পুতির মালা গলার অধিক
পুতির মালা...
পুতির মালা গুলবদনী ঝিলিক
বড় গাঙ্গে নাউ ভাসিয়ে গহীন জলে ডুবাল দিয়ে

আমি যামু সুধারাম কন্যামতি

কথা বলা যায় যেখানে শ্যামাসংগীত এবং কীর্তন সুরের প্রয়োগ রয়েছে। যেমন–'পুতির মালা কালা সুতায় লাল, পুতির মালা ধলা সুতায় নীল, পুতির মালা গলার...ঝিলিক' এখানে শ্যামাসংগীত এবং 'বড় গাঙ্গে নাউ ভাসিয়ে গহীন জলে ডুবাল দিয়ে...কন্যামতি' এই অংশে লম্বা যে টান তাতে কীর্তন সুরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে উক্ত গানের শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়ের কাছ থেকে জানা যায় গানটি সুর করার সময় চলচ্চিত্র পরিচালক (আবদুল্লাহ আল মামুন) সুরকারকে (আলম খান) বলেছিলেন যে আলম তুমি কি জানো রথীন (রথীন্দ্রনাথ রায়) কীর্তন জানে, শ্যামাসংগীত জানে? গানে এর ব্যবহার করা যায় কিনা ? পরবর্তীতে সুরকার গানটিতে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন।[৫]

কীর্তন

বৈষ্ণব পদাবলীকে ভিত্তি করে এবং সনাতন ধর্মের অনুসারীদের কীর্তন গান যা রাধা কৃষ্ণের লীলা অবম্বন করে রচিত হয়। মহিউদ্দীন ফারুক পরিচালিত *বিরাজ বৌ* (১৯৮৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি কীর্তন সুরে রচিত–

ভালবাসা সে তো মরে না মরে না মরে না এক মরণে
জনম জনম লাখ লাখ যুগ বাঁধা থাকে প্রাণে মনে
বধূ তোমার আমার এই যে বিরহ বোঝাবো বলো কি দিয়া ॥

বাদ্যযন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়াম, খোল, মৃদঙ্গ, করতাল বা জুরি। কপালে চন্দনের বড় তিলক এবং গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। এ গানটি মন্দিরা এবং খোল বাদ্যের তেহাই বাজার মধ্য দিয়ে শুরু হয়। *রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত* (১৯৮৭) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিতেও কীর্তন সুর লক্ষণীয়–

বিধি রে বিধি আমার...
বিধি কমলও করিয়া পাঠালো আমায়
লাগলাম না কারও পূজাতে

বাউল গান

বেহুলা (১৯৬৬) চলচ্চিত্রে বাউল গানের ব্যবহার–'এ ভব সংসারে জনম জনম ধরে, তোমারই চরণ বীণা নেই বাসনা' অথবা 'আমি না জানিলাম না চিনিলিাম রে/তারে কাছে পাইয়া দূরে রইলাম রে' (*আরাধনা*-১৯৭৮) প্রভৃতি।

আধুনিক উপস্থাপনে লোক সুরের গান

লোক গানের আধুনিক উপস্থাপন চলচ্চিত্রের গানে বিশেষ সংযোজন বলা যায়। যদিও এটির সূচনা চলচ্চিত্রের গানের প্রায় সূচনালগ্ন অর্থাৎ ষাটের দশক থেকেই হয়েছে। তার অন্যতম দৃষ্টান্ত *সুতরাং* (১৯৬৪) চলচ্চিত্রের–'পরানে দোলা দিল এ কোন ভ্রমরা' গানটি। তবে তা স্বাধীনতার পর বিশেষ করে আশির দশকে এর বিস্তার বাড়ে। এ সময়ে লোকসুরের আদলে এক ধরনের গান যার সাথে

নাগরিক সুরের সমন্বিত রূপের প্রয়াস বলা যায়; বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। সত্তর দশকে *সুজন সখী* (১৯৭৫), আশির দশকের *প্রাণ সজনী* (১৯৮৩), *ঝিনুক মালা* (১৯৮৫), লোককাহিনি এবং রূপকথাভিত্তিক চলচ্চিত্র *চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা* (১৯৮৪), *বেদের মেয়ে জোস্না* (১৯৮৯), *আলোমতি প্রেম কুমার* (১৯৮৯) প্রভৃতি চলচ্চিত্রের গানগুলো তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। গ্রামীণ পটভূমিতে নির্মিত *সুজন সখী* চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি তার রূপবাহী–

সব সখীরে পার করিতে নেব আনা
তোমার বেলায় নেব সখী
তোমার কানের সোনা সখী গো ॥

গানটি দ্রুত দাদরা তালে নিবন্ধিত। মধ্য লয়ে ৩/৩ ছন্দে আবর্তিত, সহজ সরল ভাষায় সাবলীল পরিবেশনা। অন্তরায় দীর্ঘ সুরের টান লক্ষ করা যায়–'ও ও ও সুজন সখীরে' তা কেবল বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থেকে করা হয়েছে বলে উপলব্ধ হয়। গানটিতে দেখা যায় নায়ক নৌকা চালায় অপরদিকে নায়িকা সখীদের নিয়ে নদীর পার ধরে হেঁটে যায়। দেনা পাওয়ানাকে কেন্দ্র করে নায়ক তার মনের কথাটি ব্যক্ত করে। এক ধরনের নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি হয়। তাতে লম্বা সুরের বিশেষ টানটির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে গুরুত্ব বহন করে *সারেং বৌ* চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটি লোকজ এবং আধুনিক উপস্থাপনে উন্নীত–

ওরে নীল দরিয়া
আমায় দেরে দে ছাড়িয়া
বন্দি হইয়া মনুয়া পাখি
হায়রে কান্দে কান্দে রইয়া রইয়া ॥

গানটি কাহার্বা তালে ৪/৪ ছন্দে নিবন্ধিত। এ গানটির সুরকার, সংগীত পরিচালক আলম খান গানটি নির্মাণ সম্পর্কে বলেন–

> আমি যে সব গানে কাজ করেছি তার বেশির ভাগই লোক সুরের আদলে করা। যেমন–'ওরে নীল দরিয়া আমায় দেরে দে ছাড়িয়া' মুকুল চৌধুরীর রচনায় *সারেং বৌ* চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। অথবা মনিরুজ্জামান মনিরের রচনায়–'আমি একদিন তোমায় না দেখিলে তোমার মুখের কথা না শুনিলে পরান আমার রয়না পরানে' এসব সুরে রয়েছে লোকজ ভাব কিন্তু লোকজ বিষয়ের আধুনিক উপস্থাপন করা হয়েছে।[৬]

দৃষ্টান্তস্বরূপ আরও কিছু গানের উল্লেখ করা যায় যা লোকজ উপাদানে অন্বিষ্ট এবং আধুনিক উপস্থাপনায় উন্নীত–'গুন গুন গুন গান গাহিয়া নীল ভ্রমরা যায়' (*সুজন সখী*-১৯৭৫), 'আমি যেমন আছি তেমন রবো/বউ হবো নারে/কারো বউ হবো নারে' (*অশিক্ষিত*-১৯৭৮), 'আমি আছি থাকব/ভালবেসে মরব' (*সুন্দরী*-১৯৭৯),'এই নিশি রাইতে তোমার ঘরে যাইতে/মন যে উতাল পাথাল করে বধূয়া' (*নরম গরম*-১৯৮৪), 'আইলো দারুণ ফাগুনরে, লাগলো মনে আগুনরে' (*চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা*-১৯৮৪), 'তুমি ডুব দিওনা জলে কন্যা, ঝিনুক খুঁজে পাইবা না' (*ঝিনুক মালা*-১৯৮৫), 'তুই যে আমার জানের জান, তুই যে আমার প্রাণের প্রাণ' (*নিষ্পাপ*-১৯৮৬),'জল খাইতে গিয়াছিলাম

দীন ভিখারির বাড়ি, কে যেন জল এনে দিল রে’ (*আলোমিত প্রেম কুমার*-১৯৮৯), ‘বেদের মেয়ে জোস্না আমার কথা দিয়েছে’ (*বেদের মেয়ে জোস্না*-১৯৮৯) প্রভৃতি।

এছাড়া *বেদের মেয়ে জোস্না* চলচ্চিত্রে বিবেকের গান–‘মায়ায় গড়া এই সংসারে/কেউ কাঁদে কেউ যায় রে চলে, মিছে কেন কাঁদিসরে নদীর কিনারায়।’ আশির দশকের শেষের দিকে এই গানটির মাধ্যমে বিবেক আবার নতুন জীবন পায়। কারণ আকাশ সংস্কৃতির আবির্ভাবে নির্মাতারা ধীরে ধীরে নগর জীবনের কাহিনি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়ে পড়েন। ফলে নগর জীবনের কঠিন বাস্তবতায় এবং চাকচিক্যতার মোহে পড়ে বিবেক অনেকাংশে লোপ পায়। তবে এ সময়ে আত্মোপলব্ধি এবং আধ্যাত্মিকতার ভাবাদর্শে রচিত হয় অনেক গান। যে সব গানের গায়কিতে আধুনিক রূপ লক্ষণীয়। কতিপয় গানের মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়–‘এই পৃথিবীর পান্থশালায় গাইতে এসে গান’ (*যোগ বিয়োগ*-১৯৭০), ‘সবাই বলে বয়স বাড়ে/আমি বলি কমেরে’ (*ফকির মজনু শাহ*-১৯৭৮), ‘হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস/দম ফুরাইলে ঠুস্’, ‘ও তোরা দেখ দেখ রে চাহিয়া’ (*বড় ভালো লোক ছিল*-১৯৮২), ‘খোদার ঘরে নালিশ করতে দিল না আমারে’ (*নালিশ*-১৯৮২), ‘ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে’ (*প্রাণসজনী*-১৯৮৩),‘এই আছি এই নাই/ওরে এই আছি এই নাই/দুইদিন পরে কেউবা ধূলো কেউ বা হবো ছাই’ (*নয়নের আলো*-১৯৮৪) ‘ভবের এই খেলা ঘরে খেলে সব পুতুল খেলা’ (*ঝিনুক মালা*-১৯৮৫), ‘ও তুই ডাকলি যারে আপন করে/সে তো অসহায়’ (*বেদের মেয়ে জোসনা*-১৯৮৯) প্রভৃতি। এসব গানের বাণী, শব্দ চয়ন, স্বর প্রক্ষেপণ, সুরের চলন, গায়কি ইত্যাদি নগরায়ণের ধ্যান ধারণা দ্বারা পরিপুষ্ট এবং আধুনিক উপস্থাপনায় অগ্রগামী।

২. আধুনিক সুর

আধুনিক গানের সুরের গঠন রোমান্টিক আবার মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রও একটি আধুনিক শিল্পমাধ্যম। ফলে দুইয়ের মাঝে রোমান্টিকতার একটা গভীর যোগসূত্র রয়েছে। চলচ্চিত্রে যে রোমান্টিক গানের অধিক ব্যবহার এবং সুবিশাল পরিসর তা কেবল এই সুরেই রচিত। এতদ্‌বিষয়ে গানের বিষয় বৈচিত্র্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রচলিত সুর কাঠামো থেকে সরে এসে চলিত ভাষার রীতি অনসুরণ অনেকটা সহজ সরল উপস্থাপনা ও দেশি-বিদেশি বাদ্যযন্ত্রসহ সুরের উদার সংযোজন ইতাদি হলো এই সুরের অন্যতম বেশিষ্ট্য। প্রসঙ্গত, বিশ শতকের গোড়ার দিকে তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব পড়ে বাংলা গান তথা শিল্প সংস্কৃতির নানা শাখা প্রশাখায়। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তন বাংলা গানকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। একদিকে চলচ্চিত্রের যাত্রারম্ভ (১৯৩১), রেডিওর জনপ্রিয়তা, গ্রামোফোনের প্রসার ইত্যাদি।[৭] মূলত এই সময় থেকেই বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে শিল্পবিভাজন শুরু হয়। গীতিকার, সুরকার এবং কণ্ঠশিল্পী। এই ত্রয়ীশিল্পীদের সমন্বয়ে প্রচুর গান তৈরি হয় দেশি-বিদেশি যন্ত্রানুসঙ্গ এবং সুরের সমন্বয়ে। মিউজিকলজিস্ট সাইম রানার ভাষায়–

> ভক্তিমূলক, ধর্মীয় কিংবা লোকসুর অথবা শাস্ত্রীয় সংগীতের কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে এক প্রকার লঘু সংগীতের সৃষ্টি–যা সমাজ জীবনের অধিকার সচেতনতা, দেশপ্রেমের স্পর্শ নিয়ে রচিত। কিছুটা ফরমায়েসিও বলা যায়। ভাষার চলন, চলিত রীতি, সুরের সারল্য, যন্ত্র ব্যবহারে দেশী-বিদেশী সুরের উদার সংযোজন।[৮]

ব্যক্তি জীবনের রোমান্টিক, প্রেম-বিরহ, আনন্দ-বেদনা, সাধারণ কাব্য সাহিত্য প্রবণতায় রচিত উল্লেখিত সুরমণ্ডিত গানের কারণে চলচ্চিত্র নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির দর্শকের পাশাপাশি আধুনিক ধ্যান ধারণাপ্রসূত শহুরে শিক্ষিত নারী-পুরুষেরও আনন্দ বেদনার অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। চলচ্চিত্রের স্বর্ণালী গান বলতে যা বোঝায় তা ষাট কিংবা সত্তর দশকের গানগুলোকেই অঙ্গুলি নিদের্শ করে এবং তা এই সুরেই অধিক রচিত এবং জনপ্রিয়। নির্বাচিত কতগুলো বিষয়সমূহের গানের সুর নিয়ে আলোচনা করা যায় যেগুলো আধুনিক সুরের ধারায় প্রবাহিত—

হিম হিম হিম হিম হিম হিম হিম আহা আহা হিম হিম
তোমারে লেগেছে এত যে ভালো
চাঁদ বুঝি তাই জানে ॥

I সাগা -া -া -া | ম -প গ-া I সা গা -র -া | ণ্‌ -র স-া I
হিম ০ ০ ০ ০ ০ হু ০ হু ০ ০ ০ ০ ০ হা হা
I সগা গা রগা | রগরা রা সরধা I -ণ্া ণ্া সা সণ্া | ণ্রা সণ্া্ধ্া-া I
তো০ মা রে০ লে০০ গেছে০০ ০ এ তো যে০ ভা০০ লো০
I -া ধা -সা সা | রগা -মা গা -রসা I সরা -া রা-া | -া -া -া -া I
চাঁ দ্‌ বু ঝি০০ তা ০ ০ জা০০ নে ০ ০ ০ ০ ০

গানের কথা বা বিষয়কে অনুসরণ করে সুরারোপিত হয়। ফলে সুরেও থাকে রোমান্টিক আবেশ। ভাব দ্বারা মানুষের চলন বলন অর্থাৎ জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। চলচ্চিত্রে মানুষের জীবনাচরণ, গতি উঠে আসে নিবিড়ভাবে। ষাটের দশকের মানুষের জীবনের গতি ছিল অনেকটা স্থির, নর নারীর প্রেম ছিল লজ্জা আড়ষ্ঠতার আড়ালে আবৃত। চলচ্চিত্রের গানের সুরেও তার প্রকাশ ঘটেছে সহজ সরল সাধারণ স্বর বিন্যাসে। মাইনর কর্ডে গানটি নিবন্ধিত। সাধারণত কোমল এবং স্নিগ্ধতার রূপ নির্ণয়ে এই কর্ড অন্যতম ভূমিকা রাখে। নায়ক-নায়িকার অনুরাগ বিষয়ক ভাবের আবহে প্রস্ফুটিত উপরোক্ত গানটি (*রাজধানীর বুকে*-১৯৬০) সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

রস বিচারে আদি (the erotic) এবং শান্ত (the quietistic) রসের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। চার/চার ছন্দের কাহার্বা তালে নিবন্ধিত গানটি মধ্য লয়ে পরিবেশিত হয়েছে, নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী তালাত মহমুদ। তাঁর কণ্ঠ সম্পর্কে সংগীত শিল্পী ও গবেষক সুমন চৌধুরীর ভাষ্য—রোমান্টিক গানের বাংলা রূপ সম্ভবত তিনিই দিয়েছিলেন তাঁর গানের নিয়ন্ত্রিত আবেগ, সুশীল বাচনভঙ্গি, প্লেটোনিও ভাব আরেক নতুন মাত্রায় উন্নীত করল বাংলা সিনেমার গান।[৯] *নাচের পতুল* (১৯৭০) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গান একইভাবে রচিত। স্বরের খুব বেশি পরিবর্তন নেই। অনেকটা সহজ স্বরের আশ্রয়ে সুরারোপিত। তবে তাতে নাটকীয়তা বিশেষভাবে বিচার্য—

আয়নাতে ঐ মুখ দেখবে যখন
কপোলের কালো তিল পড়বে চোখে
ফুটবে যখন ফুল বকুল শাখে
ভ্রমর যে এসেছিল জানবে লোকে ॥

I | ণ্সা সা সা সা | ণ্সণ্ -া দ্প্াদ্া I ণ্সা সা সা সা | সা -া -া সা I
আ০ য় না তে ঐ০০০ মু০খ্ দে০ খ্ বে য খ ০ ০ ন্
I | সা রা জ্ঞমা মা | পা মা জ্ঞরসা সা I সরা রা রা রা | রা -া -া -া I
ক পো লে০র কা লো তি০০ল প০ড় বে চো খে ০ ০ ০[১০]

উপরোক্ত গানটি আসাবরী ঠাটের অন্তর্গত এবং কাহার্বা তালের চার/চার ছন্দের এই গানে আদি (the erotic) এবং শান্ত (the quietistic) রসের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। গানের ভাষা, সুর, গায়কি প্রভৃতি আধুনিক ভাবধারাকে উপস্থাপন করে। প্রেমের গতি সাধারণত চঞ্চল প্রকৃতির হলেও কখনো কখনো নানাবিধ কারণে স্থির এবং অচঞ্চল। নির্মিত সময়ে প্রেম-ভালবাসা ছিল অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়। ফলে লজ্জা আড়ষ্ঠতার বেড়াজালে মনের কথা মনেই রয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা এবং দুরু দুরু মনের যে কম্পমান এবং একে অপরকে কাছে টেনে নেয়ার যে ভঙ্গিমা তা-ই প্রকাশ করে। এটি তুলে ধরার জন্য নাটকীয় সুরের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। তা স্পষ্ট হয়ে উঠে-নায়কের প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর প্রক্রিয়ায়; টেলিফোনে যখন তার মনের কথাটি প্রকাশ করে। অপরপ্রান্ত থেকে রিসিভার তুলে নায়িকা; মনে দুরু দুরু মনের কম্পন শুরু হয়। নিঃশ্বাসে আড়ষ্ঠতার শব্দ এবং তার প্রকাশ রয়েছে গানে। এছাড়া গানের শুরুতে নায়িকা বলে: 'হ্যালো কাকে চাই, আপনি আপনি কে? নায়ক বলে: সেই আমি' এবং গানের মাঝে ছোট ছোট সংলাপ:'কি বলব' কিছু 'বলছো না যে ?' 'পাগল' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার রয়েছে যা নাটকীয়তার আশ্রয়ে গ্রথিত।

রোমান্টিক ভাবনাকে উপস্থাপনার জন্য সুরারোপিত হয়েছে *দর্পচূর্ণ (১৯৭০)* চলচ্চিত্রে–'তুমি যে আমার কবিতা, আমারও বাঁশির রাগিণী' এবং বিরহ প্রকাশের জন্য সুরে বেদনার রূপ মূর্ত হয়ে ওঠে। 'গানেরই খাতায় স্বরলিপি লিখে/বলো কি হবে জীবন খাতায় ছিন্ন পাতায়/শুধু বেহিসাবী পড়ে রবে' (*স্বরলিপি*-১৯৭০) গানটিতে। এছাড়া প্রেমের গান–'আকাশের হাতে আছে একরাশ নীল/ বাতাসের আছে কিছু গন্ধ/রাত্রির গায়ে জ্বলে জোনাকি/তটিনীর বুকে মৃদৃ ছন্দ।'(*আয়না ও অবশিষ্ট*-১৯৬৭), 'ফুলের কানে ভ্রমর এসে/চুপি চুপি বলে যায়/তোমার আমার সারাটি হৃদয়/নীরবে জড়াতে চায়' (*পীচ ঢালা পথ*-১৯৭০) প্রভৃতি। এছাড়া নায়কের রোমান্সে পরিবেশিত–'নীল আকাশে নীচে আমি/রাস্তায় চলেছি একা/এই সবুজের শ্যামল মায়ায়/দৃষ্টি পড়েছে ঢাকা'(*নীল আকাশের নীচে* -১৯৬৯) গানটিতে। চঞ্চলতা প্রকাশে দ্রুত তাল ও সুরের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

রোমান্টিকতার প্রভাব সত্তর দশক অর্থাৎ স্বাধীনতাত্তোর চলচ্চিত্রের গানের সুরেও এসেছে। এসব গানের সুর এবং গায়কিতে স্নিগ্ধ কোমলতা, ধীর এবং শান্ত ভাব পরিলক্ষিত হয়। কখনো বা রোমান্স ও চলঞ্চলতা। কতিপয় গানের উল্লেখ করা যা–'অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান' (*অশ্রু দিয়ে লেখা*-১৯৭২), 'ছবি যেন শুধু ছবি নয়/আজ কেন তাই মনে হয়' (*মানুষের মন*-১৯৭২), 'ওগো মোর মধুমিতা গহন স্বপন পথে' (*মধুমিতা*-১৯৭৮), 'এই আকাশকে সাক্ষী রেখে/এই বাতাসকে সাক্ষী রেখে' (*সোহাগ*-১৯৭৮), 'আমার মন বলে তুমি আসবে/হৃদয়ের বসন্ত বাহারে' (*আনারকলি*-১৯৮০),'এই হৃদয়ে এত যে কথার কাঁপন মুখে কেন বলা হয় না' *(চন্দ্রনাথ*-১৯৮৪),'শত জনমের স্বপ্ন তুমি আমার জীবনে

এলে/কত সাধনায় এমন ভাগ্য মেলে' (*রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত*-১৯৮৭),'আবার দুজনে দেখা হলো, কথা হলো, মনে যে হলো' (*দুই জীবন* -১৯৮৮) প্রভৃতি।

সমকালীন বিষয় আশয় শিল্পের নানাবিধ শাখার পরির্বতন আনে এবং সময়ের আবর্তনে গানের গায়কিতেও আসে পরির্বতন। ষাট, সত্তর দশকের গানের গায়কি ছিল ধীর, স্থির, শান্ত ও রোমান্টিক আবেশময়। কিন্তু ধীরে ধীরে আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে গানের গায়কিতে ক্রমশ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এবং রোমান্টিক আবেশে গান রচিত হলেও, তবে তা অনেকটা চঞ্চল প্রকৃতির। ক্রমশ এসব গান ফুল, লতা, পাতা, পাখি এসব কথার পাশাপাশি চটুল সুরে এবং খোলা মেলা কথায় পরিবেশিত হতে দেখা যায়। যেমন–'আমার বুকের মধ্যে খানে/মন যেখানে হৃদয় সেখানে', 'আমি একদিন তেমায় না দেখিলে/তোমার মুখের কথা না শুনিলে/'(*নয়নের আলো*-১৯৮৪) প্রভৃতি।

৩. শাস্ত্রীয় কিংবা রাগ রাগিণীর সুর

বাংলা গানে শাস্ত্রীয় সুর কিংবা রাগ রাগিণীর ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত এবং কোন গানই রাগ রাগিণীর বাইরে নয়। প্রতিটি গান কোন না কোন রাগের আওতাভুক্ত। খ্রিস্ট্রীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতকে রচিত বাংলা ভাষা ও সংগীতের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। পরবর্তীতে বাংলা গানের প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে গীতি কবিগণ রাগের উল্লেখ করেছেন। চলচ্চিত্রের গান বাংলা গানেরই একটি বিশেষ ধারা এ কথাও স্বীকার্য। তবে চলচ্চিত্র পরিচালকগণ সাধারণ দর্শকের কথা ভেবে সহজ সরল মেলোডি নির্ভর সুর রচনাতেই বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। এছাড়া ঘটনাক্রমে কিংবা কাহিনির বিশেষ প্রয়োজনে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক আলী হোসেনের ভাষ্য–

> বাংলাদেশে বড় ওস্তাদের অভাব ছিল। ফলে ছাত্র তৈরি হওয়ার সুযোগ ছিল না। ভারতের দিল্লী, আগরা, লাহোর ইত্যাদি স্থানে বড় ওস্তাদ ছিল এবং সেখানকার বাবুরা তাঁদেরকে নিয়মিত পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আমার জানামতে আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য একজনই ছিলেন তিনি হলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাগ-রাগিণীর ব্যবহার সহজ ছিল না। তাছাড়া সব ধরনের দর্শক-শ্রোতার কথা ভেবে সহজ সরল ভাবেই মেলডি নির্ভর সুর তৈরি করা হতো। যা কিনা দর্শক সহজভাবেই গ্রহণ করতে পারেন।[১১]

তবে লক্ষ করা যায় রাজা-বাদশাহ অথবা বনেদি পরিবারে বিনোদন লাভের জন্য দরবারে নর্তকী কিংবা বাইজিদের দ্বারা আসরকেন্দ্রীক গান পরিবেশিত হতো। এ সব গানকে গবেষণায় আসরকেন্দ্রীক মনোরঞ্জনমূলক গান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তখনকার নাচঘরে ঢপকীর্তন, খেমটা আর বাইজিদের নাচ-গান পরিবেশিত হতো। এসব বাইজি ও খেমটাওয়ালীরা হিন্দি বা উর্দু গানের সঙ্গে নাচতেন।[১২] এ সম্পর্কে নৃত্যশিল্পী, শিক্ষক ও গবেষক সোমা মুমতাজের লেখা থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে তিন ধরনের নৃত্যের প্রচলন রয়েছে। লোকনৃত্য, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আধুনিক নৃত্য। বাংলাদেশে নৃত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় যে, ঔপনিবেশিক শাসনামলে লোকনৃত্য ছাড়া আরেক ধরনের নৃত্য পরিবেশিত হতো যা বাইজি নৃত্য রূপে পরিচিত ছিল। এই নৃত্য তৎকালীন বাংলার জমিদার বা ধণিক শ্রেণির ব্যক্তিদের মনোরঞ্জনের জন্য তাদের জলসা ঘরে পরিবেশিত হতো।এই নৃত্য সাধারণ জনগণের মধ্যে কোন ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি।[১৩]

তবে কাহিনির সূত্রধরে, নাচ-গান পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সে রূপেরই আবেশ তৈরির প্রয়াস লক্ষণীয়–'চুপিসারে এত করে কামিনী ডাকে/শরমে জড়ানো নূপুর বাজে থেকে থেকে' (*এদেশ তোমার আমার*-১৯৫৯),'মুখের হাসি নয়গো শুধু মনের দিশা মেলে/আয়না আমার পেলে/আয়না আছে' (*তোমার আমার*-১৯৬১) গানটির সুরগত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভূপালির সাথে চারুকেশী রাগের মিশ্রণ ঘটিয়ে বিশেষভাবে পরিবেশিত হয়েছে। এছাড়া ভিনদেশি গানের সুরের প্রভাব–'আমি রূপ নগরের রাজকন্যা রূপের যাদু এনেছি' (*হারানো দিন*-১৯৬৩) গানটিতে। এই গানের সুর সম্পর্কে সংগীতশিল্পী এবং গবেষক সুমন চৌধুরীর মন্তব্য–'এটি আঙ্গিকগতভাবে নিরীক্ষাধর্মী গান। কাওয়ালী গানের গতি এবং চৈতী গানের উচ্ছলতা সুর প্রয়োগ টেকসাস অঞ্চলের সুর যা পশ্চিম ভারতের কিরওয়ানী রাগ ব্যবহার করা হয়েছে উপাদান হিসেবে।'[১৪] 'বেদরদী তুমি রসিকের কদর জানো না/মিনতিরে পায় ঢালো প্রেম জানো না' (*নবার সিরাজদ্দৌলা*-১৯৬৭) এ গানের সুরেও রয়েছে চমক এবং তাল-বোলের মোহনীয় পরিবেশ তৈরির প্রয়াস। কাহারবা তালে নিবন্ধিত গানটি; পরবর্তীতে দ্রুত লয়ে পরিবেশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সমাপ্তি লাভ করে। বাণীতে প্রমোদ জীবনে বাইজির এবং খেমটাওয়ালীদের দুঃখ-বেদনার কথা প্রকাশ পেয়েছে। *অবাঞ্ছিত* (১৯৬৯) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটিতেও একই রূপের প্রকাশ–

মন তুমি কেড়ে নিলে এ কি বিষম দায় রে
কুল বধূর মান বুঝি যায় যায় রে ॥

এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিযোগিতামূলক গান নির্বাচনের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় সংগীতকে বেছে নেয়া হতো এবং এখনো তা অব্যহত আছে। চলচ্চিত্রের গানেও তা উঠে এসেছে–'জলতরঙ্গ মন আমার, সা রে মা পা নি সা বাজে, জলতরঙ্গ বাজে।'[১৫] (*কাঁচকাটা হীরা*-১৯৭০) গানটিতে সে রূপেরই প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় এবং গানটিতে তানের ব্যবহার রয়েছে।

আশির দশকে বেশক'টি জনপ্রিয় উপন্যাসের চিত্রায়ণ হয়। এসব চলচ্চিত্রে কাহিনি বা বিষয় কিংবা চরিত্রের অনুগামী হয়ে আবির্ভূত হয়েছে গান। এই গানেও রাগ-রাগিণীর পরোক্ষ প্রভাব লক্ষণীয় এবং ঠুমরী-গজলের ছায়া অবলম্বনে অনেকটা সাদা-মাটা সুরের আদলে পরিবেশিত হয়েছে গান। যেমন–'নিজের বুকে আগুন জ্বেলে/রঙিন আলো হয়ে'(*দেবদাস*-১৯৮২) এবং *শুভদা* -১৯৮৬) চলচ্চিত্রে–

আমি বাজুবন্ধ হলাম না
ঝুমকা চুড়ি হলাম না
হলাম না তো কারও গলার হার ॥

রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত (১৯৮৭) চলচ্চিত্রে–'আমি জলসা ঘরে নূপুর পরা বন্দিনী'প্রভৃতি। প্রসঙ্গত, বর্তমানে যে আইটেম সং বা আইটেম গান সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে তা এই গানের নাম করে। অনেক গবেষকের মতে চলচ্চিত্রে এই গানের মাধ্যমে অশ্লীলতার প্রবেশ ঘটে, এক শ্রেণির অসাধু চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী প্রযোজক, নির্মাতাদের মাধ্যমে। সিকোয়েন্স বা সিচুয়েশন ডিমান্ড-এর বরাত দিয়ে গানের

বাণীতে নগ্ন কথার ব্যবহার, সুরে এবং গায়কিতে অশ্লীলতার ঢঙ এই গানকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে গানের বিষয়বৈচিত্র্যে মনোরঞ্জনমূলক গানের অংশে।

৪. বিদেশি বা পাশ্চাত্য সুর

চলচ্চিত্র শিল্পের পরিধি ব্যাপক এবং বিস্তৃত। ভিনদেশি শিল্প দ্বারা নিম্ন আয়ের দেশসমূহ অধিক পরিমাণে তাড়িত হয়। বিশেষত দর্শকের দৃষ্টি কিংবা মুনাফা লাভের আশায়। বিদেশি গানের সুর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে এদেশের চলচ্চিত্রের গানেও। এমনকি হুবহু নকলের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। পাশ্চাত্য সংগীত বা বাদ্যযন্ত্রের যে প্রভাব বা আমদানি তা চলচ্চিত্রের গানের মাধ্যমে বেশি হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়–*দীপ নেভে নাই* (১৯৭০) চলচ্চিত্রের গানের প্রয়োগ ভাবনায়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় নায়িকার দৃষ্টি আকর্ষণ বা মন জয় করার জন্য নায়ক বন্ধুদের সহযোগিতায় প্রথমে–'বনে বনে গাহিছে পাখি, সুরভীতে সমীরণ গিয়েছে ঢাকি, নিশি ভোরে মেলো গো আঁখি' রাগাশ্রিত গানটি গেয়ে শোনায়। কিন্তু দেখা যায় ওপাশ থেকে নায়িকা এবং তার বান্ধবীরা হি হি হি করে হেসে ওঠে তেমন কোন সাড়া মেলে না। পরবর্তীতে বন্ধুদের অনুরোধে (রাজ্জাক) গিটার দিয়ে চঞ্চল প্রকৃতির নিম্নোক্ত গানটি গেয়ে শোনায়–

ঐ দূর দূর দূরান্তে
দিন দিনান্তে নীল নীলান্তে
কিছু জানতে না জানতে
শান্ত শান্ত মন অশান্ত হয়ে যায়
সেই মন মন মনান্তে
বন বনান্তে যুগ যুগান্তে
কিছু শুনতে না শুনতে
পান্থ পান্থ সাধ অপান্থ হয়ে যায় ॥

গানটিতে পাশ্চাত্যের বাদ্যযন্ত্র গিটার ব্যবহৃত তদুপরি সুরেও রয়েছে তার ভঙ্গিমা। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, তরুণ-তরুণীর মাঝে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি কিংবা সংগীতের প্রতি দুর্বার আকর্ষণের চিত্রটি উঠে আসে উপরোক্ত গানের মাধ্যমে। চলচ্চিত্রে পাশ্চাত্য সুরের মিশ্রণে অনুবাদী গান–'দাও দাও দুনিয়ার সব গরীবকে আজ জাগিয়ে দাও।'(*জীবন থেকে নেয়া*-১৯৭০) এটি আল্লামা ইকবালের 'উটঠো মেরি দুনিয়াকে গরিবোঁকো জাগা দো' কবিতার বাংলা রূপান্তর। অনুবাদ ও সুর করেছেন খান আতাউর রহমান [১৬] ভারতীয় উপমহাদেশের রাগরাগিণী সুরের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য দেশীয় আরবীয় বা পারস্য জনপ্রিয় উপখ্যান অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রের মনোরঞ্জনমূলক গানে আরবীয় সুর ব্যবহারের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। ইবনে মিজানের *লাইলী মজনু* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গান তারই সাক্ষ্যবাহী–

জান্নাতে হুর আমি
তোমারই মেহবুবা
চোখেরও নূর আমার হুজুরেওয়ালা ॥

পোশাকে, সুরে এবং গায়কিতে তাল কিংবা ছন্দে আরবীয় ভঙ্গিমা যা আবহ তৈরির বিশেষ প্রচেষ্টা। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে আসরকেন্দ্রীক বা মনোরঞ্জনমূলক গান তার রূপ বদল করে ক্রমশ পার্টি বা ক্লাবে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। মিউজিকলজিস্ট সাইম রানার মতে–'আধুনিক গানের আরেকটি রূপ পাওয়া যায় হোটেল বা পার্টিতে, সেখানে নৃত্য সহযোগে শারিরীক উপস্থাপনমূলক পরিবেশনা চলে আসছে পূর্বকালে বাইজিদের মাহফিলের রেশ ধরে। আগে ঠুংরী-গজল চলত এখন চলে আধুনিক গানের এক শ্রেণীর বিনোদনমূলক ধারা।'[১৭] যেখানে গিটার, ড্রামস, কিবোর্ড ইত্যাদি পাশ্চাত্য বাদযন্ত্র ব্যবহার অধিক মাত্রায় লক্ষণীয়। পাশ্চাত্য সুর এবং বাদ্যযন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত গান *মাসুদ রানা* (১৯৭৪) চলচ্চিত্রে–

ও ডার্লি ফুল তো ঝরে যাবে
দিনতো চলে যাবে ॥

এছাড়া 'দুনিয়ায় যারা অন্ধ তারাই খোঁজে ভাল মন্দ' (*জয় পরাজয়*-১৯৭৬), 'এই মনটা যদি চায় পেতে মন' (*রজনীগন্ধা*-১৯৮২), 'একবারই প্রেম জীবনে আসে' (*নীতিবান*-১৯৮৮) প্রভৃতি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচেষ্টা করা হয়েছে অনেক গানের সুর এবং কম্পোজিশন-এ। তার দৃষ্টান্ত মেলে সংগীত পরিচালক আলম খানের নিম্নোক্ত কথামালায়। 'তুমি যেখানে আমি সেখানে সেকি জান না' *নাগ পূর্ণিমা* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রের এই গান তৈরির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তিনি বলেন–

> এই ছবির (*নাগপূর্ণিমা*) পরিচালক হলো সোহেল রানা (মাসুদ পারভেজ)। সে সব সময় নতুনত্ব পছন্দ করত। আমি তার অনেক গান করেছি। আমি তাকে প্রস্তাব করলাম নাগপূর্ণিমা মানে তো সাপের মিউজিক। আমি সেটা বাদ দিয়ে রক যদি করি ? তিনি স্বাগত জানান বলেন আপনি করেন, পিকচারাইজ আমি করব। মনিরুজ্জামান মনিরকে বললাম তোমাকে একটা এক্সপেরিমেন্টাল লিরিক দিতে হবে। সে লিরিকটাও এক্সপেরিমেন্টাল করল। আমি চিন্তা করলাম একটা ব্যাক আপ তৈরি করি। রক ব্যাক আপ তৈরি করি। গানের কথা কিন্তু সাধারণ–'তুমি যেখানে আমি সেখানে সেকি জান না।' যখন আমি মিউজিকে গিয়েছি তখন দেশি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেছি যেমন-বাঁশি। মিউজিক মেলোডি কিন্তু ব্যাক আপ রক।[১৮]

আবার সিকোয়েন্সের বিশেষ প্রয়োজনে গানের মাঝে পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের পাশাপাশি গায়কি এবং সুরভঙ্গিমায়েও আসে পরিবর্তন। তা দৃষ্ট হয় *মাসুদ রানা* (১৯৭৪) চলচ্চিত্রের–'মনের রঙ্গে রাঙাব/বনেরও ঘুম ভাঙ্গাব'এই গানটিতে। এ সম্পর্কে গানটির সুরকার বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক আজাদ রহমানের কাছ থেকে জানা যায়–'একই গান যখন নায়িকা (কবরী) ছেড়ে নায়ক (রাজ্জাক) গাইছেন হোটেলে বলরুমে তখন অন্য বাদ্যযন্ত্র-গিটার, ড্রামস ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে এবং গানের ভাব পরিবর্তিত হয়ে গেছে।[১৯] এরকম নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ করা গেছে।

সুরশৈলী বিষয়ক আলোচনার অন্যতম দিক হলো এই গানের গায়কি। এর মাঝেই নিহিত রয়েছে তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিম্নরূপভাবে আলোচনা করা হলো–

গায়কি

গায়কি বা স্টাইল কিংবা নানাবিধ ‘ঘরানা’ ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে বহুকাল থেকে প্রচলতি। ‘ঘরানা’ শব্দের হিন্দি অর্থ হলো ‘ঘর’ কিন্তু সংগীতের ক্ষেত্রে ‘ঘরানা’ শব্দটির অর্থ বহুমুখী। ‘কোন একটি আঞ্চলিক স্বতন্ত্র সঙ্গীত ধারা যেমন ঘরানা’ নামে পরিচিত, তেমনি কোন ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্ট বিশিষ্ট সংগীতের ধারা (যা বংশ পরম্পরায় প্রায় অবিকৃত রূপে প্রচলতি) তাও ‘ঘরানা’ নামে প্রচলিত। ‘ঘরানা’ বলতে কোন স্থানের গায়কি বা (Style) কেই বোঝায়।[২০] চলচ্চিত্রের গানেও রয়েছে এক ধরনের নিজস্ব স্টাইল বা গায়কি। যা দিয়ে সহজেই অন্য গান থেকে আলাদা করা যায় এবং এই বৈশিষ্ট্যের অন্যতম কারণ হলো এর একটা পরিসর বা প্রেক্ষাপট রয়েছে। তা প্রতীয়মান হয় বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক আলী হোসেনের বক্তব্যে –

> একটি চলচ্চিত্রে যতগুলো চরিত্র থাকে নায়ক-নায়িকা, খলনায়ক, পার্শ্ব চরিত্রসমূহ তাদের সামাজিক অবস্থান, মানসিক অবস্থা, তাদের রুচিবোধ, তাদের শিক্ষা, তাদের আবেগ-অনুভূতি, হাসি-কান্না ইত্যাদি প্রকাশের জন্যে যে গান রচিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের শিল্পীর কণ্ঠে এমনভাবে গাওয়া হয়, যেন মনে হয় ঐ সব চরিত্রের মুখেরই গান।[২১]

সাধারণত একটি চলচ্চিত্রে যে ধরনের চরিত্র থাকে সে সব চরিত্রের আলাদা পেশা, জীবনাচরণ, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে এর গায়কি গড়ে ওঠে। এই বিশেষত্বের মধ্য দিয়ে গান পরিবেশিত হয় বলেই এর গায়কি বা গায়নশৈলী স্বতন্ত্র প্রকৃতির। উল্লেখযোগ্য চরিত্রসমূহ নিম্নরূপভাবে দেখানো যেতে পারে।

সারণি-১

ক্রম	চরিত্রসমূহ	গায়কি
১.	নায়ক	গায়কিতে নায়কোচিতভাব বিদ্যমান।
২.	নায়িকা	প্রেম-ভালবাসা, মনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ বেদনার প্রকাশ পায়।
৩.	স্বামী-স্ত্রী-সন্তান	গায়কিতে এক ধরনের পারিবারিক সুখ-দুঃখ চিত্র নির্মাণের প্রচেষ্টা।
৪.	ভাই-বোন	একে অপরের প্রতি স্নেহ ভালবাসার প্রকাশ।
৫.	মা-ছেলে	স্নেহ ভালবাসা, মায়া মমতার প্রকাশ।
৬.	সই-সখী	একে অপরের একান্ত মনের কথা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।
৭.	বিবেক-মাঝি/দরবেশ/বাউল	দর্শকের বিবেকবোধকে জাগ্রত করার জন্য।
৮.	বাইজি	বিনোদন কিংবা মনোরঞ্জন তৈরিতে।
৯.	ভিলেন বা খল নায়ক	অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য।
১০.	মাতাল বা নেশাগ্রস্থ	দুঃখ ভুলে থাকার জন্য।
১১.	কৌতুক অভিনেতা-অভিনেত্রী	হাস্যরস তৈরির প্রয়াস।

উপরোল্লেখিত চরিত্রসমূহ ছাড়াও নির্দিষ্ট কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বিশেষত চলচ্চিত্রের মূলবার্তাকে উপস্থাপন করার জন্য এক ধরনের গান ব্যবহার করা হয় যে গানকে থিম সং বা টাইটেল সং বলা হয়ে থাকে। যেমন–‘পৃথিবী তোমার কোমল মাটিতে, কেন এত সংঘাত, মানুষের বুকে মানুষেই হানে, নিষ্ঠুর কষাঘাত’ (*দীপ নেভে নাই*-১৯৭০), ‘রোদে পুড়ে পিচ গলে এই যে পথে/মন পুড়ে আশা কাঁদে তারই সাথে সাথে’ (*পীচ ঢালা পথ*-১৯৭০), ‘হে পৃথিবী আমার প্রশ্ন শোনো/আমরা মানুষ সে কি শুধু ভুল/তবে ভেঙ্গে চুড়ে দাও/ধুয়ে মুছে দাও, মানুষ তো নয় নাচের পতুল’(*নাচের পতুল*-১৯৭১) প্রভৃতি গানের কথা বলা যায়। এই গান বিশেষভাবে নমনীয়, কোমল সুরে সুরারোপিত

এবং করুণ রসে সিক্ত যা মানুষের আবেগকে প্রবলভাবে নাড়া দেয় এবং দর্শকের বিবেককে জাগ্রত করার অন্যতম প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

উল্লেখযোগ্য শিল্পীর গায়কি প্রসঙ্গ

প্রতিটি গানের পরিবেশনায় রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন গায়কি। একটি গান বিশেষভাবে কালোত্তীর্ণ হয় গানের কথা, সুর সংগীতায়োজন তদুপরি শিল্পীর গায়কির জন্য। এটি তৈরি হওয়ার পেছনে বেশ কতগুলো মানুষের চালনা শক্তি কাজ করলেও শিল্পীর স্বকীয়তা বিশেষভাবে স্বীকার্য। এমন অনেক গান রয়েছে গায়কির জন্য অন্যান্য দুর্বলতাকে ছাপিয়ে জনপ্রিয়তা কিংবা একটি ভাল পরিবেশনা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সুরকার ও সংগীত পরিচালক আলাউদ্দিন আলীর কাছ থেকে জানা যায়–'একটি গান শিল্পীর কাছ থেকে উদ্ধার করে আনতে সুরকার কিংবা সংগীত পরিচালককে অনেক কষ্ট করতে হয়। আবার অনেক শিল্পী রয়েছে অনায়াসে গানটিকে আরো অলংকৃত করে দেয়।'[২২] তবে চলচ্চিত্রে গানের গায়কি গড়ে ওঠে কিছু শর্তারোপের মধ্য দিয়ে। ফলে বিশেষ কতকগুলো বিষয়ের আত্তীকরণের প্রয়োজন হয়। গানের কণ্ঠ দেয়ার বিষয়ে শিল্পীর কোন গুণটি একজন সংগীত পরিচালককে বেশি আকৃষ্ট করে এমন প্রশ্নের জবাবে সংগীত পরিচালক আজাদ রহমান বলেন–'আমার একটা গানের কথাই আছে আপন ভাষায় আপন গান নিজস্বতায় বাড়ায় প্রাণ। নিজস্বতাকে নিয়ে সামনে আসতে হবে'।[২৩] তবে চলচ্চিত্রের গানে শিল্পীর নিজস্বতার পাশাপাশি বিশেষ বিষয় বা চরিত্র কিংবা সিকোয়েন্সকে কেন্দ্র করে রচিত গান গাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু যোগ্যতারও প্রয়োজন হয়। পূর্বাণী পত্রিকা থেকে জানা যায় চলচ্চিত্রে গানের বিশেষ গায়কি সম্পর্কে–

> চলচ্চিত্রের গান রচিত হয় দৃশ্য পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে। আনন্দ উল্লাস প্রকাশের দৃশ্যে গানের সুরের সঙ্গে দুঃখ বেদনাময় পরিবেশের গানের সুর এক হতে পারে না। আবার ক্যাবারে দৃশ্যের নাচের সুর হবে ভিন্নতর। দর্শককে সুড়সুড়ি দেবার যাবতীয় উপাচার থাকে সে সুরের পরতে পরতে। এবং গায়কিও হবে তেমনি প্রভোকেটিভ। সুতরাং গায়ক-গায়িকাকে তার কণ্ঠে একেক গানে একেক কারুকাজ আনতে হয়। যিনি সব ধরনের কারুকাজ তার কণ্ঠে আনতে পারেন, ফিল্মী সঙ্গীতে তার চাহিদা সর্বদাই থাকে।[২৪]

ভিন্ন ভিন্ন সিকোয়েন্সকে সামনে রেখে একজন শিল্পীকে গান গাইতে হয়। ফলে চলচ্চিত্রের গান রচনা থেকে শুরু করে প্রতিটি পর্যায়ে বেশ কিছু বিষয়ের মুখাপেক্ষী হতে হয় আবার তা অতিক্রমও করতে হয় কণ্ঠশৈলীর নানা উপায় অবলম্বন করে। গায়কির নানা বিষয়ে পারঙ্গম হতে হয়। এ বিষয়ক কথার আলোকে সংগীত শিল্পী উমা খান বলেন–

> আমার মনে হয় প্রথমত, কণ্ঠশিল্পীকে অভিনয় রপ্ত করতে হবে। এরপর সংলাপ বলা, হাসি কান্না ইত্যাদি সব জানতে হবে। গানের মুড জেনে নিতে হবে। কোন মুডের গান স্যাড নাকি হ্যাপি মুড। মোটকথা চলচ্চিত্র পরিচালক, সুরকার, সংগীত পরিচালক, নায়ক নায়িকার সঙ্গে সমন্বয় করে অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সাথে নিয়ে গাইতে হয়। এবং রেকর্ডিং-এর সময় নায়ক কিংবা নায়িকার উপস্থিতি থাকলে ভালো হয়। গলাটাতে তৈরি করতে হবে এমনভাবে যে নায়িকা গাইছে ঐ ঢঙে গাইতে হবে। অভিনয়শিল্পীকে অনুসরণ করে গাইতে হয়। স্ক্রিপ্টটা আগে পড়তে হবে। দৃশ্য কেমন নৃত্যপরিচালককে তা জিজ্ঞেস করতে হবে। তারপর গাওয়া [২৫]

সুবীর নন্দীর কাছ থেকে জানা যায় চলচ্চিত্রের গানের গায়কি সম্পর্কে–বেসিক গানের সাথে এর একটা পার্থক্য রয়েছে। বেসিক গান যে যার মত করে গায়। কিন্তু ফিল্মের গানের আলাদা একটা ডেলিভারি থাকে, অভিনয় থাকে। গানটির মধ্যে যত অভিনয় থাকবে তাতে পিকচারাইজেশন এবং যিনি গাইবেন (গানে কণ্ঠ মেলাবেন) তার জন্যেও সুবিধা হবে।[২৬] দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় অভিতাভ বচ্চনের অভিনয়ে পরিবেশিত *ডন* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে 'খাইকে পান বানাও রসওয়ালা' গানটির কথা। রেকর্ড করার সময় কিশোর কুমার গান না গেয়ে ঠাঁই দাঁড়িয়েছিলেন। সুরকার ও সংগীত পরিচালক কল্যাণ জি আনন্দজি তার কারণ জানতে চাইলে কিশোর কুমার বলেছিলেন–'আমাকে তো পান দেয়া হয়নি। পান ছাড়া এ গান আমি গাইব কি করে ?' কারণ মুখে পান নিয়ে গানটি অভিনেতার অভিনয়ে পরিবেশন করার বিষয় ছিল।

কিন্তু 'নেশার লাটিম ঝিম ধরেছে' (*দিন যায় কথা থাকে*) গানটি সুবীর নন্দী কোন ধরনের নেশা গ্রহণ না করেই গেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে শিল্পীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন–'আমার চেয়ে কিশোর জি কিন্তু ভাল অবস্থানে ছিলেন। উনি তো পান খেয়ে গাইলেন ওখানে তো নেশার কোন বিষয় ছিল না। কিন্তু আমারটা তো নেশা। ওটাতে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই। তো আমাকে পরিচালক (খান আতাউর রহমান) কিভাবে বোঝাবেন ? শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন তুমি মাতাল মানুষকে গান গাইতে দেখেছো ? আমি বললাম হ্যা দেখেছি, আমার চা বাগানে। ওরকম গাইতে পারবে। আমি বললাম হ্যা পারব।'[২৭]

বর্ণিত সময়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিল্পীর গায়কি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা যায়। যাঁরা চলচ্চিত্রে গানের বিশেষ দিক নির্মাণ করেছেন। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

আবদুল আলীম

সহজাত অলংকারবিহীন সুমিষ্ট দরাজ কণ্ঠের কারণে সংগীতমহলে তিনি বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ঢাকার প্রথম সবাক *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬) চলচ্চিত্রের গানে (আমি ভিন গেরামের নাইয়া) তিনি কণ্ঠ দেন। চলচ্চিত্রে তাঁর জনপ্রিয় গানের মধ্যে–'মন রে তোমার সবই ছিল জানা' (*শীত বিকেল*-১৯৬৪), 'ঢেউ উঠছে সাগরে রে' (*রূপবান*-১৯৬৫), 'দয়াল তোমার পানে চাইয়া' (*নদী ও নারী*-১৯৬৫), 'দুঃখ সুখের দোলায় দোলে' (*এতটুকু আশা*-১৯৬৮), 'যারে ছেড়ে এলাম অবহেলে' (*বেদের মেয়ে*-১৯৬৯), 'কেহই করে বেচা কেনা' (*অবাঞ্ছিত*-১৯৬৯), প্রভৃতি। মূলত তিনি ছিলেন লোকসংগীতের অন্যতম শিল্পী এবং চলচ্চিত্রে বিবেকের গানে তাঁর কণ্ঠ বিশেষভাবে জনশ্রুত। এছাড়াও দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া সাবিনা ইয়াসমিনের সাথে–'সব সখীরে পার করিতে নেব আনা আনা' (*সুজন সখী*-১৯৭৫) গানটিতে আধুনিক উপস্থাপন ভঙ্গিমা লক্ষণীয় এবং তা বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

মাহবুবা রহমান

ঢাকায় নির্মিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ সবাক (*মুখ ও মুখোশ*-১৯৫৬) চলচ্চিত্রের প্রথম প্লেব্যাক শিল্পী। তাঁর কণ্ঠে ভারতীয় সন্ধ্যা, গীতা ও মাধুরী প্রমুখ প্রখ্যাত শিল্পীদের ছোঁয়া পাওয়া যায় বলে অনেকের অভিমত। চলচ্চিত্রের উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে–'মনে বনে দোলা লাগে' (*মুখ ও মুখোশ*-১৯৫৬), 'নয়নে লাগল যে রং' (*এদেশ তোমার আমার*-১৯৫৯), 'এখন রাত্রি কুয়াশার কোলে' (*কখনো আসেনি*-১৯৬১),'এই সোনালী ভোরে' (*সূর্যস্নান*-১৯৬২) প্রভৃতি।

মাহমুদুন্নবী

স্যাড মুড এবং ধীর লয়ের রোমান্টিক গানের গায়কির জন্য তিনি ছিলেন নন্দিত শিল্পী। মাহমুদুন্নবীর কণ্ঠ মাধুর্য সম্পর্কে আরতী মুখার্জীর মন্তব্য আপেল মাহমুদের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়–'মনে পড়ে ১৯৭১ সালের কথা। বিখ্যাত আরতী মুখোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন, তোদের মাহমুদুন্নবীর কণ্ঠ এতো চমৎকার ! ভগবান এতো মেলোডিও মানুষের কণ্ঠে দিতে পারেন ?[২৮] তাঁর মেলোডি নির্ভর কয়েকটি গানের কথা উল্লেখ করা যায়–'তুমি কখন এসে দাঁড়িয়ে আছো আমার অজান্তে' (*আবির্ভাব*-১৯৬৮), সাবিনা ইয়াসমিনের সাথে দ্বৈতকণ্ঠে–'তুমি যে আমার কবিতা' (*দর্পচূর্ণ*-১৯৭০), 'আয়নাতে ঐ মুখ দেখবে যখন' (*নাচের পুতুল*-১৯৭১), 'আমি তো আজ ভুলে গেছি সবই' (*দি রেইন*-১৯৭৬), 'ওগো মোর মধুমিতা' (*মধুমিতা*-১৯৭৮), রুনা লায়লার সাথে দ্বৈতকণ্ঠে পরিবেশিত–'ঐ মধু চাঁদ আর ঐ জোছনা' (*দি ফাদার*-১৯৭৯) প্রভৃতি।

বশীর আহমেদ

শোনা যায় তালাত মাহমুদের গান শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তিনি। ফলে তাঁর গায়কিতে তালাত মাহমুদের প্রভাব রয়েছে। রোমান্টিক স্যাড মুডের গানে তিনি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। 'আমাকে পোড়াতে যদি এত লাগে ভালো' (*মনের মত বউ*-১৯৬৯), 'অনেক সাধের ময়না আমার বাঁধন কেটে যায়' (*ময়নামতি*-১৯৬৯) প্রভৃতি প্রেমের রোমান্টিক আবেশ তৈরিতেও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তাঁর গায়কিতে।

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার

জীবন বাস্তবতার কঠিন রূপ প্রতিষ্ঠা এবং রোমান্টিক আবেশ তৈরিতেও তাঁর গায়কির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেমন–'তুমি কি দেখেছো কভু জীবনের পরাজয়' (*এতটুকু আশা*-১৯৬৮), 'তুমি সাত সাগরের ওপার হতে' [সহশিল্পী শাহনাজ রহমতউল্লাহ] (*কত যে মিনতী*-১৯৭০), 'আমাদের বন্দি করে যদি ওরা ভাবে' (*সুখ দুঃখ*-১৯৭১), 'এই আকা বাঁকা পথ পেরিয়ে' (*বাঘা বাঙালি*-১৯৭২), 'ব্যথার আগুন যদি' (*ঝড়ের পাখি*-১৯৭৩), 'মুখ দেখে ভুল করো না' (*সাধু শয়তান*-১৯৭৫),'সাথী আমার হলো না তো কেউ' (*স্মাগলার*-১৯৭৬), 'ও রে নীল দরিয়া' (*সারেং বৌ*-১৯৭৮) প্রভৃতি গান। এই শিল্পী সম্পর্কে বিশিষ্ট গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ারের কথা থেকে জানা যায়–'তার একটা নিজস্ব স্টাইল ছিল। সে স্টাইল দিয়ে সে গাইত। বিশেষ করে চলচ্চিত্রের সেট গানগুলো। এছাড়া আন্দোলন করার বড় গানটা তাকে দিয়ে গাওয়ানো হত। এবং আবেগময় কণ্ঠ থাকার কারণে প্রেমের গভীরতাসম্পন্ন গানগুলো তাকে দিয়ে গাওয়ানো হত। তার কণ্ঠে সর্ব শক্তির সমাহার ছিল।' প্রসঙ্গত, ২০০৬ সালের মার্চ মাস জুড়ে বিবিসি বাংলা শ্রোতাদের বিচারে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিশটি গানের তালিকায়–'সালাম সালাম হাজার সালাম', 'জয় বাংলা বাংলার জয়' এবং 'তুমি কি দেখেছো কভু জীবনের পরাজয়' গান তিনটি অন্তর্ভুক্ত হয়।[২৯]

সৈয়দ আবদুল হাদী

বাঙালি জীবনের প্রেম-বেদনার এক গভীর রূপ নির্ণয়ে তার দরাজ এবং ভরাট কণ্ঠের গায়কি অপরিসীম ভূমিকা রেখেছে। যেমন–'এই পৃথিবীর পান্থশালায়' (*যোগ বিয়োগ*-১৯৭০), আধ্যাত্মিক

চেতনানির্ভর গান 'আছেন আমার মুক্তার' (*গেলাপী এখন ট্রেনে*-১৯৭৮), ' জলসা ঘরের জৌলুস নির্মাণে 'সখী চলো না জলসা ঘরে এবার যাই' (*ঘুড্ডি*-১৯৮০), 'জন্ম থেকে জ্বলছি মাগো' (*জন্ম থেকে জ্বলছি*-১৯৮১), 'এমনত প্রেম হয় চোখের জলে কথা কয়' (*দুই পয়সার আলতা*-১৯৮২), 'আমি তোমারই প্রেম ভিখারি' (*চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা*-১৯৮৪),'কত কাঁদলাম কত গো সাধলাম আইলানা' (*ভাত দে*-১৯৮৪) প্রভৃতি গানের গায়কি তাঁর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খন্দকার ফারুক আহমেদ

সিরিয়াস এবং চটুল মুডের গানে তিনি ছিলেন সমান দক্ষতা সম্পন্ন শিল্পী। রোমান্টিক মুড তৈরিতেও তার দখল ছিল অনেক। 'আমি নিজের মনে নিজেই যেন গোপনে ধরা পড়েছি' (*আবির্ভাব*-১৯৬৮), 'নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তায় চলেছি একা' (*নীল আকাশের নীচে*-১৯৬৯), আবার প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ গড়ে তুলতেও তিনি সিদ্ধহস্ত–'কারার ঐ লৌহ কপাট' (*জীবন থেকে নেয়া*-১৯৭০) এবং 'দিন বদলের দিল এসেছে' (*আলোর মিছিল*-১৯৭৪) প্রভৃতি গান।

ফেরদৌসী রহমান

বহুমাত্রিক শিল্পী পল্লীগীতি, আধুনিক এবং নজরুলসংগীত প্রতিটি ধারার গানে তাঁর রয়েছে সাবলীল বিচরণ।'আমি রূপনগরের রাজকন্যা রূপের যাদু এনেছি' (*হারানো দিন*-১৯৬১),'নদী বাঁকা জানি চাঁদ বাঁকা জানি' (*সুতরাং*-১৯৬৪) 'নিশি জাগা চাঁদ হাসে কাঁদে আমার মন' (*জোয়ার এলো*-১৯৬২), 'যার ছায়া পড়েছে মনেরও আয়নাতে' (*আয়না ও অবশিষ্ট*-১৯৬৭), 'গান হয়ে এলে মন ভরে দিলে' (*নীল আকাশের নীচে* -১৯৬৯), 'বলাকা মন হারাতে চায়' (*যোগ বিয়োগ*-১৯৭০) 'কথা বলো না বলো ওগো বন্ধু' (*মধুমিলন*-১৯৭০) প্রভৃতি গানে অসাধারণ গায়কি রচনা করেছেন। হালকা মেজাজের গান তিনি গাননি তবে মুজরা টাইপ গান তিনি গেয়েছেন। যেমন–'চুপিসারে এত করে কামিনী ডাকে'(*এদেশ তোমার আমার*-১৯৫৯) বাইজির অভিনীত চরিত্রে। সাধারণ অর্থে মুজরা বলতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নৃত্যগীতের আসরকে বোঝায়। উর্দুতে 'মুজরা'র অর্থ হলো নাচ-গানের আসর।

মোঃ খুরশীদ আলম

তারুণ্যের প্রতীক শিল্পী খুরশীদ আলম। যিনি প্রতিটি প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয়। সিরিয়াস মুডের গান গেয়ে থাকলেও তিনি মূলত চটুল গানে খ্যাতি লাভ করেন। এছাড়া পরিচ্ছন্ন রোমান্টিক গানও তিনি গেয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। চলচ্চিত্রের গানে গায়কির বিশেষ মাত্রার সূচনা করেন খুরশীদ আলম। ষাটের দশকে বাবুল চৌধুরী পরিচালিত *আগন্তুত* (১৯৬৯) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তাঁর আগমন হলেও সমাদৃত হন আরো পরে।[৩০] ভিন্ন কণ্ঠস্বর এবং গায়কিতে মজার কিছু বিষয় লক্ষ করা যায়। যাঁর কারণে সকলের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হন তিনি। কখনো নায়িকাকে কাছে পাওয়ার বাকুলতা বা নায়কের মনের আবেগ বিশেষভাবে তুলে ধরার প্রয়াসে কিংবা রোমান্টিক আবেশ তৈরিতেও এক সময় প্রায় সব নির্মাতার কাছে অনবির্য হয়ে উঠেছিলেন তিনি। নায়ক রাজ্জাকসহ প্রায় সব অভিনয় শিল্পীর সাথে তাঁর গায়কি এমনভাবে মিলে যায় মনে হয় যেন নায়ক স্বয়ং গাইছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু গান রয়েছে যা দিয়ে তাঁবে বিশেষভাবে চেনা যায়। রোমান্টিক গান–'ছবি যেন শুধু ছবি নয়' (*মানুষের মন*-১৯৭২), 'এ আকাশকে সাক্ষী রেখে' (*সোহাগ*-১৯৭৮), এছাড়া *দোস্ত দুশমন* (১৯৭৭)

চলচ্চিত্রে নায়িকার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণমূলক গান–'চুমকি চলেছে একা পথে' গানটিতে নানাবিধ অভিব্যক্তির প্রকাশ রয়েছে। যেমন–ওকো ওকো, তাহলে যে মরে যাব আমি... হই। *শাপমুক্তি* চলচ্চিত্রে–নায়িকাকে কাছে পাওয়ার জন্য এক ধরনের বাহানার সূচনা–'ধীরে ধীরে চল ঘোড়া/সাথী বড় আনকোড়া/রূপনগরের রানি হয়েছে আজ সোয়ারী।' আহমদ জামান চৌধুরীর গীত রচনায়, আলম খানের সুরে *মিস লঙ্কা* (১৯৮৫) চলচ্চিত্রে–'চুরি করেছো আমার মনটা হায়রে হায় মিস লঙ্কা' গানটির স্থায়ীর শেষে আ... আ... স্বরে উপরে উঠে মিলিয়ে যায়; তাতে নায়কের গায়কি জোর প্রবল হয়। আরো নানা রকম ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ করা যায় তাঁর গানে। তুততো তুততো তুরু রুরু ইতাদি। যা প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরিতে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে এবং নায়কোচিত ভাব প্রকাশপূর্বক মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য দর্শকের মনেও এক ধরনের উত্তেজনা বিরাজ করে। এছাড়া পারিবারিক সুখের ঘর রচনায় মাকে নিয়ে গেয়েছেন ২৫টি গান। তারমধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য–'মাগো মা ওগো মা' (*সমাধি*-১৯৭৬), 'মাগো তোর চরণ তলে বেহেশত আমার' (*মতিমহল*-১৯৭৭) প্রভৃতি। এছাড়া ভাই বোনের সম্পর্ক নির্মাণেও রয়েছে তাঁর গান–'বাপের চোখের মনি নয় মায়ের সোনার খনি নয়।' (*জোকার*-১৯৮০) প্রভৃতি।

প্রবাল চৌধুরী

তিনি বাংলার হেমন্ত বলেও খ্যাত। চলচ্চিত্রে তাঁর কণ্ঠে উল্লেখযোগ্য গান–'আরে ও প্রাণের রাজা' (*বাদশা*-১৯৭৫) এটি ছিল তাঁর বোন উমা খানের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠের গান। এছাড়া 'লোকে যদি মন্দ কয়' (*তরুলতা*-১৯৮০), 'আমি মানুষের মত বাঁচতে চেয়েছি' (*ভালো মানুষ*-১৯৮১), 'এই জীবন তো একদিন' (*মানে না মানা*-১৯৮২), 'ফুলের বাসর ভাঙ্গল যখন' (*চন্দ্রনাথ*-১৯৮৪), 'আমি ধন্য হয়েছি ওগো ধন্য' (*সোনা বউ*-১৯৮৫), 'সাগরের সৈকতে দাঁড়িয়ে।' (*খুনি*-১৯৮৯) প্রভৃতি।

নীলুফার ইয়াসমিন

নজরুল সংগীত শিল্পী হলেও তিনি গেয়েছেন আধুনিক গান, সিনেমার গান, রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদের গান। তিনি ঠুমরী, কীর্তনেও ছিলেন পারদর্শী। তার গলায় রোমান্টিক স্যাড মুডের গান বেশ দর্শক প্রিয়তা পায়। যেমন–'এ আঁধার কখনো যাবে না মুছে' (*জীবন তৃষ্ণা*-১৯৭৩),'যে মায়েরে মা বলে কেউ ডাকে না' (*জোয়ার ভাটা*-১৯৬৯), 'এত সুখ সইব কেমন করে' (*শুভদা*-১৯৮৬) প্রভৃতি গান।

রথীন্দ্রনাথ রায়

তিনি মূলত ভাওয়াইয়া গানের শিল্পী। লম্বা স্বরের প্রক্ষেপণ এবং দরাজ কণ্ঠের গানে বিশেষত বিবেকের কণ্ঠের গানে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে–'সবাই বলে বয়স বাড়ে' (*ফকির মজনু শাহ*-১৯৭৮), 'তুমি আরেকবার আসিয়া' (*নাগর দোলা*-১৯৭৯), 'খোদার ঘরে নালিশ করতে দিল না আমারে' (*নালিশ*-১৯৮২), 'ও তুই ডাকলি যারে আপন করে সেতো অসহায়' (*বেদের মেয়ে জোস্না*-১৯৮৯) প্রভৃতি।

নীনা হামিদ

তিনি মূলত ভাওয়াইয়া এবং পল্লীগীতি গানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। *রূপবান* (১৯৬৫) চলচ্চিত্রের নারী কণ্ঠের অধিকাংশ গান তার গাওয়া। ‘বাড়ির না দক্ষিণ পাশে গো/ও দাইমা কিসের বাদ্য বাজে গো/আমার দাইমা দাইমা গো।’ দাইমার অভিনয়ে–‘শোনো শোনো রূপবান গো/ও রূপবান বলি যে তোমারে গো/শোন রূপবান রূপবান গো।’ দাদুর প্রতি নিবেদন রূপবানের–‘শোনেন শোনেন শোনেন দাদু গো/ও দাদু বলি যে আপনারে গো শোনেন দাদু দাদু গো।’ গ্রাম বাংলার লোকগান বা গীতিকা পালার গান তার কণ্ঠে বেশ জনপ্রিয়তা পায়।

শাহনাজ রহমতউল্লাহ

তাঁর কণ্ঠে রোমান্টিক মুড তৈরির বিশেষ গায়কি রয়েছে। তাঁর সুরের টেনশন তৈরি করা এবং তা ধরে রাখার এক অভিনব কৌশল নিয়ে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। ‘মন তুমি কেড়ে নিলে এ কি বিষম দায়রে’ (*অবাঞ্ছিত*-১৯৬৬), ‘ফুলের কানে ভ্রমর এসে’ (*পীচ ঢালা পথ*-১৯৭০), ‘তুমি সাত সাগরের ওপার হতে আমায় দেখেছো’ [আবদুল জব্বারের সাথে দ্বৈতকণ্ঠে] (*কত যে মিনতী*-১৯৭০), প্রভৃতি গান বিশেষ গায়কি সম্পন্ন।

রুনা লায়লা

নারী কণ্ঠের মধ্যে রুনা লায়লার গায়কিতে রয়েছে বিশেষ ক্ষমতা যার কারণে তিনি প্রায় সব ধরনের গানে অবাধ বিচরণ করতে পারেন। ভারতীয় উপমহাদেশ তথা গোটা বিশ্বে তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেন। অন্যান্য গানের পাশাপাশি চলচ্চিত্রে চটুল প্রকৃতির গান রুনা লায়লার কণ্ঠে বেশি পরিবেশিত হতে দেখা যায়। স্বাধীনতাত্তোর চলচ্চিত্রের অধিকাংশ মনোরঞ্জনমূলক পার্টি বা ক্লাবে পরিবেশিত গানগুলোর নেপথ্যকণ্ঠ তিনি দিয়েছেন এবং দর্শক মহলে বেশ সমাদৃত হয়েছেন। কতিপয় গানের মাধ্যমে তার গায়কির বিশেষ দিক উল্লেখ করা যায়। রোমান্টিক প্রেমের গান–‘গানের খাতায় স্বরলিপি লিখে’ (*স্বরলিপি*-১৯৭১), ‘আমার মন বলে তুমি আসবে’ (*আনার কলি*-১৯৮০), ‘চঞ্চল হাওয়ারে ধীরে ধীরে চলরে’ (*দি রেইন*-১৯৭৬) প্রভৃতি। আসরকেন্দ্রীক মনোরঞ্জনমূলক গান যা নর্তকীর নাচে বিশেষ এক আবেদন তৈরি করে–‘রূপনগরের রাজা তুমি আজ পাবে সাজা’ (*রাজমহল*-১৯৭৮),‘পাগল পাগল মানুষগুলো পাগল সারা দুনিয়া’ (*বড় ভালো লোক ছিল*-১৯৮২) ‘আনা আনা ষোল আনা ভাব না হলে প্রেম মেলে না’ (*নালিশ*-১৯৮২),‘এই বৃষ্টি ভেজা রাতে চলে যেওনা’ (*নরম গরম*-১৯৮৪)‘চন্দ্র তারায় মিছে খুঁজেছি তোমায়’ (*রাজকন্যা*-১৯৮০) প্রভৃতি।

পার্টি বা ক্লাবে পরিবেশিত মনোরঞ্জনমূলক গান-‘রঙের মাস্তুলে দিলাম পিরিতের বাদাম রে’(*স্যারেন্ডার*-১৯৮৭), ‘এই মনটা যদি চায় পেতে মন’ (*রজনীগন্ধা*-১৯৮২), ‘একবারই প্রেম জীবনে আসে/একবারই মানুষ ভালবাসে’ (*নীতিবান*-১৯৮৮), ‘টাকার খেলা বড় খেলা, রূপের খেলা খোলামেলা’ [সহশিল্পী খুরশীদ আলম] (*সত্য মিথ্যা*-১৯৮৯) প্রভৃতি। উপরোক্ত গান বিশেষ করে মনোরঞ্জনের গানে–আরে রে রে রে, হি ইক, ওহো, হে ই, হ্যাই, ইহি, আহা, হাহাহা, সখীদের নিয়ে সমস্বরে গান, গায়কির বিশেষ মাত্রা যোগ করে। রুনা লায়লার গায়কি সম্পর্কে খুরশীদ আলম বলেন–‘ফিল্মে একটা আলাদা ভয়েস লাগে। যেমন কিশোর কুমার। তাঁর আনপ্যারালাল গলা।...আমাদের রুনা লায়লা ‘ও সাগর কন্যারে রাঙা দুটি পায় আ হা।’ এই যে ‘আ হা’ এই ভঙ্গিমায় করতে হবে গলাটা। সুবল দা রুনাকে এটা বলে নি। এটা কিন্তু রুনার ক্রিয়েশন। তদ্রুপ

আমারও অনেক আছে।'[৩১] এই শিল্পীর চাহিদা সম্পর্কে 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'য় প্রকাশিত খুশবন্ত সিং-এর ভাষ্য–'বাংলাদেশের মানুষ ও সরকারের প্রতি আমার অনুরোধ, ফারাক্কার সব পানি তোমরা নিয়ে যাও, বদলে রুনা লায়লাকে আমাদের দিয়ে দাও।' অনেক সংগীতানুরাগী অকপটে বলে থাকেন সেই রুনা লায়লাকে এদেশের চলচ্চিত্রের গানে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়নি। বরং কিছু সুরকার, সংগীত পরিচালক দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সুরের টাইপে তিনি আবদ্ধ থেকে ছিলেন। তা না হলে এদেশের বাংলা গান হতো আরো সমৃদ্ধ এবং নানামাত্রিকতা লাভ করতো বহুগুণে বেশি।

সুবীর নন্দী

সূক্ষ্ম কারুকাজ সম্পন্ন কণ্ঠের অধিকারী তিনি। ক্লাসিক্যাল মুডের গান বেশি করেছেন। চলচ্চিত্রে মূলত এই ধারার গানের পরিসর অনেকটা কম। কারণ চলচ্চিত্রের গানে প্রয়োজন নাটকীয়তা। তবে বেশ কিছু গান রয়েছে যা নাটকীয় গুণসম্পন্ন এবং যে সব গান বিশেষ গায়কির কারণে দর্শক মহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তারমধ্যে–'বন্ধু তোর বরাত নিয়া আমি যাব' (*বন্ধু*-১৯৭৮) 'দিন যায় কথা থাকে' (*দিন যায় কথা থাকে*-১৯৭৯), লোকসুরের আধুনিক উপস্থাপন–'হায়রে অবুঝ নদীর দুই কিনার' (*শুভদা*-১৯৮৬), 'মনরে সুখ পাখি তোর হইল না আপন' (*দেবদাস*-১৯৮২), 'নেশার লাটিম ঝিম ধরেছে'(*দিন যায় কথা থাকে*-১৯৭৯), 'মাস্টার সাব আমি নাম দস্তখত শিখতে চাই' (*অশিক্ষিত*-১৯৭৮) প্রভৃতি। এছাড়া আধুনিক প্রেমের গান–'তোমারই পরশে জীবন আমার ওগো ধন্য হলো' (*অংশীদার*-১৯৮১), 'কত যে তোমাকে বেসেছি ভালো' (*উসিলা*-১৯৮৬) প্রভৃতি গান গায়কির কারণে দর্শক প্রিয়তা পায়।

সাবিনা ইয়াসমিন

বাঙালি নারী হৃদয়ের অসীম বেদনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তাঁর কণ্ঠে। তিনি নারীর অন্তর্লোকের প্রেম-বিরহ, বেদনার করুণ আর্তির বয়ান যেন এঁকেছেন নিপুণভাবে। 'একি সোনার আলোয় জীবন ভরিয়ে দিলে' (*মনের মত বউ*-১৯৬৯),'ফুলের মালা পরিয়ে দিলে' (*ময়নামতি*-১৯৬৯) প্রভৃতি গানে। মাহমুদুন্নবীর সাথে দ্বৈতকণ্ঠে–'তুমি যে আমার কবিতা' (*দর্পচূর্ণ*-১৯৭০), 'অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান' (*অশ্রু দিয়ে লেখা*-১৯৭২), 'দুঃখ আমার বাসর রাতের পালঙ্ক' (*অলঙ্কার*-১৯৭৮), 'মন আমার ছোট্ট তরী' (*গাঙচিল*-১৯৮০), 'আমি রজনী গন্ধা ফুলের মত গন্ধ বিলিয়ে যাই' (*রজনীগন্ধা*-১৯৮২), 'এই হৃদয়ে এত যে কথার কাঁপন' (*চন্দ্রনাথ*-১৯৮৪), 'শত জনমের স্বপ্ন তুমি আমার জীবনে এলে' (*রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত*-১৯৮৭), 'আবার দুজনে দেখা হলো' (*দুই জীবন*-১৯৮৮) প্রভৃতি।

আসরকেন্দ্রীক মনোরঞ্জনমূলক গানেও রয়েছে তাঁর বিশেষ গায়কি–'জনম জনম ধরে প্রেম পিয়াসী (*দেবদাস*-১৯৮২), 'আমি বাজুবন্ধ হলাম না, ঝুমকা চুড়ি হলাম না' (*শুভদা*-১৯৮৬) প্রভৃতি। এছাড়া গ্রামীণ এবং লোকজ সুরের আধুনিক গান–'গুন গুন গুন গান গাহিয়া নীল ভ্রমরা যাই' (*সুজন সখী* -১৯৭৫),'আমি আছি থাকব ভালবেসে মরব' (*সুন্দরী*-১৯৭৯),'আরে ও পাহাড়িয়া সাপের খেলা' (*বেদের মেয়ে জোসনা*-১৯৮৯) প্রভৃতি অসংখ্য গানে তিনি কণ্ঠ দিয়েছেন। নায়ক রাজ্জাকের কাছ থেকে জানা যায় এই শিল্পীসম্পর্কে–তিনি এত অল্প বয়সে গান শুরু করেছেন যে, তার সামনে সিঁড়ি দেয়া হত। খন্দকার ফারুক এবং মাহমুদুন্নবীর সাথে যেন বালেন্স করে গাইত পারে।[৩২] প্রতিটি ক্ষেত্রে

তার দক্ষতার কমতি নেই। আবার এই শিল্পী সম্পর্কে ভিন্ন মতও পাওয়া যায়। আশির দশকে চলচ্চিত্রের গানে এক চেটিয়া বাজর দখল করে রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমিন এবং এন্ড্রু কিশোর। ফলত অনেকের মতে চলচ্চিত্রের গানে বৈচিত্র্যের সংকট তৈরি হয়। এক সংবাদে জানা যায়–

> এটা ঠিক, ফিল্মী সঙ্গীতে বৈচিত্র্য নেই। বৈচিত্র্য মানে কণ্ঠের বৈচিত্র্য। রুনা, সাবিনা বা এন্ড্রুর কণ্ঠ নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। তথাপি বার বার একই কণ্ঠের গানে শ্রোতার ক্লান্তি এসে যেতে পারে, আসছেও। সুরকাররা এটা যে বোঝেনও না, তা নয়। এই বৈচিত্র্য আনার জন্যই নতুন কণ্ঠ তারা উপহার দেন। এক্ষেত্রে ছবির পরিচালকের মতামতকেও তারা কখনো সখনো উপেক্ষা করেন। সুরকারের দৃঢ়তার কারণেই এসেছেন এন্ড্রুকিশোর। তাকে রাজশাহী থেকে ডেকে আনিয়ে গান করিয়েছিলেন আলম খান। আলাউদ্দিন আলী চট্টগ্রামে খবর পাঠিয়ে ডেকে এনেছিলেন তপন চৌধুরীকে। সামিনা চৌধুরীকেও দিয়ে প্রথম গান করান আলাউদ্দীন আলী। অথচ পরে যে হারে তাদেরকে দিয়ে গান করানো উচিত ছিল, তা করেন নি। ঘুরে-ফিরে এসে গেছেন সাবিনা এবং রুনা, এসে গেছেন এন্ড্রুকিশোর।[৩৩]

আবিদা সুলতানা

প্রায় সব ধরনের গান তিনি করেছেন। তাঁর কণ্ঠে রোমান্টিক প্রেমের আধুনিক গান–'তুমি চেয়েছিলে ওগো জানতে' (*আবার তোরা মানুষ হ*-১৯৭৩),'বিমূর্ত এই রাত্রি আমার' (*সীমানা পেরিয়ে*-১৯৭৭), 'একি বাঁধনে বলো জড়ালে আমায়' (*তালুকদার*-১৯৮৬), মাতৃত্ববোধের গান–'একটা দোলনা যদি কাছে পেতাম' (*এখনই সময়*-১৯৮০) প্রভৃতি। গ্রামীণ ও লোকসুরের কণ্ঠের গান–'এক নদীর এই উজান ভাটি' (*উজান ভাটি*-১৯৮২), শিশুকণ্ঠের গানেও বিশেষ দক্ষতা রয়েছে তাঁর। যেমন–'আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী' (*ছুটির ঘন্টা*-১৯৮০), 'হারজিৎ চিরদিন থাকবে' (*পুরস্কার*-১৯৮৩) প্রভৃতি গান। এই শিল্পী সম্পর্কে পূর্বাণী পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, সমসাময়িক কালে শিল্পীর মধ্যে আবিদা সুলতানা তুলনামূলকভাবে অনেকটা মানান সই। তার গায়কিতে ফিল্মী ঢংটা আছে। সে কারণে রুনা লায়লার পরেই ফিল্মী সংগীতে তার স্থান।'[৩৪]

এন্ড্রুকিশোর

তাঁর চলচ্চিত্রের গানে অভিষেক হয় সত্তর দশকে। এই দশকে যাত্রারম্ভ হলেও মূলত তিনি দর্শকের মন জয় করেন আশির দশকে এসে। তাঁর গায়কিতে প্রেমের বীরত্বপূর্ণ ভঙ্গিমা এবং নায়কোচিত ভরাট গলার কারণে দর্শক তাকে সাদরে গ্রহণ করে। আসলাম আহসানের চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থ থেকে জানা যায়–'আশির দশকের মাঝামাঝি এসে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও খন্দকার ফারুক আহমেদ মোঃ আলী সিদ্দিকী, বশির আহমেদের মতো গুণী শিল্পীরা সিনেমায় গান গাওয়া কমিয়ে দেন। ফলে নায়কোচিত পুরুষকণ্ঠের ক্ষেত্রে একটি শূন্যতা সৃষ্টি হয়। সেই শূন্যতা দখল করেন এন্ড্রুকিশোর।[৩৫] তাঁর গায়কি নিয়ে কথা বলা যাক–*আঁখি মিলন* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে–'আমার গরুর গাড়িতে' গানটির দৃশায়নে প্রথমে প্রাকৃতিক রূপ তুলে ধরা হয়। তার সাথে রয়েছে নায়কের কণ্ঠে–ও হো... হো... হো...হুম... হুম...ধ্বনিসমূহ। যার মধ্য দিয়ে গানটি শুরু হয়। গানের মাঝে হারে, হেই, এবং শেষে হুর-উ... হুর-উ... কুকু-উ ইত্যাদি ধ্বনি রয়েছে যার মাধ্যমে গানটি আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। *ভাই বন্ধু* চলচ্চিত্রে–'ভেঙ্গেছে পিঞ্জর মেলেছে ডানা/উড়েছে পাখি পথ অচেনা' এ গানেও হে... আহা... ...হা ইতাদি নায়োকিত উচ্ছ্বাসমূলক ধ্বনির ব্যবহার রয়েছে। প্রেম ও বিরহের গান–'হায়রে মানুষ

রঙিন ফানুস' (*বড় ভালো লোক ছিল*-১৯৮২), 'আমি চিরকাল প্রেমের কাঙাল' (*প্রিন্সেস টিনা খান*-১৯৮৩), 'সবাইতো ভালবাসা চায়' (*স্যারেন্ডার*-১৯৮৭), 'আমার বুকের মধ্যেখানে' (*নয়নের আলো*-১৯৮৪), 'চোখের জলে আমি ভেসে চলেছি' (*ঝিনুকমালা* -১৯৮৫), 'জীবনের গল্প আছে বাকি অল্প' (*ভেজা চোখে*-১৯৮৮) প্রভৃতি গান তাঁর বিশেষ গায়কির কারণে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

শাম্মী আখতার

তাঁর কণ্ঠে নারী হৃদয়ের এক গভীর বেদনার রূপায়ণ ঘটে। বিশেষত গ্রামীণ সমাজে নারী জীবনের গভীর বেদনার চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিশেষ শক্তি হিসেবে তাঁর গানের গায়কি বিশেষভাবে স্মরণীয়। *অশিক্ষিত*-১৯৮০ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তাঁর গাওয়া শুরু। এ চলচ্চিত্রে–'আমি যেমন আছি তেমন রব বউ হব নারে', 'ঢাকার শহর আইসা আমার আশা ফুরাইছে'।[৩৬] এছাড়া 'ঢাকায় যারা চাকরি গো করে/তারা কেন প্রেম করে প্রাণ সখী গো', 'বিদেশ গিয়া বন্ধু তুমি/আমায় ভুইল না/চিঠি দিও পত্র দিও জানাইও ঠিকানারে', 'আমার মনের বেদনা বন্ধু ছাড়া জানে না' (*উজান ভাটি*-১৯৮২), 'আমি তোমার বধূ' (*আরাধনা*-১৯৭৯) প্রভৃতি গান। আবার এ শিল্পী সম্পর্কে সমালোচকের ভিন্ন মন্তব্য–শাম্মীও মিষ্টি কণ্ঠের অধিকারী অথচ ফিল্মি ঢং তার কণ্ঠে ততটা আসে না।'[৩৭]

সাধারণ গান ও চলচ্চিত্র গানের মধ্যে গায়কির পার্থক্য

প্রতিটি শিল্পেরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা রা রীতি যা দিয়ে ঐ শিল্পটি সহজেই অনুমেয়। চলচ্চিত্রের গানের সুর কিংবা গায়কিও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। এই গান প্রধানত কাহিনি এবং চরিত্রনির্ভর যদিও কখনো কখনো দর্শকের বিশেষ আনন্দ দানের উদ্দেশ্যেও বিবেচ্য। ফলে এ গানের সুর, তাল, লয় এবং গায়কি প্রভৃতি হয় সহজ সরল মায়ায় আচ্ছাদিত। তবে তার একটা নিজস্ব ভঙ্গিমা রয়েছে। যার কারণেই এই গানের জনপ্রিয়তা বিশেষ মাত্রায় উত্তীর্ণ। তবে কোন শিল্পই সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের বাইরে নয়। এ ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র শিল্প এবং তার গানও ব্যতিক্রম নয় বরং একই ধারায় প্রবাহিত। প্রসঙ্গত, প্রচলিত গানের প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না হলেও ইতোমধ্যে এই গানের একটি নিজস্ব রীতি গড়ে উঠেছে এবং চলচ্চিত্রের অধিকাংশ গানের বিষয় এবং তার সুর পর্যালোচনা করলে তা-ই স্পষ্ট হয়। সমালোচকের মতে–

> রেডিও এবং টিভিতে একজন শিল্পী যে গান করেন, তার সুর একটি নির্দিষ্ট ধারায় এগোয়। উঁচু-নিচু লয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকে। অনেকটা শান্ত স্রোতস্বিনীর মত। নির্দিষ্ট ধারায়, নির্দিষ্ট লয়ের মধ্য দিয়ে এগোয়। ফিল্মী গানের একটি নির্দিষ্ট ধারা আছে তবে সেটা শান্ত স্রোতস্বিনীর সঙ্গে তুলনীয় নয়। ফিল্মী গানের সুর কখনো প্রচণ্ড চড়া কখনো অতি মাত্রায় নিচু, কখনও বা কিছু চিৎকারের সমষ্টি। এ ব্যাপারটি কণ্ঠে আনা খুব সহজসাধ্য বিষয় নয়। বোম্বাইয়া ছবিতে লতা এবং আশার কণ্ঠে এই ব্যাপারটি যত সাবলীলভাবে আসে, আর কারো কণ্ঠে ততটা আসে না।[৩৮]

গায়কিতে প্রয়োজন নাটকীয়তা, কণ্ঠের দৃঢ়তা, উচ্চতা, বৈচিত্র্যতা, অন্য কণ্ঠের সঙ্গে গাইবার দক্ষতা। অনেকের গলা নিচে কিংবা উপরে সাবলীলভাবে বিচরণ করতে পারে না বলে দ্বৈতগান গাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। দ্বৈতগানে উভয়ের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ কণ্ঠের প্রয়োজন। কণ্ঠের সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক নারী এবং পুরুষকণ্ঠের একে অপরের সাথে গাওয়ার সক্ষমতা থাকে না। এ সম্পর্কে সংগীত পরিচালক আলম খান বলেন–

> চলচ্চিত্রের গান সুর করা কিংবা সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করতে গেলে সব ধরনের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। তার অন্যতম কারণ হলো চলচ্চিত্রে একটি সিকোয়েন্স থাকে যাকে কেন্দ্র করে গান রচনা বা সুরারোপ করতে হয়। সুতরাং বিশেষ মুন্সিয়ানা না থাকলে এ কাজটি করা সম্ভব নয়। সাধারণ গান থেকে চলচ্চিত্রের গানের পার্থক্য এখানেই। সাধারণ গানে এত সবের চিন্তা করতে হয় না। সেখানে গীতিকার, সুরকার প্রায় সবাই থাকেন স্বাধীন, তারা স্বাধীনভাবে কাজ করেন। কিন্তু চলচ্চিত্রের গানে স্বাধীনতা ভিন্ন রকম দৃশ্যপট বা বিশেষ পটভূমিকে কেন্দ্র করে সব কিছু করতে হয়। এখানে বিশেষ অভিজ্ঞতা বা দক্ষতার প্রয়োজন হয়।[৩৯]

নিম্নে চলচ্চিত্রের গান ও সাধারণ গানের মধ্যে বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে।
সারণি-২

ক্রমিক	চলচ্চিত্রের গান	সাধারণ গান
১.	কাহিনি বা চরিত্রানুযায়ী রচিত ফলে এসব দিক বিবেচনা করে গাইতে হয়।	এসব কিছু মেনে গাইতে হয় না বরং স্বাধীনভাবে গাইলেই হয়।
২.	সিকোয়েন্স থাকে	ধরা বাধা কোন সিকোয়েন্স থাকে না
৩.	সংগীত পরিচালককে প্রতিনিয়ত পরিচালকের মত অনুসরণ করতে হয়।	এ ক্ষেত্রে তেমন কোন মত বা পরামর্শ গ্রহণ করতে হয় না।
৪.	ইচ্ছে হলেই যে কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা যায় না।	ইচ্ছে হলেই যে কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
৫.	গায়কিতে নাটকীয়তা প্রয়োজন	এ ধরনের কোন বাধ্যবাধকতা নেই
৬.	দ্বৈতকণ্ঠের গানে সহশিল্পীকে প্রাধান্য দিতে হয়	এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়লেও তা ভিন্নরূপ
৭.	চরিত্রানুযায়ী রচিত হয় বলে এ গানে বিচিত্র বিষয় এবং প্রচলিত অপ্রচলিত নানা চরিত্র রয়েছে। যেমন–নায়ক-নায়িকা, বিবেক-বাউল, বৈষ্ণব, শিশু চরিত্র প্রভৃতি। এসব চরিত্রের সাথে একাত্ম হয়ে গাইতে হয়।	এখানে এ ধরনের কোন শর্ত নেই বরং গায়ক/ গায়িকা মুক্ত বা স্বাধীন

ভিনদেশি সুর, গায়কি প্রসঙ্গ

অনেকগুলো শিল্পের সমাহারে চলচ্চিত্র মাধ্যমের প্রকাশ। নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে এর কাহিনি গড়ে ওঠে। ফলে কাহিনির সূত্রধরে নানা বিষয়ের আগমন ঘটে। পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করার কারণে গানের সুরে-গায়কিতে এসে পড়ে পাশ্চাত্য ভঙ্গিমা। ক্লাব বা পার্টিতে গিটার, ড্রামস, কিবোর্ড ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে পরিবেশিত গানগুলোর দিকে লক্ষ করলে তা-ই দৃষ্ট হয়। এছাড়া স্বাধীনদেশে যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। আলমগীর কবীর পরিচালিত *ধীরে বহে মেঘনা* (১৯৭৩) এদেশের যৌথ (ভারত-বাংলাদেশ) প্রযোজনার প্রথম চলচ্চিত্র।[৪০] এছাড়া নারায়ণ ঘোষ এবং আজিজুর রহমান বুলির পরিচালনায় *প্রাণ সজনী* (১৯৮৩)। এরপর ধীরে ধীরে আরো অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হয় এবং আরো অনেক দেশ যুক্ত হতে থাকে। বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত *দূরদেশ* (১৯৮৩), *মিস লংকা* (১৯৮৫), পাকিস্তান ও তুরস্কের যৌথ প্রযোজনায় *আপোস* (১৯৮৫) ও *হিমালয়ের বুকে* (১৯৮৬) বাংলাদেশ-ভারত প্রযোজিত *অবিচার*

(১৯৮৫) প্রভৃতি চলচ্চিত্র।[৪১] উভয় দেশের শিল্পী কলাকুশলীর অংশগ্রহণে নির্মিত হয় এসব চলচ্চিত্র। ফলে স্বাভাবিকভাবে গানের সুরে, কথায় এবং গায়কিতে দেশসমূহের মিশেল বিদ্যমান। আবার কিছু গানকে এদেশের চলচ্চিত্রের গানের ইতিহাসে কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সরাসরি নকল করার দায়ে। নিম্নরূপ:

চুপি চুপি বলো কেউ জেনে যাবে (চলচ্চিত্র: *নিশান*-১৯৭৭)
মূল হিন্দি গান: ধীরে ধীরে বোল কোঈ শুন না লে
শিল্পী : মুখেশ, লতা মঙ্গেশকর
মূল চলচ্চিত্র: *গোরা ঔর কালা (১৯৭২)*

নাচ আমার ময়না তুই পয়সা পাবিরে (চলচ্চিত্র: *এক মুঠো ভাত* -১৯৭৬)
মূল হিন্দি গান: নাচ মেরি বুল বুল
শিল্পী: কিশোর কুমার
মূল চলচ্চিত্র: *রোটি (১৯৭৪)*

দোস্ত আমরা দু'জন হব না দুশমন (চলচ্চিত্র: *দোস্ত দুশমন*-১৯৭৭)
মূল হিন্দি গান: ইয়ে দোস্তি হাম নেহি তোরেঙ্গে
শিল্পী:কিশোর কুমার ও মান্নাদে
মূল চলচ্চিত্র: *শোলে (১৯৭৫)*

চলচ্চিত্র সাংবাদিক, গবেষক আবদুল্লাহ জেয়াদের গ্রন্থ থেকে জানা যায়–চলচ্চিত্রের প্রথম সময় স্বর্ণযুগ বলা হয়। আশ্চর্যের বিষয় ওই স্বর্ণযুগে যতো ছবি নির্মিত হয়েছে তার প্রায় ৬০ থেকে ৭০ ভাগ ছবিই ভারতীয় বাংলা কিংবা হিন্দি বা মাদ্রাজি ছবির নকলে নির্মিত হয়েছে আর ওই নকল ছবি তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করে। ওই সময়ে নির্মিত ছবির নির্মাতাসহ নায়ক-নায়িকারাও পান জনপ্রিয়তা।[৪২] নকল প্রসঙ্গে গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক আহমেদ ইমতিয়াজ বলেন–

> যখন ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রযোজনার ছবি বানাতো তখন ভারত হতে অভিনয়শিল্পী আনার পাশাপাশি ভারতের অনুমতি এনে ভারতীয় ছবির গান বাংলায় করার জন্য সংগীত পরিচালকদের উপর এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করা হতো। আবার হুবহু ভারতীয় ছবিই বাংলাদেশে তৈরির ফলে সেই সব ছবির গানগুলোকেও হুবহু কপি করা হতো। যেমন–*কেয়ামত থেকে কেয়ামত*, *দূরদেশ*।'যদি বউ সাজো গো আরো সুন্দর লাগবে গো', 'চুপিচুপি বলো কেউ জেনে যাবে'এই গানগুলোকে হুবহু সুরে বাংলা কথায় গাওয়া হয়েছে।[৪৩]

অতীতে মানুষের একমাত্র বিনোদন মাধ্যম ছিল চলচ্চিত্র। ফলে এ নিয়ে সমালোচনা করার মত মানসিকতা পোষণ করত না। বরং এদেশের মাটিতে চলচ্চিত্র নির্মাণ হচ্ছে তা ভেবেই বিস্ময় প্রকাশ করত। কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষের ভাবনার পরিধি বেড়েছে হাতের মুঠোয় চলে এসেছে জানবার সীমাহীন সুযোগ। ইন্টারনেটের যুগে ঘরে বসেই সব তথ্য পেয়ে যাচ্ছে। ফলে শেষ পর্যন্ত অজানা থাকেনি কোন বিষয়।

সময়ের সাথে সাথে গানের সুর এবং গায়কিতে পরির্বতন লক্ষ করা যায়। উল্লেখযোগ্য গানের বিষয়, সুর এবং স্বর প্রক্ষেপণের মাধ্যমে সুর এবং গায়কির বিবর্তনের রূপ তালিকায় তুলে ধরা হলো:

এক. গ্রামীণ বা লোক সুর

লোক সুরের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রয়োগ সময়কাল উল্লেখপূর্বক তালিকা:

সারণি-৩

ক্রম	গানের শিরোনাম	গায়কি এবং স্বর প্রক্ষেপণের ধরন	চলচ্চিত্র
১.	আমি ভিন গেরামের নাইয়া	প্রিয়জনকে কাছে পাওয়ার বাকুলতা, সাধারণ গায়কি এবং স্বর প্রক্ষেপণ।	*মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬)
২.	অভিমান করো না তুমি কি গো বুঝ না	পরীক্ষামূলক লোক সুরের প্রয়োগ এবং গায়কি। তাল-ছন্দে বিচিত্রতা, কাহারবার সাথে তেওড়া তালের সংমিশ্রণ।	*হারানো দিন* (১৯৬১)
৩.	এই যে আকাশ এই যে বাতাস বউ কথা কও সুরে যেন ভেসে যাই	আধুনিক এবং লোক সুরের সংমিশ্রণ, গায়কি এবং ছন্দের ভিন্নতা।	*সুতরাং* (১৯৬৪)
৪.	হিরামতি হিরামতি ও হিরামতি আমি যাব সুধারাম কন্যামতি	পরীক্ষা-নিরীক্ষাধর্মী লোক সুরের প্রয়োগ (শ্যামাসংগীতের সাথে কীর্তনের সুর)।	*সারেং* (১৯৭৮)
৫.	ও কি ও নিদয়া বিধিবাম হইলরে	'ও কি ও বন্ধু কাজল ভ্রমরারে' ভাওয়াইয়া গানের সুরের আদলে তৈরি গান।	*সুজন সখী* (১৯৭৯)

দুই. লোক সুরের আধুনিক উপস্থাপন

লোকসুরের গানগুলো ধীরে ধীরে উপস্থাপন ভঙ্গিমায় আধুনিকতার রূপ লক্ষণীয়। সময়কাল ধরে তালিকার মাধ্যমে তা তুলে ধরা হলো:

সারণি-৩.১

ক্রম	গানের শিরোনাম	গায়কি এবং স্বর প্রক্ষেপণের ধরন	চলচ্চিত্র
১.	পরানে দোলা দিল এ কোন ভ্রমরা	গায়কিতে রোমান্টিকতা এবং স্বর প্রক্ষেপণে চঞ্চলতা।	*সুতরাং* (১৯৬৪)
২.	গুন গুন গুন গান গাহিয়া নীল ভ্রমরা যায় সেই গানের টানে ফুলের বনে	গায়কিতে রোমান্টিকতা, চঞ্চলতা, স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা।	*সুজন সখী* (১৯৭৫)
৩.	সব সখীরে পার করিতে নেব আনা আনা তোমার বেলায় নেব সখী তোমার কানের	গায়কিতে প্রেম, নায়কোচিত ভাব এবং স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা।	*সুজন সখী* (১৯৭৫)
৪.	ওরে নীল দরিয়া আমায় দেরে দে ছাড়িয়া	প্রিয়জনকে কাছে পাওয়ার ব্যাকুলতা গায়কিতে এক ধরনের শূন্যতা, হাহাকার	*সারেং বৌ* (১৯৭৮)

		ইত্যাদি।	
৫.	আমি যেমন আছি তেমন রব বউ হবো নারে কারো বউ হবো নারে	গায়কিতে রোমান্টিকতা, চঞ্চলতা, স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা ও নাটকীয়তা।	*অশিক্ষিত* (১৯৭৮)
৬.	আমি আছি থাকব ভালবেসে মরব দোহাই লাগে তোমার	গায়কিতে রোমান্টিকতা, স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা।	*সুন্দরী* (১৯৭৯)
৭.	আইলো দারুণ ফাগুনরে লাগলো মনে আগুনরে	গায়কিতে রোমান্টিকতা, একজন সঙ্গী পাওয়ার চঞ্চলতা, স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা।	*চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা* (১৯৮৪)
৮.	এই নিশি রাইতে তোমার ঘরে যাইতে মন যে উতাল পাথাল করে বধূয়া	গায়কিতে রোমান্টিকতা, চঞ্চলতা, স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা।	*নরম গরম* (১৯৮৪)
৯.	আমার গরুর গাড়িতে বউ সাজিয়ে তুত্তুর তুত্তুর তুত্তুর তু সানাই বাজিয়ে যাব তোমায় শ্বশুর বাড়ি নিয়ে	গায়কিতে প্রেম এবং নায়কোচিত ভাব, স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা এবং ও হো... হো... হো...হুম... হুম... ইত্যাদি ধ্বনিসমূহের ব্যবহার।	*আঁখি মিলন* (১৯৮৩)
১০.	তুমি ডুব দিওনা জলে কন্যা ঝিনুক খুঁজে পাইবা না	গায়কিতে প্রেম এবং নায়কোচিত ভাব, স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা।	*ঝিনুক মালা* (১৯৮৫)
১১.	তুই যে আমার জানের জান তুই যে আমার প্রাণের প্রাণ	গায়কিতে প্রেম এবং নায়কোচিত ভাব, স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা।	*নিষ্পাপ* (১৯৮৬)
১২.	জল খাইতে গিয়েছিলাম দীন ভিখারির বাড়ি কে যেন জল এনে দিল রে	গায়কিতে রোমান্টিকতা, স্বরপ্রক্ষেপণে আধুনিকতা।	*আলোমিত প্রেম কুমার* (১৯৮৯)
১৩.	বেদের মেয়ে জোস্না আমায় কথা দিয়েছে আসি আসি বলে জোস্না ফাকি দিয়াছে	গায়কিতে প্রেম, অভিমান, নায়কোচিত ভাব এবং স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা।	*বেদের মেয়ে জোস্না* (১৯৮৯)

বিবেকের গানে আরেক রূপ লক্ষ করা গেছে যা লোক সুরের আধুনিক উপস্থাপনে উন্নীত। সময়কাল উল্লেখপূর্বক তালিকার মাধ্যমে তা তুলে ধরা হলো:

সারণি-৩.২

ক্রম	গানের শিরোনাম	গায়কি এবং স্বর প্রক্ষেপণের ধরন	চলচ্চিত্র
১.	ঢেউ উঠছে সাগরে, ক্যামনে পাড়ি ধরিরে	গায়কিতে অন্তহীন বিষণ্নতা, ইঙ্গিত প্রভৃতি।	*রূপবান* (১৯৬৫)
২.	এ কুল ভাঙ্গে ও কূল গড়ে এইতো নদীর খেলা	বিষণ্নতা এবং গায়কিতে নদীর প্রবাহমানতার রূপ তুলে ধরার প্রয়াস।	*সিরাজদ্দৌলা* (১৯৬৭)
৩.	সবাই বলে বয়স বাড়ে আমি বলি কমেরে	গায়কিতে দুঃখবোধ, উপলব্ধি এবং স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা।	*ফকির মজনু শাহ* (১৯৭৮)
৪.	আছেন আমার মুক্তার আছেন আমার বারিস্টার	গায়কিতে আত্মোপলব্ধি এবং স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা।	*গোলাপী এখন ট্রেনে* (১৯৭৮)

৫.	এই জীবন তো একদিন চলতে চলতে থেমে যাবে	গায়কিতে আত্মোপলব্ধি এবং স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা।	*মানে না মানা* (১৯৮২)
৬.	হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস দম ফুরাইলে ঠুস্	গায়কিতে আত্মোপলব্ধির উন্মেষ, আধ্যাত্মিক চেতনা, স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা।	*বড় ভালো লোক ছিল* (১৯৮২)
৭.	তোরা দেখ দেখ রে চাহিয়া রাস্তা দিয়া হাঁইটা চলে রাস্তা	গায়কিতে আত্মোপলব্ধির চেতনা এবং স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা ও নাটকীয়তা।	*বড় ভালো লোক ছিল* (১৯৮২
৮.	পাগল পাগল মানুষগুলো পাগল সারা দুনিয়া	গায়কিতে আত্মোপলব্ধির চেতনা এবং স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা।	*বড় ভালো লোক ছিল (১৯৮২*
৯.	ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে রইব না বেশি দিন তোদের মাঝারে	গায়কিতে আত্মোপলব্ধির চেতনা, স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা।	*প্রাণসজনী* (১৯৮৩)
১০.	ভবের এই খেলা ঘরে খেলে সব পুতুল খেলা	গায়কিতে আত্মোপলব্ধির চেতনা ও গতিশীলতা এবং স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা।	*ঝিনুক মালা* (১৯৮৫)
১১.	ও তুই ডাকলি যারে আপন করে সে তো অসহায়	গায়কিতে প্রিয়জন হারানোর বেদনা এবং স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা।	*বেদের মেয়ে জোসনা (১৯৮৯)*
১২.	মায়ার গড়া এই সংসারে কেউ হাসে কেউ যায়রে চলে মিছে কেন কাঁদিসরে নদীর কিনারায়	গায়কিতে ইশারা বা ইঙ্গিত, দরাজ কণ্ঠে খোলা গলায় বেদনার রূপ নির্মাণের প্রয়াস এবং স্বর প্রক্ষেপণে আধুনিকতা।	*ঐ*

তিন. আধুনিক গান

ষাট-সত্তর দশকের চলচ্চিত্রের গানের মত আশির দশকের চলচ্চিত্রের গানের সুর এবং গায়কিতেও রোমান্টিকতা লক্ষ করা যায়। তবে তা কাব্যময়তা এবং কল্পনার বিস্তারণে ক্ষীণ বলে অনুভূত হয়। এ বিষয়ে চলচ্চিত্রের গানের বিষয়বৈচিত্র্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে এ সময়েরও অনেক গানের সুর এবং গায়কিতে স্নিগ্ধ কোমল, ধীর এবং শান্ত ভাব পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। উল্লেখ্য যে, এই সময়ের গায়কিতে বিশেষ এক ধরনের ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ করা যায়, যা রোমান্টিকতা প্রকাশ এবং নায়কোচিত ভাব প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। নিম্নে একটি তালিকার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-৩.৩

ক্রম	গানের শিরোনাম	গায়কি এবং স্বর প্রক্ষেপণের ধরন	চলচ্চিত্র
১.	তোমারে লেগেছে এত যে ভালো চাঁদ বুঝি তাই জানে	গায়কিতে রোমান্টিকতা স্বর প্রক্ষেপণে কমনীয়তা, শান্ত গতি ভাব সম্পন্ন।	*রাজধানীর বুকে (১৯৬০)*
২.	নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তায় চলেছি একা	গায়কিতে রোমান্স এবং চঞ্চলতা।	*নীল আকাশের নীচে* (১৯৬৯)

৩.	আয়নাতে ঐ মুখ দেখবে যখন কপোলের কালো তিল পড়বে চোখে	রোমান্টিক গায়কি স্বর প্রক্ষেপণে কমনীয়তা ধীর এবং শান্ত ভাব।	*নাচের পতুল* (১৯৭০)
৪.	ফুলের কানে ভ্রমর এসে চুপি চুপি বলে যায়	রোমান্টিক গায়কি স্বর প্রক্ষেপণে কমনীয়তা ধীর এবং শান্ত।	*পীচ ঢালা পথ* (১৯৭০)
৫.	তুমি যে আমার কবিতা আমারও বাঁশির রাগিণী	রোমান্টিক গায়কি স্বর প্রক্ষেপণে কমনীয়তা ধীর এবং শান্ত।	*স্বরলিপি* (১৯৭০)
৬.	গানেরই খাতায় স্বরলিপি লিখে	রোমান্টিক গায়কি স্বর প্রক্ষেপণে কমনীয়তা ধীর এবং শান্ত ভাব।	*স্বরলিপি* (১৯৭০)
৭.	অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান যেন ভুলে যেওনা	রোমান্টিক গায়কি স্বর প্রক্ষেপণে কমনীয়তা ধীর এবং শান্ত ভাব।	*অশ্রু দিয়ে লেখা* (১৯৭২)
৮.	ছবি যেন শুধু ছবি নয় আজ কেন তাই মনে হয়	গায়কিতে রোমান্স এবং চঞ্চলতা।	*মানুষের মন* (১৯৭২)
৯.	ওগো মোর মধুমিতা গহন স্বপন পথে	গায়কিতে রোমান্টিকতা স্বর প্রক্ষেপণে কমনীয়তা, ধীর এবং শান্ত প্রকৃতি।	*মধুমিতা* (১৯৭৮)
১০.	এই আকাশকে সাক্ষী রেখে এই বাতাসকে সাক্ষী রেখে	গায়কিতে রোমান্টিকতা এবং চঞ্চল প্রকৃতি।	*সোহাগ* (১৯৭৮)
১১.	চুমকি চলেছে একা পথে সঙ্গী হলে দোষ কি তাতে	নায়িকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার বিশেষ গায়কি কৌশল। হই... হই... ইত্যাদি উচ্ছ্বাসমূলক ধ্বনির ব্যবহার।	*দোস্ত দুশমন* (১৯৭৭)
১২.	চুরি করেছো আমার মনটা হায়রে হায় মিস লঙ্কা আ আ	নায়িকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার রোমান্টিক গায়কি কৌশল এবং নায়কোচিত ভাব। আ... আ... তুততো তুততো তুরুরুরু ইত্যাদি উচ্ছ্বাসমূলক ধ্বনির ব্যবহার।	*মিস লঙ্কা* (১৯৮৫)
১৩.	চাঁদের সাথে আমি দেব না তোমার তুলনা	নায়ক-নায়িকার রোমান্সে পরিবেশিত এবং তাদের আ আ আ,হে হে হে, হো হো হো ইত্যাদি স্বর ধ্বনির ব্যবহারে গায়কিতে ভিন্ন মাত্র যোগ হয়।	*আর্শীবাদ* (১৯৮৩)
১৪.	আমার মন বলে তুমি আসবে হৃদয়ের বসন্ত বাহারে	রোমান্টিক গায়কি স্বরপ্রক্ষেপণে কমনীয়তা, ধীর এবং শান্ত।	*আনারকলি* (১৯৮০)
১৫.	এই হৃদয়ে এত যে কথার কাঁপন মুখে কেন বলা হয় না	রোমান্টিক গায়কি স্বরপ্রক্ষেপণে সুখানুভবের বহিঃপ্রকাশ।	*চন্দ্রনাথ* (১৯৮৪)
১৬.	আমার বুকের মধ্যেখানে মন যেখানে হৃদয় যেখানে	প্রেমের সুখানুভূতির প্রকাশ। গায়কিতে রোমান্টিকতা এবং নায়কোচিত ভাব।	*নয়নের আলো* (১৯৮৪)
১৭.	শত জনমের স্বপ্ন তুমি	গায়কিতে সুখানুভব এবং কমনীয়	*রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত*

	আমার জীবনে এলে কত সাধনায় এমন ভাগ্য মেলে	স্বরপ্রক্ষেপণ, ধীর এবং শান্ত প্রকৃতির লয়।	(১৯৮৭)
১৮.	সবাইতো ভালবাসা চায় কেউ পায় কেউবা হারায় তাতে প্রেমিকের কি আসে যায়	নায়ক-নায়িকার প্রেমানুভূতির প্রবল প্রকাশ। গায়কিতে রোমান্টিকতার উপস্থিতি লক্ষণীয়।	*স্যারেন্ডার*(১৯৮৭)
১৯.	আবার দুজনে দেখা হলো কথা হলো মনে যে হলো	গায়কিতে রোমান্টিকতা এবং প্রাপ্তির আন্দদানুভব কমনীয় স্বর প্রক্ষেপণ।	*দুই জীবন* (১৯৮৮)

চার. শাস্ত্রীয় সুর বা রাগরাগিণী (আসরকেন্দ্রীক মনোরঞ্জনমূলক গান)

মূলত জমিদার বা ধনিক শ্রেণির বিনোদন মাধ্যম ছিল আসরে পরিবেশিত বাইজিদের নাচ-গান। সাধারণত ঠুমরী বা গজলের ছায়া অবলম্বনে রচিত এ গান। এরই ধারাবাহিকতায় চলচ্চিত্রেও এর রূপায়ণ ঘটেছে। তবে পরবর্তীতে এর একটা ভিন্ন রূপ গড়ে উঠে; পার্টি বা ক্লাবে পরিবেশিত গান নামে। নিম্নোক্ত তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হলোঃ

সারণি-৩.৪

ক্রম	গানের শিরোনাম	গায়কি এবং স্বর প্রক্ষেপণের ধরন	চলচ্চিত্র
১.	চুপিসারে এত করে কামিনী ডাকে শরমে জড়ানো নূপুর বাজে থেকে থেকে	গায়কিতে নাটকীয়তা, ছলনা।	*এদেশ তোমার আমার* (১৯৫৯)
২.	আমি রূপ নগরের রাজকন্যা রূপের যাদু এনেছি	গায়কিতে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা, নাটকীয়তা।	*হারানো দিন* (১৯৬৩)
৩.	মন তুমি কেড়ে নিলে এ কি বিষম দায় রে কুল বধূর মান বুঝি যায় যায় রে	গায়কিতে নাটকীয়তা, নিজেকে আবেদনময়ী করে তোলবার চেষ্টা যা দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস।	*অবাঞ্ছিত* (১৯৬৯)
৪.	বেদরদী তুমি রসিকের কদর জানো না মিনতিরে পায় ঢালো প্রেম জানো না	গায়কিতে নাটকীয়তা যা দৃষ্টি আকর্ষণ করার বিশেষ কৌশল।	*নবার সিরাজদ্দৌলা* (১৯৬৭)
৫.	নিজের বুকে আগুন জ্বেলে রঙিন আলো হয়ে	গায়কিতে নাটকীয়তা যা দৃষ্টি আকর্ষণ করার বিশেষ কৌশল।	*দেবদাস* (১৯৮২)
৬.	আমি বাজুবন্ধ হলাম না ঝুমকা চুড়ি হলাম না	গায়কিতে নাটকীয়তা যা দৃষ্টি আকর্ষণ করার বিশেষ কৌশলে পরিবেশিত।	*শুভদা* (১৯৮৬)
৭.	আমি জলসা ঘরে নূপুর পরা বন্দিনী	গায়কিতে নিজের কষ্ট, ক্ষোভ নানা ইঙ্গিতময়তা।	*রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত* (১৯৮৭)

পাঁচ. বিদেশি বা পাশ্চাত্য সুর (পার্টি বা ক্লাবে পরিবেশিত গান)

বিদেশি বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে বাদ্যযন্ত্রের পাশাপাশি সুরে রয়েছে পাশ্চাত্য ভঙ্গিমা। পরবর্তীকালে গানের বাণীতে ইংরেজি শব্দের ব্যবহারও লক্ষ করা গেছে। নিম্নোক্ত তালিকাতে তার উল্লেখ রয়েছে।

সারণি-৩.৫

ক্রম	গানের শিরোনাম	গায়কি এবং স্বর প্রক্ষেপণের ধরন	চলচ্চিত্র
১.	ঐ দূর দূর দূরান্তে দিন দিনান্তে নীল নীলান্তে কিছু জানতে না জানতে শান্ত শান্ত মন অশান্ত হয়ে যায়	দ্রুততার ছন্দে গায়কিতে পাশ্চাত্য ভঙ্গিমা, নায়িকার দৃষ্টি আকর্ষণ কিংবা মন জয় করার প্রয়াস।	*দীপ নেভে নাই* (১৯৭০)
২.	মনেরও রঙে রাঙাব বনের ঘুম ভাঙাব	গায়কিতে পাশ্চাত্য ভঙ্গিমা আনার প্রচেষ্টা, নায়কের অভিনয়ে যখন হল রুমে পরিবেশিত হয়। এটাও চলচ্চিত্রের গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।	*মাসুদ রানা* (১৯৭৪)
৩.	তুমি যেখানে আমি সেখানে সে কি জান না	গায়কিতে পাশ্চাত্য ভঙ্গিমা এবং প্রেম। সুর রচনায় পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা।	*নাগপূর্ণিমা* (১৯৮৩)
৪.	জান্নাতে হুর আমি তোমারই মেহবুবা চোখেরও নূর আমার হুজুরেওয়ালা	গায়কি এবং সংগীত রচনায় আরবীয় সুর ভঙ্গিমা আনার প্রচেষ্টা।	*লাইলী মজনু* (১৯৮৩)
৫.	ও ডার্লি ফুল তো ঝরে যাবে, দিনতো চলে যাবে,	গায়কিতে পাশ্চাত্য ভঙ্গিমা, উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং বিশেষভাবে আনন্দ দানের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা। ইংরেজি শব্দের ব্যবহার।	*মাসুদ রানা* (১৯৭৪)
৬.	দুনিয়ায় যারা অন্ধ তারাই খুঁজে ভাল মন্দ	গায়কিতে পাশ্চাত্য ভঙ্গিমা, বিনোদনের পাশাপাশি এক প্রকারের ইশারা বা ইঙ্গিত।	*জয় পরাজয়* (১৯৭৬)
৭.	এই মনটা যদি চায় পেতে মন নীল স্বপ্নে যদি ভরে দু'নয়ন	গায়কিতে পাশ্চাত্য ভঙ্গিমা, বিনোদনই যার মূল উদ্দেশ্য।	রজ*নীগন্ধা* (১৯৮২)
৮.	জলসা ঘরে মাতাল হাওয়ার তুফান জেগেছে, তাই তো আমার বুকের মাঝে আগুন লেগেছে	গায়কিতে দেশীয় ভাবের সাথে পাশ্চাত্য ভঙ্গিমার সংমিশ্রণ যা শুধুমাত্র আনন্দ ফুর্তিকে নির্দেশ করে এবং আরে, বাহ, বাহ ইতাদি উচ্ছ্বাসমূলক ধ্বনির অধিক ব্যবহার।	*নরম গরম* (১৯৮৪)
৯.	একবারই প্রেম জীবনে আসে একবারই মানুষ ভালবাসে হা হে হে	গায়কিতে পাশ্চাত্য ভঙ্গিমা বিশেষভাবে আনন্দ দানের প্রয়াস নির্মাণ। হা হে হে ইত্যাদি উচ্ছ্বাসমূলক ধ্বনির ব্যবহার।	*নীতিবান* (১৯৮৮)
১০.	টাকার খেলা বড় খেলা রূপের খেলা, খোলা মেলা হেই হো হো	হেই হো হো ইত্যাদি উচ্ছ্বাসমূলক ধ্বনির ব্যবহার এবং গায়কিতে পাশ্চাত্য ভঙ্গিমার আনন্দ উৎসব।	*সত্যমিথ্যা* (১৯৮৯)

উপরোক্ত তালিকায় লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ধীরে ধীরে গানের বাণীর যেমন একটা পরিবর্তন ঘটেছে সময়ের আবর্তনে তেমনি সুরেও রয়েছে তার প্রকাশ এবং গায়কিতেও। প্রেমের গানে ধীরে ধীরে আড়ষ্ঠতা ছেড়ে ব্যক্তি স্বাধীনতা, প্রেম রোমান্স ইত্যাদি আরও খোলা মেলার দিকে অগ্রসর হয়েছে। প্রেমের রূপ পাল্টে নায়কোচিত ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভিন্ন মাত্রায়। এর কারণ হিসেবে প্রধানত শিক্ষা-দীক্ষা এবং আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। আসরকেন্দ্রীক গান পার্টি বা ক্লাবে স্থান করে নিয়েছে অধিক মাত্রায়। যেখানে পাশ্চাত্য আবহ তৈরির প্রয়াস বেশি লক্ষ করা যায় এবং মানুষের জীবন যাপনের গতির সাথে পাল্টেছে গানের, বাণী, ছন্দ ও তাল।

তাল ও ছন্দ

চলচ্চিত্র সকল শ্রেণির দর্শকের বিনোদনের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম। যদিও বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির আবির্ভাবে এর প্রসার বেড়েছে। তবে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি মানুষের কাছে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এসব বিবেচনায় গানের বাণী সুর-তাল-ছন্দ খুব সহজ সরলভাবে রচিত এবং অধিকাংশ গান এবং সুর পরিচিত ছন্দবোধের মধ্যেই আবর্তিত। গানের প্রাণ হলো তাল। তাল এবং ছন্দ মানুষের আজন্মবোধ। গীতিকবি মোহাম্মদ রফিকউজ্জামানের ভাষায়–

> গানের এই বিশেষ উপাদানটি আমাকে দারুণভাবে আন্দোলিত করে। গানের ভাব-কবিতা-সুর এবং তার বিচিত্র আবেগ মনকে আচ্ছন্ন করে, বিভিন্ন আবেদনে প্রভাবিত করে। মনের বাসতো দেহের মধ্যেই। মনের সেই সব ভাবে আন্দোলিত হয় দেহ। গানের তাল সেই আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করে।[৪৪]

বাংলা তার তালবৈচিত্র্যে অনন্য। নানা ধরনের ছন্দ বৈচিত্র্য রয়েছে এদেশের গানে। কিন্তু চলচ্চিত্রের গানে বহুল ব্যবহৃত গুটিকয়েক তাল। তারমধ্যে–কাহার্বা, দাদরা, দ্রুত দাদরা, তেওড়া তালই অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত। এছাড়াও ত্রিতাল বা তিন তালের ব্যবহারও রয়েছে। তবে তা খুব স্বল্প পরিসরে। নিম্নোরূভাবে বাংলা গানের তালের একটি পরিচয় তুলে ধরা হলো:[৪৫]

সারণি–৪

বাংলা গানে ব্যবহৃত তালসমূহ

চতুরস্র জাতি	তিস্রজাতি	খন্ডজাতি	মিশ্রজাতি	মিশ্রজাতি
ত্রিতাল, চৌতাল কাওয়ালী, ঠুংরী, ছেপ্‌কা, কাহারবা, আড়াঠেকা, মধ্যমান, চতুর্মাত্রিক, একতাল, জলদ ত্রিতাল, তিলওয়াড়া, পটতাল, মত্ততাল, ব্রহ্মতাল, যৎ প্রভৃতি।	খেমটা, দাদরা, আড়াখেমটা, কাশ্মীরি খেমটা, লোফা প্রভৃতি।	ঝাঁপতাল, সুর ফাঁক তাল, সূলতাল প্রভৃতি।	আড়া-চৌতাল, পোস্তা,ধামার, তেওট,রূপক, তেওড়া, দীপচন্দী, ঝুমরা, প্রভৃতি।	পঞ্চম সওয়ারী, গজঝম্প তাল, শিখর তাল প্রভৃতি।

স্বাধীনতাপূর্ব চলচ্চিত্র গানে উর্দু, হিন্দি, মাদ্রাজী গানের প্রভাব রয়েছে। ফলে তালের ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়েছে। যেমন–'রূপ নগরের রাজকন্যা রূপের যাদু এনেছি' (*হারানো দিন*-১৯৬১), 'নদী বাঁকা জানি চাঁদ বাঁকা জানি' এবং 'তুমি আসবে বলে কাছে ডাকবে বলে (*সুতরাং*-১৯৬৪), 'ঐ দূর দূর দূরান্তে (*দীপ নেভে নাই*-১৯৭০), প্রভৃতি এবং ব্যান্ড সংগীতের বিট বা তাল ৪/৪ বিট লক্ষণীয়। স্বাধীনতাত্তোর চলচ্চিত্রের গানে পাশ্চাত্য ভঙ্গিমার ছন্দ আরো বেশি প্রভাব ফেলে। যেমন–মনোরঞ্জনের জন্য রচিত পার্টি বা ক্লাবে পরিবেশিত গানসমূহ–'ও মাই ডার্লি ফুল তো ঝরে যাবে' (*মাসুদ রানা*-১৯৭৪), 'এই মনটা যদি পেতে চায় মন' (*রজনী গন্ধা*-১৯৮২), 'একবারই প্রেম জীবনে আসে, একবারই মানুষ ভালবাসে' (*নীতিবান*-১৯৮৮) অথবা একে অপরকে (নায়ক-নায়িকা) দৃষ্টি আকর্ষণমূলক গান–'চুমকি চলেছে একা পথে' (*দোস্ত দুশমন*-১৯৭৭) প্রভৃতি গানে। এছাড়া (*নাগপূর্ণিমা*-১৯৮৩) চলচ্চিত্রে–'তুমি যেখানে আমি সেখানে সে কি জানো না' গানটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাদ্যযন্ত্র

সংগীতের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং গানের সুর আরও মধুর করে তোলার জন্য বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে এদেশে বাদ্যযন্ত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভাবই মুখ্য বিষয়। ভারতীয় সংগীতে যে ধরনের বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় সে সবই প্রযোজনানুযায়ী চলচ্চিত্রের গানে ব্যবহৃত হয়েছে। ভরতের (খ্রিঃ পূঃ ৫০০-১০০) নাট্যশাস্ত্রে প্রথমত বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণি বিভাগ করা হয়। বাদ্যযন্ত্রগুলিকে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা হয়।[৪৬] নিম্নে তা দেখানো হলো:

বাদ্যযন্ত্র

ততবাদ্য	শুষির বাদ্য	আনদ্ধ	ঘনবাদ্য
তত বিতত	বাঁশি, সানাই	তবলা,পাখোয়াজ	করতাল,
ঝাঁঝ			
সেতার, বেহালা			
তানপুরা, এস্রাজ			

বর্ণিত শ্রেণির আওতায় আরো অনেক বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। যেমন: একতারা, দোতারা, ঢাক, ঢোল, খোল, সরদ, বেহালা, হারমোনিয়াম প্রভৃতি। বাদ্যযন্ত্রগুলো নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া চলচ্চিত্র যেহেতু প্রাযুক্তিক মাধ্যম ফলে একে আশ্রয় করে নানা ধরনের ভিনদেশি বাদ্যযন্ত্রের আমদানি ঘটেছে। স্বাধীনতাপূর্ব চলচ্চিত্রের গানে দেশীয় বাদ্যের পাশাপাশি পাশ্চাত্য বাদ্যের ব্যবহার রয়েছে এবং স্বাধীনাত্তোরকালের চলচ্চিত্রের গানে এর ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে বিদেশি বাদ্যযন্ত্র-গিটার, ড্রামস, কিবোর্ড প্রভৃতি। মিউজিকলজিস্ট সাইম রানার মতে–'এলো ব্যান্ড। তারুণ্যের আনাড়িপনা, জুয়াড়িপনা, সস্তা-প্রেম বিষাদ ও হতাশাকে তীব্র চিৎকারে ভাসিয়ে দেয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এতে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার বিচারে একদিকে প্রবীণদের নাকসিটকানি-গলা ধাক্কা, অপরদিকে তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে ব্যান্ডদলের ব্যানার প্রশস্ত হতে থাকে। শহরে শহরে মহল্লায় মহল্লায় শত শত ব্যান্ডদল তৈরি হলো।'[৪৭] নতুন বিষয়ের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ কিংবা ব্যান্ডশিল্পীদের প্রতি

দর্শকের আগ্রহ ক্রমশ তেরি হওয়ার কারণে বিদেশি নতুন সব বাদ্যযন্ত্রের প্রতি এদেশের দর্শক বিশেষত তরুণরা আকৃষ্ট হয় এবং পাড়া বা মহল্লায় ছোট ছোট ব্যান্ড ফর্ম গড়ে ওঠে। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির সাধনে ভারতীয় উপমহাদেশে ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্র আমদানি হতে থাকে এবং তখন থেকে কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে যুক্ত হয় এই সকল বাদ্যযন্ত্র। এ সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য থেকে জানা যায় গানকে আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্য, দেশি-বিদেশি বাদ্যযন্ত্রসহ নানা ধরনের যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহৃত হতে থাকে এবং এভাবেই শুরু হয় বাংলা গানের আধুনিক যুগ।[৪৮]

প্রসঙ্গত, শুরুর দিকে এদেশের চলচ্চিত্রের গানে আলাদাভাবে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের প্রচলন ছিল না। একমাত্র ভূমিকা রেখেছিল ঢাকা অর্কেস্ট্রা এবং আলাউদ্দিন লিটল অর্কেস্ট্রা। ঢাকা অর্কেস্ট্রার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ধীর আলী মনসুর (১৯২০-১৯৮৪) তিনি পেশায় ছিলেন একজন বংশীবাদক। আলাউদ্দিন লিটল অর্কেস্ট্রার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ওস্তাদ খাদেম হোসেন খান। এহতেশাম পরিচালিত *এদেশে তোমার আমার* (১৯৫৯) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু। দুই অর্কেস্ট্রায় ছিলেন বাংলাদেশের গুণীশিল্পীরা। তাদের শিল্পনৈপুণ্যের ছোঁয়ায় সিনেমার গান হয়ে উঠত অসাধারণ। সংগীতজ্ঞ মোবারক হোসেন খান-এর কাছ থেকে এ সম্পর্কে জানা যায়। তাঁর ভাই ওস্তাদ খাদেম হোসেন খান একজন সেতার বাদক ছিলেন। তিনিই মূলত এটি ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। ৮-১০ বাদ্যযন্ত্রীদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই দল। এরমধ্যে আবিদ হোসেন খান সেতার ও সরোদ বাজাতেন, মীর কাসিম খান এবং খাদেম হোসেন খান সেতার বাজাতেন। এস্রাজ বাজাতেন ফুল ঝুরি খান। বেহালায় ছিলেন খুরশীদ খান, আমিনুর খান। এবং মোবারক হোসেন খান নিজে চেলো বাজাতেন। যে সব চলচ্চিত্রে আলাউদ্দিন অর্কেস্ট্রা বাজিয়েছে–*সুতরাং* (১৯৬৪), *রূপবান* (১৯৬৫), *১৩ নং ফেবু ওস্তাগার লেন* (১৯৬৬), *এতটুকু আশা* (১৯৬৮), *বাঁশরী (১৯৬৮)*, *আবির্ভাব* (১৯৬৮), *নীল আকাশের নীচে* (১৯৬৯), *মধু মিলন* (১৯৭০), *পীচ ঢালা পথ* (১৯৭০), *কখগঘঙ (১৯৭০)*, *দীপ নেভে নাই* (১৯৭০), *দর্পচূর্ণ* (১৯৭০), *স্বরলিপি* (১৯৭০), *নাচের পুতুল* (১৯৭১) প্রভৃতি।

গান শেখার সহায়ক যন্ত্র হিসেবে বহুল পরিচিত হারমোনিয়াম। তারই সূত্র ধরে হারমোনিয়াম এবং তবলার অধিক ব্যবহার রয়েছে চলচ্চিত্রের গানেও। বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক আলী হোসেনের কাছ থেকে জানা যায় তখন গানে ন্যাচারাল বাদ্যযন্ত্র–তবলা, দোতরা, ভায়োলিন, ঢোলক, বাঁশি, ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। এদেশে পারিবারিক আসর থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি গানে রয়েছে হারমোনিয়াম, তবলার ব্যবহার। *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০) চলচ্চিত্রে–'এ খাচাঁ ভাঙ্গব আমি কেমন করে।' *মনের মত বউ* চলচ্চিত্রে–'আহা কিয়ে সুন্দর হারিয়েছি অন্তর' এবং 'সুরের বাঁধনে তুমি যতই কণ্ঠ সাধো।' *কাঁচের দেয়াল* (১৯৬৩) চলচ্চিত্রে–'শ্যামল রবণ মেয়েটি ডাগোর কালো আঁখিটি' প্রভৃতি। *কাঁচকাটা হীরা* (১৯৭০) চলচ্চিত্রে–'জলতরঙ্গ মন আমার, সা রে মা পা নি সা বাজে, জলতরঙ্গ বাজে।' গানটি তবলা এবং তানপুরার সহযোগে গেয়ে থাকে। এছাড়া আসরকেন্দ্রীক বা মনোরঞ্জনমূলক গানে তবলা এবং হারমোনিয়ামের পাশাপাশি অবস্থানে বাইজির ঝলসানো রূপের পরবিশেনা অধিক মাত্রায় লক্ষণীয়। যেমন: *দেবদাস* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে–নাচ পরিহার করে হারমোনিয়াম বাজিয়ে 'জনম জনম ধরে প্রেম পিয়াসী' গানটি গেয়ে শোনায় চন্দ্রমুখী। *শুভদা* (১৯৮৬) চলচ্চিত্রে 'আমি বাজুবন্ধ হলাম না' মনোরঞ্জনের এই গানটি আসর পরিকল্পনায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। নৌকার ছাদের উপরে হারমোনিয়াম এবং তবলার সহযোগে পরিবেশিত হয়। গ্রামীণ বা লোকজ গানের ক্ষেত্রে বিরহ-

বেদনার বহিঃপ্রকাশ নির্মাণে রয়েছে বাঁশির ব্যবহার বিচিত্র পরিসরে। ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক আজাদ রহমান বলেন –

> নানান ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হতো। আমার নিজের কথাই বলি। আবার *মাসুদ রানার* কথায় আসছি। *মাসুদ রানার* চলচ্চিত্রে মনেরও রং এ রাঙাবো। কবরীর লিপসিং এ সেটা চিত্রায়িত হয়েছে। তো কবরীর চরিত্রানুযায়ী আমি কিন্তু সেই প্রকৃতি, সেই পরিবেশ, সেই সাগর, পাহাড় এটা মনে রেখেই যন্ত্র ব্যবহার করেছি। আমাদের সেতার, বেহালা, বাঁশি, কিন্তু একই গান যখন আমাদের নায়ক রাজ রাজ্জাক তিনি গাইছেন হোটেলে বলরুমে তখন কিন্তু অন্য বাদ্যযন্ত্র গিটার, ড্রামস একই গান কিন্তু তাতে গানের ভাবও পরিবর্তিত হয়ে গেছে।[৪৯]

তবে কাহিনি বা চরিত্রের প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক যে কোন ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশীয় যন্ত্রের বদলে বিদেশি বাদ্যযন্ত্র বিশেষত কির্বোডকেন্দ্রীক সংগীতায়োজনের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। এক কিবোর্ড দিয়েই সব বাদ্যযন্ত্রের কাজ করা হচ্ছে। ফলে দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার না থাকায় তা যেমন বিলুপ্তির পথে তেমনি বাদকের সংকট প্রকট হচ্ছে। বর্তমান সময়ের গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল বলেন–'আজ থেকে ১৫-২০ বছর আগেও চলচ্চিত্রের গানে অনেক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল। যেমন–সেতার, এস্রাজ, বেহালা, সানাই এক সাথে অনেকগুলো বাঁশির ব্যবহার। আগে এই সব বাদ্যযন্ত্রের অনেক শিল্পী ছিল। এখন তাঁদের সংখ্যা কমে একজনে এসে দাঁড়িয়েছে প্রায়।'[৫০]

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. সুমন চৌধুরী, চলচ্চিত্রের গান, ইসরাফিল শাহীন (সম্পা.) *পরিবেশনা শিল্পকলা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৮৫।

২. (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান : ১৪.০৬.২০১৫/ গ্রীণ রোড, ঢাকা।)

৩. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোক সংগীতের ধারা*, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫, পৃ, ১৩১।

৪. নাজমুল হুদা, *লোকসংগীত* মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পা.) বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৭৬।

৫. (https://www.youtube.com/watch?v=7bksZJ4TDdE) (১৯/০১/২০১৯)

৬. (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১০.০৫.২০১৫)

৭. প্রবীর সেনগুপ্ত, *বাংলার গান বাংলা গান*, ড. অরুণ কুমার (সম্পা.) পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৫১।

৮. সাইম রানা, *বাংলাদেশের সংগীতের বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২০৮।

৯. সুমন চৌধুরী, চলচ্চিত্রের গান, ইসরাফিল শাহীন (সম্পা.) *পরিবেশনা শিল্পকলা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৭৯।

১০. ড. মৃদুলকান্তিচক্রবর্তী, *হারানো দিনের গান*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৬১।

১১. (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান : ১৬.০৬.২০১৫/ জাপান সিটি গার্ডেন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।)

১২. অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৫।

১৩. ড. সোমা মুমতাজ, বাংলাদেশের আধুনিক নৃত্যে ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রভাব ও সাম্প্রতিক প্রবণতা : একটি বিশ্লেষণ, মোঃ ফকরউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.) *শিল্পকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, (একত্রিংশবর্ষ, ১ম সংখ্যা) ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৫।

১৪. সুমন চৌধুরী, চলচ্চিত্রের গান, ইসরাফিল শাহীন (সম্পা.) *পরিবেশনা শিল্পকলা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৮৩।

১৫. আসলাম আহসান, *বাংলাদেশের সিনেমার স্মৃতি জাগানিয়া গান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৩২।

১৬. আসলাম আহসান, *বাংলাদেশের সিনেমার স্মরণীয় গান*, প্রথমা ঢাকা, ২০১৭, পৃ, ১৫৭।
১৭. সাইম রানা, আধুনিক গান, ইসরাফিল (সম্পা.) *পরিবেশনা শিল্পকলা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৭৭।
১৮. (https://www.youtube.com/watch?v=dUQ2XF2GljY) (১৬/১২/২০১৮)
১৯. (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান : ১৪.০৬.২০১৫/ গ্রীণ রোড, ঢাকা।)
২০. প্রবীর সেনগুপ্ত, *বাংলার গান বাংলা গান*, ড. অরুণ কুমার (সম্পা.) পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ২১১।
২১. (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান : ১৬.০৬.২০১৫/ জাপান সিটি গার্ডেন, ঢাকা)
২২. (https://www.youtube.com/watch?v=wzurkYz7sV8) (১৫/০১/২০১৯)
২৩. (https://www.youtube.com/watch?v=cJcunkJSqC8&t=3357s) (২৫/১২/২০১৮)
২৪. ফিল্মী সঙ্গীতে নতুনরা আসছে না কেন?, খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেন (সম্পা.) পূর্বাণী ঈদ সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ.২০২।
২৫. (সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ ২২.০২.২০১৭, ইস্টার্ন টাউয়ারস, বাংলা মটর, ঢাকা।)
২৬. (https://www.youtube.com/watch?v=y49Qci7ATlI&t=1167s) (১৮/০১/২০১৯)
২৭. প্রাগুপ্ত।
২৮. আসলাম আহসান, *বাংলাদেশের সিনেমার স্মৃতি জাগানিয়া গান* ,বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৫০।
২৯. (https://www.youtube.com/watch?v=88VaRvVHtqQ) (৩০/১২/২০১৮)
৩০.(সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান : ২৭.০২.২০১৭।)
৩১.(সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১০.০৫.২০১৫)
৩২. (https://www.youtube.com/watch?v=qJ8lOs_g6-Q) (২৪/১২/২০১৮)
৩৩. ফিল্মী সঙ্গীতে নতুনরা আসছে না কেন?, খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেন (সম্পা.) পূর্বাণী ঈদ সংখ্যা,ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২০২।
৩৪. ফিল্মী সঙ্গীতে নতুনরা আসছে না কেন?, খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেন (সম্পা.) পূর্বাণী ঈদ সংখ্যা,ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২০২।
৩৫. আসলাম আহসান, *বাংলাদেশের সিনেমার স্মৃতি জাগানিয়া গান* ,বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৮৪।
৩৬. (https://www.youtube.com/watch?v=HXvDCBtLJx4) (৩০/১২/২০১৮)
৩৭. ফিল্মী সঙ্গীতে নতুনরা আসছে না কেন?, খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেন (সম্পা.) পূর্বাণী ঈদ সংখ্যা,ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২০২।
৩৮. প্রাগুপ্ত।
৩৯. (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১০.০৫.২০১৫/ ফোনের মাধ্যমে)
৪০. আসলাম আহসান, *বাংলাদেশের সিনেমার স্মরণীয় গান* (১৯৫৯-২০১৬), প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭,পৃ. ২৫৯।
৪১. আবদুল্লাহ জেয়াদ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পাঁচদশকের ইতিহাস*, জ্যোতি প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২৬০।
৪২. প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৫৫।
৪৩. রুখসানা করিম (কানন), *বিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, ২০১৭,পৃ. ১৮৩-১৮৪।
৪৪. মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, *বাংলা গান বিবিধ প্রসঙ্গ*, হাওলাদার প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১১।
৪৫. প্রবীর সেনগুপ্ত, *বাংলার গান বাংলা গান*, ড. অরুণ কুমার (সম্পা.) পুস্তক বিপণি, ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ২০২।
৪৬. প্রাগুপ্ত, পৃ. ২০৭।
৪৭. সাইম রানা, আধুনিক গান, ইসরাফিল (সম্পা.) *পরিবেশনা শিল্পকলা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৭৫।
৪৮. প্রবীর সেনগুপ্ত, *বাংলার গান বাংলা গান*, ড. অরুণ কুমার (সম্পা.) পুস্তক বিপণি, ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ১৫১।
৪৯. (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান : ১৪.০৬.২০১৫/ গ্রীণ রোড, ঢাকা।)
৫০. রুখসানা করিম (কানন), *বিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, ২০১৭,পৃ.১৮২।

তৃতীয় অধ্যায়
চলচ্চিত্রে গানের বিষয়বৈচিত্র্য

নানাবিধ শিল্পের শাখা-প্রশাখা ধারণ করে চলচ্চিত্র এমন একটি মাধ্যম যা শিল্প সমন্বয়কের বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ। শিক্ষা ও বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে দর্শকের নিকট বিশেষভাবে উপস্থাপিত। শিল্প সমাহারের মধ্যে গান অর্থাৎ নেপথ্যকণ্ঠ সংগীত বাংলা চলচ্চিত্রের সবাক যুগের সূচনাকাল থেকে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। বিভিন্ন আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়েও আজ অবধি এর ধারাবাহিকতা অব্যহত রয়েছে। যে কোন দেশের শিল্প সংস্কৃতি, সে দেশের ঋতুবৈচিত্র্যের ধারায় বিকাশমান এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত। গণযোগাযোগের অন্যতম চলচ্চিত্র মাধ্যমও একই ধারায় প্রবহমান। সাধারণ অর্থে চলচ্চিত্রের গান চলচ্চিত্রের কাহিনি বা বিষয় ভাবনার উপর নির্ভরশীল। তবে অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমী রূপও লক্ষণীয়। কেননা সব কিছুর নিয়ন্তা হলো কাহিনি বা বিষয় এবং পরিচালকের মুন্সিয়ানা। একটি চলচ্চিত্র তার বিশেষ একটি কাহিনি বা বিষয়কে ধারণ করে বিকশিত হলেও বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে চরিত্রের সামাজিক মর্যাদা, মানসিক অবস্থা, অথবা বিশেষ কোনো পরিস্থিতি তৈরির প্রয়োজনে গান তার বিচিত্র বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়। শুধুমাত্র গানই নয় চলচ্চিত্রে অন্যান্য সহযোগী শিল্পকেও একই পথ অনুসরণ করতে হয়। ফলে কাহিনি যে দিকে অগ্রসর হয় অন্যান্য বিষয়কেও হতে হয় সেই দিকের অনুগামী। এ জন্যে চলচ্চিত্রে গান শুধুমাত্র রচিত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ সম্পর্কে সুরকার ও সংগীত পরিচালক আজাদ রহমান বলেন—

> অবস্থান, প্রকৃতি, সময় এসব কিছুকে সামনে রেখে চলচ্চিত্রে গান তৈরি করতে হয়। বানাতে হয়, আমরা চলচ্চিত্রে গান বানাতাম। এটা শুধু সুর করা নয়, এটা শুধু গানের কথা লেখাও নয়। সব মিলিয়ে-চরিত্র উপযোগী দর্শক-শ্রোতাদের আগ্রহে এবং বিনোদনের একটি সর্বোতকৃষ্ট সুর, কথার সম্মিলিত যে শৈল্পিক রূপ সেটাই আমরা সচেষ্ট হয়ে করবার চেষ্টা করতাম।[১]

চলচ্চিত্রে গান কাহিনি বা বিষয় এবং চরিত্র উপযোগী করে রচিত হওয়ার কারণে একটি চলচ্চিত্রে বিচিত্র রকমের গানের সমারোহ ঘটে থাকে। তাছাড়া একই গানে থাকে বিচিত্র রসের ব্যবহার।[২] ফলে চলচ্চিত্রের গানের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিভাজন কঠিন হয়ে পড়ে। তবে প্রাথমিকভাবে চলচ্চিত্রের বিষয় বা কাহিনির উপর নির্ভর করে চলচ্চিত্রের গানের সার্বিক বিষয় আশয়। ফলে অনিবার্য হয়ে উঠে চলচ্চিত্রের ধারা বা জাতি বিচার। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

চলচ্চিত্রে গানের মূল বিষয় হলো এর প্রেক্ষাপট। ফলে চলচ্চিত্রের জন্য রচিত তদুপরি প্রাসঙ্গিক গানগুলোকেই গবেষণায় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তবে পূর্বে রচিত এবং পরবর্তীতে জনপ্রিয়তার সূত্রধরে অনেক গান চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে প্রসঙ্গক্রমে সে গানগুলোও আলোচনায় এসেছে। বর্ণিত সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক ইত্যাদি ঘটনাবলী অবলোকনপূর্বক বাঙালির সমাজ ও পারিবারিক জীবনের একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে নারী-পুরুষের অবস্থান বিশেষত নারীর সামাজিক মর্যাদার একটি চিত্র ওঠে এসেছে। এছাড়া বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, সাপ ও বাঘ ভীতি রাজরোষ ইত্যাদি নানাবিধ দুর্যোগের

সম্মুখীন বাঙালি বাঁচার জন্য আশ্রয় নিয়েছে নানাবিধ লোকবিশ্বাসের, গানের মাধ্যমে তারও একটি রূপ পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের তথা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ফলে স্বাধীনতার পূর্বাপর অবস্থার রূপ নির্ণিত হয়েছে গানে গানে।

লোকজ এবং আধুনিক গান দুটি ধারা নির্ধারণের কারণে গ্রামীণ ও নগর জীবনের দুটি ভিন্ন রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়া গানের প্রয়োগ ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক কখন, কিভাবে, কোন গান ব্যবহৃত তার একটি রূপ তুলে ধরা হয়েছে। এবং সময়ের সাথে সাথে গানের বাণীর পরিবর্তন সে বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়ের গান চলচ্চিত্রের ব্যবহারের কারণ ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত গানের বিষয়বৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দিয়ে চলচ্চিত্র বিষয়ক কোন গবেষণা কিংবা গ্রন্থ চোখে পড়েনি। ফলে এখানে বিভাজনের যে ধারা রচিত হয়েছে তা গবেষকের একান্ত নিজস্ব বিচার বিশ্লেষণের ফসল। ফলে অনেকের ভিন্ন মত থাকতে পারে। তবে বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক, সংগীতজ্ঞ এবং শিল্পীর সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার বর্ণিত সময়কালে অর্থাৎ (১৯৫৬-১৯৮৯) সালের মধ্যে লক্ষ করা গেছে যে, মুক্তিপ্রাপ্ত অধিকাংশ চলচ্চিত্র লোকগাথা বা কল্পকাহিনিনির্ভর, পারিবারিক, সামাজিক, সাহিত্যনির্ভর। স্বাধীনতাপূর্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ইতিহাস ও গণ-আন্দোলনভিত্তিক চলচ্চিত্র এবং স্বাধীনতাত্তোরকালে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের গান নিয়ে রচিত চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে মিউজিক্যাল মুভি বা সংগীতনির্ভর, অ্যাকশনধর্মী, শিশুতোষ, পোশাকি বা ফ্যান্টাসি প্রভৃতি বিষয়ক চলচ্চিত্র। উল্লেখ্য যে, বক্ষ্যমাণ গবেষণার সময়কালে নির্মিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের গানসমূহের বিষয়, প্রয়োগ ভাবনা, সুর প্রভৃতি বিশ্লেষণ করলে প্রধানত লোকজ এবং আধুনিক দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। দীর্ঘ কালে ঋদ্ধ বাংলার লোক ঐতিহ্যিক বিভিন্ন গীতিকা বা পালার গানের সাথে অন্যান্য লোকজ উপাদানে অন্বিষ্ট গানসমূহকেও এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা বাংলার লোকসংস্কৃতির নানা মাত্রিকতায় উপস্থাপিত।

বিষয়বৈচিত্র্যে ৩০ টি নির্বাচিত বিষয়সহ মোট ২৬ টি পর্বে অধ্যায়টি আলোচিত। গ্রামীণ ও লোকজ গানের ধারার মধ্যে যথাক্রমে–১. প্রেমের গান ২. বিরহ-বেদনার গান ৩. অভিমানের গান ৪. নায়ক-নায়িকার উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গান ৫. নারী-পুরুষের বাদ-প্রতিবাদের গান ৬. সই-সখীর গান ৭. দোস্ত-বন্ধুর গান ৮. বিবাহ সংক্রান্ত গান–গায়ে হলুদের গান, বিয়ের গান, বাসর ঘর তৈরির গান, বাসর রাতের গান ৯. ব্যঙ্গাত্মক বা হাস্যরসের গান ১০. সাপুড়ে বা সর্প বিষয়ক গান ১১. বিবেকের গান ১২. আধ্যাত্মিক চেতনা ও আত্মোপলব্দির গান প্রভৃতি।

এবং ব্যক্তি জীবনের রোমান্টিক, প্রেম-বিরহ, আনন্দ-বেদনা সাধারণ কাব্য সাহিত্য প্রবণতায় রচিত এবং প্রচলিত সুর কাঠামো থেকে ভিন্ন বিশেষত লোকসুর, শাস্ত্রীয় সংগীত ব্যতিরেকে সাধারণ সহজ সরল কথা-সুরের সমন্বয়ে গায়কি এবং প্রমিত উচ্চারণে উত্তীর্ণ এবং আধুনিক উপস্থাপনে উন্নীত সে সব গানসমূহকে আধুনিক ধারার গানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আধুনিক ধারার গানের মধ্যে– ১. রোমান্টিক গান-প্রেম, বিরহ-বেদনা ২.অভিমানের গান ৩. একে অপরের (নায়ক-নায়িকার) প্রতি দৃষ্টি

আকর্ষণ বা মন জয় করার গান ৪. মনোরঞ্জরমূলক গান- ৫. পারিবারিক বন্ধনের গান ৬. জীবনমুখী গান ৭. দেশ-মাতৃকার গান ৮. এছাড়া অন্যান্য বিষয়ের গানের মধ্যে– ১. শিক্ষা প্রসারের গান ২. শিশুকণ্ঠে মুক্তি ও দেশাত্ববোধের গান ৩. আত্মোৎসর্গের গান ৪. কল্পনার চোখে স্বপ্নপূরণের গান ৫. বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের গান ৬. পাশ্চত্য বা মাইকেল জ্যাকসন প্রভাবিত গান ৭. দ্রোহ ও মৌন প্রতিবাদের গান ৮. সৃষ্টিকর্তার কৃপা লাভ ও নীরবতা ভঙ্গের গান ৯. স্মৃতি বা স্বজনকে ফিরে পাওয়ার গান ১০. স্ট্রিট সং বা পথের গান ১১. মদ্যপায়ীর গান প্রভৃতি।

উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভাজন দুটোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হলেও কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও ঘটেছে অর্থাৎ দুটোর মিশ্রণ রয়েছে। তা কেবল গবেষণার গতির চলমানতার কথা ভেবে এবং একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে চলার জন্য। নিম্নে লোকজ গান/গীতিকা বা পালার গান নিম্নরূপভাবে আলোচনা করা হলো।

এক. লোকজ গান/গীতিকা বা পালার গান

১. প্রেমের গান
   - ক. নায়িকার একাকী অভিনয়ে প্রেমের গান
   - খ. নায়কের একাকী অভিনয়ে প্রেমের গান
   - গ. নায়ক-নায়িকার দ্বৈতাভিনয়ে প্রেমের গান

২. বিরহ-বেদনার গান

৩. অভিমানের গান

৪. নায়ক-নায়িকার উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গান

৫. নারী-পুরুষের বাদ-প্রতিবাদের গান

৬. সই/সখীদের গান

৭. দোস্ত/বন্ধুর গান

৮. বিবাহ সংক্রান্ত গান
   - ক. গায়ে হলুদের গান
   - খ. বিয়ের গান
   - গ. বাসর ঘর তৈরির গান
   - ঘ. বাসর রাতের গান

৯. ব্যঙ্গাত্মক বা হাস্যরসের গান

১০. সাপুড়ে বা সর্প বিষয়ক গান

১১. বিবেকের গান

১২. আধ্যাত্মিক চেতনা ও আত্মোপলব্দির গান

দুই. আধুনিক ধারা

১. রোমান্টিক গান

প্রেম

- ক. নায়িকার অভিনয়ে প্রেমের গান

- খ. নারী হৃদয়ের শাশ্বত প্রেমের গান
- গ. নায়কের অভিনয়ে প্রেমের গান
- ঘ. নায়ক-নায়িকার দ্বৈতাভিনয়ে প্রেমের গান

বিরহ

- ক. নায়িকার বিরহে গান
- খ. নায়কের বিরহে গান
- গ. চিঠি পত্রে প্রেম-বিরহের গান

২. অভিমানের গান

৩. একে অপরের (নায়ক-নায়িকার) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ বা মন জয় করার গান

৪. মনোরঞ্জনমূলক গান

- ক. আসরকেন্দ্রীক পরিবেশিত মনোরঞ্জনের গান
- খ. পার্টি বা ক্লাবে পরিবেশিত মনোরঞ্জনের গান

৫. পারিবারিক বন্ধনের গান

- ক. মাতৃত্ববোধের গান
- খ. মাতৃভক্তি ও মাতৃবন্দনার গান
- গ. পারিবারিক বিচ্ছেদের গান

৬. জীবনমুখী গান

৭. দেশ-মাতৃকার গান

- ক. স্বাধীনতার গান
- খ. দেশাত্ববোধক গান
- গ. ভাষার গান বা প্রভাতফেরির গান
- ঘ. মুক্তির গান
- ঙ. বিদ্রোহী চেতনার গান
- চ. কৃষক বিদ্রোহের গান

অন্যান্য বিষয়ের গান

১. শিক্ষা প্রসারের গান
২. শিশুকণ্ঠে মুক্তি ও দেশাত্ববোধের গান
৩. আত্মোৎসর্গের গান
৪. কল্পনার চোখে স্বপ্নপূরণের গান
৫. বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের গান
৬. পাশ্চত্য বা মাইকেল জ্যাকসন প্রভাবিত গান
৭. দ্রোহ ও মৌন প্রতিবাদের গান
৮. সৃষ্টিকর্তার কৃপা লাভ ও নীরবতা ভঙ্গের গান
৯. স্মৃতি বা স্বজনকে ফিরে পাওয়ার গান
১০. স্ট্রিট সং বা পথের গান

১১. মদ্যপায়ীর গান

উপরোক্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়ের যে সব গান চলচ্চিত্রের ব্যাপক পরিসর জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে সে সব গানগুলো ব্যবহারের কারণ ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করা হলো:

১. লোকজ গান/গীতিকা বা পালার গান

গ্রামীণ সমাজের নানা ঘটনা বা কাহিনি যা লোকজ উপাদানে সমৃদ্ধ এছাড়া লোক সাহিত্যের বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে গীতিকা বা পালার গান। এসব বিষয় আশয় কাহিনির সূত্র ধরে বিকশিত হয়েছে। তারই রূপায়ণ বর্ণিত গানসমূহের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। নর-নারীর প্রেমকে কেন্দ্র করে প্রেমের গান, বিরহের গান, একান্ত মনের কথা প্রকাশের অন্যতম সঙ্গী সই বা সখীদের গান, বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়–বাসর ঘর তৈরির গান, বাসর রাতের গান, বেদে সম্প্রদায়ের জীবন কাহিনি নির্মাণকে কেন্দ্র করে সাপুড়ে বা সর্প বিষয়ক গান, হাস্যরস তৈরির নিমিত্তে অর্থাৎ বাঙালির চিরায়ত বসবোধকে তুলে ধরার প্রয়াসে ব্যঙ্গাত্মক বা হাস্যরসের প্রভৃতি গান ব্যবহৃত হয়েছে।

২. রোমান্টিক গান-প্রেম, বিরহ, অভিমান

চলচ্চিত্র তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিক শিল্পমাধ্যম। এর সাথে রোমান্টিক ভাবের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ফলে এই দাবীর সঙ্গে গানও যুক্ত হয় রোমান্টিকতার নানা ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে। চলচ্চিত্রে রোমান্টিকতা গড়ে উঠে সাধারণত নর-নারীর প্রেম-ভালবাসাকে কেন্দ্র করেই। চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড় অংশ জুড়ে রয়েছে প্রেম অর্থাৎ মানব মানবীর প্রেম বিষয়ক গান। যা বিশেষ কল্পনার আশ্রয়ে নির্মিত এবং চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্যকে বিনির্মাণ করতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

চলচ্চিত্রের স্বাতন্ত্র এখানেই যে, কল্পনার ভেতর দিয়ে নানা মাত্রিকতায় সম্ভাবনার কথা বলা। বাংলা চলচ্চিত্রে এটি প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছে এর গান। নায়িক-নায়িকার না বলা কথা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রে প্রেমের গান প্রকৃত অর্থে দর্শকের মনের ইচ্ছাকেই চরিতার্থ করে। তারই ফলস্বরূপ চলচ্চিত্রে প্রেম, বিরহ অভিমান প্রকাশে গান ব্যবহৃত হয়েছে রোমান্টিকতার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে।

৩. একে অপরের (নায়ক-নায়িকার) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ বা মন জয় করার গান

পূর্বে ব্যক্ত হয়েছে নর-নারীর প্রেমকে উপজীব্য করে রোমান্টিকতার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এর সূত্রপাত হয়েছে বর্ণিত বিষয়ের গানের মধ্য দিয়ে–যেখানে সম্পর্ক তৈরির পেছনে দুজনের অর্থাৎ নায়ক কিংবা নায়িকার কাউকে না কাউকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। সুতরাং সম্পর্ক নির্মাণের অন্যতম মাধ্যম বা কৌশল হিসেবে এই গানের ব্যবহার রয়েছে।

৪. পারিবারিক বন্ধনের গান

বোধ হওয়ার পর থেকে মানুষ তার জীবনের বিশেষ প্রয়োজনে পারিবারিক বন্ধনের তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতে শিখেছে। ফলে সেই টান থেকে পারিবারিক বন্ধনের জয় গান করার

প্রচলন গড়ে ওঠেছে। কিন্তু কঠিন বাস্তবতার সংগ্রামে কিংবা হিংসা-বিদ্বেষ, ভুল বোঝাবুঝি ইত্যাদির কারণে এই মধুর বন্ধন ক্রমশ ম্লান হয়ে পড়ায় পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার জন্য এই গানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এছাড়া সময়ের আবর্তনে আধুনিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় বিভিন্ন সময়ে পারিবারিক কাঠামোতে ক্ষয় ধরেছে। অবক্ষয় রোধকল্পে পারিবারিক জীবনে সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার চিত্র প্রকাশে এই গানের অবতারণা। দর্শক এই গানের মধ্য দিয়ে যাপিত জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখার প্রয়াস পায়। চলচ্চিত্রের বৃহৎ পরিসর জুড়ে এই গানের সরব উপস্থিতি লক্ষণীয়। বিশেষত ‘মা’ কে কেন্দ্র করে অনেক গান রচিত হয়েছে। এছাড়া রয়েছে নারী হৃদয়ে মাতৃত্ববোধের গান; নারীর চিরায়ত চাওয়া পাওয়াকে ঘিরেই আবর্তিত।

৫. আসরকেন্দ্রীক বা মনোরঞ্জনমূলক গান

মূলত এই গান জমিদার কিংবা ধনিক শ্রেণির রঙমহলে বাইজি দ্বারা পরিবেশিত বিনোদনমূলক গান। কাহিনির সূত্রধরে কিংবা সাধারণত প্রেমে ব্যর্থ কিংবা ক্ষণিক দুঃখ, কষ্ট, বিরহ-বেদনা ভুলে থাকার জন্য এই গানের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে ধীরে ধীরে এই জলসার বা আসকেন্দ্রীক গানের আরেকটি রূপ পাওয়া যায় যা পার্টি বা ক্লাবে পরিবেশিত গান।

৬. বিবেকের গান

প্রতিনিয়ত মানুষের বিবেক বিবেচনা থেকে সরে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক বার বারই নীতি নৈতিকতা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সচেষ্ট থেকেছেন। হাজার বছরের লোকঐতিহ্যিক গীতিকা বা যাত্রা পালার গানে বিবেক চরিত্র বা বিবেকের গান তারই রূপবাহী। বলা যায় তারই সূত্রধরে চলচ্চিত্রের এই গানের ব্যবহার রয়েছে।

৭. ব্যঙ্গাত্মক বা হাস্যরসের গান

আড্ডা এবং হাস্যরসে মজে থাকা বাঙালির চিরায়ত রসবোধের মধ্যে অন্যতম। এই গান মূলত যাত্রা কিংবা নাটক থেকে উৎসারিত। নাটকে কিংবা যাত্রায় দর্শককে ক্ষাণিক বিশ্রাম দেয়ার শর্তে কৌতুক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়ে এই ধরনের গান পরিবেশিত হতে দেখা যেতো। তারই ধারাবাহিকতায় চলচ্চিত্রের গানেও রয়েছে এর ব্যবহার। তবে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে শিক্ষা কিংবা সচেতনার প্রয়াস নির্মাণের বিষয়টিও এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

৮. জীবনমুখী গান

জীবনের কঠিন বাস্তবতা থেকে এই গানের সূত্রপাত। জীবন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চরম হতাশায় মনের অজানা কথাগুলো গানের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য এই গান ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

৯. দেশ-মাতৃকার গান

নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে একটি দেশ বা জাতি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেশ গড়ার ইতিহাসে এটি বিদ্যমান। এদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া নানাবিধ ঘটনা এবং তা থেকে মুক্তি লাভের জন্য অনুপ্রেরণার অন্যতম শক্তি হিসেবে জন্ম নেয় দেশ বিষয়ক গান। যেমন–দেশ গড়ার গান, বিজয়ের গান, দেশাত্ববোধক গান, ভাষার গান বা প্রভাতফেরির গান, মুক্তির গান, বীররসের গান/বিদ্রোহী চেতনার গান, কৃষক বিদ্রোহের গান প্রভৃতি; কাহিনির সূত্র ধরে তা চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

১০. কল্পনার চোখে স্বপ্ন-পূরণের গান

স্বপ্ন দেখা বা পূরণের আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম। এর মাধ্যমে মানুষ তার জীবনে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা খুঁজে পায়। কল্পনা এবং বাস্তবতার মিশেলে তা রূপায়ণের চেষ্টা করা হয়েছে।

১১. আত্মোৎসর্গের গান

জগৎ সংসারে এমনও অনেক মানুষ আছে, সকলের গোচরে কিংবা অগোচরে যারা অন্যের জীবন বাঁচাতে নিজের জীবন উৎসর্গ করে। ঘটনার বাস্তবতা কিংবা সম্ভাবনার পরিসর তৈরির অন্যতম প্রয়াস হিসেবে এই গানের ব্যবহার হয়েছে।

১২. শিশুকণ্ঠে মুক্তি ও দেশাত্ববোধের গান

পাঠশালা এবং বাবা-মায়ের কঠোর শাসন বারণ পেরিয়ে শিশুরা হাসি আনন্দের মধ্যে থাকতে ভালবাসে তারই ফলস্বরূপ মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় পথচলার আনন্দ গানে প্রকাশিত হয়েছে। জয়-পরাজয় নিয়েই মানুষের জীবন। সেই নিগূঢ় সত্যকে উপলব্ধি করার প্রয়াস এবং আগামীতে সুন্দর সুস্থ জীবন তথা দেশ নির্মাণে ব্রতী হওয়ার অনুপ্রেরণায় এই গান ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১৩. সৃষ্টিকর্তার কৃপা লাভ ও নীরবতা ভঙ্গের গান

সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ তদুপরি চরম অসহায়ত্ব, ক্ষুধা, দারিদ্রতা, নিপীড়ন, নির্যাতন ইত্যাদি থেকে মুক্তি না পেয়ে চরম ক্ষোভ আর কষ্টে সৃষ্টিকর্তার নীরবতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এ গান ব্যবহৃত হয়েছে।

১৪. বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের গান

খলনায়ক যদি কখনো জোরপূর্বক নায়িকার ভালবাসা পেতে চায় কিংবা না পেয়ে প্রত্যাখাত হয় অতঃপর তার সম্ভ্রমহানী করার চেষ্টা করে আবার কখনোবা আত্মসাৎ করতে চায় কারো সহায় সম্পত্তি ইত্যাদি। ঠিক ঐ সময়ে মহান কোন চরিত্র যারা নর্তকী কিংবা অন্য কোন ছদ্মবেশ ধারণ করে অসহায় ব্যক্তি কিংবা সৎ মানুষের জীবন-সম্ভ্রম রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। গানে গানে নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি করার মধ্য দিয়ে খলনায়কের হাত থেকে নায়িকাকে উদ্ধার পরবর্তী নায়কের হাতে তুলে দেয়া এই গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এক. লোকজ গান/গীতিকা বা পালার গান

বাংলার হাজার বছরের লোকসাহিত্যের অন্যতম সম্পদ লোকগীতিকা। এদেশের লোক জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অপার আধার হিসেবে বিদিত। মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গগীতিকা, প্রাচীন পূর্বগীতিকা অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক গীতিকা বা পালা লোকমুখে বহুকাল ধরে প্রচলিত। গীতিকাসমূহে সমাজ সমকাল ও সাহিত্য সংগীতের মেলবন্ধনে লোক মানসের স্বরূপের সঙ্গে শিল্পনিষ্ঠার প্রাসঙ্গিকতা বিদ্যমান। গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া নিরক্ষর কবির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে প্রল্লবিত হয়েছে চলচ্চিত্রের বহুমাত্রিক শিল্পকৌশল। লোককাহিনি নির্ভর তথা লোকজ উপাদানে অন্বিষ্ট চলচ্চিত্র এদেশের একটা বড় অংশ জুড়ে বিস্তৃত।

লোকজীবনের নানা কাহিনিকে উপজীব্য করে নির্মিত হয়েছে অনেক চলচ্চিত্র। এসব কাহিনির বেশির ভাগই জনপ্রিয়তার সূত্র ধরেই পরবর্তীতে চলচ্চিত্রে রপায়ণ ঘটেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য সালাহ্উদ্দিন পরিচালিত *রূপবান* (১৯৬৫), জহির রায়হানের *বেহুলা* (১৯৬৬), সৈয়দ আউয়ালের *গুনাই বিবি* (১৯৬৬০) প্রভৃতি। এছাড়াও ইবনে মিজান পরিচালিত *রাখাল বন্ধু* (১৯৬৮), দিলীপ সোম পরিচালিত *সাত ভাই চম্পা* (১৯৬৮), খান আতাউর রহমানের *অরুণ বরুণ কিরণ মালা* (১৯৬৮) প্রভৃতি অন্যতম। প্রচলিত লোক কাহিনির বিষয়ভিত্তিক চলচ্চিত্র না হয়েও গ্রাম বাংলার পটভূমিতে নির্মিত অনেক চলচ্চিত্রের কাহিনি বা বিষয় রয়েছে যার ব্যবহৃত গান লোকজ উপাদানে অন্বিষ্ট। তারমধ্যে সুভাষ দত্তের *সুতরাং* (১৯৬৪) অন্যতম।

স্বাধীন দেশে অর্থাৎ সত্তর দশকে গ্রামীণ কাহিনি নির্ভর বেশ কিছু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত চলচ্চিত্রসমূহ অন্যতম। অনেকে এসব চলচ্চিত্রসমূহকে সংগীতনির্ভর অর্থাৎ গান বহুল চলচ্চিত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। এসব চলচ্চিত্রের কাহিনি সমাজ জীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না বলেও কোন কোন সমালোচকের অভিমত। এসব চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহারের সংখ্যা চৌদ্দ থেকে পনেরটি পর্যন্ত লক্ষ করা যায়। এরমধ্যে–প্রমোদকারের *সুজন সখী* (১৯৭৫), শিবলি সাদিকের *নোলক* (১৯৭৮), জহিরুল হকের *প্রাণ সজনী* (১৯৮৩), ইবনে মিজানের *চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা* (১৯৮৪), বেলাল আহমেদের *নয়নের আলো* (১৯৮৪), আবদুস সাত্তার খোকনের *ঝিনুক মালা* (১৯৮৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রচলিত লোককাহিনি বিষয়ক চলচ্চিত্র হারুনুর রশীদের *গুনাই বিবি* (১৯৮৫), ইবনে মিজানের *রঙিন রাখাল বন্ধু* (১৯৮৬) ও *রঙিন জরিনা সুন্দরী* (১৯৮৭), আজিজুর রহমানের *রঙিন কাঞ্চন মালা* (১৯৮৮) ও *রঙিন রূপবান* (১৯৮৫), শফিউল আজমের *রঙিন অরুণ বরুণ কিরণ মালা* (১৯৮৮), মিলন চৌধুরীর *রঙিন সাত ভাই চম্পা* (১৯৮৭), চাষী নজরুল ইসলামের *রঙিন বেহুলা লক্ষিন্দর* (১৯৮৮), তোজাম্মেল হক বকুলের *বেদের মেয়ে জোস্না* (১৯৮৯), সাইদুর রহমান মুকুলের *আলোমতি প্রেমকুমার* (১৯৮৯) প্রভৃতি। বর্ণিত সময়ের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের লোকজ গান গীতিকা বা পালার গান নিম্নরূপভাবে দেখানো যায়।

১. প্রেমের গান
   - ক. নায়িকার একাকী অভিনয়ে প্রেমের গান
   - খ. নায়কের একাকী অভিনয়ে প্রেমের গান
   - গ. নায়ক-নায়িকার দ্বৈতাভিনয়ে প্রেমের গান

২. নায়ক-নায়িকার উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গান

৩. নারী-পুরুষের বাদ-প্রতিবাদের গান
৪. অভিমানের গান
৫. সই/সখীদের গান
৬. দোস্ত/বন্ধুর গান
৭. বিরহ-বেদনার গান
৮. বিবাহ সংক্রান্ত গান
 ক. গায়ে হলুদের গান
 খ. বিয়ের গান
 গ. বাসর ঘর তৈরির গান
 ঘ. বাসর রাতের গান
 ঙ. বিবাহ সংক্রান্ত গান
৯. ব্যঙ্গাত্মক বা হাস্যরসের গান
১০. সাপুড়ে বা সর্প বিষয়ক গান
১১. বিবেকের গান
১২. আধ্যাত্মিক চেতনা ও আত্মোপলব্দির গান

উপরোক্ত গানসমূহের ভাষা, সুর প্রভৃতি লোকজ উপাদান অন্বিষ্ট অর্থাৎ লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারায় প্রতিস্থাপিত এবং এর মধ্যে অধিকাংশ গান আধুনিক উপস্থাপনে উন্নীত। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে গানের সুরশৈলী নিয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে।

১. প্রেমের গান

লোকজীবনের নর-নারীর প্রেমকে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে অনেক সাহিত্যকর্ম এবং তা বাংলা সাহিত্যের বৃহৎ অংশ জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং চলচ্চিত্রে গানেরও বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে প্রেম। গ্রামীণ পটভূমিতে নির্মিত চলচ্চিত্রে নর-নারীর সাধারণ জীবনের মনের কথামালা গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হতে দেখা যায় এবং বর্ণিত গানসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত। যেমন–প্রেমের প্রথম পর্যায়ে গান, যা সাধারণত নায়ক বা নায়িকার যৌবন প্রাপ্ত অথবা যৌবনবতী হয়ে উঠা অথবা একে অপরের প্রতি ভালবাসাকে কেন্দ্র করে একাকী অভিনয়ে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে দুজনের মাঝে ভালবাসার মেলবন্ধন অর্থাৎ মিলনান্তক প্রেমের গান যা নায়ক বা নায়িকার দ্বৈতাভিনয়ে পরিবেশিত হয়। এসবের গানের ভাষায়, সুরে রয়েছে লোকজ উপাদান এবং গায়কিতে লোকভঙ্গি। আবার এসব গানের মধ্যেও রয়েছে রোমান্টিকতার নানাবিধ বহিঃপ্রকাশ। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ের রোমান্টিক গানের অংশে।

ক. নায়িকার একাকী অভিনয়ে প্রেমের গান

নায়িকার যৌবনবতী হওয়া তদুপরি মনের মানুষ পাওয়ার কামনা তীব্রতর হয় বর্ণিত শিরোনামের এই গানে। চলচ্চিত্রের সাধারণত প্রেমের প্রথম পর্যায়ের গান এটি। শ্রেণি এবং স্থান কাল ভেদে প্রেমানুভূতির প্রকাশ কিংবা উপস্থাপনা ভঙ্গিমায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও প্রেম সর্বত্র বিরাজমান, এক ও অভিন্ন। গ্রামীণ জীবনে নর-নারীর প্রেম সাদা-মাটা সহজ সরল ভাষায় আচ্ছাদিত। সুভাষ দত্তের *সুতরাং* (১৯৬৪) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি তারই রূপবাহী। সাদা-কালোর আলোয় বাংলার প্রাকৃতিক

সৌন্দর্যের রূপ উঠে এসেছে বিচিত্র ভঙ্গিমায়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় গ্রামের মোড়লের কন্যা জরিনা (কবরী) এবং একই গ্রামের যুবক জব্বার (সুভাষ দত্ত) ক্ষেতে খামারে গরু ছাগল চরায়। প্রায়শ দুজনের মধ্যে খুনশুটি লেগে থাকে। একদিন জব্বারকে গরুর পেছনে পেছনে রশি ধরে দৌড়াতে দেখা যায়। রশি ধরে গরুটিকে আটকে রাখার চেষ্টা করে সে। কিন্তু গরুর শক্তির সাথে কোন মতেই পেরে উঠে না জব্বার। ধপাস্ করে পড়ে যায় মাটিতে। দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে, হি হি করে হেসে ওঠে জরিনা বলে: 'বোকা'। জব্বার রাগে-অনুরাগে মাথার পাগড়ি খুলে ফেলে। জরিনার কাছে গিয়ে তার হাতটি চেপে ধরে। জরিনা বলে: 'আহ ছাড়ো কেউ দেখে ফেলবে।' তারপর দুষ্টু হাসি দিয়ে চলে যায় জরিনা। জব্বার গরুটির গলায় আদরে হাত বুলায় এবং চুমু খায়। এ যেন একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনারই অপূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ। অপরদিকে জরিনাও গুনগুন করে সুর তোলে তার প্রাণ ভ্রমরার জন্য–

পরানে দোলা দিল এ কোন ভ্রমরা
ফুলের বনে গুঞ্জরিয়া যায়
সে যে ফুলের বনে
সে কি মনের বনে গুঞ্জরিয়া যায়
হায় কি করি উপায়
বলিতে শরম লাগে ॥

চিত্র-১: *সুতরাং* (১৯৬৪) চলচ্চিত্রে 'পরানে দোলা দিল এ কোন ভ্রমরা' গানের একটি স্থিরচিত্রে কবরী।

গানের বাণীতে প্রেমের ইঙ্গিত হিসেবে ভ্রমরা এবং ফুল প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত। জরিনার (কবরী) আপন মনে গেয়ে চলা বিষয়টি নায়িকার রোমান্সকেই প্রকাশ করে। নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী আঞ্জুমান আরা বেগম। গীতিকার সৈয়দ শামসুল হক, সুরকার সত্য সাহা। এই চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিতেও রোমান্টিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায়, জব্বারের চোখে জল। তার হুজুর কারণ জানতে চাইলে জব্বার বলে: 'আজ টাকাটা গুণে দেখলাম। আর মাত্র পঞ্চাশ টাকা বাকি আছে। সামনের মাসে দেশে ফিরে যাবো। ওকে (জরিনা) পাবো সেই আনন্দেই চোখের পানি বেরিয়ে এসেছে।' তারপর স্বপ্নে দেখে তার প্রেমিকা অধীর আগ্রহে অপেক্ষার প্রহর গুণছে গানে গানে–'তুমি

আসবে বলে কাছে ডাকবে বলে, ভালবাসবে ওগো শুধু মোরে।' গানটিতে রোমান্টিক ভাবধারা লক্ষমাত্রায় উপস্থিত। যেমনটি প্রয়োগ ভাবনায় তেমনটি গানের বাণীতেও। প্রিয়জনের আগমনে শুধু প্রেমিকার হৃদয় অধীর নয় প্রকৃতিকুলও ব্যাকুল। ব্যক্ত হয়েছে–'তাই চম্পা বকুল, করে গন্ধে আকুল, এই জোছনা রাতে মনে পড়ে' কথার মধ্য দিয়ে। গানের বাণীতে প্রেম, প্রকৃতি কল্পনার বিপুল বিস্তারণ তা কেবলই কল্পনার চোখে প্রকাশমান। সুতরাং প্রয়োগ ভাবনা এবং গানের বাণী রোমান্টিক ভাবনার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। গ্রাম বাংলার পটভূমিতে নির্মিত *সুজন সখী* (১৯৭৫) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটিতেও অনেকটা একই ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলা যায়।

গুন গুন গুন গান গাহিয়া নীল ভ্রমরা যায়
সেই গানের টানে ফুলের বনে
ফুলের মধু উছলায় ॥

উপরোক্ত গানটি চলচ্চিত্রে প্রেমের প্রথম পর্যায়ের গান। সখীর (কবরী) প্লাবিত যৌবনকে ঘিরে প্রবাহিত তদুপরি মধুর প্রেম গুঞ্জরণে বাহিত। তা উঠে আসে প্রথমত: 'আমায় ভুল করিতে ভুল করাইছে সৃষ্টি বিধাতায়, নইলে কি আর সোনার যৌবন ভাটা পইরা যায়।' এই কথার মধ্য দিয়ে এবং দ্বিতীয়ত প্রাণ বন্ধুকে কাছে পাওয়া অতঃপর তার নিকট জীবন যৌবন সপে দেয়ার ব্যকুলতায়–

পাইতাম যদি প্রাণ বন্ধুরে
ঘুম পাড়াইতাম ফুল শয্যায়
আমার জীবন যৌবন বিকাইতাম
বন্ধুর দুইটি রাঙা পায় রাঙা পায় ॥

উপরন্তু ফুল, পাখি, লতা, গুল্মের এমন প্রাকৃতিক পরিবেশে সখীর দেহ মনে চঞ্চলতার যে ধাবমানতা তাতে তারই রূপ বিধৃত হয়। গানে নীল ভ্রমরার কথার উল্লেখ আছে তা তার প্রেমিক পুরুষকেই প্রতীকী অর্থে বোঝানো হয় এবং তাকে পাওয়ার আকুতিতে ব্যক্ত হয়– 'ভ্রমর যখন ফুলের সাথে করে আলিঙ্গন, চাইয়া থাকি তখন আমার কেমন করে মন, ফুল যদি হইতাম আমি গাছেরও ডালায়, তখন নীল ভ্রমরা হইয়া বন্ধু উইড়া পড়ত আমার গায় আমার গায়।' সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে এবং কবরীর অভিনয়ে পরিবেশিত গানটির গীতিকার ও সুরকার খান আতাউর রহমান। প্রসঙ্গত, ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণ ব্যাহত হয়। তার সাক্ষ্য মেলে উক্ত সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হলে ক্ষমতা দখলকারীরা পূর্বে নির্মিত সকল ছবির প্রদর্শনী বন্ধ করে দেন। এমনকি সামাজিক ছবিতে ব্যবহৃত বঙ্গবন্ধুর ছবি কেটে ফেলা হয়। যার কারণে নির্মাতারা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছবি তৈরি করতে সাহস করেনি।[৩] তবে এ সময়ে *সুজন সখী* ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় বিশেষত অনবদ্য এর গানের কারণ। উপরোক্ত গানটির ন্যায় একই অনুভূতির প্রকাশ ইবনে মিজানের *চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা* (১৯৮৪) চলচ্চিত্রে লক্ষ করা যায়। চন্দন দ্বীপের রাজা সুলতানে আজমের (শওকত আকবর) একমাত্র কন্যা শাহজাদি দিলরুবার (অঞ্জু) অভিপ্রায়ে। গানটিতে তার যৌবনবতী হয়ে উঠা অতঃপর একজন মনের মানুষ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হয় সখীদের নিয়ে পরিবেশিত নিম্নোক্ত গানে–

আইলো দারুণ ফাগুনরে

লাগলো মনে আগুনরে
একা একা ভাল লাগে না
ও ও ও একা একা ভাল লাগে না ॥

উপরোক্ত গানটিতে ঋতু বদলের হাওয়ায় শাহজাদি দিলরুবার মন শিহরিত এবং তাতে প্রেমের সঞ্চারণ হয়। একজন সঙ্গীর কামনা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। প্রকৃতির নানা রূপে মুগ্ধ হয়ে শাহজাদির চিত্ত হয় ব্যাকুল। অন্তর বিকশিত হয় তার মনের মানুষ পাওয়ার জন্য। বলা হয়: 'বনে বনে ফুলের মেলা ভ্রমর করে খেলা, তাই দেখিয়া আমার মনে বাড়ে দারুণ জ্বালারে।' আবার ঋতুর রানি বসন্তের আগমনে প্রকৃতি নানা সাজে সজ্জিত হলেও বসন্ত বাহারের এমন ক্ষণে শাহজাদির মনের বাগান শূন্য পড়ে রয় একজন প্রাণ ভ্রমরার জন্য। তারই কামনা ব্যক্ত হয়: 'বসন্তেরই এমন দিনে মনের বাগান খালি, কোথায় গেলে পাব বলো আমার সুজন মালিরে।' বাগানের মালির ন্যায় যে তার জীবনকে প্রেম-ভালবাসায় রাঙিয়ে তুলবে তারই আশাবাদ ব্যক্ত হয় গানটিতে। এই চলচ্চিত্রে আরেকটি প্রেমের গান যেখানে অফুরান ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। প্রেমিক শাহজাদা নওশাদের (ওয়াসিম) জন্য প্রেমিকার হৃদয়ে ভালবাসার তুফান বয়ে যায়। তা বোঝানোর আপ্রাণ প্রচেষ্টায় শাহজাদির মন ব্যাকুল হয় এবং শেষ পর্যন্ত মনটা খুলে দেখাতে চায় 'সিন্ধুকের' মত করে তার ভালবাসার মানুষটির নিকট। তারই প্রকাশ নিম্নোক্ত গানে–

মনটা যদি খোলা যেত সিন্ধুকেরই মত
দেখাইতে পারিতাম তোমায় ভালবাসি কত
পাগল করিলা বন্ধু কি জাদু করিয়া ॥

প্রসঙ্গত, সমকালীন বিষয় আশয় চলচ্চিত্রের সঙ্গী। চিরায়ত গ্রাম বাংলার সংসার জীবনে 'সিন্ধুক' হলো অতীব প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রের মধ্যে একটি। যার মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের মূলবান সামগ্রী অর্থালংকার ইত্যাদি গচ্ছিত রাখা হয়। নারীর অলংকার নাকের নোলক, কানের দুল, প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ নদীর কূল, নৌকা বা তরী ইত্যাদি উপমা হিসেবে গানে ব্যবহৃত হয়েছে–'নাকের যেমন নোলক আছে কানের আছে দুলরে, ফুলের যেমন ভ্রমর আছে নদীর আছে কূলরে।' সময়ের আবর্তে বর্তমানে সিন্ধুকের ব্যবহার নাই বললেই চলে কিংবা পরিবর্তন এসেছে অন্যান্য সামগ্রী কিংবা নারীর অলংকারেও কিন্তু চলচ্চিত্রে রচিত এই গান কালের সাক্ষ্যবাহী। সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে পরিবেশিত হয় গানটি। আমজাদ হোসেনের *নয়ন মণি* (১৯৭৬) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানে নায়কের প্রতি নায়িকার প্রেমানুরাগের সহজ সরল উক্তি নিম্নোরূপভাবে প্রকাশ পায়–

চুল ধইর না খোঁপা খুলে যাবে হে নাগর
আউলা কেশে পাগল বেশে ক্যামনে যাব ঘর ॥

গানটিতে বাঙালি নারীর সামাজিক চিত্র উঠে আসে। ঘর থেকে নারী যে বেশ বা সাজে বের হয় ফিরতি পথে তার ভিন্নতা ঘটলে পরিবার এবং সমাজে নানা রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। গানের শুরুতে এ আশংকারই প্রকাশ ঘটে। আবার চুল ছেড়ে প্রেমিকের ভিন্ন অঙ্গ স্পর্শের আকাঙ্ক্ষারই সতর্ক বাণীতে ব্যক্ত হয়–'হাত ধইর না চুড়ি ভেঙ্গে বিঁধলে আমার হাতে, বলবে লোকে কলঙ্কের দাগ

কে দিল এই রাতে।' চলচ্চিত্রে দেখা যায় নয়ন (ফারুক) তার মনের মানুষ মণির (ববিতা) জন্যে অপেক্ষা করে।

চিত্র-২: *নয়ন মণি* (১৯৭৬) চলচ্চিত্রে 'চুল ধইর না খোঁপা খুলে যাবে হে নাগর' গানের একটি স্থিরচিত্রে ববিতা এবং ফারুক।

দেরি করে আসার কারণ জানতে চেয়ে বলে: 'দেরি করলি ক্যান? মণি বলে: আমি কি তোমার মত পুরুষ মানুষ নিঃস্বাধীন। যখন যেমন উইড়া উইড়া ব্যারামু ? জবাবে নয়ন বলে: আরে তুই তো পুরুষের বাপ। যখন তখন গাছে উঠতে পারস। সময় অসময় সারা পাড়া মাথায় কইরা লইয়া নাচতে পারস্। আমার বেলায় লজ্জা লাগে? জোরে ধমক দিয়ে বলে: দেরি করলি ক্যান? মণি ভয়ে থমকে যায়। এরপর নিজেকে সামলে নিয়ে নয়নের চোখের দিকে তাকিলে বলে: ধমকাও ক্যান ? আমি কি তোমার ঘরের বউ নাকি? আমারে বেশি কিছু কইলে কিন্তু আমি কানমু। কানবি ? তোর কান্দন আমি বার করতাছি।' বলে চুলের খোঁপা ধরে নয়ন। আর মণি বলে: 'আহ ! ছাড়ো।' এরপর দূরে সরে গিয়ে তার অনুভূতি প্রকাশ করে উপরোক্ত গানের মাধ্যমে।

আমজাদ হোসেনের *সুন্দরী* (১৯৭৯) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটিতেও কাঞ্চনের (ইলিয়াস কাঞ্চন) প্রতি সুন্দরীর (ববিতা) প্রেমের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় সুন্দরীর জন্ম হওয়ার সময় তার মা মারা যায়। একমাত্র বাবা ইমান আলীকে (জসিম) ঘিরে তার জীবন। অপর দিকে কাঞ্চনের দুঃখের সীমা নেই। পিতা-মাতাহীন সৎ ভাই-ভাবির সংসারে নানা নির্যাতনের মধ্যে বেড়ে ওঠে সে। এমন দুই দুখি হৃদয়ের মাঝে ধীরে ধীরে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারই রূপ দৃষ্ট হয় নিম্নোক্ত গানটিতে–

আমি আছি থাকব ভালবেসে মরব
দোহাই লাগে তোমার
আমারে পাগল কইরা না ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় সুন্দরীর বাবা ইমান আলী আর নুরু (আনোয়ার হোসেন) দুই লাঠিয়াল কাঞ্চনকে লাঠি খেলা শেখায়। সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার আশায়। তালুকদারের (আরিফুল হক) অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ, প্রতিবাদ গড়ে তোলার প্রত্যাশায়। তাদের জীবদ্দশায় যা করতে পারেনি। শুধু তালুকদারের (আরিফুল হক) গোলামি কিংবা হুকুম পালন ছাড়া। সেই অপূর্ণতা কাঞ্চনের মাধ্যমে পূর্ণ

করার প্রচেষ্টা চালাতে দেখা যায়। তিন জনের হাতে লাঠি নানা ভঙ্গিমায় তা চালাচালি করে। সুন্দরী দূরে দেখে। এক সময় কাঞ্চন তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লে তাকে পানি এনে দেয়। আবার চলে লাঠি। অবিরাম লাঠি চলে নানা কৌশলে নানা কসরতে আক্রমনাত্মক ভঙ্গিমায়। হঠাৎ কপাল ফেটে রক্ত ঝরে কাঞ্চনের। সুন্দরী কাপড় বেঁধে দেয় কপালে বড় আদরে-সোহাগে। আবার শুরু হয় লাঠি চালানো।

একদিন রাতে সুন্দরী রান্না করে। কাঞ্চন চুপি পায়ে সুন্দরীর পেছন দিক থেকে এসে তাকে ভয় পাইয়ে দেয়। সুন্দরী ভয় পেয়ে দৌড়ে ঘরে ঢুকতে যায়। সামনে এসে তার পথ রোধ করে কাঞ্চন। লাঠি চালনার ভঙ্গিতে পায়ে পায়ে দোলে। কাঞ্চনের এমন ভঙ্গিমা দেখে সুন্দরী লজ্জা পায় কিন্তু সেও মনে মনে কাঞ্চনের আনন্দে নিজেকে যুক্ত করে। এক সময় কাঞ্চন চলে যেতে চায়। পেছন দিক থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে সুন্দরী উপরোক্ত গানটি গেয়ে ওঠে। কাঞ্চন পেছন ফিরে সুন্দরীর দিকে তাকায়। দুজনের মাঝে ভালবাসার মধুর পরিবেশ তৈরি হয়। সি বি জামানের *উজান ভাটি* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিতে নারী হৃদয়ের অর্থাৎ সোনাইয়ের প্রেমানুভূতির প্রকাশ ঘটে। বেশ কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় সোনাই (নবীনা) এবং মনির (সুজন)। গ্রামীণ জীবনে নানা ধরনের ঘটনার ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয় তারা। দুজনের মাঝে নানা রকম খুনশুটি লেগেই থাকে। আবার ঘটনাচক্রে দেখা যায় দুজনের মাঝে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারই প্রকাশ সোনাইয়ের নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে–

দিনের কথা দিনে ভালো রাইতের কথা রাইতে
তার চেয়ে ভালো লাগে থাকতে তোমার সাথে
বন্ধু কি জানি
বশীকরণ তাবিচ করছি নি ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় মনির এবং কিরমু (দিলদার) বড়শি দিয়ে মাছ ধরে। স্কুলে যাওয়ার পথে পেছন দিক থেকে মিয়া ভাই বলে ডাকে মনিরের ছোট ভাই। বলে: ‘তোমার খবর আছে। ...তোমারে দেহা করতে কইছে। রাইতে পিয়ারা বাগানে। মনির বলে: ‘রাইতে পেয়ারা বাগানে ? কেরা ? সোনা বু। মনির অবাক হয়ে বলে: রাইতে ? ক্যান অহন কইতে পারে না? না। সোনা বু কইছে। দিনের কথা দিনে কইতে অয়, আর রাইতের কথা রাইতে। ঠিক আছে দেহুম নি। তুই স্কুলে যা।’ এই বলে মাছ ধরায় ফিরে যায় মনির আর একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে ‘দিনের কথা দিনে আর রাইতের কথা রাইতে।’

তারপর দেখা যায় সোনাই নিজের কথা মত পেয়ারা বাগানে উপস্থিত হয়; হাতে ফুল নিয়ে সেজে গুজে অপেক্ষা করে মনিরের জন্যে। মনিরও বেশ পরিপাটি হয়ে আসে। তাকিয়ে থাকে সোনাইয়ের দিকে। সোনাই বলে: ‘কথা আছে। মনির বলে: কি এমন কথা দিনে কওন যায় না। দিনে শরম করে। ক্যান রাইতে শরম করে না? শুরু হয় উপরোক্ত গান। গানটিতে লোকলজ্জার ভয় ব্যক্ত হয়: পাড়াপড়শি সকলেরই হইলাম চক্ষুশূল, লোক নিন্দার কাঁটা দিয়া বাঁধলাম খোপার চুল।’ সুজনকে ঘিরে নাচে সোনাই এবং মনের অব্যক্ত ভালবাসা প্রকাশ করে গানের মাধ্যমে। চলচ্চিত্রের শুরু থেকে সোনাই চরিত্রে যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় এই ঘটনার ফল তার বিপরীত। যার সামনে কথা

বলতে ভয় পায়। পাড়া জুড়ে যে দারোগা নামে খ্যাত। সে কিনা মনিরের প্রেমে মশগুল। হয়তো তা ব্যক্তও হয়–'বশীকরণ তাবিচ করছি নি' কথার মাধ্যমে।

উপরোক্ত গানটির ঠিক বিপরীত ভাবনা পরিলক্ষিত হয় আজিজুর রহমানের *অশিক্ষিত* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটিতে। তবে আপাত দৃষ্টিতে গানটিতে ভিন্নতর ভাবনা পরিলক্ষিত হলেও কোকিলের গেয়ে ওঠার বিষয়টি শেষ পর্যন্ত চঞ্চলা স্বভাবের লাইলীর (অঞ্জনা) প্রেমেরই ইঙ্গিত বহন করে। চলচ্চিত্রে গানটি পরিবেশিত হওয়ার পূর্বে দেখা যায় রহমত (রাজ্জাক) পুকুরে বড়শি ফেলে মাছ ধরে। কে যেন পানিতে ঢিল ছুড়ে? আশে পাশে তাকায় কাউকে দেখতে পায় না। বলেঃ 'কাউরে তো দেহি না। ঢিল কি আসমান থিকা পড়ে নাহি! দিন দুপুরে ভূতের খেল।' হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে দেখে গাছের ডালে লাইলী বসে পেয়ারা খাচ্ছে আর খিল খিল করে হাসছে। রহমত এগিয়ে এসে বলেঃ 'দিন দুপুরে ভূত আইব কৈ থিকা। এডাতো দেহি পেতনি।' লাইলী ধপাস্ করে গাছের ডাল থেকে নেমে বলেঃ 'খবরদার পেতনি কইবিনা।' চিক্কর দিয়া তাইলে সক্কলেরে কইয়া দিমু, পাহাড়াদার হইয়া মাছ চুরি করতাছস।' দুজনের মাঝে নানা ধরনের খুনশুটি হয়। এক সময় রহমতকে মাতব্বরের চ্যামচা বললে রহমত ক্ষেপে গিয়ে তার হাত মুচড়ে দিয়ে বলেঃ 'তুই আমারে চ্যামচা কইলি? আরে লাগে তো ছাড়। ছাড় না তোর পায়ে ধরি ছাড়। যা ছাইড়া দিলাম। আর কোনদিন চামচা কইবি না, কইয়া দিলাম। কি কব? ভাবতে থাকে লাইলী। তারপর বলেঃ 'হ্যা কি কইবি? পাইছি, তুই তাইলে, তুই তাইলে রসগোল্লা। দুজনে হাসিতে ফেটে পড়ে। রহমত নিজেকে দেখিয়ে বলে রসগোল্লা আর লাইলীর দিকে আঙুল নেড়ে বলে গরম মসল্লা। রহমত লাইলীর থুতনি নেড়ে বলে কী সুন্দর মিল মাশাল্লাহ। যাও বাড়ি গিয়া করো আল্লাহ আল্লাহ।' লাইলী ভেংচি কেটে চলে যায়।

অপরদিকে লাইলীর বাবা বাঁশের উপর মাছ ধরার জাল নেড়ে দেয়। আর লাইলী লাইলী বলে ডাকে আর বলেঃ 'না একটুও ঘরে থাকবার চায় না। এই লক্ষ্মী ছাড়া মাইয়া আমার জাত মান সব ডুবাইব। আজকে ওর ঠাং-ই ভাইঙ্গা ফালামু।' তারপর দেখা যায় গাছের ডালে নুপূর পরা দুটো পা ঝুলছে মিউজিকের তালে তালে। তার ক্লোজ শট। লাইলীর মিড শট তার দুপাশে ফিতেয় বাঁধা বেণি নড়ছে। একা একা নিজের সাথে কথা বলেঃ 'আমারে না সবাই জ্বালাই। কেউ চাই শাসন করতে। আবার কেউ চায় বান্ধা রাখতে। আমার না কিচ্ছু ভাল্লাগে না।' উঁচু গাছের ডালে কোকিল গেয়ে ওঠে কু...কু...কু...কু স্বরে। পাখির ডাকে সাড়া দিয়ে বলেঃ 'হুম বউ কথা কও যাহ্!' তারপর শুরু হয় তার মনের যত কথা নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে–

আমি যেমন আছি তেমন রবো বউ হবো না রে
কারো বউ হবো না রে
কথা বলব না রে ॥

উপরোক্ত গানটিতে লাইলীর যে চঞ্চলতা তা তার যৌবনবতী হয়ে উঠা অতঃপর রহমতের সাথে ঘটে যাওয়ার ঘটনারই প্রকাশ। গানটির স্থায়ীর শেষে পাখি আবার উঁচু ডালে কু কু কু কু স্বরে গেয়ে ওঠে। লাইলী তার স্বভাবগত আচরণে বলেঃ 'আহ্ পাখিটা তো জ্বালায় মারলো?। গানে যে পাখির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা তার একজন সঙ্গীর কামনার প্রতীকী অর্থ বহন করে যেন। তারপর চঞ্চলতাবশত সে ছোটাছুটি করে। শাম্মী আক্তারের কণ্ঠে পরিবেশিত হয় গানটি।

সি বি জামানের *উজান ভাটি* (১৯৮২) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটিতেও একই মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। সোনাইয়ের (নবীনা) যৌবনবতী হয়ে উঠা অতঃপর তার মনে প্রেম সঞ্চারণের বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। সিকদার বাড়ির মেয়ে সোনাই। সকলে দারোগার মত ভয় করে তাকে। সই বানুকে সঙ্গে নিয়ে সারাদিন এপাড়া ওপাড়ায় দস্যীপনা করে বেড়ায়। কাউকে পরোয়া করে না। ক্ষেতে গরু-বাছুর গেলে তা ধরে খোয়ারে দেয়। খোয়ার কর্তা পয়সা চাইলে চোখ রাঙালেই সব মিটে যায়। স্বাধীনচেতা সোনাই যেন কারো ঘরনি হতে চায় না বরং বিয়ের কথা এলে ঘটককে নানা রকম কৌশলে তাড়িয়ে দেয়। এমন পরিস্থিতি তৈরি করে যেন ঘটক দৌড়ে পালালে বাঁচে। এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সোনাইয়ের মধ্যে দেখা যায়। একা একা থাকতেই ভালোবাসে সে। নিম্নোক্ত গানটিতেও তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়–

আমি একা একা থাকি রে
চঞ্চল পাখি রে
কারো যে ধার যে ধারি না
লোকে কত কথা বলে রে
কত নালা চলে রে
এ কথা সে কথা শুনিনা ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় কোকিলের কুহু কুহু ডাকে মুখরিত গ্রাম। গ্রামের মেঠো পথ ধরে গান গেয়ে বেড়ায় সোনাই। কোন কিছুই যেন তার মুক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করতে পারে না। একান্ত নিজের মত করে জীবন কাটাতে চায়। এমন স্বাধীনচেতা জীবনেরই জয়গান গাইতে দেখা যায় সোনাইকে। কিন্তু এ চঞ্চলতা কি একা থাকার চঞ্চলতা ? না কারো নিকট ধরা দেয়ারই ইঙ্গিতবাহী ?

খ. নায়কের একাকী অভিনয়ে প্রেমের গান

চলচ্চিত্রে নায়িকার পাশাপাশি নায়কেরও রয়েছে প্রেমানুভূতি প্রকাশের নানা দিক। বর্ণিত শিরোনামের গানে জব্বারের (সুভাষ দত্ত) মনোবাসনা পরিবেশিত হয় তার নায়িকা জরিনাকে (কবরী) ঘিরে। চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে জরিনাকে বিয়ে করার আনন্দে গ্রামের দিকে রওয়ানা করে সে। প্রথমে ট্রেন এবং পরে গরুর গাড়ি ব্যবহার করতে দেখা যায়। গরুর গাড়ি চলছে আর নায়কের মন তার প্রিয় জরিনার কথা ভেবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ছে। তার সাথে সাথে প্রকৃতি যেন গেয়ে উঠছে নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে তারই প্রকাশ–

এই যে আকাশ এই যে বাতাস
বউ কথা কও সুরে যেন ভেসে যায়
বেলা বয়ে যায় মধুমতি গায়
ওরে মন ছুটে চল চেনা ঠিকানায় ॥

উপরোক্ত গানটিতে দুটি বিষয় বিদ্যমান। প্রেম এবং বিরহ। প্রথম অংশে প্রেম এবং দ্বিতীয় অংশে বিরহ যা গাড়িয়ালের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়েছে। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন যথাক্রমে কাজী আনোয়ার হোসেন এবং আব্দুল আলীম। ইবনে মিজানের *চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা* (১৯৮৪) চলচ্চিত্রে

নিম্নোক্ত গান প্রেমিকার প্রতি প্রেমিকের ভালবাসা নিবেদনের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। গানটি জুড়ে অন্ধ শাহজাদার সকল আশা আকাঙ্ক্ষা, বেঁচে থাকার শক্তি ব্যক্ত হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় শাহজাদি একদিন শিকার করতে গিয়ে পাহাড় থেকে পা ফস্‌কে গভীর অরণ্যে পড়ে যায় এবং পা ভেঙ্গে যায় তার। শাহজাদির চিৎকার শুনে ছুটে আসে ঘটনাচক্রে নির্বাসিত অন্ধ শাহজাদা নওশাদ (ওয়াসিম)। দুজনকে নানাভাবে বনের বিপদ সঙ্কুল পরিবেশে, কখনো বাঘের আক্রমণ থেকে কখনো বা সাপের উতপাত থেকে রক্ষা করে বন্ধু বাহাদুর হাতি। শাহজাদি দিলরুবার পা ভাল হলে রাজদরবারে ফিরে যেতে চায় শাহজাদাকে সঙ্গে করে। শাহজাদাও তার মনের কথা প্রকাশ করে নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে–

নায়ক: আমি তোমারই প্রেম ভিখারি
ভালবেসে ঠাঁই দিও পরানে গো
আমি তোমারই প্রেম ভিখারি
পাশে থেকো জীবন মরণে ॥

শাহজাদা নওশাদের নির্বাসিত জীবনে চরম বিপদ সঙ্কুল পরিবেশে ঘটনাচক্রে একমাত্র শাহজাদিই তাকে ভালবাসার চাদরে আগলে রেখেছিল। ফলে শাহজাদা তার বাকি জীবন তার পাশে থেকে অতিবাহিত করতে চায়। জীবনে মরণে তার ভালোবাসায় সিক্ত হতে চায়। তারই বাসনা ব্যক্ত হয়েছে–‘পাশে থেকে জীবনে মরণে...ভালোবেসে ঠাঁই দিও পরানে গো।’ আলমগীর পরিচালিত *নিষ্পাপ* (১৯৮৬) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিতে প্রেমিকার সাক্ষাৎ পাওয়ার অধীর আশায় প্রেমিকের আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রতিফলিত হয় নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে। নিম্নবর্ণিত গানটি একসময় মিনার (চম্পা) অভিনয়ে আরিফের (আলমগীর) অভিমান ভাঙ্গানোর প্রয়াসে পরিবেশিত হয়েছিল এবং তাতে দুজনের বন্ধন দৃঢ় হয়েছিল। সেই গান আবার নায়কের অনুভূতিতে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। যখন সে ঘটনাচক্রান্তে কারাবন্দি এবং তার নায়িকা থেকে অনেক দূরে।

তুই যে আমার মিলন মালারে বন্ধু পিরিতের
নকশি সুতায় গেঁথে রাখি
কান্দে পরান ভাসে দু’নয়ন প্রাণ সজনি
দমে দমে তোরে ডাকি
হায় গো দমে দমে তোরে ডাকি ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় গ্রামের মোড়লের চক্রান্তে মিথ্যে খুনের মামলায় পাঁচ বছরের জেল হয় আরিফের। জেলার জসিমকে একদিন দাগি আসামিদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচানোর কারণে তার বাসায় কাজের সুযোগ হয় আরিফের। সেখানে জেলারের বোন জলিকে (রেহানা জলি) দিয়ে আরিফ তার প্রেমিকা মিনার জন্য চিঠি লিখিয়ে নেয়। তারপর থেকে তার অপেক্ষার পালা শুরু হয়। একা একা কথা বলে নিজের সাথে–‘আমি ওকে আসতে বলেছি’ আবার খুশিতে গদ গদ হয়ে বলে: ‘আর যদি ও আসে। তাহলে আমাদের আবার দেখা হবে। আবার কথা হবে। আবার ওকে আমি দেখতে পাবো। খুশিতে হা হা হা করে হাসতে থাকে আরিফ। তার খুশি দেখে অন্যান্য আসামিরা অবাক হয়। তারা জানতে চায় তার খুশির কারণ। আরিফ বলে: ‘সেদিন তোমাদের বলেছিলাম না ? আমি আমার সুর হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আজ সেই সুর আবার আমি খুঁজে পেয়েছি’ আসামিরা বলে: ‘তাহলে

একটু গাওনা শুনি? তারপর গলা খাকারি দিয়ে আরিফ শুরু করে উপরোক্ত গান। অন্যান্য আসামিরাও নেচে নেচে তাল মেলায় তার সাথে।

গ. নায়ক-নায়িকার দ্বৈতাভিনয়ে প্রেমের গান

বর্ণিত শিরোনামের গান সাধারণত প্রেমের দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। উক্ত গানে একে অপরের প্রতি গভীর প্রেমানুভূতি প্রকাশের রূপ পরিলক্ষিত হয়। গ্রামীণ পটভূমিতে নির্মিত সুভাষ দত্তের *সুতরাং* (১৯৬৪) চলচ্চিত্রে দ্বৈতকণ্ঠে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক প্রেমের গানে তা দৃষ্ট হয়। মোস্তাফা জামান আব্বাসী এবং ফেরদৌসী রহমানের কণ্ঠে, কবরী এবং সুভাষ দত্তের অভিনয়ে নিম্নোক্ত গানটি পরিবেশিত হয়।

জরিনা: নদী বাঁকা জানি চাঁদ বাঁকা জানি
তাহার চেয়ে আরো বাঁকা তোমার ছলনা
জব্বার: এই ছিল কি তোমার মনে গো ॥

দৃশ্যায়নে দেখা যায় যে, নদীর পার ধরে হেঁটে চলে জব্বার (সুভাষ দত্ত) এবং জরিনা (কবরী)। দুজনে পা দিয়ে নদীর জল নাড়ে। জব্বার অন্যদিকে তাকালে জরিনা দুষ্টুমির ছলে জব্বারের মুখে জল ছুড়ে মেরে দৌড়ে পালায়। জব্বার মুখের জল মুছে জরিনার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসে। জরিনা দু'হাতে শাড়ি উঁচু করে ধরে, জলের মাঝে গানের তালে তালে ছলাৎ ছলাৎ ভঙ্গিতে হেঁটে চলে। খান আতাউর রহমান পরিচালিত *অরুণ বরুণ কিরণ মালা* (১৯৬৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক প্রেমের গানে দুজনের পরিচয় বিনিময়ের সাথে সাথে মনের ভাব প্রকাশের বিষয়টি উঠে এসেছে অত্যন্ত সজহ সরল ভঙ্গিমায়–

নায়িকা: কোনবা দেশে থাকরে কুমার কোনবা দেশে ঘর
সাপুড়িয়ার বাড়ি আইলা মনে কি নাই ডররে মন পাগল
ও মন পাগল হইলো রে
নায়ক: আলমগীর নগরে আসিলাম শিকারে
মন যে আমার মাতাল হইলো দেখিয়া তোমারে রে মন পাগল ॥

আমাদের সমাজে নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে হৃদয় বৃত্তির একটা চিরায়ত পার্থক্য বিদ্যমান। নারীকে কোমল এবং পুরুষকে কঠিন রূপে বিবেচনা করা হয়। সে বিষয়টিও গানে গানে প্রকাশিত হয়েছে। নারীর অভিমতে–'তুমি তো বিদেশিরে নাগর নিঠুর শিকারি, পিরিতে মজাইয়া মন শেষে যাইবা ছাড়ি' 'নেপথ্যকণ্ঠ দিয়েছেন সৈয়দ আবদুল হাদী এবং সাবিনা ইয়াসমিন। চলচ্চিত্রে কবরী এবং আজিমের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। এই চলচ্চিত্রে আরেকটি প্রেমের গান। এই গানটিও দ্বৈতকণ্ঠে একই শিল্পী এবং দ্বৈতাভিনয়ে পরিবেশিত হয়। নায়িকা: অবেলাতে আমায় ডাইকো না ডাইকো না প্রাণ, নায়ক: দূরে দূরে তুমি থাইকো না থাইকো না প্রাণ।'

গ্রামীণ ও সামাজিক কাহিনি নির্ভর সি বি জামানের *উজান ভাটি* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি মনিরের (সুজন) কল্পনায় তার প্রিয় সোনাইকে ঘিরে আবর্তিত। চলচ্চিত্রে দেখা যায় মনির তার প্রেমিকা সোনাইকে (নবীনা) গ্রামে রেখে জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে শহরে যায় চাকরির সন্ধানে।

ষড়যন্ত্র করে সোনাইয়ের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ তৈরি হতে দেয় না। দীর্ঘদিন পর গ্রামে ফিরবে, তার প্রেমিকা সোনাইয়ের সান্নিধ্য পাবে, তারই প্রতীক্ষায় কল্পনার বিপুল বিস্তারণে গানে গানে সুখের স্বপ্ন রচিত হয় মনিরের মনে−

নায়িকা: এক নদীর এই উজান ভাটি আমরা দুটি ধারা
এক আকাশে জ্বলে ওঠা আমরা দুটি তারা
নায়ক: এক নদীর এই উজান ভাটি আমরা দুটি ধারা
এক আকাশে জ্বলে ওঠা আমরা দুটি তারা
নায়িকা: ও ও ও তুমি আমার আমি তোমার
প্রেমে পাগল পারা
নায়ক: তুমি আমার আমি তোমার
প্রেমে পাগল পারা ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় মনিরের শহরে আসার বছর শেষ হতে চলল। কিন্তু এখনো সে বন্ধক বাড়ি-ঘর ছাড়াতে পারেনি। তার হাতে পর্যাপ্ত টাকা নেই। এ নিয়ে ভীষণ মন খরাপ তার। আবার সোনাইয়ের মুখখানি তার মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে। তাকে কথা দিয়ে এসেছে বাড়ি ফিরে তাকে নিয়ে সুখের ঘর বাঁধবে। এসব কথা মনিরের মনে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। কিন্তু কি করবে সে ভেবে পায় না। মনিরের চিন্তিত মুখ দেখে মহাজন (প্রবীর মিত্র) জানতে চায় তার কি হয়েছে। মনিরের কথা শুনে মহাজন সানন্দে তার প্রয়োজনীয় টাকা দিয়ে দেয়। টাকা পেয়ে সে খুব আনন্দিত হয়। রাতে ঘুমানোর পূর্ব মুহূর্তে মহাজনের ব্যবহার এবং সুন্দর কথা তাকে মুগ্ধ করে। তারপর সুখের এমন সময়ে কল্পনার দু'চোখ বেয়ে চলে আসে সোনাই। দুজনে মিলে উপরোক্ত গানটি গায়। গানটি কল্পনার চোখে পরিবেশিত হলেও তা সুখ স্বপ্ন রচনার ইঙ্গিত প্রকাশ করে। মোস্তফা আনোয়ারের *আঁখি মিলন* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিতে অস্ফুট প্রেমের বহিঃপ্রকাশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যদিও দুজনের মাঝে প্রায়শ খুনশুটি লেগে থাকত। কিন্তু তার অন্তরালে ভালবাসাও ছিল। দুজনের খুনশুটিতে তারই রূপ ধরা পড়ে তার প্রকাশ ঘটে এভাবে−

নায়িকা: কথা বলব না বলেছি
শুনব না শুনেছি
মনে মনে চুপি চুপি
তোমারে ভালোবেসেছি
আমি তোমারে ভালোবেসেছি
বলব না বলেছি
নায়ক: কাছে আসব না এসেছি ডাকব না ডেকেছি
মনে মনে চুপি চুপি
তোমারে যে চেয়েছি
জানব না জেনেছি ॥

সাবিনা ইয়াসমিন এবং সৈয়দ আবদুল হাদীর কণ্ঠে, সুচরিতা এবং ইলিয়াস কাঞ্চনের অভিনয়ে পরিবেশিত হয় গানটি। চলচ্চিত্রে গানের পূর্ব মুহূর্তে দেখা যায় রানি (রানী) তার ছোট বোন আঁখিকে (সুচরিতা) বলে: 'জানিস কাল রাতে না সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখেছি। আঁখি জানতে চায় স্বপ্নের কথা। তখন বলে: দেখি মস্ত দরবেশ। ইয়া আলখাল্লা পড়া। আমাকে এসে আর্শীবাদ করছে। সুন্দর স্বপ্ন দেখেছিস বুবু, আঁখি বলে। তারপর হক মওলা বলতে বলতে সত্যি সত্যি একজন দরবেশ এসে হাজির হয়। রানির হাত দেখে বলে: এ দেখছি মহা ভাগ্যবতীর হাত। কয়েকদিন আগে তার ছেলে হয়েছে তার কথা বলে। স্বামী খুব ভালোলোক সে কথা বলে। রানি তার স্বামী সন্তানের জন্য দোয়া চায়। অপর দিকে তার ছোট বোন আঁখিকে বলে সে এক খানদাননী। মানুষের সাথে কেবল ঝগড়া করে। ওকে শাসন করতে হবে। নইলে অমঙ্গল হবে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে আঁখি। সে স্বভাবশত ভেংচি কাটে। রানি তার বোন আঁখিকে জোর করে হাত দেখাতে নিয়ে যায়। দরবেশ বলে: কী সাংঘাতিক এ মেয়েকে যে কোন ছেলে বিয়ে করবে না' ধ্যাত বলে হাত সরিয়ে নেয় এবং রাগ করে দূরে সরে যায় আঁখি। দরবেশ তাকে ডাকতে বলে যে সে দোয়া পড়ে ফুঁ দিয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আঁখি আসে বিড় বিড় করে দরবেশ ফুঁ দিতে যেয়ে তার গোঁফ খুলে যায়। খেয়াল করে আঁখি। মিলনের চেহারা বেরিয়ে আসে। অনেক কাজের কথা বলে দ্রুত চলে যেতে চায় মিলন। রানি বলে যে তার ছেলেকে দোয়া করে যেতে। দরবেশ চেয়ারে বসে হক মওলা হক, মওলা করতে থাকে। আঁখি এগিয়ে গিয়ে বলে: ...অনেক তেলেসমাতি জানেন দেখছি। দরবেশ বলে: হক মওলা। আঁখি বলে: চুপ মওলা। ... দাঁড়াও তোমার দরবেশী বের করছি।' বলে মাথার চুল খুলে ফেলে। দরবেশ বলে: 'এই খবরদার খবরদার...দরবেশের মাথার চুল আঁখির হাতে ঝুলতে থাকে। দৌড়ে পালাতে যেয়ে মিলন বাড়িতে রাখা কাদা, মাটি, গোবরের উপর পড়ে যায়। তারপর দেখা যায় আঁখি কুয়োর পানি ঢেলে মিলনের গা পরিষ্কার করে দেয়।

আঁখি বলে: 'শুনেছি স্ত্রীরা স্বামীর গোসলের পানি তুলে দেয়। কিন্তু আমি তোমার কে? যে তোমার পানি তুলে দেব? তুমিই বলো না যে তুমি আমার কে? হুম বলব, হুম বলো আঁখি বলে: বউ। তারপর মিলন কাছে গিয়ে দু'বাহু ধরে খুশিতে বলে: সত্যি আঁখি? হুম ঠেকা? বলে লজ্জায় দৌড়ে পালায়। পিছু পিছু ছুটে মিলন। আঁখি দৌড়াতে থাকে। দুজনের ছোটাছুটি এবং হাসিতে মুখরিত হয় সবুজ প্রান্তর। অবশেষে মিলন আঁখির কাছে যায় এবং হাত ধরে বলে: তুমি যা বললে তা কি সত্যি আঁখি? কেন ? এতদিনেও বুঝতে পারোনি। হ্যা পারি। সত্যি তুমি আমার বউ হবে? আঁখি বলে হুম। তারপর দুজনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। মিলন বলে: 'আঁখি' তারপর উপরোক্ত গানটি শুরু হয়।

গ্রাম বাংলার পটভূমিতে নির্মিত জহিরুল হকের *প্রাণ সজনী* (১৯৮৩) চলচ্চিত্র। এ চলচ্চিত্রে নিম্লোক্ত গানটি সাবিনা ইয়াসমিন এবং এন্ড্রুকিশোরের কণ্ঠে, অঞ্জু এবং ওয়াসিমের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। একে অপরকে কাছে পেয়ে জীবনের গভীরতম সুখ অনুভূত হয় তাদের। এ সুখ যেন ঘর ছাড়া করে দেয় একে অপরকে। দুজনের প্রেমানুভূতিতে তারই প্রকাশ–

নায়িকা: কী জাদু করিলা পিরিতি শিখাইলা
থাকিতে পারি না ঘরেতে প্রাণ সজনি
নায়ক: কি মন্ত্র পড়িলা ভাবেতে মজাইলা

থাকিতে পারি না ঘরেতে প্রাণ সজনি ॥

উপরোক্ত গানটিতে প্রেয়সীর রূপে মুগ্ধ প্রেমিকের বয়ান–'পড়ে গো ঢলিয়া হাসিয়া হাসিয়া, তোমারই মুখেতে পূর্ণ শশী।' প্রেমিক মনের ব্যাকুলতা সৃষ্টিকর্তা যেন দুজনকে দুজনের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। সে কথা ব্যক্ত হয় নায়কের গানে–'আমারও লাগিয়া নিরলে বসিয়া, তোমারে যতনে গড়িল বিধি' আবার নায়িকার অভিব্যক্তি: 'মরিব মরণে তোমারই বিহনে, তোমারে জীবনে না পাই যদি।' গান শেষে দেখা যায় ওয়াসিম অঞ্জুকে জড়িয়ে ধরে বলে: 'আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। আমি তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।' এ যেন গভীর ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ।

এফ কবীর চৌধুরীর *নরম গরম* (১৯৮৪) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি মধু (অঞ্জু) এবং সুজনের (জাভেদ) প্রেমের প্রাথমিক পর্যায়ের গান। চলচ্চিত্রে দেখা যায় সুজন বাঁশরিয়া তার হাতে বাঁশি এবং তার বাঁশির সুরে মুগ্ধ মধু। কিন্তু সুজন গরীব ঘরের ছেলে। তার বাড়িতে একমাত্র দাদি ছাড়া আর কেউ নেই। অপরদিকে মধু নায়েবের কন্যা। ফলে সুজনের মনে নানা সংশয় কাজ করে মধুকে পাওয়া-না পাওয়ার ব্যাপারে। দুজনের কথপোকথন থেকে এমনই জানা যায়। সুজন বলে: 'জানিস আমার ভয় হয়। কিসের? আমি গরীব ঘরের ছেলে। এক দাদি ছাড়া এই দুনিয়ায় কেউ নেই।' মধু বলে: আমি ? সুজন একটু হাসি হেসে বলে: 'তুই নায়েবের মেয়ে। তোর বাবা যদি আমাকে তোর জামাই হিসেবে পছন্দ না করেন। মধু সুজনকে আশ্বস্ত করে বলে: সুজন আমাদের দুজনের সম্পর্ক যদি পবিত্র হয়ে থাকে তাহলে সমস্ত বাঁধা বিপত্তি বালির বাঁধের মত ভেঙ্গে যাবে। সুজন অবাক হয়ে বলে ওঠে: মধু ! তারপর নিম্নোক্ত গানটি শুরু হয়–

নায়িকা: ওরে ও বাঁশিওয়ালা
আমারই মনের জ্বালা
সইতে আর পারি না ॥
হায়রে পিরিত মানে যন্ত্রণা

নায়ক: ওরে ও মধুবালা
তুমি যে গলার মালা
তোমায় ছাড়া বাঁচি না
হারে পিরিত মানে বাসনা
পিরিত মানে যন্ত্রণা ॥

নায়কের মনে সংশয়ের প্রকাশ: 'এই প্রেমের বলো হবে কি পরিণাম' তার উত্তরে মধু বলে: 'প্রেমের পরিণাম ভেবে কেউ প্রেম করে না।' এই চলচ্চিত্রে সুজন এবং মধুর অভিনয়ে পরিবেশিত দ্বৈতকণ্ঠে আরো একটি প্রেমের গান নিম্নে উল্লেখ করা হলো প্রেমের দ্বিতীয় পর্যায়ের গান এটি।

নায়িকা: এই নিশি রাইতে তোমার ঘরে যাইতে
মন যে উতাল পাথাল করে বধূয়া
নায়ক: এই নিশি রাইতে আরো কাছে পাইতে
মন যে উতাল পাথাল করে বধূয়া ॥

সাবিনা ইয়াসমিন ও সৈয়দ আবদুল হাদী, অঞ্জু ঘোষ এবং ওয়াসিমের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। গীতিকার মনিরুজ্জামান মনির, সুরকার আলম খান। আবদুস সামাদ খোকনের *ঝিনুক মালা* (১৯৮৫) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিতে প্রেমিক-প্রেমিকার মনের বাসনা ব্যক্ত হয়। নিজেদের নামের সাথে নানাবিধ উপমা ব্যবহৃত হওয়ার মধ্য দিয়ে। গানে গানে সহজ সরল ভঙ্গিমায় ভাবের যে বহিঃপ্রকাশ

তা প্রেমেরই রূপবাহী। চলচ্চিত্রে দেখা যায় একদিন মিজু আহমেদের কুদৃষ্টি পড়ে মালার (মুনালিসা)দিকে। জোরপূর্বক তার সাথে আপত্তিকর সম্পর্ক তৈরি করতে চায়। ঝিনুক (ফারুক) তার কুচক্রী নজর থেকে মালাকে রক্ষা করে। এর জন্য একদিন ঝিনুককে তার মহামূল্যবান বাউল চাচার দেয়া দোতারা হারাতে হয়। অর্থাৎ ঐ ঘটনার প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে মিজু তার দোতারা ভেঙ্গে দেয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মিজু আহমেদের দলবলকে ভীষণভাবে আহত করে ঝিনুক। অতঃপর ঝিনুক এবং মালার মাঝে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মালা একদিন কলসি কাখে জলের ঘাটে এলে ঝিনুক মিষ্টি মধুর আলাপনে নিষেধ করে জলে ডুব দিতে। গানে গানে তার প্রকাশ ঘটে এভাবে–

নায়ক: তুমি ডুব দিওনা জলে কন্যা
ঝিনুক খুঁজে পাইবা না
মুক্তা তাতে রইবে না
এই ঝিনুকের মাঝে তুমি
মুক্তা খুঁজে দেখ না
নায়িকা: তুমি আমার মনের পান সুপারি
ডাঙ্গায় তুমি থাইকো না
দূরে দূরে রাইখো না
ডাঙ্গার ঝিনুক জলে আইলে আর কিছু চাই না ॥

চিত্র-৩: *ঝিনুক মালা* (১৯৮৫) চলচ্চিত্রে 'তুমি ডুব দিওনা জলে কন্যা' গানের একটি স্থিরচিত্রে ফারুক।

উপরোক্ত গানটিতে মালার কলসি নিয়ে গোসল করাকে কেন্দ্র করে ভালবাসার সূচনা। প্রেম প্রস্তাবনার নানাবিধ কৌশল উপস্থাপিত গানে গানে। নায়িকা যখন নায়কের প্রেমে বিভোর তখন নায়কও তার মন যাচাই করে নেয় এভাবে: 'গায়ের লোকে যদি দেখে যদি দেখে, অপবাদের কালি সবাই দেবে মেখে' তার উত্তরে নায়িকা বলে: 'করি না ভয় লোকের কথায় তোমায় পেলে, ধরা দাও তুমি আমার আঁচল তলে।' উপরোক্ত গানটিতে নারীর চিরায়ত হৃদয় এবং গ্রাম বাংলার রূপ বিধৃত হয়; বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার নানাবিধ অনুষঙ্গ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। ঝিনুক যখন তার মালাকে কাছে পাওয়ার ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। তখন মালা তার জবাব দেয় এভাবে: 'বিয়ার আগে ডাইকো না গো ইশারাতে, আগে পাঠাও পালকি আমায় তুইলা নিতে।' আবার ঝিনুক বলে: শেরওয়ানি পরতে আমার গরম লাগে, জামাই হইয়া যাইতে আমার শরম লাগে।' আলমগীর পরিচালিত *নিষ্পাপ* (১৯৮৬)

চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি মিনা (চম্পা) এবং আরিফের (আলমগীর) প্রেমের প্রথম পর্যায়ের গান। দুজনের প্রেমানুভূতি প্রকাশে পরিবেশিত হয়–

নায়ক: হে হে হে হা হা হা
নায়িকা: হো হো হো হো হো হো
নায়ক: তুই যে আমার জানের জান
তুই যে আমার প্রাণের প্রাণ ॥
লাজ শরমের বালাই নাই
কান কথারও মুখে ছাই
আয় না সখী প্রাণ সজনি বুকের মাঝে আয় ॥

নায়িকা: ওরে আমার জানের জান
ওরে আমার প্রাণের প্রাণ
শরম ভরম নাইরে নাই
লাজে ভয়ে মরে যাই
পাগল সখা দারুণ রক্ষা
সামাল করা দায় ॥

দুজনের প্রেম-ভালোবাসাকে ঘিরে সমাজে নানা রকম গুঞ্জন তৈরি হয়। সেই লোকলজ্জা এবং আড়ষ্ঠতায় অস্ফুট রয়ে যেতে পারে দুজনের ভালোবাসা। উপরোক্ত গানটিতে দুজনের প্রেমালাপে তাই স্থান পেয়েছে। আবার এসব বাধা অতিক্রমে আরিফের গানে বলা হয়–'লাজ শরমের বালাই নাই, কান কথারও মুখে ছাই' বরং প্রেমে দুজন মত্ত হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে: 'আয় না সখী প্রাণ সজনি বুকের মাঝে আয়।' অপরপক্ষে নায়িকা অর্থাৎ মিনা তার নারী হৃদয় সে পুরুষের মত লাজ লজ্জা বিসর্জন দিতে পারে না। নায়ক যখন নায়িকাকে কাছে পেয়ে বেহুঁশ তখন নায়িকা বলে: 'শরম ভরম নাইরে নাই, লাজে ভয়ে মরে যাই, পাগল সখা দারুণ রক্ষা, সামাল করা দায়।' এই চলচ্চিত্রে আরো একটি প্রেমের গান; যা মূলত আরিফের কল্পনায় পরিবেশিত হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় ঘটনাচক্রে মোড়লের চক্রান্তে আরিফ জেলে যায়। মিনার বাবা মিনাকে মিথ্যে কথা বলে যে আরিফ মারা গেছে। তারপর তাকে জেলার জসিমের কাছে বিয়ে দেয়। কিন্তু জেল খানায় বসে আরিফ তার প্রেমিকাকে গভীর ভাবে স্মরণ করে এবং কল্পনায় তার অনুভূতি প্রকাশ পায় নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে–

নায়িকা: পিরিতের ছোট্ট ঘরে রাখিব আপন করে
বান্ধিয়া অন্তরে অন্তর
ও ও ও বান্ধিয়া অন্তরে অন্তর

নায়ক: পিরিতের ছোট্ট ঘরে রাখিব আপন করে
বান্ধিয়া অন্তরে অন্তর
ও ও ও বান্ধিয়া অন্তরে অন্তর ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় আরিফের নামে মিথ্যা খুনের সাক্ষী দেয় মিনার বাবা, গ্রামের মোড়ল। তারপর পাঁচ বছরের জেল হয় আরিফের। প্রবীণ কয়েদিরা তাকে নানাভাবে নির্যাতন করে। মাতৃহারা, সহায়, সম্বলহীন আরিফ এত কষ্টের পরও সে তার প্রেমিকা মিনাকে (চম্পা) ভুলতে পারে না। তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার কল্পনায় বিভোর থাকে। জেল খানায় তার প্রেমিকার সাথে সুখের জীবন গড়ার স্বপ্নে প্রহর গুণে। একে অপরকে ছাড়া যেন তাদের জীবন অচল এবং তার বয়ান প্রকাশিত হয় প্রকৃতির নানাবিধ

উপমা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। প্রেমিক কণ্ঠে ধ্বনিত হয়–'তোরে ছাড়া ফাগুন মাসে বৈশাখী ঝড় মনে হয়।' প্রেমিকের কাছে তার প্রেমিকা বেঁচে থাকার জীয়ন কাঠি প্রভৃতি কথার মধ্য দিয়ে আরিফের মনের কল্পনা প্রতিভাত হয়।

সাঈদুর রহমান সাঈদের *আলোমিত প্রেম কুমার* (১৯৮৯) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিতে দুজনের মনে প্রেম সঞ্চারণের অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। তৃষ্ণার্ত নায়ক জল খাইতে গিয়ে নায়িকার প্রেমে বিভোর এবং দুজন দুজনকে অবচেতনে ভালোবেসে ফেলে। তারই বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় গানে–

নায়ক: জল খাইতে গিয়েছিলাম দীন ভিখারির বাড়ি
কে যেন জল এনে দিলরে
ও সে মানুষ কিনা পরি রে
মন পাগল হলো তার লাগিয়া রে ॥

নায়িকা: জলের ছলে দুপুর কালে
আইলো কে মোর বাড়ি
যতন করে জল দিলাম তারে
ও জল গেল যে পড়িয়ারে
মন পাগল যে তার লাগিয়া রে ॥

নায়িকার অভিব্যক্তিতে প্রকাশমান–'যতন করে জল দিলাম তারে, ও জল গেল যে পড়িয়ারে, মন পাগল যে তার লাগিয়া রে ' গানের কথায় ব্যক্ত হয় 'জল পড়া' মানে যুবকের প্রেমে পড়ারই প্রতীকী রূপ যা জল পড়ার মাধ্যমে উপস্থাপিত। ইবনে মিজান *চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা* (১৯৮৪) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি শাহজাদি দিলরুবা (অঞ্জু) এবং শাহজাদা নওশাদের (ওয়াসিম) বিয়ের দিনক্ষণকে কেন্দ্র করে রচিত। তিন মাস পর তাদের বিয়ের ঘন্টাটি বাজবে। এখন কেবল অপেক্ষার পালা। এই সংবাদে দুজনের মনে অপেক্ষার বাধ ভেঙ্গে মিলনের ব্যাকুলতা তীব্র হয়। গানে গানে তারই প্রকাশ–

শাহজাদি: তিরিশ তিরিশ তিন তিরিশে
ওরে মাস যে হবে তিন খানা
এখন আমার দিন কাটে না এক খানা
শাহজাদা: তিরিশ তিরিশ তিন তিরিশে
ওরে মাস যে হবে তিন খানা
আমার তো দিন কাটে না এক খানা ॥

শেষ পর্যন্ত বাহাদুর হাতির সহযোগিতায় সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে যুদ্ধে জয়ী হয় দুজন। শাহজাদার পরিচয় জানতে চায় রাজা এবং আরাকান রাজ্যে খোঁজ নিতে বলে। পয়গম্বর যাবে আরাকান রাজ্যে। ফিরে আসতে সময় লাগবে তিন মাস। এই সময়ে দুজনকে প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে হবে। কিন্তু তাদের মন মানে না। উতলা মন ব্যাকুল হয় ক্ষণে ক্ষণে একে অপরকে কাছে পাওয়ার তীব্র বাসনায়।

১. বিরহ-বেদনার গান

প্রেম-বিরহ উভয়ের সর্বত্র পাশাপাশি পথচলা। প্রেমের অপর পিঠেই থাকে বিরহ। লোকজীবনে রয়েছে এমন বিরহ প্রেমের অনেক গান। গ্রাম বাংলার অত্যন্ত জনপ্রিয় যাত্রাপালা *রূপবান*। পরিচালক সালাহ্উদ্দিন *রূপবান* এর চলচ্চিত্রায়ণ করেন ১৯৬৫ সালে। এই লোককাহিনিচিত্রে রূপবানের দুঃখ-বেদনার জীবন গাথারই রূপ গানে গানে প্রতিফলিত হয়েছে। বিরহ-ই যেন রূপবানের একমাত্র সঙ্গী। এতে ২৬ টি গানের সন্ধান পাওয়া যায়।[৪] তন্মধ্যে শুধু একটি গানে রূপবানের যৌবনবতী হয়ে উঠার প্রসঙ্গ থাকলেও তা যেন অন্যান্য গানের মত একই সুরে ও গায়কিতে পবিবেশিত যা বিরহের আবেশেই আচ্ছন্ন। দাইমা যখন বলে: 'কিগো রূপবান শুধু খেললেই চলবে? লেখাপড়া করতে হবে না'? তখন রূপবান (সুজাতা) তার উত্তর দেয় গানে গানে–

কিসের লেখা কিসের পড়া গো
ও দাইমা কিছুই ভালো লাগে না
আমার দাইমা দাইমা গো

গভীর অরণ্য। বাঘ, ভাল্লুকের ভয়ে আতঙ্ক রূপবানের মন। ঘুমিয়ে আছে বার দিনের শিশু স্বামী রহিম। বনের ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে রহিমকে একলা রেখে রূপবান জল আনতে যাওয়ার জন্য কলসি কাখে নেয়। পেছন ফিরে ঘুমন্ত রহিমের মুখখানি দেখে গভীর বেদনায় কেঁদে ওঠে রূপবানের মন। গানে গানে তারই প্রকাশ–

প্রাণপতি আমি কোন বা প্রাণে তোমায় ছেড়ে যাই
এই দুখিনীরে মনোপ্রাণ তোমাকে করেছি দান
তুমি বিনে কে আছে আমার প্রাণপতি গো
আমি কোন বা প্রাণে তোমায় ছেড়ে যাই ॥

ওস্তাদজীর নির্দেশ ঘোড়ায় চড়ে এবং জরির জামা গায়ে পরে মক্তবে যেতে হবে। এ নিয়ে রহিম যখন চিন্তিত তখন তাজেল রহিমকে ডেকে বলে: 'তুমি আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি চলো আমি তোমাকে ঘোড়া কিনে দিব' রহিম বলে: 'তোমার ঘোড়া আমি নিব কেন? আমার দিদি আমাকে ঘোড়া কিনে দেবে' এই বলে রহিম চলে যায়। শোনো রহিম, শোনো রহিম বলে পেছন দিক থেকে ডাকে তাজেল। এই দৃশ্য দেখে রূপবানের মন বিচলিত হয়ে ওঠে। তাজেলকে উদ্দেশ্য করে তার গান–

শোনো তাজেল গো মন না জেনে প্রেমে মইজো না
আগে চিনিলে গো তারে পরে চিনলে পড়বে গো ফেরে
শেষে কাঁদলে দুঃখ যাবে না ॥
আমি করি বন্ধুর আশা তুমি তাজেল সর্বনাশা
এই জ্বালা আর প্রাণে সয় না ॥

শিশু রহিমকে নিয়ে বন বাদারে নানা সমস্যায় পড়ে রূপবান। বনের মাঝে বাস করে এক মাসি। তার কাছে থাকার পরামর্শ দেয় জংলী রাজা। রূপবানের ভরা যৌবন, শিশু রহিমের দুধ খাওয়ার খরচাদি ইত্যাদি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে মাসি । তাই রূপবানকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে রূপবান মাসি কে আশ্বস্ত করে বলে: 'আমার কাছে কিছু মোহর আছে'। শুনে মাসি বলে: 'মোহর বেশ মা

বেশ আমি গরীব কিনা তাই বলছিলাম। দাও মা ওকে আমার কোলে দাও।' এই বলে মাসি রহিমকে ঘরে নিয়ে যায়। রূপবান মনের দুঃখে গান গায়–

মনের দুঃখ তুইলারে বন্ধু রাইখাছি অন্তরেরে
তোমায় নিয়ে ঘুরিরে বন্ধু দেশে দেশান্তরে
নদীর কাছে কইলে দুঃখ জল যায় শুকাইয়া রে
আর বৃক্ষের কাছে কইলে দুঃখ পত্র যায় ঝরিয়া রে ॥

রহিম বলে: 'আচ্ছা দিদি তুমি আমাকে সব সময় চোখে চোখে রাখ কেন? আমিতো এখন বড় হয়েছি।' রূপবান: তাইতো আরো বেশি বেশি রাখি। রহিম: কেন? রূপবান: রাখিতো তোমাকে আমার কাছ থেকে কেউ যেন কেড়ে না নেয়। আমার মতো দুখী আর কেউ নেই দাদা। তুমি আমাকে দুঃখ দিওনা। রহিম: তুমি শুধু কাঁদো দিদি। আমার ভাল লাগে না। আমি খেলতে চললাম।' রহিম খেলতে চলে যায়। রূপবানের গান–

প্রাণ বন্ধুরে দুখিনীরে আর কাঁদাইও না
আমি করি বন্ধুর গো আশা
সে আশা হয় নিরাশা
এত জ্বালা আর প্রাণে সহে না ॥

মালির কাছ থেকে তাজেলের সঙ্গে রহিমের সম্পর্ক জেনে রাজা প্রজা পাঠিয়ে ধরে নিয়ে যায় রহিমকে। কারাগারে রহিমকে দঁড়ি দিয়ে বেঁধে রাজ জল্লাদ আর চাবুক দিয়ে একের পর আঘাত করতে থাকে। রহিম আ আ স্বরে চিৎকার করে। রহিম কোথায় আছে কি করছে এসবের সঠিক সন্ধান না জানলেও তার আর্ত চিৎকারে রূপবানের অন্তরাত্মা যেন ঠিকই কেঁদে ওঠে। যার কারণে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে রূপবান নিম্নোক্ত গানে–

দুঃখ যে মনের মাঝে হানিল আমায়
তারে নি ভালো রাখিবে খোদায় ॥

প্রসঙ্গত এদেশের চলচ্চিত্র, নাটক এবং যাত্রার পালার হাত ধরেই সূচনা লাভ করেছে। যার প্রমাণ মেলে প্রথমত সবাক চলচ্চিত্র আবদুল জব্বার খানের *মুখ ও মুখোশের* (১৯৫৬) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। এটি ছিল মূলত পরিচালক কর্তৃক রচিত নাটক এবং পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালে জনপ্রিয় যাত্রাপালা *রূপবান*-এর চিত্রায়ণ করেন সালাহ্উদ্দিন। *রূপবান* জনপ্রিয়তা লাভের পর উর্দু ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ হ্রাস পায়। এটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র মাধ্যমের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। বাংলা এবং উর্দু ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রের পরিসংখান থেকে তা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৫] নিম্নরূপ বাংলা ও উর্দু চলচ্চিত্রের তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

সারণি-১

ক্রম নং	চলচ্চিত্র মুক্তির সাল	মুক্তিপ্রাপ্ত মোট চলচ্চিত্রের সংখ্যা	বাংলা চলচ্চিত্র	উর্দু চলচ্চিত্র

			সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
১.	১৯৫৬	১	১	১০০%	০	০%
২.	১৯৫৯	৪	৩	৭৫%	১	২৫%
৩.	১৯৬০	২	২	১০০%	০	০%
৪.	১৯৬১	৪	৪	১০০%	০	০%
৫.	১৯৬২	৫	৪	৮০%	১	২০%
৬.	১৯৬৩	৫	২	৪০%	৩	৬০%
৭.	১৯৬৪	১৬	৮	৫০%	৮	৫০%
৮.	১৯৬৫	১১	৬	৫৫%	৫	৪৫%
৯.	১৯৬৬	২৬	১৪	৫৪%	১২	৪৬%
১০.	১৯৬৭	২৩	১৫	৬৫%	৮	৩৫%
১১.	১৯৬৮	৩৪	২৮	৮২%	৬	১৮%
১২.	১৯৬৯	৩৩	২৫	৭৬%	৮	২৪%
১৩.	১৯৭০	৪১	৩৯	৯৫%	২	৫%
১৪.	১৯৭১	৬	৬	১০০%		
১৫.	মোট	২১১	১৫৭	৭৪%	৫৪	২৬%

স্বাধীনতার পর অর্থাৎ ১৯৭২ সালে তিনটি মাত্র উর্দু চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছিল। এরপর আর কোনো উর্দু চলচ্চিত্র মুক্তি পায়নি। মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র তিনটি পাকিস্তানি পর্বে নির্মিত বলে জানা যায়।[৬] তবে ১৯৭৩ সালে উর্দু ভাষায় রূপকার নির্মিত *দেবর* নামক একটি চলচ্চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।[৭]১৯৭২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের ভাষাভিত্তিক সংখ্যা ও শতকার হারের তুলনা।

মোট চলচ্চিত্রের সংখ্যা	বাংলা চলচ্চিত্র		উর্দু চলচ্চিত্র	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
২৯	২৬	৯০%	৩	১০%

খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্ম-বিষয়ক আখ্যান-কাব্য প্রচলিত ছিল, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই প্রথম বাঙালির সামাজিক অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে। এই কারণে মঙ্গলকাব্যসমূহকে বাংলার মাটির সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।[৮] মধ্যযুগে বাঙালি বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, সাপ ও বাঘ ভীতি রাজরোষ ইত্যাদি নানাবিধ দুর্যোগ মোকাবেলা করেছে এদেশের মানুষ। যতই এ সব দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছেন ততোই তারা বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর আশ্রয় নিয়ে প্রতিকারের প্রার্থনা জানিয়েছে। ইহলৌকিক দেব দেবীর মাহাত্ম্য-কীর্তনকে উপলক্ষ্য করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশাল পরিমণ্ডলে এক শ্রেণির কাব্য গড়ে ওঠে। সাহিত্যের ইতিহাসে সেগুলো মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।[৯]

মঙ্গলকাব্যের ধারায় জহির রায়হানের *বেহুলা* (১৯৬৬) চলচ্চিত্র বাংলার চিরায়ত পৌরাণিক কাহিনির উপর নির্মিত। চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গান বেহুলার জীবনের এক করুণ চিত্র নির্মাণ করে। দৃশ্যায়নে দেখা যায় লখিনের (রাজ্জাক) বাবা চাঁদ সদাগর বেহুলাকে (সুচন্দা) বলছে: ‘তোমার মাথার সিঁদুর

মুছে ফেল। উত্তরে বেহুলা বলছে: 'আমি পারব না বাবা, পারব না' ছি, কাঁদিসনে মা। তাহলে ঐ চ্যাংমুরি কানী হাসবে। '...চ্যাংমুরি কানীর ঐ উচ্ছিষ্ট দেহ আমি জলে ভাসিয়ে দেব। জলে ভাসিয়ে দেব। না না না ভাসিয়ে দিওনা ভাসিয়ে দিওনা বাবা। ওকে ভাসিয়ে দিওনা। সেই নিয়ম। সেই প্রথা। অনেক সময় জলের গুণে মরাতো বেঁচে ওঠে। তাই আমি আমার লখিনকে জলে ভাসিয়ে দেব। তুই দেখে নে শেষ বারের মত। 'সময় সময় মরাও তো বাঁচে' বাঁচে ? হ্যা, তবে তাকে ভাসিয়ে দাও বাবা'। বাবার কথায় আশায় বুক বাঁধে বেহুলা। তারপর মনকে শক্ত করে বলে: 'আমি সেই সাবিত্রী। মা বলেছেন, বাবা আর্শীবাদ করেছেন। আমি ওর সঙ্গে ভেসে যাব। দূরে, বহু দূরে সেই অমৃতের দেশে। '...আমি তাকে ফিরিয়ে আনবই তুমি আয়োজন করো বাবা'। ভরা বর্ষায়, কলা গাছের ভেলায় ভাসিয়ে দেয়া হয় লখিনকে। স্বামী লখিনের নিথর দেহের পাশে বসে থাকে বেহুলা। বিয়ের সাজ এখনো মুছেনি। ঢেউয়ের দোলায় ভাসছে ভেলা। বিশাল জলরাশির উত্তাল তরঙ্গ, নদীর বাতাস, বেহুলার খোলা চুল। কি এক বেদনার্ত মুহূর্ত। গানের সুরে বেহুলার মনের বেদনা ধ্বনিত হয় যেন আকাশে বাতাসে।

কি সাপে দংশিল লক্ষাইরে
ও বিধি কি হইল ॥

চিত্র-৪: *বেহুলা* (১৯৬৬) চলচ্চিত্রে 'কি সাপে দংশিল লক্ষাইরে'
গানের একটি স্থিরচিত্রে সুচন্দা।

লোকসংগীতের জনপ্রিয় ধারার মধ্যে ভাওয়াইয়া অন্যতম। নিম্নোক্ত জনপ্রিয় ভাওয়াইয়া গানটি কাহিনির সূত্রধরে আমজাদ হোসেন পরিচালিত *বাল্যবন্ধু* (১৯৬৮) চলচ্চিত্রে বিরহ বেদনার চিত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে কাজের সন্ধানে ভোর সকালে বের হয় গাড়িয়াল। স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিঃসঙ্গ স্ত্রীর বেদনা দীর্ঘায়িত হয়। গাড়িয়ালের পথের পানে চেয়ে তারই বয়ান–

ও কি গাড়িয়াল ভাই
কত রবো আমি পন্থের দিকে চাইয়ারে
যেদিন গাড়িয়াল উজান যায়
নারীর মন মোর চুইরা রয় রে

প্রিয় বিরহ ক্লিষ্ট বিরহিনী আর কতকাল আশায় বুক বাঁধবে? এভাবে আর কতদিন একাকী কাটবে তার সময়। গাড়িয়ালের কথা ভেবে তার মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়। প্রসঙ্গত, গানটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র উন্মেষের আগে থেকেই শিল্পী আব্বাস উদ্দিন আহমেদের কণ্ঠে ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে রেকর্ড হয় এবং বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[১০] চলচ্চিত্রে নীনা হামিদ-এর কণ্ঠে পরিবেশিত গানটি হয় উপরোক্ত গানটি। এই গানের ব্যবহার শিবলী সাদিকের *নোলক* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রেও দেখা যায়। 'ও কি গাড়িয়াল ভাই, কতো রবো আমি পন্থের দিকে চাইয়া রে।' পুরুষতান্ত্রিক বাঙালি গ্রামীণ জীবনে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা তার পুরোটাই স্বামীকে ঘিরে। স্বামীই তার সব আশা ভরসা। সেই স্বামী যখন স্ত্রীকে ফেলে কাজের সন্ধানে দূর-দূরান্তে পাড়ি জমায়। তখন তার মন কোথাও স্থির হয় না। তার প্রমাণ মেলে একই চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত আরেকটি ভাওয়াইয়া গানের কথায়; যেখানে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর নির্ভরশীলতা, আস্থা এবং তার মায়া বটবৃক্ষের ছায়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সেই বেদনার আর্তি ফেরদৌসী রহমানের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় গানটিতে–

ও কি ও বন্ধু কাজল ভ্রমরারে
কোনদিন আসিবেন বন্ধু কইয়া যাওরে ॥

পোশাকি এবং ফ্যান্টাসি চলচ্চিত্রের ভিড়ে ১৯৭৮ সালে মুক্তি পায় শিবলি সাদিক পরিচালিত *নোলক* চলচ্চিত্র। গ্রামীণ পটভূমির এ কাহিনিচিত্রে গাড়িয়ালের পারিবারিক জীবনের টানাপোড়েন, যৌতুক প্রসঙ্গ অতঃপর সংসার ভেঙ্গে যাওয়া এবং নোলকের জীবন বিপন্ন হওয়ার নানা ঘটনার রূপ প্রতিফলিত হয়। নারী-হৃদয়ে অপার বেদনার পাশাপাশি পুরুষ-হৃদয়ও কাঁদে। নিম্নোক্ত গানগুলোর দিকে লক্ষ করলে তাই স্পষ্ট হয়। ১৯৭৮ সালে আব্দুল্লাহ আল মামুন শহীদুল্লাহ কায়সারের জনপ্রিয় উপন্যাস 'সারেং বৌ'-এর চলচ্চিত্রায়ণ করেন তাতে এক সারেং জীবনের মর্মকথা দৃষ্ট হয়। মনুয়া পাখিকে (প্রিয় স্ত্রী) দূরে রেখে দেশ দেশান্তরে নোঙ্গর ফেলার যে জীবন সেই জীবনেরই এক বেদনার্ত রূপ বিধৃত হয় গানটিতে–

ওরে নীল দরিয়া আমায় দেরে দে ছাড়িয়া
বন্দি হইয়া মনুয়া পাখি হায় রে কাঁন্দে রইয়া রইয়া ॥

চিত্র-৫: *সারেং বৌ* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে 'ওরে নীল দরিয়া আমায় দেরে দে ছাড়িয়া' গানের একটি স্থিরচিত্রে ফারুক।

গানের দৃশ্যায়নে দেখা যায় নায়কের (ফারুক) কল্পনার চোখ দরিয়ার বিশাল জলরাশির মাঝে নায়িকার (কবরী) মুখটি খুঁজে ফেরে। দুইয়ের মাঝে কি এক মিলের ঐকতান যা মিলনাকাঙ্ক্ষারই ইঙ্গিত বহন করে। নায়িকাও প্রিয়জনের কল্পনায় বিভোর। প্রিয়জনকে কাছে পাওয়ার বেদনায় ব্যাকুল হৃদয়। আবদুল জব্বারের কণ্ঠে পরিবেশিত গানটির গীতিকার মুকুল চৌধুরী, সুরকার আলম খান। গানের কথায় লোকগানের আবেশ থাকলেও সুরের ভিন্ন উপস্থাপনার কারণে তা আবার সীমানা ছাড়িয়ে অন্য সৌন্দর্যকে স্পর্শ করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সুরশৈলী সংক্রান্ত পঞ্চম অধ্যায়ে।

সারেং বৌ এর 'ওরে নীল দরিয়া' আর *নোলক* (১৯৭৮) এর প্রাণ পাখির 'বাওকুমটা বাতাস যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে' গান দুটিতে একই রকম বিরহ-বেদনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। ভাওয়াইয়া গানের দীঘল সুরের টানে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর পুঞ্জীভূত বেদনার কথা প্রকাশিত হয় গভীর মমতায়। উভয়েরই লক্ষ্য এক। একটি হলো অপার সমুদ্র অপরটি হলো দীর্ঘপথ। দুটোই জীবন-জীবিকার কঠিন বাস্তবতার সংগ্রামে ছুটে চলা। প্রিয় স্ত্রীকে ফেলে দূর-দূরান্তে পাড়ি জমানো। স্ত্রী যেমন স্বামীর পথপানের দিকে প্রতীক্ষার প্রহর গুণে। তেমনি স্বামীরও কোন কাজে মন স্থির হয় না, ক্ষণে ক্ষণে প্রিয় স্ত্রীর মুখখানি ভেসে ওঠে। নিম্নোক্ত গানটিতে আপাত দৃষ্টিতে চঞ্চলতা কিংবা খানিকটা আনন্দের প্রকাশ অনুভূত হলেও আসলে তা বেদনারই এক ভিন্ন রূপ তা দৃষ্ট হয় গানের শেষ দিকে। যেখানে বলা হয়–'ওরে সেও সোনা অবশেষে ঘরৎ বসি কাঁন্দে রে।' গানটির নেপথ্য কণ্ঠ শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়।

হুর হুর হট হট
বাওকুমটা বাতাস যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে
ওরে ওই মতন মোর গাড়ির চাকা পন্থে ঘুরে রে
ওকি গাড়িয়াল মুই চলং রাজপন্থে ॥

আমজাদ হোসেনের *সুন্দরী* (১৯৭৫) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি নিঃস্ব, রিক্ত কাঞ্চনের (ইলিয়াস কঞ্চন) সীমাহীন দুঃখ, কষ্ট আর স্নেহ ভালবাসাহীন জীবনের করুণ আর্তিতে পরিবেশিত হয়–

কি করে বলিব আমি আমার মনে বড় জ্বালা
কেউ কোনদিন আমারে তো কথা দিল না ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় পিতা-মাতাহীন কাঞ্চন সৎ ভাইয়ের সংসারে বেড়ে ওঠে। সংসারের প্রায় সব কাজ করার মধ্য দিয়ে জীবন কাটে তার। তবুও সে তার ভাই-ভাবিদের স্নেহ ভালবাসা পায় না। একদিন রাত করে বাড়ি ফিরলে অনেক ডাকা ডাকি করার পর কেউ দরজা খুলতে চায় না। অবশেষে তার ভাবি বিরক্তির সুরে ঘর থেকে বের হলেও তাকে খাবার দেয় না। বরং বলে দেয় আজ থেকে তার এ বাড়িতে খাবার বন্ধ। কান্না করে মনের দুঃখে কাঞ্চন লাঠিয়াল ইমান আলীর বাড়িতে যায়। ইমান আলী (জসিম) এবং তার মেয়ে সুন্দরী (ববিতা) তারা নিজেরা না খাইয়ে তাদের খাবার কাঞ্চনকে খেতে দেয়। ভাইদের প্রতি কাঞ্চনের অভিমান, কষ্ট মনে ভারি হয়ে ওঠে। সে তার সম্পত্তি

ভাইদের কাছ থেকে বুঝে নিতে চায়। ভাইয়েরা তাকে মেরে ক্ষত বিক্ষত করে এবং জানিয়ে দেয় তাকে কোন সম্পত্তি দেয়া হবে না। টাকার জন্যে নুরু (আনোয়ার হোসেন) এবং ইমান আলী (জসিম) সারা জীবন তালুকদারের (আরিফুল হক) নির্দেশে অন্যায় করেছে, মানুষ খুন করেছে। তারা এখন কাঞ্চনকে লাঠি খেলা শেখাতে চায়। বিশেষত তালুকদারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গড়ে তোলার আশায়, যা তারা কখনো করতে পারেনি। নিজেদের সেই স্বপ্ন পূরণ করতে চায় যোগ্য উত্তরসূরী তৈরি করার মধ্য দিয়ে। এই সংবাদ শুনে তালুকদারের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। সে কাঞ্চনের মেজ ভাইকে ডেকে কাঞ্চনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। এক রাতে তার মেজ ভাই তাকে হত্যা করতে গেলে কাঞ্চন প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে বেঁচে আসে। প্রাণে বাঁচলেও বাড়িতে তার জায়গা হয় না। বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এমনই পরিস্থিতির মধ্যে উপরোক্ত গানটি পরিবেশিত হয়। এই গানটি আবার সুন্দরীর অভিনয়ে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। কাঞ্চনের নিশ্চুপ নীরবতার প্রতি ক্ষুদ্ধ এবং মনোবেদনার রূপ নির্ণয়ে। আবদুল লতীফ বাচ্চুর *যাদুর বাঁশি* (১৯৭৭) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি মৃত্যু শয্যায় শায়িত এক নিভু নিভু প্রাণের গভীর আকুতিতে প্রকাশ পায়। একে অপরকে ছাড়া জীবন যেন মিছে। তারই বয়ান গানে–

আকাশ বিনা চাঁদ হাসিতে পারে না
জাদুবিনা পাখি তেমন বাঁচিতে পারে না
জাদু পাখি এক দুজনা
ওরে জাদু তোরে ছাড়া জীবনে কিছুই চাহি না ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় জাদুর (অপু সারওয়ার) সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মহাজনের মেয়ে পাখির (সুচরিতা) সাথে। পাখির বাবা জাদুর সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি নয়। অবশেষে দুজনে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় হঠাৎ জাদুর ভাইয়ের সামনে পড়ে তারা। অতঃপর তার ভাইয়ের সহায়তায় বিয়ে করে শহরে পালিয়ে যায়। শহরে গিয়ে হঠাৎ দূরারোগ্য ব্যধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় জাদু। ডাক্তার ইউসুফের (বুলবুল আহমেদ) সহায়তায় জাদু হাসপাতালে ভর্তি হয়। পাখি তার স্বামীর দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ার কথা জেনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে এবং ডাক্তারকে বলে: 'একি কইলেন ডাক্তার সাব! ডাক্তার তাকে আশ্বস্ত করে বলে: 'না তোমার জাদুকে আমি মরতে দেব না।' কিন্তু জাদুকে বাঁচতে হলে যে অনেক টাকার দরকার!'

অপরদিকে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে জাদু। পাখির কাছ থেকে শোনা প্রিয় সেই গানটির কথা মনে পড়ে তার। কল্পনার চোখে হাসপাতালের দরজার এসে দাঁড়ায় তার পাখি। জাদু বলে: 'পাখি তোর ঐ গানটা বুঝি আমার আর শোনা হইব না।' জাদুর মুখচ্ছবি জুম আউট হয়ে বাঁশির বিগ ক্লোজ আপ হয়। মিউজিক বাজে তারপর কল্পনার চোখে উপরোক্ত গানটি শুরু হয়। এক বেদনার্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আমজাদ হোসেনের *দুই পয়সার আলতা* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি কাজলের (রাজ্জাক) অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। প্রিয় মানুষকে আপন করে কাছে না পাওয়ার যে অপারগতা তারই বেদনায়–

এমন তো প্রেম হয় চোখের জলে কথা কয়

নিজে নিজে জ্বলে পুড়ে
পাষাণে বাঁধে যে হৃদয় ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় কুসুম ছোট বেলায় মাকে হারিয়েছে তারপর বাবা। চাচা-চাচির সংসারে মানুষ হয় সে। দিনে দিনে চাচির কাছে বোঝা হয়ে ওঠে সে। বিয়ের কাজ আসে কিন্তু যৌতুকের কারণে তার বিয়ে ভেঙ্গে যায়। এ নিয়ে তার চাচি অলক্ষী বাবা-মায়ের মাথা খেয়েছিস বলে গালিগালাজ করে এবং শারীরিকভাবেও তার উপর চরম অত্যাচার করা হয়। এমতাবস্থায় রাতের অন্ধকারে কাজল কুসুমের সাথে জানালা দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু কুসুম ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে কোন জবাব দেয় না। তারপর কাজলের বেদনায় উপরোক্ত গানটি পরিবেশিত হয়। আবার ঘটনাচক্রে ঝরনার (নূতন) সাথে যখন কাজলের বিয়ে হয় তখনও এই গানটি বেদনার অন্যতম অনুরণনে বেজে ওঠে নারীর হৃদয়ে। এই চলচ্চিত্রে কুসুমের (শাবানা) অভিনয়ে পরিবেশিত হয় আরো একটি গান যা বেদনার অপার জগৎ তৈরি করে–

এই দুনিয়া এখন তো আর সেই দুনিয়া নাই
মানুষ নামের মানুষ আছে দুনিয়া বোঝাই ॥

যৌতুক দিতে না পরার কারণে যখন কুসুমের বিয়ে বার বার ভেঙ্গে যাচ্ছিল। তখন বছর বছর বিয়া করে আর বউকে পিটিয়ে মারে অন্তর আলীর সাথে কুসুমের বড় চাচির প্ররোচনায় তার বিয়ে ঠিক হয়। গুনাই (প্রবীর মিত্র) লাল চাচির (আনোয়ারা) পা ধরে মিনতি করে বলে: 'লাল চাচি গো এই অন্যায়টা কইরো না।...লোকটা খারাপ। বউ পিটাইয়া মারে। এই বিয়াটা ভাইঙ্গা দাও।' কুসুমকে যাত্রার জোকার সাজিয়ে লাল চাচি বিয়ে ভেঙ্গে দেয়। কিন্তু লাল চাচির জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। সে রাতে স্বামী অর্থাৎ কুসুমের চাচা তার উপর চরম শারীরিক নির্যাতন করে। চরম অশান্তির ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয় কুসুমের জীবন।

চিত্র-৬: *দুই পয়সার আলতা* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে 'এই দুনিয়া এখন তো আর '
গানের একটি স্থিরচিত্রে শাবানা।

একদিন দেখা যায় কুসুমের গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। সমস্ত গা যেন পুড়ে যাচ্ছে তার। পানি তৃষ্ণায় কাতরায়কুসুম। লাল চাচির কাছে গেলে সেও ফিরিয়ে দেয় চাপা ক্ষোভ আর অপমানের কারণে। এক গ্লাস পানি খাওয়ার জন্য সে রাতের আঁধারে জ্বর নিয়ে তার প্রেমিক কাজলের (রাজ্জাক) বাড়িতে যায়। জানালা দিয়ে তাকে ডাকে। কাজল প্রথমে ইতস্ততবোধ করে। বাবার ভয়ে ঘর থেকে বেরুতে

চায় না। কিন্তু কুসুম পানি খেতে চাইলে বের হয়ে এসে তাকে পানি খাওয়ায়। তারপর কাজল তাকে দ্রুত ফিরে যেতে বলে। কুসুম প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় তার পাহাড় সম কষ্ট আর বেদনায় চৌচির হয় হৃদয়। উপরোক্ত গানটি সেই বেদনারই রূপায়ণ করে। নকল মানুষের ভিড়ে আসল মানুষের রূপ বদলে যায়; সে তার ভালাবাসাকে সাহস করে আদায় করতে অসমর্থ হয়। তারই বয়ান–'এই মানুষের ভিড়ে আমার সেই মানুষ নাই। গানে ব্যক্ত হয়েছে তার জীবনের অপার বেদনা–'মাটির দেহ খাইলো ঘুণে দেখল না তো কেউ, সারা জীবন দুই নয়নে রইলো জলের ঢেউ।' কাজলের কাছ থেকেও ভালবাসার সদুত্তর পায়নি। তার রিক্ত নিঃস্ব একাকী কষ্টের আর্তি–'আমার মনের বাগান রইলো খালি সেই বাগানের সুজন মালি বলো কোথায় পাই।' গানটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরুস্কার লাভ করে।[১১]

বাঙালি গ্রামীণ জীবন-সংসারে নারীর জীবন পুরোটা তার স্বামী কিংবা প্রেমিকের উপর নির্ভর করে অতিবাহিত হয়। ফলত জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে প্রিয়জনকে ফেলে পাড়ি জমাতে হয় দূর দূরান্তে। এমন পরিবেশ পরিস্থিতিতে প্রেমিকা বা স্ত্রী হয় পাগল পারা। কোথাও তার মন স্থির হয় না কেবল প্রতিনিয়ত ছটফট করে তার প্রাণ বন্ধুর জন্য এবং প্রিয়জন ছাড়া তার জীবন যেন বেদনার অকূল পাথার সম। সি বি জামান নির্মিত *উজান ভাটি* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে তারই রূপায়ণ লক্ষ করা যায় নিম্নোক্ত গানে–

বিদেশ গিয়া বন্ধু তুমি আমায় ভুইল না
চিঠি দিও পত্র দিও জানাইয়ো ঠিকানা
পানি হইলে বন্ধু আমি যাইতাম তোমার সঙ্গে
মনের কথা কইতাম রে হায় নদীর তরঙ্গে ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় মনির (সুজন) এবং সোনাই একে (নবীনা) অপরকে ভালবাসে। মনির গরীর ঘরের ছেলে। তার ভিটে বাড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু সেই ভিটে বাড়ি ঘটনাচক্রান্তে বন্ধক থাকে কুরবান সিকদারের কাছে। অপরপক্ষে সোনাই সিকদার বাড়ির মেয়ে তার বাবা অনেক সহায় সম্পত্তির মালিক। সোনাইয়ের সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় শহরে গিয়ে চাকরি করতে চায় মনির। সোনাইকে সে আশ্বস্ত করে বলে: 'আমার গতর খাটিয়ে রোজগার করব।' মনির ঠিক করে কালই সে শহরে যাবে। সে তার ছোট ভাই ছানু এবং সঙ্গী কিরমুর (দিলদার) কাছ থেকে বিদায় নেয়। ওদেরকে বলে সোনাই কে যেন তারা দেখে রাখে। দূরে দাঁড়িয়ে থাকে সোনাই। মনির কাছে গেলে তার হাতে খাবার তুলে দিয়ে বলে: রাস্তায় খাইয়ো।' অঝোরে কান্না করে সোনাই। মনির নৌকায় ওঠে। পাল তোলা নৌকা। বৌঠার ক্লোজ থেকে জুম আউট হয়ে লং শটে পরিণত হয়। পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে সোনাই। তার কেবল অপলক দৃষ্টি প্রাণ বন্ধু মনিরের নৌকার পানে। তারপর উপরোক্ত গানটি গেয়ে চলে।

গানটিতে নারী হৃদয়ে বেদনার এক করুণ চিত্র রচিত হয়। বিয়ে করা স্ত্রী হলে স্বামীর সঙ্গে যেতে পারতো। সুখ-দুঃখে এক সাথে থাকতে পারতো। তা ব্যক্ত হয়: 'পাণি হইলে বন্ধু আমি যাইতাম তোমার সঙ্গে, মনের কথা কাইতাম রে হায় নদীর তরঙ্গে।' আবার প্রেমিকের জন্য তার অপেক্ষার প্রতিশ্রুতি, বিশেষ অনুরোধ শহরের চাকচিক্য পরিবেশে যেন তাকে কষ্ট না দেয়া হয়। তার

মিনতি–'অবলারও সরল প্রাণে দাগা দিও না।' প্রসঙ্গত, তথ্যপ্রযুক্তির আবির্ভাবে বর্তমানে চিঠির প্রচলন নেই বললেই চলে। কিন্তু বর্ণিত গানের মাধ্যমে তার আবেদন রয়ে যায়। এতদ্‌বিষয়ে আরো গানের আলোচনা রয়েছে এই অধ্যায়ের চিঠি-পত্রে প্রেম-বিরহের গান প্রসঙ্গে। এছাড়া সমসাময়িককালে নির্মিত রাজ্জাকের *বদনাম* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে–'হয় যদি বদনাম হোক আরো, আমি তো এখন আর নই কারো' আখতারুজ্জামানের *প্রিন্সেস টিনা খান* (১৯৮৪) চলচ্চিত্রে–'আমি চিরকাল প্রেমের কাঙাল, যে ডালে বান্ধি বাসা ভাঙে সেই ডাল, আমার এমনই কপাল, হায়রে এমনই কপাল' বেলাল আহমেদের *নয়নের আলো* (১৯৮৪) চলচ্চিত্রে 'আমার সারা দেহ খেও গো মাটি, এই চোখ দুটো মাটি খেওনা' প্রভৃতি গানে বিরহ-বেদনার চিত্র বিধৃত হয়েছে।

আবদুস সামাদ খোকনের *ঝিনুক মালা* (১৯৮৫) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিতেও জীবনের এক চরম অপ্রাপ্তি আর অপার বেদনা যেন কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় স্কুল ছুটির ঘন্টা বাজে এরপর শুরু হয় ছেলে-মেয়েদের বাড়ি যাওয়ার ছুটোছুটি। বাউল সুজন (প্রবীর মিত্র) নদীর পাড় ধরে দোতারা বাজিয়ে গানটি গেয়ে চলে; যা সহজিয়া বাউল হৃদয়েরই বহিঃপ্রকাশ যেন। গ্রামের মেঠোপথ ধরে গান গেয়ে চলেছে সে। এটাও বাংলার চিরায়ত রূপ। এ গান যেন কোনদিন শেষ হবার নয়। অনন্তকালের সুর যেন তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়–

চোখের জলে আমি ভেসে চলেছি
পথের দেখায় আমি পথে নেমেছি
হায়রে মনের আশা আজও মেটেনি
হায়রে সুখের কলি আজও ফোটেনি ॥

একই চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিতেও প্রিয়জনের বিদায়কে ঘিরে প্রিয়তমার হৃদয়ে গভীর বেদনা প্রলম্বিত হয়। জীবন বাস্তবতার কঠিন নিয়মে প্রেমিক যখন তার প্রেমিকাকে রেখে দূর পরবাসে পাড়ি জমায় তখন প্রেমিকার মন এভাবেই কেঁদে মরে–

নায়িকা: ওরে আমার প্রাণের বুলবুল তোমায় ছাড়ি কেমনে
বিদায় দিতে আমার মনে জ্বলে আগুন জ্বলেরে
নায়ক: শোন আমার প্রাণের ময়না
যাইবার বেলা কাইন্দ না
চোখের পানি দেখলে ওগো
আমার যাওয়া হইবো না
তুমি আর কাইন্দনা ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় সৎ মা আর ভাইয়ের সংসারে বড় হয় জাহানারা (সুচন্দা)। সহায় সম্বলহীন এতিম সুজন (প্রবীর মিত্র) যার ভিটে বাড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। বাউল জীবন তার। সারাদিন মাঠে-ঘাটে গান গেয়ে বেড়ায়। জাহানারা এবং সুজন একে অপরকে ভালবাসে। কিন্তু দু'জনের ভালবাসা মেনে নিতে চায় না জাহানারার সৎ মা; সুজনকে বিয়ে করলে সহায় সম্পত্তির অংশীদার হবে তার আশঙ্কায়। সুজন জাহানারাকে ছাড়া বেঁচে থাকা কল্পনা করতে পারে না। জাহানারার সৎ ভাই কৌশলে সুজনকে শহরে পাঠানোর কথা বলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশায়। সুজন শহরে যাবার জন্য

বিদায় নেয় জাহানারার কাছ থেকে। জাহানার মন কিছুতেই সায় দেয় না। তবু জীবনের কঠিন বাস্তবতায় তাকে রাজি হতে হয়। সুজনকে বিদায় দেয়ার কালে জাহানারার মনোবেদনা প্রকাশিত হয় উপরোক্ত গানের মাধ্যমে।

চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত *শুভদা* (১৯৮৬) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানে প্রিয়জন হারানোর বেদনার আর্তি মর্মে মর্মে ধ্বনিত হয়। নদী ভাঙ্গনের ন্যায় প্রেমিকের বুকটা যেন ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়। নিম্নোক্ত গানে সেই বেদনারই প্রকাশ। চলচ্চিত্রে দেখা যায়, সদানন্দ (রাজ্জাক) এবং তার বন্ধু সারদা (সাত্তার) নদীর পাড়ে বসে আছে। নদীতে ডুবে থাকা নৌকার ছাউনি দেখিয়ে সারদা বলেঃ ‘ওই যে ওখানে ললনা ডুবে মরেছে’ সদানন্দ বলেঃ ‘কি করে জানলে ? তার পরনের শাড়ি পাওয়া গিয়েছিল ওখানে। তারপর সদানন্দ নৌকার ছাউনির কাছে এগিয়ে যায়। পেছনে পেছনে পা ফেলে সারদা। সদানন্দের কান্নার শট, নৌকার ডুবে থাকা ছাউনির শট। সদানন্দ ধীরে ধীরে নামে জলে। অপলক দৃষ্টিতে ছাউনির কাছে যায়। তারপর শাড়িটি দু’হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। আবহসংগীতে ঢাক-কাশির বাদ্যে বাজে পূজার বাজনা। নিচ থেকে মাটি তুলে আনে সদানন্দ। সারদা বলেঃ ‘কি করবে ? দু’হাতে ভেজা মাটি মাখিয়ে বলে শিব গড়ব। তারপর হাতে থাকা মাটি ছুড়ে মারে দূরে। শুরু হয় নিমোক্ত গান–মুখোমুখি

হায়রে অবুঝ নদীর দুই কিনার
না যায় দূরে না পায় কাছে
মুখোমুখি চেয়ে আছে অন্তর দুজনার ॥

যাকে কোনদিন ভালবাসার কথা বলা হয়নি অথচ সেই মানুষটির মৃত্যু সংবাদে সদানন্দের হৃদয় প্রবলভাবে কেঁদে ওঠে। নদীর প্রবল স্রোত, পার ভাঙ্গনের চিত্রায়ণ তা যেন সদানন্দের হৃদয়-বেদনারই প্রতীকী রূপ। অবিরাম স্রোতধারার করাল গ্রাসে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া। লং শটে নদীর বিশালতার চিত্র ধারণ করা হয়েছে, তাতে করে প্রকৃতির অসীম শক্তির কাছে মানুষ যে কত ক্ষুদ্র, অসহায় সে কথাও যেন চিরসত্য হয়ে নাড়া দেয়।

আজিজুর রহমানের *রঙিন কাঞ্চন মালায়* (১৯৮৮) চলচ্চিত্রের গানেও পিতা-মাতাহীন কিশোরী শাহজাদি কাঞ্চনমালার বেদনা প্রতিফলিত হয়। এ চলচ্চিত্রে ১৪ টি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৭ টি গানে কাঞ্চনমালার বিরহ-বেদনায় উপস্থাপিত। সহায় সম্পত্তির লোভে দ্বিতীয় স্ত্রী বাদশাকে হত্যা করে। বাদশার একমাত্র কিশোরী মাতৃহীন কাঞ্চনমালা সৎ মায়ের কাছে নানান চক্রান্তের শিকার হয়। এতিম অসহায় কিশোরী প্রতিনিয়ত সৎ মায়ের অত্যাচারে প্রচণ্ড মর্মাহত হয়। রুনা লায়লার কণ্ঠে সেই বেদনার করুণ রূপ চিত্রায়িত হয়–‘কি করিব কোথায় যাব, দুঃখে প্রাণ যায় যায় রে।’ চলচ্চিত্রে দেখা যায় সিপাহশালা ইমদাদ খাঁ জমিদারি দখল করতে চায়। তাই সে বাদশার দুশ্চরিত্রা দ্বিতীয় স্ত্রী দৌলতুন্নেসাকে দিয়ে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে বাদশাহকে। তারপর শুরু হয় বাদশার একমাত্র কিশোরী কন্যা শাহজাদি কাঞ্চনমালার উপর চরম নির্যাতন।

তাকেও বিষ পানে হত্যা করে গাছের নিচে ফেলে দিতে বলে সৈনিককে। সিপাহশালার আদেশ পালন করে সৈনিক। মৃত কাঞ্চনমালাকে গাছের নিচে ফেলে রাখতে গিয়ে দেখে সে মরেনি। আবার হত্যা

করতে চাইলে কিশোরী শাহজাদি এক সময় সৈনিককে বাবা বলে সম্বোধন করে। বাবা বলে ডাকায় এবং কাঞ্চনমালার পরনে স্বর্ণালংকারের লোভে সৈনিক তার কাছে উল্টো ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাকে রেখে চলে যায়। এমতাবস্থায় আশ্রয়হীন কাঞ্চনমালা বনে বাদারে ঘুরে বেড়ায়। সেই বেদনার রূপ ধ্বনিত হয় –'মা হারালাম বাপ হারালাম, আপনজনা কোথায় পাই, পশু পঙ্খীর বাসা আছে হায়রে আমার কিছু নাই।' কাঞ্চনমালার গানের সাথে দূর থেকে পুরুষের কণ্ঠে আশাবাদের কথা ভেসে আসে–'ও তোর কোন চিন্তা নাইরে কোন চিন্তা নাই'...ও তুই পাবি সুখের ঠাঁই রে' যা বিবেকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তোজাম্মেল হক বকুলের *বেদের মেয়ে জোসনা* (১৯৮৯) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গান বিশেষভাবে খ্যাত মুজিব পরদেশীর কণ্ঠে এবং ইলিয়াস কাঞ্চনের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। ঘটনাচক্রান্তে কারাগারে যেতে হয় খুনীর অপরাধে শাহজাদাকে (ইলিয়াস কাঞ্চন)। কারাগারের কষ্টে, দুঃখে, যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে গানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তার বেদনা–

মা আমি বন্দি কারাগারে
আছি গো মা বিপদে বাইরের আলো চোখে পড়ে না ॥

এ কথা স্বীকার্য যে, উপরোক্ত গানটি চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হওয়ার পূর্বেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ ধারণা অমূলক নয় যে, জনপ্রিয়তার সূত্র ধরেই তা চলচ্চিত্রে স্থান করে নেয়। প্রসঙ্গত, ১৯৮৯ সালে সামাজিক পোশাকি, লোকগাথা ভিত্তিক এবং কুংফু কারাতে ছবির প্রাধান্য ছিল বেশি। তারমধ্যে এটি ছিল অন্যতম ব্যবসায়িক ছবি।

৩. অভিমানের গান

প্রেম, বিরহ-বিচ্ছেদ, অভিমান একে অপরের পরিপূরক। যেখানে প্রেম আছে সেখানে অভিমানেরও সরব উপস্থিতি লক্ষণীয়। প্রেম-ভালবাসার দৃঢ়তা বাড়িয়ে তুলতে অভিমান কখনো কখনো বিশেষ ভূমিকা পালন করে। চলচ্চিত্রের কাহিনি জুড়ে মান-অভিমানের প্রসঙ্গ রয়েছে অনেক গানে। আলমগীর পরিচালিত *নিষ্পাপ* (১৯৮৬) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিতে আরিফের (আলমগীর) অভিমান ভাঙ্গাতে মিনার (চম্পা) প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় মিনা এবং আরিফ একে অপরকে ভীষণ ভালাবাসে। মিনার বাবা গ্রামের মোড়ল। নানা অন্যায় অবিচারের সঙ্গে জড়িত। আরিফ গরীব ঘরের ছেলে একমাত্র মাকে নিয়ে তার সংসার। একদিন আরিফ মোড়লের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে এ নিয়ে মিনা তার বাবার রোষানলে পড়ে। এক সময় দেখা যায় আরিফ মন খারাপ করে। আরিফের কাছে গিয়ে মিনা বলে: 'আচ্ছা বল্‌তো? ক্যান তুই বাবার সাথে ঝগড়া করতে গেলি? এমনি তে বাবা তোকে দেখতে পারে না।...তোর ঘরে বউ হওয়া আমার ভাগ্যে নেই।' এ নিয়ে দুজনের সাথে তর্ক-বির্তক হয়। আরিফের কথা হলো মিনাকে ভালবাসে বলে তার বাবার সব অন্যায় সে সহ্য করতে রাজি নয়। এ নিয়ে দুজনের মাঝে মনোমানিল্য হয়। এক সময় রাগ হয়ে মিনাকে আরিফ বলে: 'তোর যদি তোর বাবার প্রতি এতোই টান থাকে, তবে যা তুই তোর বাবাকে নিয়ে থাক। আমার কাছে আসার তোর দরকার নেই।' রাগ হয়ে মিনাকে যেতে বলে আরিফ। কিন্তু মিনা আরিফকে ছেড়ে যাবে না। অবশেষে একাই চলে যায়। আরিফের রাগ ভাঙ্গাতে মিনা শুরু করে নিম্নোক্ত গান–

তুই যে আমার মিলন মালারে বন্ধু পিরিতের

নকশি সুতায় গেঁথে রাখি
কান্দে পরান ভাসে দু'নয়ন প্রাণ সজনি
দমে দমে তোরে ডাকি
হায় গো দমে দমে তোরে ডাকি ॥

আশির দশকে লোককাহিনিভিত্তক বা রূপকথাভিত্তক চলচ্চিত্র নির্মাণের নবতর সূচনা হয়। এই সময়কালের সবচেয়ে আলোচিত গ্রাম বাংলার প্রচলিত লোককাহিনি *বেদের মেয়ে জোস্না*র (১৯৮৯) চলচ্চিত্রায়ণ করেন তোজাম্মেল হক বকুল। এই ছবির প্রতিটি গান ব্যাপক দর্শক প্রিয়তা অর্জন করে। তন্মধ্যে এন্ড্রুকিশোর এবং রুনা লায়লার কণ্ঠের নিম্নোক্ত গানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যা ইলিয়াস কাঞ্চন এবং অঞ্জুর অভিনয়ে পরিবেশিত হয় অভিমানের গান হিসেবে–

বেদের মেয়ে জোস্না আমায় কথা দিয়েছে
আসি আসি বলে জোস্না ফাঁকি দিয়েছে ॥

চিত্র-৭: *বেদের মেয়ে জোস্না* (১৯৮৯) চলচ্চিত্রে 'বেদের মেয়ে জোস্না আমায় কথা দিয়েছে' গানের একটি স্থিরচিত্রে ইলিয়াস কাঞ্চন এবং অঞ্জু ঘোষ।

বিশেষত গ্রামীণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর বাড়ির বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা প্রকট। গানেও তা ব্যক্ত হয়েছে–'দাদারে-দাদিরে আমি কি দিয়ে বোঝাই, কাঞ্চের কলসি নিয়ে আমি প্রেম যমুনায় যাই' যার দরুন প্রেমিকার (অঞ্জু) আসতে দেরি হয়। এতে প্রেমিক (ইলিয়াস কাঞ্চন) হৃদয় তার প্রিয় মানুষটিকে কাছে না পাওয়ার ব্যাকুলতায় ছটফট করতে থাকে এবং তার মনে অভিমান জন্ম নেয়। গানটিতেও সে কথা উঠে এসেছে অত্যন্ত সাবলীলভাবে, ছন্দময় রূপে। সহজ সরল ভাষায় দ্বৈতকণ্ঠের উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক গানের মাধ্যমে এবং অভিমান দীর্ঘায়িত হওয়ার আগেই তা মীমাংসাতে পরিণত হয়। তা দৃষ্ট হয় গানের শেষে যেখানে নায়ক বলে: 'এসব কথা রেখে তুমি আমায় করো বিয়া, আবার দুজনে মিলে বলে: 'চলো চলো চলো বন্ধু ঘরে ফিরে যাই, দাদা আর দাদিরে গিয়ে নিরালায় বোঝাই।' গীতিকার তোজাম্মেল হক বকুল, সুরকার আবু তাহের। কণ্ঠশিল্পী এন্ড্রুকিশোর এবং রুনা লায়লা।

গানের সুর, ছন্দ, তালে, কম্পোজিশনও লোকজ আবহ এবং বাংলার অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকবাদ্য বাঁশি, দোতরা এবং বেদে সম্প্রদায়ের সাপের খেলা দেখানোর বাঁশিও ব্যবহার করা হয়েছে। নায়কের (ইলিয়াস) হাতে বাঁশি এবং নায়িকার (অঞ্জু) কাঞ্চের কলসি যা গ্রাম বাংলার বিশেষ অনুষঙ্গরূপে

সিদ্ধ। ফলে পরিচিত বিষয়ের নতুন রূপে প্রাপ্তিতে দর্শক তা প্রাণ ভরে গ্রহণ করেছে। এছাড়া ঘটনাচক্রে (কাজীর কন্যা) সর্পজীবি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের কন্যা বেদের মেয়ে জোস্‌নার সঙ্গে শাহজাদার প্রেম-বিরহ দর্শককে হলমুখী করতে আরো বেশি উৎসাহ তৈরি করেছিল। ঢাকার চলচ্চিত্রের ৩২ বছরের ইতিহাসে এটিই হচ্ছে একমাত্র চলচ্চিত্র যে, ১ কোটি টাকার সীমিত বাজার থেকে আয় করেছে প্রায় ১৫ কোটি টাকা।[১২] আনন্দ মেলা চলচ্চিত্রের ব্যানারে লোককাহিনিভিত্তিক এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল মাত্র ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা। ছবিটির ব্যবসার প্রকৃত অংক নিয়ে মতান্তর থাকলেও পাক্ষিক তারকালোকও ১৫ কোটি টাকার উল্লেখ করেছে।[১৩] এই ছবিটি জনপ্রিয়তা লাভ করার পেছনে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে বাংলার প্রচলিত কাহিনি এবং এর গানগুলো। বলা হয়ে থাকে চলচ্চিত্রে প্রয়োগকৃত সংগীতায়োজনের মাধ্যমে বাঙালির চিরায়ত আবেগের উপস্থাপন হয়েছে। উল্লেখ্য, ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও আলোচ্য চলচ্চিত্রটির পুনর্নির্মাণ ব্যবসায় সাফল্য লাভে সক্ষম হয়েছে বলে জানা যায়।'[১৪]

৪. নায়ক-নায়িকার উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গান

গ্রামীণ পটভূমিতে নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহে নায়ক-নায়িকার মধ্যে এক ধরনের খুনশুটির প্রবণতা লক্ষণীয়। গানের মাধ্যমেও তা পরিবেশিত হতে দেখা যায়। গ্রাম বাংলার পটভূমিতে নির্মিত *সুজন সখী* (১৯৭৫) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটিতে নায়িকার প্রতি নায়কের দৃষ্টি আর্কষণ তৈরির প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় সখী (কবরী) এবং তার সইয়েরা মিলে তাদের আরেক সইয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়। নদীর কাছে এসে সখী সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বলে: 'নারে আমি না হয় নাই গেলাম'। এক সই বলে: 'ওমা এতদিন পর রেহানা বাপের বাড়ি আইছে। না গেলে দুঃখ পাইব না? সখী বলে: সন্ধ্যা হইলে বাবা বকবো'। আরেক সই সন্ধ্যার আগে চলে আসার আশ্বাস দিলে সখী রাজি হয়। কিন্তু নদীতে কোন নৌকা দেখতে পায় না।

চিত্র-৮: *সুজন সখী* (১৯৭৫) চলচ্চিত্রে 'সব সখীরে পার করিতে নেব আনা আনা '
গানের একটি স্থিরচিত্রে ফারুক।

হঠাৎ সুজন (ফারুক) নৌকা বাইতে বাইতে আসে। এক সই বলে : 'ও মাঝি আমাগো হ্যাপার একটু নামাইয়া দিবা? সখী সইদের ইশারায় বলে: 'ওই ওই তো সেই ব্যাল চোরা। তারপর নৌকায় ওঠে বসে সখী এবং তার সইয়েরা। এক সখী বলে :'আপনে নাকি ব্যাল চোরা? সুজন বলে : চোর হইলাম ক্যামনে ? যেদিন চুরি করুম সেদিন আর ফেরত দিমু না। চোরেরে বানলে হাকিম ও ছাইড়া

দিব না। হাকিমের কথা ক্যান ? যার চুরি যাইব সে বাইন্ধা রাখলেই পারে? সখী বলে : ডাকাত একটা। আরেক সই জিজ্ঞেস করে নাম কি ? নাম দিয়া কাম কি? একজনের একটা দেওয়া নাম আছে বসন্তের কোকিল। গলার স্বরটা তো ফাটা বাশের মত। নামটা তো ঠিক হয় নাই। সখী হাসে। সুজন বলে: যে নাম দিছে হেরে কন? আরেক সই জিগায় বাড়ি কোন গেরামে: ঐ আল্লার দুনিয়ার এক কোণায়।' সবাই হি হি করে হেসে ওঠে। নৌকা পাড়ে এলে সুজন বলে: নামেন। সকলে নৌকা থেকে নামে। সখী বলে: কত দেওন লাগব ? নৌকার গলইয়ে বসে সুজন উত্তর দেয় আট আনা। সখী অপর গলইয়ের উপর পয়সা রেখে চলে যায়। সুজন উঠে এসে পয়সা হাতে নিয়ে বলে: এইটা নিয়ে যান এই বলে ছুড়ে দেয়। সখী মাটি থেকে তুলে উত্তর দেয় : 'ক্যান কি হইছে এইটার? সুজনের জবাব নিম্নোক্ত গানে গানে–

সুজন (ফারুক) সব সখীরে পার করিতে নেব আনা আনা
তোমার বেলায় নেব সখী তোমার কানের সোনা সখী গো
আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি তোমার কাছে পয়সা নেব না ॥

এক সই বলে: জবাব দে না ঠোঁট কাটারে, সখী: দিমু ? সই: দিবি না যে, সখী: দাঁড়া দেই

সুজন: ও সুজন সখীরে প্রেমের ঘাটে পারাপারে দরাদরি নাই
মনের বদল মন দিতে হয়
সখী (কবরী): প্রেমের কথা জানি না মনের বদল করি না
পারের কড়ি লইবা যদি লও
... ...

সুজন: ও সুজন সখীরে প্রেমের হাটে বেঁচা কেনায় কুলমান নাই
মনের মত মন হতে হয়
সখী: মনের মত মন মাঝি চেনা বড় দায়
আসল কিবা নকল কারে কয়
সুজন: যেমন খুশি তেমন করে যাচাই করে লও
সখী গো আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি মাঝ দরিয়ায় নাও ডুবাবো না

উপরোক্ত গানটি মরমী শিল্পী আবদুল আলীম এবং সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে গীত হয়। গানটির গীতিকার ও সুরকার খান আতাউর রহমান। দ্বৈতকণ্ঠের উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক গান মূলত নায়িকাকে কাছে পাওয়ার বাহানা এবং তাতে নারী হৃদয়ের যে শঙ্কা তার রূপও চিত্রিত হয়। গানের শেষ অন্তরায় লক্ষ করা যায় সখী যখন সুজনের কুলমান নিয়ে প্রশ্ন তোলে সুজন তার উত্তরে বলে–'ও সুজন সখীরে প্রেমের হাটে বেঁচা কেনায় কুলমান নাই মনের মত মন হতে হয়।' তারপরও সখীর মনে সন্দেহের রেশ রয়ে যায়। তার প্রকাশ–'মনের মত মন মাঝি চেনা বড় দায় আসল কিবা নকল কারে কয়' সন্দেহের রেশ ঘুচাতে সুজনের উত্তর–'যেমন খুশি তেমন করে যাচাই করে লও সখী গো আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি মাঝ দরিয়ায় নাও ডুবাবো না' প্রেমিক যেভাবে তার ভালবাসার মানুষটিকে

আশ্বস্থ করে; যা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মনের চিরাচরিত রূপ বিধৃত হয়। এই চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানেও নায়কের হাস্যরস বা খুনশুটি আসলে তা মিষ্টি মধুর প্রেম রচনারই ইঙ্গিতবাহী এবং যা প্রেমিকার মন জয়েরই এক অভিনব কৌশল।

হায়রে কথায় বলে
গাছে ব্যাল পাকিলে তাতে কাকের কি
ও কাকের কা কা ডাকে যদি একে একে
গাছের ব্যাল ঝরিয়া যায় তাতে দোষের কি ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় পূর্বের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাতের অন্ধকারে বন্ধুদের নিয়ে বেল চুরি করতে আসে সুজন (ফারুক)। এক বন্ধু বলে: 'এই অন্ধকারে ব্যাল চুরি! ব্যাল গাছে যে কাঁটা, গা হাত পা ছিলা দিব না? সুজন বলে: 'আরে বেকুব (হাতের টর্চটি দেখিয়ে) বড় টর্চ আনছি, চল।' অপরদিকে সখী (কবরী) তার ঘুমন্ত দাদির পাশে শুয়ে সেদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনার স্মৃতিচারণ করে: 'তোমাগো আত্মা এত ছোড ক্যান? পাকা ব্যাল দেখলে মানুষ এমন ঢিলাই-ই। সখীও একই কথার পুনরাবৃত্তি করে ব্যঙ্গ স্বরে–'পাকা ব্যাল দেখলে মানুষ এমন ঢিলাই-ই? 'ব্যাল পাকলে কাকের কি ? কাক! আমি কাক? কাক না কি? বসন্তের কোকিল? কোকিল না কাক। কাল সকালে দেইখো? পুরা গাছ সাফ কইরা দিমু। সখী মিষ্টি হাসি হেসে বলে: 'ডাকাত' তারপর ঘুমিয়ে পড়ে।

এদিকে দেখা যায় সুজন তার দলবল নিয়ে ব্যাল পারছে। ব্যাল পারা শেষ হলে এক এক করে গাছ থেকে নামে সকলে। এক বন্ধু লুঙ্গিতে করে বেল নিতে চাইলে সুজন নিষেধ করে। সব বেল পড়ে থাকে গাছের নিচে। চারজনে চারটা ব্যাল নিয়ে চলে যায়। সখীর তখনো ঘুম ভাঙ্গেনি। ঘুম ভাঙ্গে সকলের হা হা হা হাসিতে। সখী বিছানা থেকে ওঠে বসে। তারপর মিউজিক বাজে। দেখা যায় গরুর গাড়িতে সুজন এবং তার দলবল। সুজন গান ধরে তার সাথে বাকিরা দোহারের ভঙ্গিমায় গায়।

সেদিনের ব্যাল গাছে ঢিল ছোড়া এবং সখীর নিষেধাজ্ঞায় যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল সুজনের মনে তার জবাব চিত্র অঙ্কিত হয় গানটিতে। এবং ব্যক্ত হয় এভাবে–'দিয়া থুইয়া খায় না যারা একা একা খায় তাদের কপাল এমনি কইরা ছাই হইয়া যায়।' বহুল প্রচলিত কথাকে আশ্রয় করে গানটিতে যে তরুণ-তরুণীর চিরায়ত তারুণ্যের রূপ বর্ণিত হয় তা হাস্যরসের বিশেষ দিক নির্মাণ করে। মূলত সখীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তার এ ঘটনার অবতারণা। তার ইঙ্গিত মেলে কারো সাড়া শব্দ অর্থাৎ সখীর দেখা না পেয়ে গানের মাঝে প্রাসঙ্গিক কথা বলার মধ্য দিয়ে। এবং গানের শেষে তখনো কাউকে দেখতে না পেয়ে বলে: 'কী ব্যাপার টের পায় নাই এখনো? দাঁড়া দেইখা আসি। বলে গরুর গাড়ি থেকে নামে সুজন এবং সখীর বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু এরপরও কাউকে দেখতে না পেয়ে উকি ঝুঁকি মারে। সখী গাছের আড়ালে লুকায়। বলে: 'কথা নাই মুখে? সুজন বলে: কার সাথে কথা কমু ? ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকলে? এরপর সখী দাদি গো... বলে জোরে ডাকে। সুজন দৌড়ে গরুরু গাড়ির কাছে যায় এবং হট হট করে গাড়ি হাঁকায়। সখী অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে।

আমজাদ হোসেনের *দুই পয়সার আলতা* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিও কাজলের (রাজ্জাক) অভিনয়ে পরিবেশিত হয় যা তার মনের মানুষটির মন জয় করার রূপটিই প্রতিফলিত হয়। এ গানে

শাড়ি হলো সম্পর্ক নির্মাণের উছিলামাত্র। এটাকে ঘিরে দুজনের মাঝে মত বিনিময় হয় এবং মনোবাঞ্ছা চরিতার্থে মধুর প্রেম রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়–

নায়ক: ও আমি তারেই দেব শাড়ি
ঘোমটা দিয়ে যে রূপসি
যাবে আমার বাড়ি ॥

নায়িকা: সব কথাই বুঝে পুরুষ একটি কথা বুঝে না
বিয়ের আগে প্রেমের নামে এসব কিছু সাজে না
এত কাছে এসো না কলঙ্কিনী করো না
এবার আমায় দাও গো যেতে হাতে পায়ে ধরি
নায়ক: ও আমি বলো কি যে করি
আমার কথা ভেবে না হয় করলে কিছু দেরি

চলচ্চিত্রে দেখা যায় কুসুম (শাবানা) তার কলসির পাশে শাড়ি রেখে গোসল করে। গোসল শেষে তার শাড়ি খুঁজে পায় না। লজ্জা আর সংকোচে আশে পাশে তাকায়। দেখে ক্ষেতের আড়াল থেকে লম্বা বাঁশের ডগায় তার শাড়ি ঝুলছে। একটু পর দেখা যায় কাজল বাঁশে ঝুলানো শাড়ি নিয়ে মিউজিকের তালে তালে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসে এবং উপরোক্ত গানটি গায়। গানটি গ্রাম বাংলার নারী-পুরুষের মিষ্টি মধুর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নির্মিত এবং এই সম্পর্কটিকে ঘিরে নানাবিধ সামাজিক প্রতিকূলতা রয়েছে তার একটি চিত্র লক্ষণীয়। কুসুমের গানে তা উঠে আসে এভাবে–'বিয়ের আগে প্রেমের নামে এসব কিছু সাজে না, এত কাছে এসো না কলঙ্কিনী করো না।' ইত্যাদি কথার মধ্য দিয়ে।

৫. নায়ক-নায়িকার বাদ-প্রতিবাদের গান

সমাজ জীবনে নারী-পুরুষের মাঝে একধরনের বিভেদ বিদ্যমান। চলচ্চিত্রের কাহিনিতেও তার রূপ নির্ণয় করা হয়েছে; উক্ত বিষয়টিকে ঘিরে নানা ধরনের হাস্যরস তৈরির প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। কেবলমাত্র তা কৌতুক অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নায়ক-নায়িকার মাঝেও সম্পর্ক তৈরির প্রয়াসে গানের মাধ্যমে হাস্যরসের ঘটনা ঘটে। আজিম পরিচালিত *প্রতিনিধি* (১৯৭৬) চলচ্চিত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন-বরণ উৎসবকে ঘিরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সেখানে শিক্ষার্থীরা নাচ-গান পরিবেশন করে। সেখানে প্রচলিত সমাজে নারী-পুরুষের মাঝে একে অপরকে দোষারোপ করার যে চিরাচরিত সংস্কৃতি তার রূপ বিধৃত হয় নিম্নোক্ত গানে–

এক ছাত্র: নারী জাতি স্বার্থপর
ছাত্র-২: একেবারে গায়ে উঠে জ্বর
রাজ্জাক: মেয়ে জাতির এমনি স্বভাব
হাজার পেলেও যায় না অভাব
স্বামীদের বানিয়ে কাবাব
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খায়

তারা এমনি ভয়ঙ্কর
সুজাতা: খোটা দিলে আমি তোমার মান রাখব না
বাপের বাড়ি চলে যাব কাছে থাকব না ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নবীন-বরণ অনুষ্ঠানে সুজাতার নেতৃত্বে একদল নৃত্য পরিবেশন করে। সকলের করতালিতে মুখরিত হয় হল রুম। এরপর এক ছাত্র প্রবেশ করে' বলে: নারী জাতি স্বার্থপর, আরেকজন বলে: 'একেবারে গায়ে উঠে জ্বর।' এরপর মঞ্চে প্রবেশ করে রাজ্জাক এবং বলে: 'মেয়ে জাতির এমন স্বভাব, হাজার পেলেও যায় না অভাব, স্বামীদের বানিয়ে কাবার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খায়, তারা এমনি ভয়ঙ্কর।' নাচের ভঙ্গিমায় প্রবেশ করে সুজাতা সুরে সুরে বলে: খোটা দিলে আমি তোমার মান রাখব না। বাপের বাড়ি চলে যাব কাছে থাকব না।' মেয়েদের দল একই কথার পুনারবৃত্তি করে সমস্বরে। রাজ্জাক এবং সুজাতার মাঝে নাচের সওয়াল জবাব চলে রাজ্জাক বলে: 'বাপের বাড়ি যাওয়ার পথে খাল কেটে দেব। একই কথা সমস্বরে বলে ছেলেরা। দুজনের নেতৃত্বে দুটি দল (ছেলে-মেয়ের) পরিচালিত হয়। নানাবিধ উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক কথা বার্তায় হাস্যরস তৈরি করে যা উপস্থিত অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিশেষভাবে আনন্দ দেয়।

আজিজুর রহমান-এর *ছুটির ঘন্টা* (১৯৮০) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটিতেও নারী-পুরুষের চিরায়ত খুনশুটির বিষয়টি লক্ষণীয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় একদিন আব্বাস (রাজ্জাক) তার আচারের দোকানদার রবিউলকে খুঁজে পায় না। আব্বাস রান্না বান্না নিয়ে পড়ে মহাবিপাকে। চুরি করে আচার খাওয়ার অপরাধে ধোলাই করেছে তাকে। তার কারণে বিদেশ যাওয়ার নাম করে পালায় রবিউল। আঙ্গুরীকে (শাবানা) সামনে পেয়ে আব্বাস বলে: 'তুই চল না রান্নাটা কইরা দিবি' আঙ্গুরী বলে: 'ও হায়রে খাব গাছ মিয়ার হাউশ কত? বলে সরে যায়।' তারপর ঢোলের তেহাই বেজে উঠে, রবিউল এবং তার প্রেমিকার নিম্নোক্ত খুনশুটির গানে। রাস্তার লোকজন বেষ্টিত নাচ-গানের আসরে আব্বাস এবং আঙ্গুরী ভির ঠেলে প্রবেশ করে এবং খুনশুটির মাত্রা আরো বাড়িয়ে তোলে।

মাইয়া মানুষ!
সুরত আলী: মাইয়া মানুষ ক্যান যে আইলো দুনিয়ায়
আরে মাইয়া মানুষ ক্যান যে আইলো দুনিয়ায়
আরে ও মাইয়া মানুষ জীবনে হইলো না হুঁশ
যদি না থাকত পুরুষ ভাইসা যাইতি দরিয়ায়
মাইয়া মানুষ

নারী: যা যা পুরুষ মানুষ ক্যান যে আইলো দুনিয়ায়
পুরুষের বাহাদুরি কেবলই ছল চাতুরি
পুরুষ মানুষ ক্যান যে আইলো দুনিয়ায়
যদি না থাকত নারী হইতো তোদের কি উপায়
পুরুষ মানুষ

উপরোক্ত গানটিতেও নারী-পুরুষের চিরাচরিত ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়। একে অপরের জীবনে কে কত অপরিহার্য এবং কার স্বভাব কেমন ইত্যাদি স্থান পায়। কখনো পুরুষ নারীর বেশ ধারণ করে, ছাপা জামা পড়ে আবার নারীরা পুরুষের বেশে চলার চেষ্টা করে এসব বিষয় আশয় উঠে আসে। প্রথম দিকে গানে হাস্যরস তৈরির প্রয়াস থাকলেও শেষের দিকে একটি বক্তব্য প্রতিভাত হয় যে, নারী এবং পুরুষ দুজনই দুজনার। দুজনের বন্ধন কিংবা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একজন নারী কিংবা পুরুষের জীবন সার্থক হয়ে ওঠে। তা ব্যক্ত হয় এভাবে–'নারী হইলো ঘরের শোভা, পুরুষ হইলো ঘর। পুরুষ নারী মিলা হইলো দুনিয়া সুন্দর।'

সি বি জামান-এর *উজান ভাটি* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে নায়ক-নায়িকার মাঝেও নারী-পুরুষের প্রচলিত খুনশুটি লক্ষ করা যায় যা হাস্যরসের উদ্রেক করে। চলচ্চিত্রে দেখা যায় নদীর পারে সোনাই (নবীনা) তার সখীর সাথে বিবাহ সংক্রান্ত আলাপ করে। সখী বলে: 'বিয়া করুম ক্যা? পুরুষ মানুষের গোলাম অয়নের লাইগা ?' সোনাই বলে: আমরা কারো হুকুমের গোলাম হমু না।...সারাদিন ঘুইরা ঘুইরা আইয়া কইব, অই আমারে ভাত দে। আমার গামছা কৈ? গোসলের পানি দে, হুম তার লাইগা বান্দির মত থাকতে হয় সব সময়। কারো ধার ধারুম না। কাউকে বিয়াও করুম না।' বলতে বলতে দুজনে হাসিতে ফেটে পড়ে। খেজুর গাছের আড়াল থেকে মনির (সুজন) তার হাত বাড়িয়ে গান ধরে–

ছেলে: বয়সকালে বিয়া না হইলে
মাইয়া লোকের কি দাম আছে
চুল পাকিলে যাবি কার কাছে
মেয়ে: গলায় পইড়া বিয়ার ফাঁসি
পুরুষ ম্যানষের হইমু দাসী
এমন দিন তো বাঘে খাইয়াছে ॥

উপরোক্ত গানটিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান নির্ণয় তদুপরি সমাজ সংসারে তার মর্যাদার সংকট প্রতিফলিত হয়। ফলত নারীরা পুরুষের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক বিবাহ বিমুখীতায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। গানটিতে হাস্যরস তৈরির প্রয়াস থাকলেও প্রচলিত প্রথার বাইরে এক ধরনের প্রতিবাদমূলক বক্তব্যও প্রকাশ পায়। বিবাহিত জীবনে নারী যে দাসীর রূপে আসীন তার বাস্তবচিত্র এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তার বিরোধীতা করে বলা হয়েছে–'গলায় পইড়া বিয়ার ফাঁসি, পুরুষ ম্যানষের হইমু দাসী, এমন দিন তো বাঘে খাইয়াছে।' দিন বদলের হুঁশিয়ারিও লক্ষ করা গেছে। তবে এ কথাও সত্যি যে, নারী এবং পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। কাউকে ছাড়া কারোর জীবন পরিপূর্ণ হয় না। দুজনের যৌথ প্রচেষ্টায় জীবন সুন্দর হয় হয়ে ওঠে। তবু নারীর প্রতি অবমাননা করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তারই সূত্র ধরে গানের শেষে বলা হয়েছে–'নারী বধূ নারী মধু নারী মা-বোন, তবু কেন পুরুষ জাতি ভাঙ্গে নারীর মন।'

মোস্তফা আনোয়ারের *আঁখি মিলন* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রেও একটি পরিবারে ছেলে সন্তানের জন্ম লাভকে ঘিরে এক আনন্দমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। নিম্নোক্ত নাচে-গানে পারিবারিক আনন্দ-উৎসব উদযাপিত হয়। যেখানে সমাজ সংসারে নারী-পুরুষের অবস্থান নির্ণয়ে দু'পক্ষ মরিয়া হয়ে ওঠে। চলচ্চিত্রে দেখা যায় নয়ন (প্রবীর মিত্র) এবং রানির (রানী) কোল জুড়ে আসে ছেলে সন্তান। সদ্যজাত সন্তানকে ঘিরে

পারিবারিক এক আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হয়। মিলন (ইলিয়াস কাঞ্চন) এবং আঁখির (সুচরিতা) দল মিলে উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক গানের আসর বসে; যা বাঙালি সমাজে নারী-পুরুষের চিরায়ত ভেদাভেদ প্রসঙ্গ উপস্থাপিত–

ছেলে: ছেলের কাছে বাপ বড় জানিস নিশ্চয়
সারা জীবন ছেলের লাগে বাপের পরিচয়
সমবেত ছেলে: লাগে বাপের পরিচয়
বাপের পরিচয়
বেশ বেশ দিক কথা অতি চমৎকার

মেয়ে: আরে ছেলের কাছে মা'য় বড় সব মানুষই জানে
জন্ম নিয়ে মুখে প্রথম মায়েরই নাম আনে
সমবেত মেয়ে: ছেলে মায়ের নাম আনে
মায়েরই নাম আনে
বেশ বেশ দিক কথা অতি চমৎকার

ছেলে: আরে স্কুল বলো কলেজ বলো নাম লেখাতে হলে
কাগজে কলমে শুধু বাপের নামই চলে
আরে বাপের নামই চলে
ওরে বাপের নামই চলে
বেশ বেশ দিক কথা অতি চমৎকার

মেয়ে: আরে জ্বর বলো জ্বারি বলো অসুখে-বিসুখে
বিপদ আপদে হলে ছেলে মা মা বলে ডাকে
সমবেত মেয়ে: হায়রে মা মা বলেই ডাকে
হায়রে মা মা বলে ডাকে

নারী-পুরুষ একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের একটি নাম। সাধারণত জগত সংসারে কেউ কাউকে ছাড়া পরিপূর্ণ নয়। তথাপি কে কার চেয়ে অতি উত্তম এবং সামাজিক জীবনে কার কত গুরুত্ব তা নিয়ে নানা ধরনের বাক্য বিনিময়ের প্রচলন রয়েছে। উপরোক্ত গানটিও তারই ভাবনাজাত ফসল। প্রসঙ্গত, এ সমাজে এখনও একটি ছেলে সন্তানের আশায় একাধিক মেয়ে সন্তানের জন্ম হওয়ার নজির রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নব দম্পতিদের সমস্ত স্বপ্ন ঘিরে থাকে একটি ছেলে সন্তান। এটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রূপ। যেখানে পুরুষ নারীর চেয়ে ক্ষমতাধর। পারিবারিক, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় বিধানের সর্বত্র পুরুষের অগ্রাধিকার বেশি।

এক সময় কাগজ কলমে শুধু বাবার নাম লেখা হতো। গানেও সে দৃষ্টান্ত রয়েছে–'আরে স্কুল বলো কলেজ বলো নাম লেখাতে হলে, কাগজে কলমে শুধু বাপের নামই চলে।' ফলে একটি পরিবারে সন্তানের জন্মলাভের ক্ষেত্রে ছেলে সন্তানের কামনাই বেশি থাকা স্বাভাবিক। তবে এও সত্যি যে, আশির দশকের চিত্র এমন হলেও বর্তমানে প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালতে বাবার

নামের পাশাপাশি মায়ের নামের উল্লেখ রয়েছে। বর্তমান সময়ের নারীরা অনেক এগিয়ে চলেছে শিক্ষা-দীক্ষায়, কর্মে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে। ফলত অবস্থার অনেক পরিবর্তন এসেছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এর চেহারা আরো উজ্জ্বল হবে বলে আশা করা যায়।

৬. সই বা সখীদের গান

গ্রাম বাংলার কিশোর-কিশোরীদের মাঝে চিরায়ত একটি সম্পর্কের নাম দোস্ত এবং সই। যাকে আজকাল বন্ধু এবং বান্ধবী নামে ডাকা হয়। যদিও দুইয়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ দোস্ত এবং সই সম্পর্কের সাথে দুই পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা জড়িত থাকতেন। এটি ছিল মুরব্বীদের পাতানো একটি সম্পর্ক। তখনকার সমাজের মানুষ শিক্ষা-দীক্ষায় এতটাই অনগ্রসর ছিল যে, নিজেরাই নিজেদেরকে পরাধীনতার শেকলে বন্দি করে রাখতো। ফলে প্রেম-ভালবাসা এসব ছিল অত্যন্ত গোপনীয় এবং নিষিদ্ধ, এমনকি বড়দের কাছে লুকিয়ে বেড়ানোর বিষয়। এ সম্পর্কে গবেষক গোলাম মুরশিদের মন্তব্য প্রণীধানযোগ্য–

> বাঙালিদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো প্রেমের কথা গোপন রাখার প্রবণতা। সেই সমাজে এই রীতি প্রকট আকারে ধারণ করেছিল এবং এমনকি এই রীতি একালেও বজায় রয়েছে। ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও এ যুগেও কেউ কাউকে বলে না যে আমি তোমাকে ভালোবাসি।[১৫]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের বাইরে বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে একান্ত মনের কথাগুলো যার সাথে আদান-প্রদান করতো সে হলো সই। জীবনে দোস্ত কিংবা সই বিশেষ একটি সম্পর্কের নাম। ফলে শিল্প সাহিত্যের বৃহৎ অংশ জুড়ে এই সম্পর্কটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে; বিশেষত গানে। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান রয়েছে যেখানে সই কিংবা সখী বিশেষ একটি চরিত্র হিসেবে আসীন–'সখী ভাবনা কাহারে বলে, সখী যাতনা কাহারে বলে' কাজী নজরুল ইসলামে গানেও সই-এর প্রসঙ্গ এসেছে বিভিন্ন ভাবে–'সই ভাল করে বিনোদ বেণি বাঁধিয়া দে' প্রভৃতি। চলচ্চিত্রের গানেও এর প্রভাব রয়েছে বিশেষত নায়ক-নায়িকার মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম সঙ্গী হিসেবে। যদিও তা এখন একটি বিশেষ রীতিতে পরিণত হয়েছে।

দিলীপ সোম পরিচালিত *সাত ভাই চম্পা* (১৯৬৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানের আগ মুহূর্তে ভাব প্রকাশের এমনই রূপ দৃষ্ট হয়। কাঠুরিয়ার মেয়ে তার সইদের নিয়ে ভাবি প্রেমিকের আলাপনে চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং একে অপরকে বলছে: 'আমার কাছে পাকা কুল যদি টক হয় তাহলে খুব ভালো লাগে। আমার কাছে অচেনা কোনো ফুল, তাতে যদি গন্ধ থাকে, তাহলে ভাললাগে।' জনৈক সই বলে: 'অচেনা ? অচেনা পুরুষের মাঝে কেমন পুরুষ হলে পছন্দ হয় ? মনে কর স্বাস্থ্যবান সুগঠন একেবারে রাজপুত্রের মতন। তার বয়সটা কত হলে ভালো হয়? জ্বালাস নে সই। কিন্তু এ জ্বালায় সুখ আছে সই। বাকি কথার প্রকাশে শুরু হয় গান–

জ্বালাইলে যে জ্বলছে আগুন নিভানো বিষম দায়
আগুন জ্বালাস নে আমার গায় লো
বৈশাখ মাসে ফুল ফুটে থরে থরে
ভ্রমরায় মধু খায় গুনগুন স্বরে
প্রাণ নাথ আইলো না ॥

প্রিয়জনের কল্পনায় ব্যাকুল হয়ে উঠে নারী হৃদয়। গানের শেষ অন্তরায় বলা হয়েছে–'আইলোরে বসন্তের বাহার মধু ফাগুনে, ছটফট করে মন কোকিলার গানে, যৌবন জোয়ার এলো উথলে মনে, বন্ধু

রইলো দূরদেশে সদাই তারে মনে চায়।' জহির রায়হান পরিচালিত *বেহুলা* (১৯৬৬) চলচ্চিত্রে বেহুলা-লখিনকে উদ্দেশ্য করে কলসিটিকে ঘিরে সখীদের যে আনন্দের প্রকাশ, তা যেন শুধু বেহুলা-লখিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সখীদের মনের আকাঙ্ক্ষারও যেন প্রকাশ ঘটে। কলসিটি যেন তাদের মনের মানুষেরই রূপ ভূমিকার অবতীর্ণ। প্রতীকী অর্থে তারই বাসনার ইঙ্গিত বলে অনুভূত হয়। বেহুলার মত তারাও যেন তাদের প্রেমিককে পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে–

হায়রে পিতলের কলসি তোরে লইয়া যামু যমুনায়
তোর অঙ্গের পরশ দিয়া অঙ্গ জুড়ায় ॥
যমুনার জল দেখতে কালো চান করিতে লাগে ভালো
ওরে রসের সাগরে কলসি তোমারে ডুবায় ॥

রাজপ্রাসাদে আতিথেয়তার সুযোগে বেহুলা ও লখিন্দরের মাঝে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। দুজনের প্রেমের সম্পর্কটিকে ঘিরে সখীদের মাঝে এক ধরনের আনন্দ উল্লাস সৃষ্টি হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় কোন এক সকালে বেহুলা (সুচন্দা) লখিনকে খোঁজ করে। সখীরা কলসি কাখে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বলে: 'বিদেশি'? 'কোথায় যাবে আর দিঘির পাড়ে বসে আছে হয়তো'... । হঠাৎ লখিনকে দেখতে পেয়ে বেহুলা কলসি গাছের আড়ালে রেখে তার কাছে এগিয়ে যায় এবং বলে: 'এত সকাল সকাল চলে এলে যে'? লখিন বলে: 'বাইরে আসলে কাউকে বলে আসতে হয়।' 'ও আমি এখন যাই' বলে গাছের আড়ালে রাখা কলসিটিকে খুঁজতে থাকে বেহুলা। বলে: 'আমার কলসি এখান থেকে নিলো কে? এখানেই তো ছিল' কলসির ক্লোজ শট। সখীরা হাতের তালুতে কলসিটিকে নিয়ে গান গাইছে উপরোক্ত গান।

এই চলচ্চিত্রে একই ভাবনার আরেকটি গান যা বেহুলাকে ঘিরে সখীদের পরিবেশনায় ব্যবহৃত। চলচ্চিত্রে দেখা যায়, জ্যোতিষী সব দিক গণনা করে বলছে: 'প্রভু লখিনের বিয়ে পশ্চিমেই হবে। কন্যা অতি সুন্দরী। সর্বগুণে গুণান্বিতা। কর্মে ধীর, ধর্মে স্থির। বিদ্যায় স্বরস্বতী। বুদ্ধিতে দ্রুপদী। চরিত্রে সাবিত্রী' চাঁদ সওদাগর শুনে বলে উত্তম বলেছো: 'ধনপতি। আশ্চর্য আশ্চর্য মানুষের মন। আমি এই চেয়েছিলাম।'... শাহী সওদাগরের মেয়ে বেহুলা আমার পরম বন্ধু শাহী সওদাগর'। লখিন্দরের সঙ্গে বেহুলার বিয়ের আলাপনের পরমুহূর্তেই এই গান শুরু হয়। দৃশ্যায়নে দেখা যায় বেহুলা স্নান করছে আর তাকে ঘিরে ছয় সখী জলনৃত্য পরিবেশন করছে আর গানে গানে বেহুলার রূপ বন্দনা করছে–'কুচরবণ কন্যারে তোর, মনে কত রঙ্গ, ডাঙ্গর ডাঙ্গর দেহখানি নরম চিকন অঙ্গরে'।

সখীরা: ও বেউলা সুন্দরী ও বেউলা নাচনি
তোর রূপের কথা দেশ দেশান্তর জানেন সকলে
কুচরবণ কন্যারে তোর মনে কত রঙ্গ
ডাঙ্গর ডাঙ্গর দেহখানি নরম চিকন অঙ্গরে ॥

চিত্র-৯: *বেহুলা* (১৯৬৬) চলচ্চিত্রে 'ও বেউলা সুন্দরী ও বেউলা নাচনি '
গানের একটি স্থিরচিত্রে সুচন্দা ও সখীরা।

আবার ধরাল পুটি মাছের সৌন্দর্যের সঙ্গে তার কাজল বরণ নয়নের তুলনা করা হয়েছে এবং কঞ্চি চিকন কটির চলনকে লাজুক লাজুক চলন বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ যেন যৌবনবতী বেহুলার বিয়ের পিঁড়িতে আসন লাভের ইঙ্গিত। সৌন্দর্য বন্দনা যেন কারো সান্নিধ্য পাওয়ার বাসনারই বহিঃপ্রকাশ। আবদুল লতিফ বাচ্চুর *যাদুর বাঁশি* (১৯৭৭) চলচ্চিত্রে পাখি (সুচরিতা) তার সখীদেরকে প্রেমের দোলা দিতে বারণ করে নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে–

আর দোলা দিস না ওলো সই
পরানে লাগে বড় ডর
দরিয়ার ঢেউ বুকে আমার
চলছে বিষম ঝড় ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় কাজের মজুরি পেয়ে জাদু (অপু সারোয়ার) তার অন্ধ মাকে বলে: 'মা আইজ পয়লা মজুরি পাইছি।' মা ছেলের অর্থ রোজগারের কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে:'পয়লা মজুরি পাইছস হাতে নারে বাবা হাতে না। আমার আমার আমার আঁচলে দে'। জাদু তার মায়ের আঁচলে পারিশ্রমিকের টাকা বেঁধে দেয়। তারপর খুশিতে এক দৌড়ে যায় দরিয়ার পাড়ে। সেখানে বালুর মধ্যে হাঁটু গেড়ে আঁকিবুকি করে। মনে হয় এ যেন কোন আঁকিবুকি নয় কারো জন্যে অপেক্ষার পায়তারা। আশে পাশে তাকিয়ে কাউকে খোঁজার যে চেষ্টা তা তারই রূপবাহী। এক সময় মাথার কাছে এসে দাঁড়ায় সুচরিতা বলে: 'কি করতাছস ? কিছু না, কিছু না সর।' বলে পায়ে মিষ্টি আঘাত করে। মারলে কিন্তু দিমু না। কি দিবি না? তুই যা চাস? কি চাই বলতেই পাখি চোখের সামনে হাত উচিয়ে বলে এই যে। 'দে কইলাম' বলে জাদু তার পিছু পিছু দৌড়ায়।

দৌড়াতে দৌড়াতে পাখি জাদুর বুকের উপর ধপাস করে পড়ে যায়। পানিতে হাবু ডুবু খেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পাখি বলে: 'ঐ ছ্যামরা করলি কি? এহন আমি বাজানরে কি কমু?' জাদু তার ভেজা শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'হা কইরা কি দেখতাছস? দ্যাখতাছি তুই কতো বড় হয়ে গেছস। বড় তো তুইও হইছস। চ্যামরা থেকে দামড়া হইয়া গেছস। ভাগ্য ভাল আমাগো কেউ দ্যাহে নাই।

দেখলে কি হইতো ? দেখলে কি হইতো আমরা দুইজন বড় হইছি না! ব্যাদদপ।' বলে গালে ঠোকনা কেটে চলে যায় পাখি। তারপর সখীদের কলসির উপর ক্লোজ শটের মাধ্যমে উপরোক্ত গানটি শুরু হয়। পাখি গানের মাধ্যমে দোলনায় ঝুলে আর সখীদের বলে তার যে–'যৌবনের ফুল ফুটেছে মনে। সখীরা বলেঃ 'কলসি বুকের নিচে পইড়া উঠছে বড় ঝড়। গানটির গীতিকার আহমদ জামান চৌধুরী, সুরকার আজাদ রহমান, কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন। সি বি জামান নির্মিত *উজান ভাটি* (১৯৮২) চলচ্চিত্রেও সখীর কাছে তার আকুতি নির্ণিত হয় নিম্নোক্ত গানে–

নায়িকা: ঢাকায় যারা চাকরি গো করে
তারা কেনে প্রেমে পড়ে প্রাণ সখী গো
সখী গো সে আইব কোন মাসে
সখী: মাস যাইব টাকা পাইব কিনব নতুন শাড়ি
শাড়ি গয়না কিনার পরে ফিরা আইব বাড়ি ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় সোনাই (নবীনা) এবং তার সখী বানু বসে আছে। সোনাইয়ের মন ছটফট করে তার প্রেমিক মনিরের জন্য। চাকরি করতে গিয়েছে শহরে কিন্তু কোন যোগাযোগ নেই। সেই ব্যাকুলতায় তার মনে নানা দুশ্চিন্তা ভর করে। সই বানুকে জিজ্ঞেস করেঃ এতদিনে শহরে পৌঁছাইছে না? চাকরি পাইছে না ? সই তাকে আশ্বস্ত করে বলেঃ হ চাকরি পাইছে। তাইলে তো রোজগারও করতাছে। হ করতাছেই তো। তাইলে আহে না ক্যা?' সই তাকে অস্থির না হতে বারণ করে বলেঃ 'কয়দিন হলো যে গেছে ?' কিন্তু সোনাইয়ের মন কোথাও স্থির হয় না। তার কোন কিছু ভালো লাগে না। নানা প্রশ্ন জাগে তার মনে। তাই সখীকে বলেঃ ভাললাগে না যে? কি করুম? সই বলেঃ ভাল্লাগেনা ক্যা? এই কথার জবাব দেয় সোনাই তার উপরোক্ত গানে। জহিরুল হকের *প্রাণ সজনী* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানে বাঁশির সুরের প্রসঙ্গ এসেছে, যে বাঁশির সুরে প্রেমিকার মন করে আনচান সখীর নিকট তারই প্রকাশ–

সখী কারে ডাকে ঐ বাঁশি নাম ধরিয়া
তুই দেনা বলিয়া
আমি হৃদয় আসনে তারে বসাব যতন করে
খোপাতে রাখিব গাঁথিয়া
তারে দে না আনিয়া ॥

কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন, অঞ্জু ঘোষের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। আবদুস সাত্তার খোকনের *ঝিনুকমালা* (১৯৮৫) চলচ্চিত্রে মালার (মোনালিসা) যৌবনবতী হয়ে উঠা এবং তার মনের মানুষ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়। সে কথাই তার সইয়ের কাছে ব্যক্ত করে।

সইলো সই তোরে কই ক্যামনে একা ঘরে রই
পরান আমার বাইরাম বাইরাম করে কেন রে ॥

চিত্র-১০: *ঝিনুকমালা* (১৯৮৫) চলচ্চিত্রে 'সইলো সই তোরে কই ক্যামনে একা ঘরে রই' গানের একটি স্থিরচিত্রে মোনালিসা এবং সহযোগী শিল্পী।

উপরোক্ত গানটিতে লক্ষ করা যায়, প্রথম সই বলে: 'সইলো সই তোরে কই, ক্যামনে একা ঘরে রই, পরান আমার বাইরাম বাইরাম করে কেন রে।' আবার ২য় সই তার উত্তরে বলে: 'সইলো সই তোরে কই মনে তোর ফুটছে খই, এতো জলদি খাইয়ুম খাইয়ুম করো কেন রে।' গানের মাধ্যমে দুজনের সম্পর্কের একটি চিরায়ত রূপ-রসিকতা, একান্ত মনের কথা, আনন্দ প্রকাশের নানা ভঙ্গিমা প্রতিফলিত হয়। আজিজুর রহমানের *রঙিন কাঞ্চন মালা* (১৯৮৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিতেও কিশোরী কাঞ্চির একজন মনের মানুষ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয় সই সখীর সমবেত কণ্ঠের পরিবেশিত গানে–

দিন গেল মাস গেলো গেলো কত সাল
এইভাবে কাটিয়া গেলো আরো কতকাল
সমবেতকণ্ঠে: দিন যায় যায় রে

সিপাহশালা ইমদাদ এবং সৎ মার চক্রান্তে কিশোরী শাহজাদি কাঞ্চনমালা ধোপানির ঘরে আশ্রিত এবং সেখানে পরিচিত পায় কাঞ্চি নামে। দেখা যায় সারাদিন কাপড় কাচার কারণে তার হাতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। মায়ের মত আদরে ধোপানি তাকে মুখে খাবার তুলে খাইয়ে দেয়। তারপর দেখা যায় উপরোক্ত গানটি গায় সই-সখী মিলে। গানটিতে কাঞ্চনমালার যৌবনবতী হওয়া তদুপরি একজন প্রেমিক পুরুষের বাসনার রূপটিই প্রকাশ পায়।

৭. দোস্ত/বন্ধুর গান

চলচ্চিত্রের গানে সই বা সখীর যেমন রূপায়ণ ঘটেছে তেমনি দোস্ত কিংবা বন্ধুর সম্পর্কটিও স্থান পেয়েছে নানা মাত্রিকতায়। দিলীপ বিশ্বাসের *বন্ধু* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে তা-ই প্রতীয়মান হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় গ্রামের পথ ধরে দূর থেকে তারেক (রাজ্জাক) তারেক বলে ডাকে শপথ (উজ্জ্বল)। তারপর কাছে এসে একে অপরের গলা জড়িয়ে ধরে বন্ধুত্বের মহব্বত বিনিময় করে। এরপর তারেক বলে: 'শপথ তুই এখনো যাস্নি? উত্তরে শপথ বলে: 'তোদের ছেড়ে কি করে যাই বল ? বেশ করেছিস তোকে আর যেতেই দেব না। একটা সুন্দর মেয়ে দেখে তোকে বিয়ে দিয়ে ঘর জামাই করে দেব। শপথ তোর বিয়েতে আমি এত ফূর্তি করবো...।' খুশির আনন্দে আর কোনো কথা বলতে পারে না তারেক। তোতলামু করতে থাকে। এরপর দুজনের হাসির সাথে সাথে মিউজিক বেজে উঠে এবং তারেক–'হেই' বলে নিম্নোক্ত গানটি শুরু করে–

বন্ধু তোর বারাত নিয়া আমি যাব
নওশা সাজাইয়া পালকিতে চড়াইয়া
খুশিতে নেচে নেচে গান শোনাব ॥

বন্ধু মানেই দুরন্তপনা এবং জীবনের একান্ত মনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ ইত্যাদি বিনিময়ের অন্যতম সঙ্গী। উপরোক্ত গানটিতে তারই রূপ বিধৃত হয় দারুণভাবে।

৮. বিবাহ সংক্রান্ত গান

বাঙালি সমাজে পারিবারিক জীবনে সম্পর্ক স্থাপনের রয়েছে নানাবিধ আনুষ্ঠানিকতা। একজন পুরুষ ও নারীর কাছে বিয়ে হলো জীবনের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত একটি সম্পর্কের নাম। এ উপলক্ষ্যে বর বা কনের বাড়িতে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশী এসে জড়ো হয়। সকলের আগমনে বিয়ে বাড়িতে জমজমাট পরিবেশ তৈরি হয় এবং তার মাঝেই শুরু হয় বিয়ের গানের আসর। অবিরাম সুরের ধারায় সারা বাড়ি মুখরিত হয়ে ওঠে। বিয়ের নানা পর্যায়ের আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এই গানের বাণী বা কথা রচিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন পর্বের এই আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে গায়ে হলুদ, গোসল বা স্নান, বর-কনের সাজ ইত্যাদি বিশেষভাবে জনপ্রিয়। এসব আনুষ্ঠানিকতাকে ঘিরে গায়ে হলুদের গান, বিয়ের গান, বাসর ঘর তৈরির ঘর, বাসর রাতের গান প্রভৃতি বিষয় বা পর্যায়ের গানের প্রচলন রয়েছে।

ক. গায়ে হলুদের গান

বিবাহ সংক্রান্ত আয়োজনের অন্যতম আনুষ্ঠানিকতা হলো গায়ে হলুদ। এই আনুষ্ঠানিকতার রূপায়ণ চলচ্চিত্রেও প্রতিফলিত হয়। মুস্তাফিজ পরিচালিত *ডাক বাবু* (১৯৬৫) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গান তার অন্যতম দৃষ্টান্ত–

হলুদ বাটো মেন্দি বাটো, বাটো ফুলের মৌ
বিয়ের সাজে সাজবে কন্যা করমচা রং বৌ ॥

কনের গায়ে হলুদকে কেন্দ্র করে রচিত এই গান বহুল পরিচিত; যে গান না বাজলে গ্রামে গঞ্জে বিবাহ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতার বিশেষ পর্ব গায়ে হলুদ যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। গানটির গীতিকার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সুরকার আলী হোসেন, কণ্ঠশিল্পী শাহানাজ বেগম এবং সহশিল্পীরা। এই গানটিই মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানকে চলচ্চিত্রে গানের জগতে অনিবার্য করে তুলেছিল। এ সম্পর্কে সুরকার আলী হোসেন বলেন–

> আমার প্রথম বাংলা ছায়াছবি 'ডাকবাবু'র গান লেখার জন্য ১৯৬৫ সালে আমি কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানকে অনুরোধ জানাই।'.....ছবিতে গান লিখতে তিনি খুব আগ্রহী ছিলেন না। আমার অনুরোধে সেই তার ছবিতে প্রথম গান লেখা। মাত্র দুদিনে তিনি এই ছবির পাঁচটি গান লেখেন। ছবি মুক্তি পেলে প্রত্যেকটি গান অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। '... বিশেষ করে 'হলুদ বাটো মেন্দি বাটো, বাটো ফুলের মৌ ' গানটি বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে, শহরে সর্বত্র বিয়ের আসরে গীত হয়।[১৬]

সাইফুল আজম কাশেম পরিচালিত *সোহাগ* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিও গায়ে হলুদকে ঘিরে পরিবেশিত–

দাও গায়ে হলুদ পায়ে আলতা হাতে মেন্দি
বিয়ের সাজে কন্যারে সাজাও জলদি
যেন রূপ দেখে তার যায় মজে শাশুড়ি ননদি ॥

চিত্র-১১: *সোহাগ* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে 'দাও গায়ে হলুদ পায়ে আলতা হাতে মেন্দি' গানের একটি স্থিরচিত্রে শাবানা ও ববিতা।

আপাত দৃষ্টিতে উপরোক্ত গানটি কন্যার গায়ে হলুদকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ আনন্দ উৎসবের বিষয় মনে হলেও এর অন্তরালে রয়েছে এক নারীর সীমাহীন বেদনা। চলচ্চিত্রে দেখা যায় ঘটনাক্রমে রানি (শাবানা) তার স্বামী ফারুকের (বুলবুল আহমেদ) বাড়িতে আশ্রিত। কাছে থেকেও সে অচেনা, অনেক দূরে। স্বামী ফারুকের সাথে ডালিয়ার (ববিতা) বিবাহপূর্বক গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে মর্মাহত রানিকেই গায়ে হলুদ দেয়ার পর্বটির সূচনা করতে হয়। এ এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে রানি। গীতিকার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, কণ্ঠদান সাবিনা ইয়াসমিন, সুরকার আলী হোসেন।

বিয়ের আরেকটি গান জহির রায়হান পরিচালিত *বেহুলা (১৯৬৬)* চলচ্চিত্রে। গানের আগ মুহূর্তে দেখা যায় ঠাকুরকে ডেকে চাঁদ সওদাগর বলে: 'বিয়ের সমস্ত আয়োজন শেষ করে ফেলো। সবাইকে নেমতন্ন দাও। ধনী-গরীব, আবাল, বৃদ্ধ, অন্ধ, খোঁড়া, কেউ যেন বাদ না যায়।' খোল বাদ্যের উপর জুম আউট শট ধারণের মাধ্যমে শুরু হয় বর (লখিন্দর) পক্ষের পুরুষদের পরিবেশনায় গান ও নৃত্য–

সোনার লখিন টোপর পইড়েছে
বেহুলা সতী হলুদ ম্যাইখেছে
শুনছোনিকি দেখছোনিকি
বুঝছোনিকি থোড়বড়ি ॥

অপরদিকে বেহুলার পিতা শাহী সওদাগর ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলে। ঠাকুর বলে: 'জীবনে এই প্রথম দেখলাম বিয়ের প্রথম রাত হলো ছেলের বাড়িতে। প্রভু শেষ পর্যন্ত কুলপ্রথা', 'কুলপ্রথা'! অবাক হয়ে বলেন শাহী সওদাগর। তারপর তিনি বলেন: 'আইন, নিয়ম, সমাজ এই সবই বেশি না দুটি ছেলে-

মেয়ের জীবনের দাম বেশি। কোনটা ঠাকুর?' তারপর বেহুলাকে বিয়ের সাজে সাজায় সখীরা। পরিবেশিত হয় গান ও নৃত্য–

কিহারে পঞ্চ বাহির হইল
বরণ ডাহায়ালা নিয়ারে ॥

তমিজ উদ্দিন রিজভী পরিচালিত *আর্শীবাদ* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি সানুর (অঞ্জনা) গায়ে হলুদকে কেন্দ্র করে শাম্মী আক্তারের কণ্ঠে সই-সখীদের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়–

ঘরের কাছে গোলাপ গাছে
গোলাপ ঘুর ঘুর করে
খাটে বসে বিয়ের কন্যা বিয়ের হলুদ পড়ে
সমবেত কণ্ঠে: কন্যা বিয়ের হলুদ পড়ে ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় সৈয়দ বাড়ির মেয়ে সানুর সঙ্গে রসুলপুরের মিয়া বাড়ির সাহেদের (প্রবীর মিত্র) বিয়ে ঠিক হয়। সানু সম্পর্কে পরিবার এবং পরিবারের বাইরের কিছু অসৎ লোক মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে। এক সময় দেখা যায় সানুর বড় ভাই (আনোয়ার হোসেন) এবং মসজিদের ইমাম সানুর স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে সত্য কথা জানানোর জন্য সাহেদের (সুমিতা দেবী) বাড়ি যায়। মসজিদের ইমাম সাহেদের মাকে বলে: 'আমি মসজিদের ইমাম। সারা গ্রামের লোক আমার পিছনে কাতার দিয়ে নামাজ পড়ে। আমি মিথ্যে বলি না। সানু মা আমার ফুলের মত পবিত্র, নিষ্পাপ। এ বিয়ে না হলে... ।' সাহেদের মা ইমামের কথায় আশ্বস্থ হয় এবং বিয়ের আয়োজন করতে বলে। তারপর শুরু হয় উপরোক্ত গান। গায়ে হলুদের আয়োজনে গানে গানে মুখরিত হয় সারা বাড়ি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এবারো চক্রান্তের কারণে বিয়েটি শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়।

চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত *বেহুলা লখিন্দর* (১৯৮৮) চলচ্চিত্রে ঢোল বাদ্যের বোল-ছন্দে শুরু হয় সমবেত কণ্ঠে নিম্নোক্ত কনে পক্ষের গায়ে হলুদের গান–

কি মাখাব কাঞ্চা হলুদ বরণ গায় রে
বেহুলার হলুদ বরণ গায় ॥
কি ধোয়াব সোনার অঙ্গ কোন সে গঙ্গা জলে রে
বেহুলার সোনার বরণ গায় ॥

অপরদিকে লক্ষিন্দরকে হলুদ পরায় এবং পুরুষেরা সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করে–

শিব চন্দনের ফোঁটা দিলাম মুখে দিলাম বর
কোমরে জড়ায়ে দিলাম
সুখের আঁচল
সখীরে রূপ করে টলমল ॥

গায়ে হলুদের আনুষ্ঠানিকতায় গানে গানে আনন্দ মুখর হয়ে উঠে বাড়ি। আমজাদ হোসেনের *গোলাপী এখন ট্রেনে* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি গোলাপীর (ববিতা) বিয়ে উপলক্ষ্যে পরিবেশিত হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় কবিয়ালের (আনোয়ার হোসেন) দুই মেয়ে ছোট মেয়ে আলাপী, বড় মেয়ে গোলাপী এবং স্ত্রীকে (রোজী সামাদ) নিয়ে তার সংসার। আয় রোজগারের দিকে কবিয়ালের কোন খেয়াল নেই। কেবল সারাদিন পথে ঘাটে গান গাওয়া ছাড়া। এক সময় তমিজের ছেলের সঙ্গে গোলাপীর বিয়ে ঠিক হয়; যৌতুক হিসেবে র‍্যালি সাইকেল দেয়ার শর্তে। ধনী ঘরের ছেলে তাকে র‍্যালি সাইকেল দিতেই হবে কবিয়াল এ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে মিলনের (এটি এম শামসুজ্জামান) বাবার কাছে জমির দলিল বন্ধক রেখে সাইকেল কেনা হয়। এদিকে গোলাপীর গায়ে হলুদ পরানো হয়। অপরদিকে তার মা অঝোরে কাঁদে। বাউল তার দেখে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে: ‘কান্দিস না কান্দিস না, মাইয়া বড় হইলে কি ঘরে রাখন যায়?’ এরপর গোলাপীকে সাইকেলে বসিয়ে সারা বাড়ি চালায় এবং সমবেত কণ্ঠে নিম্নোক্ত গানটি গায়–

উত্তরে দামান্দের বাড়ি, তার কাছে মিনতি করি
আদরিণী সোহাগিনি
ময়না পাখিরে
দিলাম তোমায় রাইখ তারে
সুখের পিঞ্জরে ॥

চিত্র-১২: *গোলাপী এখন ট্রেনে* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে ‘উত্তরে দামান্দের বাড়ি, তার কাছে মিনতি করি’ গানের একটি স্থিরচিত্রে আনোয়ারা ও ববিতা।

বিয়ের সংবাদে আনন্দময় পরিবেশ তৈরি হলেও কনের স্বামীর ঘরে চলে যাওয়াকে কেন্দ্র করে পিতা মাতা, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সকলের মাঝে এক ধরনের শূন্যতা বিরাজ করে। কনে এবং বর, দুজনের প্রতি তারা বিবাহ পরবর্তী জীবনে সুখী সুন্দর জীবন প্রত্যাশা করে। বর এবং কনেকে কেন্দ্র করে বিশেষ দায়িত্বশীলতা, পতি সেবা ইত্যাদি বিষয়ক কথা বলা হয়ে থাকে। সকলের আদরের ময়নাটিকে (কনে) স্বামী যেন তার আদর-সোহাগে সারাজীবন ভরে রাখে তার প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানানোর কথা গানে ব্যক্ত হয়।

খ. বিয়ের গান

নর-নারীর একত্রে থাকার সামাজিক বৈধ্যতা হলো বিয়ে। সৃষ্টি প্রক্রিয়া অব্যহত রাখা হলো বিয়ের অন্যতম লক্ষ্য। মানব জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। নৃবিজ্ঞানী বিবাহের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে-A complex result of genetic and cultural behaviour in Homo-Sapiens. (Greenwood) [১৭] চলচ্চিত্রের কাহিনিতে নর-নারীর বিয়ের আয়োজনকে ঘিরে নানা ধরনের অনুষ্ঠানাদি লক্ষ করা যায়। আমজাদ হোসেনের *গোলাপী এখন ট্রেনে* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি গোলাপীর বিয়ের অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। পাড়া প্রতিবেশী সকলে মিলে গানটি গায় এবং কনেকে দেয়া বরপক্ষের উপহার সামগ্রী সম্পর্কিত নানা দোষত্রুটির কথা ব্যক্ত হয়। বাঙালি সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠানকে ঘিরে কনে এবং বর পক্ষের দেয়া উপহার সামগ্রী নিয়ে তীব্র আলোচনা-সমালোচনার রীতি বহুকাল ধরে প্রচলিত। সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে গানে গানে প্রকাশ করার প্রবণতাও লক্ষণীয়। তারই রূপ বিধৃত হয় নিম্নোক্ত গানে–

আইছে দামান সাহেব হইয়া বইছে মুখে রুমাল দিয়া
ঘোমটা খোলার আগে তোমায় করি গো সাবধান
চান্দের আলো দেইখা তুমি হইয়ো না অজ্ঞান

দামান বেটা কিপটার বেটা স্নো আনছে আঠা আঠা
আলতার মধ্যে গঙ্গার পানি পায়ে লাগে না
এত সস্তায় আসমানিরে পাওয়া যাবে না

আমজাদ হোসেনের *সুন্দরী* (১৯৭৯) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি বিয়ের আসরে পরিবেশিত হয়। তবে তা ভিন্ন ইঙ্গিত পোষণ করে। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতায় কনে পক্ষ বরাবরই অবহেলিত। তার রূপ চিত্রিত হয় নিম্নোক্ত গানটিতে। চলচ্চিত্রে দেখা যায় সমাজে পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে গান গেয়ে টাকা রোজগার করে সুন্দরী (ববিতা)। চলচ্চিত্রের শুরুতেই তাকে দেখা যায় সে খুব চঞ্চল, সারা পাড়া-গ্রাম মাতিয়ে রাখে তার চঞ্চলতা দিয়ে। অন্যায় এবং প্রতিবাদীর অন্যতম কণ্ঠস্বরও সে। তার দৃষ্টান্ত মেলে গ্রামের কোন এক লোকের বর্তমান স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও আরেকটি বিয়ে করার কারণে তার সাথে তুমল ঝগড়া করে সে। আবার তাকে এক সময় বড় একটা দা ধার করতে দেখা যায়। এতিম অসহায় সুন্দরী একলা ঘরে থাকে। নিরাপত্তার কথা ভেবে হাতিয়ার হিসেবে দা নিয়ে ঘুমাতে দেখা যায়। বিয়ে বাড়িতে টাকার বিনিময়ে গান গাইতে গেলেও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ভুলে না। বরং সকল ধরনের বৈষম্য তার গানের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করে। নিম্নোক্ত গান তারই দৃষ্টান্তবাহী। বর পক্ষের সামনেই তার কণ্ঠ থেকে বের হয়ে আসে কনের উপর নানা অনিয়ম, অবহেলার নিদারুণ চিত্র–

ববিতা: শোনো মোড়ল নানা বলি যে তোমারে
এমন ছেলের কাছে মেয়ে দিব না দিব না
সমবেত কণ্ঠে: শোনো মোড়ল নানা বলি যে তোমারে
এমন ছেলের কাছে মেয়ে দিব না দিব না

ববিতা: কন্যার হাতে মেন্দি আছে হিরার আংটি নাই

সমবেত: আহা হিরার আংটি নাই
ববিতা: মুখের চন্দন নষ্ট হয় যে আবির পাঞ্জা চাই
সমবেত: আবির পাঞ্জা চাই
ববিতা: আমার একখান কথা আছে দশজনারে কই
সমবেত: আহা দশজনারে কই
ববিতা: যত কিছু বোঝাও তোমরা আমি রাজি নই
সমবেত: আহা আমি রাজি নই
ববিতা: তোমরা মানুষ যখন ভালো না কবুল করতে দিব না
সখী আমার সোনাভান নিতে পারবা না।
সমবেত: পারবা না।

গানটিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটি চিত্র ওঠে আসে। বর পক্ষ কন্যারে নিতে আসে কিন্তু আনুষ্ঠানিকতার নানা ত্রুটি ধরা পড়ে। তা দেখে সুন্দরী অবাক হয় অতঃপর সকলের সামনে গানের মাধ্যমে তা তুলে ধরে। লেখা পড়া না জানলেও সুন্দরী খুব স্পষ্টভাষী সোজা সাপটা কথা বলে অভ্যস্ত এবং নারীর অধিকার সচেতনও বটে। গানেও তা ব্যক্ত হয়–'কন্যারা যে দুধ খাওয়ামু সোনার বাটি কৈ, এমন কথা কইতে গেলে আমি মন্দ হই।' পুরুষের যৌতুক নেবার প্রথা চালু আছে কিন্তু নারীর কোন চাওয়ার অধিকার নেই। বর পক্ষ যা দেবে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার প্রবণতা এ সমাজে দীর্ঘকাল ধরে চালু আছে। সুন্দরী এই স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে গানের মাধ্যমে বলার চেষ্টা করে। সমগ্র নারী জাতির প্রতিনিধিত্ব করে যেন সুন্দরী। ফলত বর পক্ষের লোকজন অসন্তুষ্ট হয় এবং তাতে কনের বাবা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ভীষণ রাগান্বিত হয়।

গান শেষে দেখা যায় কন্যার বাবা সুন্দরীকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় আর বলে: 'তোরে এই গান কে গাইতে কইছিলো? এই গান গাওনের লিগা তোরে আমি কন্টাক (কন্ট্রাক্ট) করছি। সুন্দরী বলে: 'গামুনা কাবিনের নামে গয়না দিয়া একটা ম্যায়ারে কিনা নিতেছে সারা জীবনের জন্যে। আর হেই গয়না যদি পিতলের গয়না হয় তে কমুনা? একশবার কমু, হাজার বার কমু, আমার কন্টাকের টাকা দেন। আমি চইলা যামু।' চাচা বলে: 'তুই আর এক পয়সাও পাবি না। আমার জামাই, জামাইয়ের জ্ঞাতি গোষ্ঠীরে তুই গালাগালি করবি। আর তোরে আমি ট্যাকা দিমু? বার হ বার হ আমার বাড়ি থিক্যা।'

সুন্দরী ভীষণ ক্ষুধার্ত তাই সে একমুঠো খাওয়ার জন্য চাচার কাছে অনুনয় করে বলে: 'চাচা অহন বাজে বেলা বারোডা। কত মানুষ তো আপনার বিয়া বাড়িতে খাইতাছে। আমি অহন পর্যন্ত এক গ্লাস পানিও খাই নাই। আমার ঘরে আজ চাইল ডাইল কিছুই নাই। আমার কন্টাকের টাকাটা দেন। তা না হইলে আমি না খাইয়া থাকুম।' চাচা ক্ষেপে গিয়ে বলে: 'এক পয়সাও পাবি না তুই।' সুন্দরীর কোনো কথাই শোনে না চাচা বরং আরো অপমানের ভয় দেখিয়ে বলে: 'যাবি না বিয়া বাড়ির সমস্ত ম্যানষেরে ডাক দিমু। ক্ষুধার্ত পেটে কান্না করতে করতে চলে যায় সুন্দরী।

গ্রামাঞ্চলের বহুল প্রচলিত বিবাহ সংক্রান্ত গান চলচ্চিত্রের কাহিনিতে ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে মিজানের *চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা* (১৯৮৪) চলচ্চিত্রে–'লীলা বালি লীলা বালি বরো যুবতী সইগো,

বরো যুবতী সইগো, কি দিয়া সাজামু তোরে'। উক্ত গানে রাজ নর্তকী দিলরুবা এবং আসলামের নাচ-গানে জমজমাট হয়ে উঠে শাহী মহল। চলচ্চিত্রের কাহিনিতে দেখা যায় পয়গম্বর পাঠালে আরাকানের বাদশা আসে শাহী মহলে। প্রায় সকলের উপস্থিতিতে তার পুত্র শাহজাদা নওশাদের (ওয়াসিম) সাথে শাহজাদি দিলরুবার (অঞ্জু) বিবাহের দিন তারিখ ধার্য হয় আগামী চাঁদের প্রথম দিবসে। তারপর শুরু হয় উপরে বর্ণিত গান এবং নাচ। আজিজুর রহমানের *রঙিন কাঞ্চন মালা* (১৯৮৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি মৃত বাদশার কন্যা কাঞ্চনমালা (রোজিনা) এবং শাহজাদা ফারুকের (সাত্তার) বিবাহ উপলক্ষ্যে পরিবেশিত হয়–

একক: রাজ দুলালী আজই যাবে স্বামীর ঘরে
সমবেত: এই কামনা করি থেকো সুখের বাসরে ॥

বিয়ের গানে সাধারণত নতুন দম্পত্তিকে ঘিরে নানা ধরনের শুভ কামনা করা হয়। সংসার জীবনে যেন তারা সুখ-শান্তিতে বসবাস করে। স্ত্রী যেন তার পতি সেবায় নিজেকে নিবেদিত রাখে। সে কথাই ব্যক্ত করা হয়–'স্বামীর চরণতলে বেহেশত নিও গড়ে'

গ. বাসর ঘর তৈরির গান

বিবাহত্তোর সম্পর্ক যাপনের বিশেষ স্থানের নাম 'বাসর ঘর'। এই ঘরটিকে তৈরি কিংবা নানা সাজে সজ্জিত করার প্রচলন রয়েছে বহু আগে থেকেই। তেমনি আবার এটিকে ঘিরে নানা আনুষ্ঠানিকতা বিশেষত গান পরিবেশনারও রীতি রয়েছে; গ্রামাঞ্চলে তা বেশি লক্ষণীয়। যদিও নগরায়ণের ফলে এই গানের প্রচলন এখন খুব একটা নেই বললেই চলে তবে অনেক অঞ্চলে এখনো এই গানের প্রচলন রয়েছে বলে জানা যায়। কালের বিবর্তনে বাংলার লোকঐতিহ্যিক অনেক বিষয় বিলুপ্তির পথে পাড়ি জমালেও চলচ্চিত্র মাধ্যমের কারণে তা আজ সংরক্ষিত হয়ে আছে। জহির রায়হান পরিচালিত *বেহুলা* (১৯৬৬) চলচ্চিত্র বাংলার চিরায়ত লোকসংস্কৃতির বিষয়সমূহের চিত্রায়ণ যা ইতিহাসের অন্যতম পরিচয়বাহী। বাসর ঘর তৈরির বিষয়টি আমাদের সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বেহুলা এবং লখিন্দরের জন্য লোহার বাসর ঘর নির্মাণ করা হয়। যাতে কোন প্রকার সাপ ঢুকতে না পারে। কিন্তু এতে সর্পদেবী মনসার উক্তি প্রকম্পিত হয়–'বার বার পরাজয়। মর্তের মানুষ তুচ্ছ সওদাগরের কাছে এতবার হেরে যাচ্ছি।' বিশু মিস্ত্রী তার সহকারীদের নিয়ে গানে গানে লোহার বাসর ঘর তৈরি করে–

বাসর বান্দিলাম বান্দিলাম
লোহার বাসর ঘর বাসর বান্দিলাম (বান্ধিলাম)
ওরে সেই বাসরে বসত করবে বেহুলা-লখিন্দর ॥

ঘ. বাসর রাতের গান

বাঙালি নারী-পুরুষের জীবনের স্মরণীয় এবং কাঙ্ক্ষিত একটি রাতের নাম 'বাসর রাত'। ফুল শয্যার রাতও বলা হয়। একে অপরের কাছে সমর্পিত হওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয় তাদের আগামী দিন। জহির রায়হান পরিচালিত *বেহুলা* (১৯৬৬) চলচ্চিত্রে দেখা যায় লখিন্দর (রাজ্জাক) লোহার বাসর ঘরে শুয়ে আছে। দুধের পেয়ালা এগিয়ে দেয় বেহুলা (সুচন্দা) তার দিকে। দুধের পেয়ালাটি লখিন্দর হাতে

নেয়ার সময় বেহুলার হাতটি ধরার চেষ্টা করে। বেহুলা কৌশলে তার হাতটি সরিয়ে নেয় লজ্জা আড়ষ্ঠতায়। গানের মাধ্যমে তার মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে–

প্রভু না না না
আজকে থুইয়া কালকে থুইয়া পরশু মঙ্গলবার
এই তিন দিন গত হইলে সবই যে তোমার ॥

৯. ব্যঙ্গাত্বক বা হাস্যরসের গান

স্বভাবত মানুষ রসিকতা প্রবণ এবং হাস্যরস ভালোবাসে। বাঙালিরও চিরায়ত রূপ এটি। হাজার বছরের লোকঐতিহ্যিক শিল্পের বিবিধ শাখা প্রশাখা, গীতিকা বা আদি শিল্পমাধ্যম যাত্রাপালাসহ লোক সংগীতের নানা শাখা-প্রশাখা প্রভৃতি পর্যালোচনা করলে তা-ই দৃষ্ট হয়। এদেশে বাড়ির উঠানে কিংবা খোলা মাঠে বসে রাত ভর যাত্রাগান, জারি গান, বাউলগান প্রভৃতি পরিবেশনা উপভোগ করার প্রচলন রয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। যাত্রাপালায় দর্শককে ক্ষাণিক বিশ্রাম দেয়ার জন্যে হাস্যরসের নানা কথা বার্তা এবং অঙ্গভঙ্গি নিয়ে উপস্থিত হয় কৌতুক অভিনেতা-অভিনেত্রী। এছাড়াও লোকসংগীতের আরেকটি ধারা জারি গান যার অন্যতম চরিত্র হলো ঠ্যাটা। পালা চলাকালিন সময়ে উপস্থিত দর্শকের মাঝে কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মূল গায়েনকে এই চরিত্রটি বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন বানে জর্জরিত করে। মূলধারার চলচ্চিত্রেও তার প্রভাব পড়েছে বিভিন্নভাবে। বিশেষত কৌতুক অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়ের পরিবেশিত হাস্যরসের গানে। আধুনিক বাংলা গানে মিলন কিংবা হাসির উপাদান কম থাকার দরূন চলচ্চিত্রে পরিবেশিত এই হাস্যরসের গান বাড়তি মাত্রা যোগ করে থাকে। এবং দর্শক মনে তা বিশেষ আনন্দের সঞ্চার হয়। ফলে এই গানগুলো বাংলা গানের সে অভাব পূরণ করতে কিছুটা হলেও সমর্থ হয়েছে। জহির রায়হান পরিচালিত *বেহুলা* (১৯৬৬) চলচ্চিত্রে বিশু মিস্ত্রী (আমজাদ হোসেন) এবং তার স্ত্রী কমলীর নাম চরিত্রে এই বিষয়ক গানের সন্ধান পাওয়া যায়। দৃশ্যায়নে দেখা যায় বিশু মিস্ত্রীর স্ত্রী কমলী বলছে:'বের হ বের হ ... সারা দুনিয়ায় ঘর তুলে বেড়ায় আর নিজের ঘরটা যে পড়ো পড়ো সেদিকে খেয়াল নেই'। ...শ্বশুর বাড়িতে ঘর জামাই থাকতে লজ্জা করে না? বউয়ের পরনে শাড়ি নেই, ঘরে খাবার নেই...'। কমলীর এমন গালিগালাজে বিশু মিস্ত্রী তার নিজের কপাল ঠোকে মনের দুঃখে গেয়ে চলে নিম্নোক্ত গানটি–

মরি হায়রে হায় দুঃখে পরান যায়
দিবানিশি জ্বইলা মরি বউয়ের যন্ত্রণায়
মরি হায়রে হায় ॥

আপাত দৃষ্টিতে গানটিতে হাস্যরসের উদ্রেক হলেও অভাব অনটন আর ক্ষুধা দারিদ্রতায় পারিবারিক কলহের বাস্তবতার চিত্রটিকে এড়ানো যায় না। ঘর জামাই বিশু মিস্ত্রী এবং তার স্ত্রী উভয়ের উপরোক্ত গানের তারই প্রকাশ ঘটে। একই দম্পতির অভিনয়ে পরিবেশিত আরেকটি গান। চাঁদ সদাগরের কাছ থেকে বাসর ঘর তৈরির কাজ পেয়ে মনের আনন্দে নেশা করে (কলকি টেনে) বাড়ি ফেরে বিশু মিস্ত্রী। বাড়ি এসে দেখে তার স্ত্রী কমলী ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমাচ্ছে। খড়ের ঘরের ভাঙ্গা জানালা দিয়ে কমলীকে দরজা খোলার অনুরোধ জানায় গানে গানে বিশু মিস্ত্রী। স্বামী-স্ত্রীর এমন উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক

গানে হাস্যরসের উদ্রেক হয়–

স্বামী: দ্বার খোলো দ্বার খোলো কমলী
আমি তোমার সোয়ামী গো ॥

স্ত্রী: মিনশেরে তুই আর কতকাল করবি গন্ডগোল
হিংড়ী গলায় পোড়ার মুখো বাজাস্‌নে আর ঢোল ॥

হাস্যরসের গান আবদুল জব্বার খানের *কাঁচ কাটা হীরে* (১৯৭০) চলচ্চিত্রেও লক্ষ করা যায়। সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা গানের মাধ্যমে একে অপরের সাথে বিনিময় করছে। তারই রূপ দৃষ্ট হয় নিম্নোক্ত গানে–

এমন বিয়া ক্যানে তুই দিলিরে দাদা
তোর বউ তরকারি রান্দে কিবা তাহার গুণ
আর আমার বউ তরকারি রান্দে দেয় না তাতে নুন ॥

সাইফুদ্দিন এবং তার সহশিল্পীর অভিনয়ে পরিবেশিত হয় উপরোক্ত গানটি। এই চলচ্চিত্রে কিপটে চাচার কৃপণতা নিয়ে রাজ্জাক এবং সহশিল্পীর অভিনয়ে পরিবেশিত আরেকটি গান; যা দর্শক মনে হাস্যরসের উদ্রেক করে–

রাজ্জাক: মরি হায়রে হায় ও মরি হায় হায়
ফসল করে একজনে আরেক জনে খায়
অন্তর মন্তর রুই কাতলা পারে ওঠে যায়
ভাতিজা: ঝুরি ঝুরি ডিম দিয়ে যায়
কিপটে বুড়োর হাসগুলো ॥

প্রমোদকারের *সুজন সখী* (১৯৭৫) চলচ্চিত্রে সখীর (কবরী) বাবা সোলেমানের (খান আতা) দোকানে কাজ করে বগা (টেলিসামাদ)। দোকান মালিকের একমাত্র মেয়ে সখী। তার সাথে প্রেমের স্বপ্ন দেখে বগা। সখীর মন পাওয়ার জন্য সাধুর কাছে যায় এবং নানা তাবিজ কবজের আশ্রয় নেয়। একদিন খাওনের নাম কইরা সকলের অগোচরে সখীর ঘরে ঢোকে বগা। বিছানার উপর পড়ে থাকা চিরুনীতে আটকে থাকা চুল দেখে তার মন খুশিতে দিশেহারা হয় । বলে: পাইছি, আল্লায় দিছে, সাধু বাবা এই চুল দিয়া তুমি এমন জাদু করবা সখীরে। সখী যেন দিন রাইত আমার চিন্তায় পাগল হইয়া ঘুরে। সখীকে বশ করার নানা রকম কৌশল অলম্বন করার পরও যখন সখীর মন পায় না। তখন বিরহ-ই হয়ে উঠে তার একমাত্র সঙ্গী। তারই প্রকাশ নিম্নোক্ত গানে–

ড্যাগোর ভেতরে ডাইলে চাউলে
উতরাইলিলো সই
সেই উতরান মুরে উতরাইলি
শ্যাম পিরিতি আমার অন্তরে

আহা শ্যাম পিরিতি আমার অন্তরে ॥

চিত্র-১৩: *সুজন সখী* (১৯৭৫) চলচ্চিত্রে 'ড্যাগোর ভেতরে ডাইলে চাউলে' গানের একটি স্থিরচিত্রে টেলিসামাদ।

আপাত দৃষ্টিতে উপরোক্ত গানটিতে হাস্যরসের উদ্রেক হলেও প্রেমিক মনের কষ্টকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। বরং তা বিচিত্রভাবে বর্ণিত হয়–'বাটাটা বিছায়া মরিচও পিষাইলে গো সই, সেই পিষান মোরে পিষাইলি, শ্যাম পিরিতি আমার অন্তরে।' এতেই ক্ষান্ত হয়নি প্রেমিক হৃদয়। কাগজের ঘুড়ির সাথে নিজের যন্ত্রণার তুলনা করে বলেছে–'কাগজের ঘুড্ডি পবনে ওড়ে ওগো সই সেই উড়ান মুরে উড়াইলি, শ্যাম পিরিতি আমার অন্তরে।' সাদা মাটা মানুষের মনের কষ্টগুলো অত্যন্ত সহজ, সরল এবং সাবলীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অশোক ঘোষের *মতিমহল* (১৯৭৭) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিতেও হাস্যরস তৈরির প্রচেষ্টা লক্ষণীয়–

দিওয়ানা বানাইয়া
খাইবা আমায় গিল্লা
এতো কলজা (কলিজা) কোথায় পাবো হায় গো ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় মতি মহলে কাজের মেয়েরা নায়েবের কন্যা ফিরোজা বানুর (কবরী) সাথে ছোট নবাবজাদা জামশেদের বিবাহ উপলক্ষ্যে রান্না বান্নায় ব্যস্ত। টেলিসামাদ একটা বড় গামলা করে খাসির কলিজা নিয়ে কদবানুর কাছে যায়। বলে: 'কদবানু আমার কলিজে গ্রহণ করো।' কদবানু অবাক হয়ে বলে: 'আপনার কলিজে? এতো খাসির কলিজে।' ওই একই কথা প্রথমে লও কলিজে খাসি। তারপর দেবো কলিজে হাদির।' ফুলবানু দূরে দাঁড়িয়ে রান্না করে। তার এ কথা শুনে হাসিতে ফেটে পড়ে সে। তার কাছে গিয়ে বলে: ফুলবানু তুমি হাসছো? ফুল বানু বলে কদবানু রে কলিজে দেবেন। আমারে দেবেন কি? টেলিসামাদ কাউকে ফেরায় না। বরং এক এক করে সবাইকে তার অঙ্গগুলো ভাগ করে দেয়ার কথা ব্যক্ত করে নিম্নোক্তভাবে গানের মাধ্যমে–

গুল বানুরে গুর্দা দিলাম কলজা দিলাম পরিরে
ফুলজানেরে পরান দিলাম ফ্যাফসা দিলাম বুড়িরে
আমার দেহ কাইট্টা কুইট্টা ভাগা ভাগি কইরা লও
হাড্ডি গুড্ডি নাড়ী ভুড়ি তোমরা যে যা নিতে চাও
মাইয়া মানুষ দেখলে আমার মাথা ঘুইরা যাই গো ॥

কিন্তু তারা তা নেবে না বরং তাদের সবার দাবী একটাই: কলিজা চাই। এমতাবস্থায় টেলিসামাদ পড়ে চরম বিপাকে। আসলে তা টেলিসামাদকে পাওয়ারই ইঙ্গিত বহন করে। বিপাকোত্তার পরিস্থিতিতে পরিবেশিত হয় উপরোক্ত গান। মোস্তাফা মেহমুদের *মধুমিতা* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে হাস্যরসের নিম্নোক্ত গান টেলিসামাদ এবং আঞ্জুমান আরার কণ্ঠে গীত হয়–

বুকে চাক্কু মাইরা যাবি ছাইড়া
হে হে সুন্দরী
এমন কথা হইতে পারে না ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় ঘটক হেকমত আলী (টেলিসামাদ) গাছের উপর বসে হেরে সুন্দরীর গোসল করা দেখে। হেরে সুন্দরী তার গোসল করা শেষে কলসি কাখে রওয়ানা হয় বাড়ির দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে গাছ থেকে লাফ দিয়ে নামে হেকমত। হেরে সুন্দরী আঁতকে ওঠে এবং কলসি খানা পড়ে আধখানা হয়ে যায়। এগিয়ে গিয়ে বলে: 'হেকমত ভাই ব্যথা পাইছো? হেকমত বলে: হ্যা পাইছি পাইছি। পায়ের হাঁটুতে মালিশ করে হেরে। কিন্তু হেকমত তার হাত সরিয়ে বুকের কাছে নিয়ে বলে এই হানে (এই খানে)। এই কথা শুনে হেরে ধাক্কা মেরে চলে যায়। মাটিতে পড়ে থাকে হেকমত। তারপর দেখা যায় হেরের নিতম্বের ক্লোজশট জুম আউট হয়ে লংশটে পরিবর্তিত হয়। হেকমত তা দেখে বলে: 'খাইছে খাইছে, চাক্কু মাইরা দিছে, হায় হায়রে বুকে চাক্কু মাইরা দিছে।' বলে জ্ঞান হারানোর ভান করে।

পিছন ফিরে দৌড়ে আসে হেরে। তার বুকে মাথা রেখে হৃদ-গতি পর্যবেক্ষণ শেষে চলে যেতে উদ্যত হয়। হেকমত তার হাত টেনে ধরে এবং উপরোক্ত গানের মাধ্যমে দু'জনে একে অপরের মনের ভাব প্রকাশ করে। গানটিতে হাস্যরস সৃষ্টি হয়। চলচ্চিত্রে বিশেষ বিনোদনের জন্য পরিচালক এই গানের অবতারণা করে থাকেন। গানটিতে পুরুষের বিয়ে এবং তার সক্ষমতা নিয়ে হেরের নানা প্রশ্ন থাকলেও গান শেষে সবকিছু মেনে নিয়ে দু'জন-দু'জনাকে ভালবাসার চিত্র অঙ্কিত হয়। হেরে বলে: 'চাই না তোর টাকাকড়ি, চাইনা গয়না শাড়ি, বিয়ার পরে ঝগড়াঝাটি আর তো করুম না। হেকমত: তোরে ছাড়া আমি বাঁচুম না।'

অশোক ঘোষের *বাদল* (১৯৮১) চলচ্চিত্রে হাস্যরসের গান টেলিসামাদের অভিনয়ে–'অই এখন কি করি, একটা মালা কয় গলায় পড়ি, রূপের হাটে ছড়াছড়ি, লাল পরি আর নীল পরি, অই একটা মালা কয় গলায় পড়ি।' আজিজুর রহমান বুলির *নেপালী মেয়ে* (১৯৮৫) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি রথীন্দ্রনাথের কণ্ঠে টেলিসামাদের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়; যা মূলত হাস্যরস তৈরির নিমিত্তে ব্যবহৃত। গানের ভেতর যে সব কথা বার্তার প্রকাশ তা যেন তারই ইঙ্গিতবাহী। টেলিসামাদ তার স্ত্রীকে রাজরানি করে রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়। আবার বিনা পয়সায় বিয়ে করবে না। শ্বশুর বাড়ি থেকে টাকা আনার প্রসঙ্গ টেনে বলে: আমি তালের দিওয়ানা বেতালে চলি না, বিয়ার সাথে চাই মালপানি।'এক ধরনের বাড়াবাড়ি দেখা যায় যা মূলত হাস্যরস তৈরির প্রয়াসে রচিত।

ষাট বছরের খুকি বিয়া করবানি

আমায় বিয়া করবানি
ঘরের ঘরনি চাইনা আমি
কইরা রাখুম রাজরানি

কত জয়গুন বাইগুন আর ফুলজান কুলসুম
আমার পিছে তারা ঘুর ঘুর করে
কত বাবা-মায়ে চায় জামাই করে
মেয়ে তুলে দিতে আমার ঘরে
আমি তালের দিওয়ানা বেতালে চলি না
বিয়ার সাথে চাই মালপানি ॥

আজিজুর রহমান বুলির *দেশ বিদেশে* (১৯৮৭) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানে হাস্যরসের উদ্রেক হলেও আসলে তা ভিন্ন অর্থ অর্থাৎ জীবন-জীবিকার কঠিন বাস্তবতার চিত্র ওঠে আসে। বাংলাদেশের ছেলে কালা মিয়া (টেলিসামাদ) লেখাপড়া জানে না। ইংরেজিতে কেবলমাত্র ইয়েস নো ভেরি গুড ছাড়া কিছু বলতে পারে না। বিদেশে যেয়ে পড়ে চরম বিপাকে অবশেষে নিম্নোক্ত গান গেয়ে রোজগারের পথ তৈরি করে–

প্যাটের ক্ষুধায় ইচ্ছা করে
গাড়ির নিচে মারি ঝাঁপ
ক্যান যে বিদেশে আইলাম বাপরে বাপ ॥

প্রতিটি মানুষ তার জীবনে হাস্যরস তৈরির প্রয়াস খুঁজে পায় নিজের মত করে। শ্রেণি ভেদে এই রূপ হয় ভিন্ন। শহরে কিংবা উচ্চবিত্তের কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্রে বিশেষত নায়ক-নায়িকার মাঝে হাস্য রসের প্রকাশ নাই বললেই চলে। বিশেষত গ্রামীণ পটভূমিতে নির্মিত চলচ্চিত্র ছাড়া। নিম্ন মধ্যবিত্তের কাহিনিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার মাঝে গানের মাধ্যমে খুনশুটিমূলক হাস্যরসের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। দর্শক এই গানের মাধ্যমে বিনোদন লাভ করে। তবে ক্রমশ এই গানের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে হতাশা জনকভাবে।

১০. সাপুড়ে বা সর্প বিষয়ক গান

নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওর প্রভৃতি বেষ্টিত এদেশের ভূ-খণ্ডে বসবাসরত মানুষ নানা রকম বিপদ শঙ্কুল পরিবেশের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছে। বেঁচে থাকার প্রেরণা হিসেবে বিবিধ দেব-দেবীর নৈকট্য সাধন অতঃপর নিজেদেরেকে সমর্পন করার রীতির প্রচলন রয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিবিধ শাখা-প্রশাখায় তার নির্দশন রয়েছে বিস্তৃত পরিসরে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, সাপের আক্রমণ ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য তারা নানা রকম শক্তির আশ্রয় খুঁজেছে। জন্ম নিয়েছে নানা কল্পকাহিনির। এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত সনাতন ধর্মাবম্বলীদের মাঝে সর্প বিষয়ক দেবী মনসা পূজার প্রচলন রয়েছে। দেবী মনসার মাহাত্ম্য বর্ণনা তথা চান্দ সওদাগরের কাহিনি অবলম্বনে রচিত গ্রাম বাংলার মাঠে ঘাটে প্রান্তরে পরিবেশিত হয় অঞ্চলভেদে বেহুলা, বেহুলার ভাসান, বেহুলা লক্ষিন্দর প্রভৃতি যাত্রাপালা।

এরই ধারাবাহিকতায় চলচ্চিত্রে সর্পবিষয়ক গল্প কিংবা কাহিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং তা বিচিত্রভাবে চিত্রিত হয়েছে এবং চলচ্চিত্রের নামের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে তার বিষয় আশয়। যেমন:

ইবনে মিজানের *নাগিনীর প্রেম* (১৯৬৯), *নাগ নাগিনী* (১৯৭৯), এফ কবীর চৌধুরীর *শীষ নাগ* (১৯৭৯) শেখ নজরুল ইসলামের *নাগিন* (১৯৮০), মাসুদ পারভেজের *নাগ পূর্ণিমা* (১৯৮৩), দেলোয়ার জাহান ঝন্টুর *নাগ রানী* (১৯৮৩), ইবনে মিজানের *সতী নাগ কন্যা* (১৯৮৫), মতিউর রহমান পানুর *নাগ মহল* (১৯৮৬), নূর হোসেন বলাইয়ের *বিষকন্যার প্রেম* (১৯৮৬), শহীদুল ইসলাম খোকনের *পদ্মগোখরা* (১৯৮৭), মতিউর রহমান বাদলের *নাগিনা* (১৯৮৭) ইবনে মিজানের *নাগ জ্যোতি* (১৯৮৮), দারাশিকোর *সর্পরানী* (১৯৮৮), শফিউল আলম আজমের *রঙিন অরুণ বরুণ কিরণ মালা* (১৯৮৮), চাষী নজরুল ইসলামের *রঙিন বেহুলা লক্ষিন্দর* (১৯৮৮), ইবনে মিজানের *সাপুড়ে মেয়ে* (১৯৮৯), তোজাম্মেল হক বকুলের *বেদের মেয়ে জোসনা* (১৯৮৯) প্রভৃতি। উপরোক্ত চলচ্চিত্রের বিষয় বা কাহিনির উপর নির্ভর করে রচিত হয় এর গান। তবে অন্যান্য বিষয়ের গানও রয়েছে যা কাহিনির সূত্র ধরে আবির্ভূত। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

জহির রায়হানের *বেহুলা* (১৯৬৬) চলচ্চিত্রে দেখা যায় মনসার নির্দেশ মতে সাপ ঢোকে বাসর ঘরে। সাপ দেখে আঁতকে ওঠে বেহুলা। সাপকে অনুনয় বিনয় করে, যেন তার স্বামীকে না কাটে। সাপটিকে দুগ্ধ পান করতে দেয় এবং সাপের মন্ত্র জপে–'বাটি ভরা দুগ্ধ আমি দিলাম তোমায়, তাহারে করিয়া পান, লও হে বিদায়, সাপরে সাপরে তুমি সাপ মোর ভাই, তোমার তুলনা সে তো পৃথিবীতে নাই'।

উত্তর বাঁধলাম পশ্চিম বাঁধলাম বাঁধলাম পূর্বদ্বার (সাপের মন্ত্র)
দক্ষিণ দ্বারে সর্বনাশা সকল মানুষ আর
সাক্ষী থাইকো চন্দ্র সূর্য প্রভু অবতার
দক্ষিণ দ্বারে সর্বনাশা সকল মানুষ আর
সতী আমি সতী নারী পতি লক্ষিন্দর
সত্য সত্য সত্য হইলে খাবি কি এই ঘর ॥

খান আতাউর রহমান পরিচালিত রূপকথাভিত্তিক *অরুণ বরুণ কিরণ মালা* (১৯৬৮) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটি সর্পজীবি শিশুর অভিনয়ে পরিবেশিত হয় এবং পরবর্তীতে গানের মাধ্যমে এই শিশুরা ধীরে ধীরে বড় চরিত্রে পরিণত হয়। এটিও মূলধারা চলচ্চিত্রের বিশেষ একটি রীতি হিসেবে প্রচলিত। তা কেবল গানের মাধ্যমেই প্রকাশ প্রবণতা লক্ষণীয়। চলচ্চিত্রের কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গান যেমন বিশেষ ভূমিকা রাখে তেমনি চরিত্র বিকাশের অনেক ক্ষেত্রে একই রূপ পরিলক্ষিত হয়। বড়দের গানে কণ্ঠ দিয়েছেন সৈয়দ আবদুল হাদী এবং সাবিনা ইয়াসমিন।

আমরা এক বোন দুইটি ভাই
অরুণ বরুণ কিরণ মালা
আমরা সাপ খেলা দেখাই ॥

এই চলচ্চিত্রের আরেকটি সাপুড়ে গান। রাজদরবারে রাজার সামনে বিশেষ একটি উদ্দেশ্য পূরণার্থে পরিবেশিত হয়। এই রীতির প্রচলন রয়েছে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প ইতিহাসের প্রায় সবাক যুগে অর্থাৎ গান ব্যবহারের পর থেকেই। গানের মাধ্যমে বিশেষ একটি কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয় এবং কুচক্রীর হাত থেকে নির্যাতিত, নিরাপরাধ মানুষকে রক্ষা করার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত

আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের গানের অংশে। নিম্নোক্ত গানের বাণীতে নাটকীয় বিষয় দৃষ্ট হয়–

খা খা বক্ষিলারে কাঁচা ধইরা খা
যাদের বাইরে সরল ভিতর গরল
খা রে তাদের ধইরা খা ॥

চলচ্চিত্র মাধ্যমে গানের শক্তি এভাবেই প্রতিফলিত হয়। যেখানে বলা হয়েছে–'আমানতের মাল যারা খিয়ানত করে হায়, ইমানি বেইমানি যারা করে দুনিয়ায়।' গানের শেষে আরো বলা হয়েছে যারা কালকে প্রজা আজকে রাজা, খারে তাদের ধইরা খা, খা খা চাকরের বউরে খা, রাখালের বউরে খা, রাজারে যে পাগল বানায়, সেই সেনাপতি তারে ধইরা খা।' কণ্ঠশিল্পী সৈয়দ আবদুল হাদী এবং সাবিনা ইয়াসমিন।

এই ধরনের বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের গান ইবনে মিজান পরিচালিত *রাখাল বন্ধু* (১৯৬৮) চলচ্চিত্রেও লক্ষ করা যায় যে, একদিন রাজ কর্মচারীরা রাখাল বন্ধুকে ধরে নিয়ে যায় এবং বন্দি করে তার উপর নির্যাতন চালায়। রাখালকে তিনদিনের সময় বেঁধে দেয়া হয় যে, হয় বিষ পান করে আত্মহত্যা করবে, নতুবা জল্লাদ তার গলা কাটবে। অপরদিকে রাখাল বন্ধুর প্রেমিকা পরিবানু আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে ফুলবানু রাজবাড়ি এসে শাহজাদার খপ্পরে পড়ে। তাকে সে প্রমোদ কক্ষে নিয়ে নাচতে বাধ্য করে। ফুলবানু রাজি না হলে তাকে সে চাবুকের ভয় দেখায়। ফুলবানু কৌশলে কাজ হাসিল করার পরিকল্পনা করে। অবশেষে শাহজাদার পাত্রে শরাব ঢেলে দিতে রাজি হয় এবং সঙ্গে নাচে গায়–

নয়নে নয়নে কী দোলা লাগে
এ মধু ক্ষণ দিওনা বিফলে
বাহু ডোরে বাঁধো মোরে প্রীতির ছলে ॥

উপরোক্ত গানের মাধ্যমে নেচে গেয়ে শরাব খাইয়ে শাহজাদাকে অজ্ঞান করে ফুলবানু তার উদ্দেশ্য হাসিল করে। কারাগার থেকে রাখালবন্ধুকে মুক্ত করে তার প্রেমিকা পরিবানুর নিকট নিয়ে যায়। গানের বাণীতে বিনোদনের জন্য আকর্ষণীয় শব্দ রয়েছে যা মনোরঞ্জনমূলক গানের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও তা কেবলমাত্র বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে ব্যবহৃত হয়েছে।

শেখ নজরুল ইসলামের *নাগিন* (১৯৮০) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি সাপ ধরার কৌশল আয়ত্ত করার বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিবেশিত হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় ঘটনাচক্রান্তে জমিদারের কিশোরী কন্যা জেবাকে সর্প দংশন করে। তারপর প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। এরপর মংরু বেদে তাকে বিশেষ কৌশলে বাঁচিয়ে তোলে। তার ছেলে-মেয়ের কাছে বড় হয়। বেদে বহরে রাজকন্যা জেবার নাম হয় দুলি। সাপ ধরার বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করতে যেয়ে দেখা যায় দুজনই বড় চরিত্রে পরিণত হয়। জেবা হয় দুলি অর্থাৎ (সুচরিতা) এবং চম্পা (নূতন)। তাদের নাচে-গানে মুখরিত হয় বেদে পল্লী–

হায় গোখরা রে গোখরা
আরে ছাড় তোরে নখরা
ভেঙ্গে দেব বিষের দাঁত
হারায়ে জাত বেদেনির হাত
ছেড়ে দেরে নখরা
আজ হয়ে যাবে বাজিমাত
হারায়ে জাত বেদেনির হাত

এই চলচ্চিত্রে আরো একটি গান যা গেয়ে দুলি এবং চম্পা সাপ খেলা দেখায়। উপস্থিত দর্শকদের মাতিয়ে তোলে।

চম্পা দুলি নাম আমাদের
সাপ খেলা দেখাই
সাপ নাচাতে রঙ্গভরে অঙ্গ যে দোলাই
শঙ্খচূড়ের বিছা মোরা কোমরে জড়াই

১৯৮৯ সালে তোজাম্মেল হক বকুল বেদে সম্প্রদায়ের জীবন কাহিনি নিয়ে নির্মাণ করেন *বেদের মেয়ে জোসনা*। নির্মিত এই চলচ্চিত্রে বেদেরা তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে সাপের খেলা দেখিয়ে। চলচ্চিত্রে দেখা যায় জনৈক ব্যক্তি রানি মা কে খবর দেয় যে দুইজন বেদেনি এসেছে তারা সাপের খেলা দেখাতে চায়। সঙ্গে থাকা উজির কন্যা এ কথা শুনে সাপের খেলা দেখার খুব আগ্রহ প্রকাশ করে এবং আহ্লাদে রানি মা'র গলা ধরে বলে: 'রানি মা আমি সাপের খেলা দেখবো।' রানি মা তারার থুত্নি ধরে বলে: দেখবে ? চলো' তারপর রানি মা তার আসনে বসে। শুরু হয় সাবিনা ইয়সামিনের কণ্ঠে এবং বেদে কন্যার (অঞ্জু) অভিনয়ে নিম্নোক্ত গান–

ও রানি সালাম বারে বার
নামটি আমার জোস্না বানু রানি থাকি লক্ষার পার
মোরা এক ঘাটেতে রান্ধি বাড়ি
আরেক ঘাটে খাই
মোদের সুখের সীমা নাই
পথে ঘাটে লোক জমাইয়া মোরা সাপ খেলা দেখাই
মোদের সুখের সীমা নাই
ও মোদের সুখের সীমা নাই

গানে গানে বেদেনির পরিচয় পর্বের উপস্থাপন শেষ হলে রানি মা বলে: 'বেশ বেশ এবার সাপের খেলা দেখাও।' তারপর আবার শুরু করে গানের নিম্নোক্ত অংশ–

আরে ও ও ও পাহাড়িয়া সাপের খেলা
লাগল আজি রঙের মেলা
সেই খুশিতে মন উতলা

খেলা খেলা
পাহাড়িয়া সাপের খেলা

উপস্থিত দর্শককে নানা ভাবে ভয় দেখিয়ে আরেক বেদেনি অর্থাৎ জোস্‌নার দাদি (রওশন জামিল) গান ধরে–

খা খা খা খা আরে বক্ষিলারে খা ঐ দুশমন রে খা
জোস্‌না (অঞ্জু): কোন পাহাড়ে ছিলা তুমি আইছো রাজার বাড়িরে
ভাল কইরা দেখাও রে খেলা দিব দুধ কলারে
আরে দেখ দেখ...

বেদেরা তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে সাপের খেলা দেখিয়ে এবং চমক লাগানোর বিশেষ কৌশল তাদের রপ্ত করা আছে। নাতিন এবং দাদি মিলে জমিদার বাড়ির উঠোন নাচে-গানে মাতিয়ে তোলে এবং উপস্থিত রানিসহ সকলে তা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে। প্রসঙ্গত, শিক্ষার অভাবে নানা কুসংস্কারে জর্জরিত ছিল এদেশের মানুষ। বিজ্ঞানের আর্বিভাব এবং আধুনিকায়নের ফলে এদেশের মানুষের জীবন যাপনে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তেমনি চিকিৎসা বিজ্ঞানও হয়েছে উন্নতি। ফলে বেদে সম্প্রদায়ের পেশা আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে এবং দীর্ঘদিনের পেশা বদল করে তারা আজ আধুনিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে নির্মিত চলচ্চিত্র এবং তার ব্যবহৃত গানের মাধ্যমে বেদে পল্লীর জীবন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করবে।

১১. বিবেকের গান

বৌদ্ধ পরবর্তী যুগ থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা নাটক বা যাত্রা পালায় বিবেক নিয়তি সূত্রধরের গান একটি উল্লেযোগ্য সংগীত ধারা হিসেবে জনপ্রিয় ছিল।[১৮] সংস্কৃত নাটকে এই কাজটি করত সূত্রধর। কোন একটি চরিত্রের উপর যাত্রাপালায় কিংবা নাটকে অন্যায়ভাবে জুলম চাপালে বিশেষ একটি চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে। যার নাম বিবেক। ১৮৯৪ সালে পালাকার অহিভূষণ ভট্টাচার্য তাঁর 'সুরথ-উদ্ধার' যাত্রা পালায় প্রথম বিবেক নামক চরিত্রের অবতারণা করেন। এই পালার বিবেকের গান–'আপন বুঝে চল এই বেলা, ঐ বাস্তশকুন উড়ছে মায়ায় গো, বসে যুক্তি দিচ্ছেন হাড় গোলা।' এই গানটি যাত্রাপালার ইতিহাসে প্রথম বিবেকের গান।[১৯] এই গানটি দিবোদাস নামে যে বিবেক বার বার গেয়েছিল তা ছিল অশরীরী। বিংশ শতকের তিরিশের দশকের মাঝামাঝিতে অশরীরী বিবেক শরীরী রূপ পায়। বিবেক রূপান্তরিত হয় দাঁড়ি, মাঝি, ভিক্ষুক, চাষি, মজুর, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ ইত্যাদি চরিত্রে। যাঁর হাত ধরে এই বিবর্তনের সূচনা হয়েছে তিনি যাত্রা পালার সম্রাট হিসেবে খ্যাত ব্রজেন্দ্র কুমার দে। অহিভূষণ ভট্টাচার্যের অশরীরী বিবেককে তিনিই প্রথম নাটকীয় কৌশলে পালা কাহিনির একটি অন্যতম চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেন ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গবীর' যাত্রা পালায়।[২০]

সৃষ্টিকর্তার কৃপা লাভ, আশার সঞ্চারণ, মনস্তত্ত্ব, দর্শন, আধ্যাত্মিক চেতনায় সাজানো হয়ে থাকে এই গানের পঙ্‌ক্তিমালা। বিশেষ এক দীর্ঘ সুরের সহযোগে গান গাইতে গাইতে মঞ্চে প্রবেশ করে বিবেক এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের কথা বলে মঞ্চ ত্যাগ করে। বর্তমানে যাত্রা ও নাটকের ক্ষেত্রে আঙ্গিকের পরিবর্তন হলেও বিবেকের গান বাংলা গানের বিশেষ একটি ধারা হিসেবে আজও চিহ্নিত

রয়েছে। এমত আছে যে, উক্ত চরিত্রের মাধ্যমে কাহিনিকার কিংবা নাট্যকার আসলে তার নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশ করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে 'দাদা ঠাকুর' নামক একটি চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেন এই চরিত্র। যার মাধ্যমে তিনি নিজের বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ করে থাকেন।

এরই ধারাবাহিকতায় চলচ্চিত্রে এই গানের ব্যবহার লক্ষ করা যায় অধিক পরিমাণে। সালাহ্উদ্দিন পরিচালিত লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্র *রূপবান* (১৯৬৫) এর নিম্নোক্ত গানটি নৌকার মাঝি চরিত্রে পরিবেশিত হয়। *রূপবান* গ্রাম বাংলার মানুষের অতি জনপ্রিয় যাত্রা পালা। পরিচালক রূপবানের চিত্রায়ণ করেন অনেকটা যাত্রার আদলেই। দৃশ্যায়নে দেখা যায় নিরাশপুরের আঁটকুড়ে বাদশা একাব্বর (সিরাজুল ইসলাম)। তিনি মনে করেন যে, সিংহাসন ছেড়ে ফকির বেশে বনে বনে ঘুরলে আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করবেন অর্থাৎ পিতৃত্বলাভে সক্ষম হবেন। তাই তিনি রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব ভার উজিরের (তেজেন চক্রবর্তী) উপর অর্পন করে, বলেন: 'আমার মনোবাঞ্ছা যতদিন পূর্ণ না হয় ততোদিন আমি রাজ্যের ধারে আসব না। আমার অনুরোধ আমার অনুপস্থিতিতে আপনি রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করবেন।' রাজ্য ছেড়ে চলে যান তিনি। এক সময় নদী পার হতে হলে নৌকার মাঝি জিজ্ঞেস করে: 'আপনি কেডা মিয়া ? আপনার পায়ে দেহি জড়ির জুতা।' অপর মাঝি বলে: 'এ যে দেহি একবারে একাব্বর বাদশার জুতার লাহান।' (বাদশা কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকে) আরে থুথু হেই ব্যাটা আঁটকুড়ে বাদশার নাম কইরা দিলিতো আইজগ্যা দিনডা মাটি কইরা। ব্যাটা পাজি নচ্ছার কোথাকার।' মাঝিদের এমন বাক্যালাপে বাদশা ব্যথিত হয় সেই অভিব্যক্তির শট এবং গুন টেনে মাঝি নৌকা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার শট। এছাড়া বিশাল জলরাশির শট ধারণের মাধ্যমে মাঝির অভিনয়ে পরিবেশিত হয় নিম্নোক্ত গান–

ঢেউ উঠছে সাগরে রে
ক্যামনে পাড়ি ধরি রে
দিবানিশি কান্দি রে নদীর কূলে বইয়া ॥

চিত্র-১৪: *রূপবান* (১৯৬৫) চলচ্চিত্রে 'ঢেউ উঠছে সাগরে রে' গানের একটি স্থিরচিত্রে জনৈক মাঝি।

অথৈ পানির নদী যেন কূল কিনারা বিহীন। এই অনিশ্চিত যাত্রার সত্যিকারে গন্তব্য কোথায়? এই মানব জীবনের আসলে কোথায় মুক্তি। তারই ইশারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় গানটিতে। আবার বলা হয়েছে–

হায় মন রে -
অনাথেরে করো দয়া তুমি কান্ডারি হইয়া

এ যেন অনাথের উপর আল্লাহর অশেষ রহমত কামনা। নিরাশপুরের বাদশা যেন নিরাশ না হন। আশায় বুক বেঁধে তিনি যেন অকুল সাগর পার হতে পারেন তারই যেন ইশারা। আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শে রচিত গানটির নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী আবদুল আলীম। সংগীত পরিচালনা করেছেন সত্য সাহা। এ চলচ্চিত্রে একই শিল্পীর কণ্ঠে একই বিষয়ের আরেকটি গান। দৃশ্যায়নে দেখা যায়। বার দিনের রহিমকে নিয়ে বনবাসে যায় রূপবান। পথিমধ্যে নদী পার হতে হয় তাকে। রূপবানের কাছে টাকা-পয়সা না থাকায় নৌকার মাঝিরা (চাচা/ভাতিজা) তাকে পার করতে রাজি হয় না। ভাতিজা উপহার কিংবা বকশিস বুঝলেও তার চাচা পয়সা ছাড়া কিছুই চিনে না। পয়সার সামনে মোহর তার কাছে মূল্যহীন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর বকশিস দেবার শর্তে মাঝি নৌকা ছাড়ে। খোলা নৌকার মাঝে বারদিনের শিশু স্বামী শাহজাদা রহিমকে নিয়ে বসে আছে রূপবান। ঢেউয়ের দোলায় ছলাৎ ছলাৎ শব্দে নৌকা চলছে। আর গানটি গেয়ে চলছে মাঝি–

ও দয়ালরে একি তোমার খেলা
না মিটিতে সাধ না মিটিতে আশা
অকালে ভাসাইলাম দুঃখের ভেলা

অকালে দুঃখের ভেলায় বয়ে চলছে রূপবান। এ এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে সে। বিধির লীলা বোঝা বড়ই কঠিন। এমনতর গভীর বেদনা আর আধ্যাত্মিক চেতনায় রচিত হয়েছে গানটি। গানটির গীতিকার মাসুদ করিম। প্রসঙ্গত, ১৯৬৬ সালে ২৫টি ছবি মুক্তি পায় তার মধ্যে ১১টির মত ছিল লোকগাথাভিত্তক।[২১] *রূপবান* নির্মাণের মধ্য দিয়ে উর্দু ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা নিম্নগামী হয়। দর্শক উর্দু থেকে বাংলা ভাষার প্রতি মনোযোগী হয় এবং পরিচালক, প্রযোজক যেমন বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়ে উঠে তেমনি বাংলার আদি অভিনয়কলা যাত্রারশিল্পের ভিন্ন প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন দর্শক সানন্দে গ্রহণ করে। এই ছবির কাহিনি এবং গান আগে থেকে লোকমুখে প্রচলিত হলেও চলচ্চিত্রায়ণের মাধ্যমে এর পরিসর আরো বেড়ে যায়।

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার মর্মান্তিক পতনের ঘটনা নিয়ে নির্মিত হয় বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনানির্ভর চলচ্চিত্র নবাব *সিরাজদ্দৌলা (১৯৬৭)*। এটি পরিচালনা করেন খান আতাউর রহমান।[২২] তৎকালে *নবাব সিরাজদ্দৌলা* যাত্রাপালা ও মঞ্চনাটক হিসেবে বেশ জনপ্রিয় ছিল। এ চলচ্চিত্রে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের নিম্নোক্ত গানটিও একই ভাব ধারাকে উপস্থাপন করে। নবাব সিরাজদ্দৌলা (আনোয়ার হোসেন) যখন পালিয়ে যায় নৌকার মাধ্যমে গানের মাঝে মাঝির সঙ্গে সিপাহিদের এক সময় কথোপকথন হয়। নদীর ওপার থেকে জনৈক সিপাহি জিজ্ঞেস করে: ‘হে মাঝি কার নৌকা যায়। মাঝি উত্তরে বলে: ‘তোমার বাবার’ জনৈক সিপাহি বলে: ‘নৌকা পারে ভিড়াও’। মাঝি বলে: ‘অ্যা নৌকা পারে ভেড়াও বেটা যেন নবাব

সিরাজদ্দৌলা।' নবাব সিরাজদ্দৌলা মাঝিকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বলে: 'ও আমাকে চেনে নি' মাঝি নবাবকে বলে: 'হুজুর কয়েকজন সিপাই নৌকা পারে ভেড়াতে বলছে।' নবাব সিরাজদ্দৌলা বলে: 'তুমি বেয়েই চলো।' সিপাহিদের মধ্যে আলোচনা হয়–'সাধারণ নৌকা হবে নইলে অত সহজে কথার জবাব দিতে পারতো না। জনৈক সিপাহি বলে: 'তাই হবে।' এরপর শুরু হয় গান–

একূল ভাঙে ওকূল গড়ে এইতো নদীর খেলা
সকাল বেলা আমির যে ভাই ফকির সন্ধ্যা বেলা ॥

চলচ্চিত্রের এই গানটিতে নবাব সিরাজদ্দৌলার নিয়তির অনিবার্য দিক পরিলক্ষিত হলেও আশার সঞ্চারণও লক্ষ করা যায়। যেখানে বলা হয়েছে–'একূল ভাঙে ওকূল গড়ে এইতো নদীর খেলা, সকাল বেলা আমির যে ভাই ফকির সন্ধ্যা বেলা।' গানটি কবির মূল সুরেই ব্যবহৃত হয়েছে। মরমী শিল্পী আব্দুল আলীম গেয়েছেন। চলচ্চিত্রে জনৈক্য মাঝির অভিনয়ে পরিবেশিত হয়।[২৩]

জীবনের চরম সংকটময় মুহূর্তে বেঁচে থাকার বিশেষ অনুপ্রেরণার শক্তি হিসেবে আশা জাগানিয়া বিবেকের গানের অন্যতম বিষয়। নারায়ণ ঘোষ মিতার *এতটুকু আশা* (১৯৬৮) চলচ্চিত্রে এমন একটি গান লক্ষ করা যায়। যে গানের নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী আবদুল আলীম। চলচ্চিত্রে তা জনৈক বাউলকে একতারা বাজিয়ে নদীর পার ধরে হেঁটে হেঁটে গাইতে দেখা যায়। এটিও বিবেক চরিত্রের আরেকটি রূপ *রূপবান* চলচ্চিত্রে গানের আলোচনায় তা ব্যক্ত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন রূপধারণ করে চরম সংকটময় মুহূর্তে কিংবা অসহায় কোন চরিত্রের পাশে এসে সাহস বা আশা সঞ্চার করাই হলো এই চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই গানেও তা দৃষ্ট হয়–

মনরে দুঃখ সুখের দোলায় দোলে ভব নদীর পানি
দুঃখের ধারায় বেয়ে যা তুই আশার তরী খানি ॥

হেনার (সুজাতা) বাবাকে যখন দেনার দায়ে অন্যের জমি চাষ করতে হয় তখন আশে পাশের লোকজন এ নিয়ে নানা সমালোচনা করে। বিশেষত তার শিক্ষিত চাকরিজীবী ছেলেকে কেন্দ্র করে। দিনে দিনে অতিষ্ঠ হয়ে যায় হেনার বাবা। কোনো উপায়ান্তর না পেয়ে পথে পথে ফেরি করে জিনিসপত্র বিক্রি করে। হেনার ছোট ভাই সালাম (আলতাফ) খোঁড়া। ভাবছিল সে ভাইয়ের টাকায় তার পায়ের চিকিৎসা হবে। কিন্তু সে ভাই আজ সবাইকে ছেড়ে শহরে পরিবার নিয়ে থাকে। অপরদিকে জোয়ার্দার দেনার দায়ে বাড়ি ভিটা ছেড়ে দেয়ার হুমকি দেয়। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে গানটিকে আশার অন্যতম ভরসা হিসেবে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। যেখানে বলা হয়েছে–'ভাটার পরে জোয়ার যেমন বারে বারে আসে, পূর্ণিমারই তিথি তেমন অমা রাতের শেষে।'

নারায়ণ ঘোষ মিতার *এতটুকু আশা (১৯৬৮)* চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিতে সন্তানের প্রতি পিতার অগাধ ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। দৃশ্যায়নে দেখা যায় দাদা হওয়ার আনন্দে ছেলের প্রতি পিতার অনেক অভিমান থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সব ভুলে গিয়ে শহরে ছেলের কাছে যায়। ক্ষুদ্র উপহার নিয়ে ছেলের নবজাত সন্তানকে দেখবার আশায়। কিন্তু ছেলের শহুরে বউয়ের কাছে অসম্মানিত হয়ে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে ফিরে আসতে হয় তাকে। বউয়ের উপস্থিতিতে গেটের দারোয়ান

তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। বৃদ্ধ পিতার মাথা ফেটে রক্ত ঝরে। এ সময়ে নিম্নোক্ত গানের চরণ যুগল বেজে উঠে প্রবল বেদনায়, যা কিনা সন্তানের প্রতি পিতার অবুঝ মনেরই বহিঃপ্রকাশ এবং দর্শকের বিবেকে নাড়া দেয় গভীরভাবে।

হায়রে অবুঝ মন এ কি তোর পরাজয়
ধূলিতে লুটায় প্রাণের বাসনা হৃদয়ের সঞ্চয় ॥

দিলীপ সোম পরিচালিত *সাত ভাই চম্পা* (১৯৬৮) চলচ্চিত্রে বিবেকের আরেকটি রূপ লক্ষ করা যায়। ঘুমন্ত বাদশা বাহাদুর (আজিম) স্বপ্নে বাতলে দেয় স্বপ্ন পূরণের উপায়। এখানেও বিবেক চরিত্র দরবেশ রূপে গানে গানে নিঃসন্তান রাজার প্রাণে আশা সঞ্চার করে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাসে অটল থাকার কথা বলে—

কাঁদিস নারে কাঁদিস না তুই মুছে দে ঐ আঁখি জল
ফলবে রে তোর মনের আশা কাঁদিস কেন বিফল
আল্লাহ আছেন তোর উপরে ইমান রাখিস অটল

রাজ সিংহাসনে বসে রাজার সন্তান-শূন্যতার ভাবনা আরো তীব্র হয় এবং প্রবল আর্তনাদে ধ্বনিত হয়—'না না না মনের আশা ফলবে না। একটি সন্তানের আশায় আমি একে একে ছয়টি রানিকে প্রাসাদে এনেছি কিন্তু তারা কেউ আমায় একটি সন্তানও দিতে পারল না।' আবার গানে গানে আশা জাগানোর সুর দরবেশের গলায়—

দুঃখের বোঝা নিলি যত এবার পাবি তার ফল
ছয় রানিতে দেয়নি যাহা সাত রানিতে সফল
যারে যা তুই মৃগয়াতে বিলম্বেতে কুফল ॥

ঘুম থেকে জেগে বলে রাজা: 'একি স্বপ্ন দেখলাম ! ভেবেছিলাম জীবনে আর বিবাহ করব না। কিন্তু একি স্বপ্ন দেখলাম...এভাবে ছটফট করতে থাকে রাজা। ইচ্ছা পূরণের উপায় পেলেও নানা শর্তারোপের আজ্ঞায় তার মন বিচলিত হয়ে ওঠে। ঐতিহ্যবাহী যাত্রাশিল্পের জীবন্ত কিংবদন্তী মিলন কান্তি দে'র মতে—'সিনেমা-থিয়েটারে যেমন কারিগরি কলাকৌশলের সাহায্যে কখনো কখনো অভিনীত চরিত্রের দ্বান্দ্বিক মুহূর্তের প্রকাশ ঘটানো হয় যাত্রা পালায় এই কাজটি করে বিবেক।' বিবেক চলমান ঘটনার ক্লাইমেক্স সৃষ্টি করে। পালাকাহিনির কোন একটি চরিত্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লে লোভে-মোহে, ভালো-মন্দে, বিভ্রান্ত হয়ে পড়লে বিবেক তখন দিকনির্দেশনা দেয় এবং উপরোক্ত গানে তা দৃষ্ট হয়।

কামাল আহমেদ পরিচালিত *অবাঞ্ছিত (১৯৬৯)* চলচ্চিত্রে একই বিষয়ের আরেকটি গান। জমিদার আকরাম চৌধুরীর পুত্র ফিরোজ (আজিম) ভালোবেসে বিয়ে করে সাবেক গোমস্তা ওসমান শেখের নাতনি রোকেয়াকে (সুজাতা)। এই বিয়ে কিছুতেই মেনে নিতে চান না জমিদার পিতা। বরং রাজ্যকে নীলামের হাত থেকে বাঁচাতে অন্যত্র বিয়ে করাতে চায় ফিরোজকে এবং বলে: 'এই বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। রসূলপুরের সরকার সাহেব আমাকে টাকা দিতে রাজি হয়েছেন শুধু এই শর্তে যে, তার

মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে হবে। ফিরোজ বলে: 'আপনি টাকার লোভে! টাকার লোভে নয়। টাকার দায়ে। এই টাকাটা না পেলে খাজনা দেয়া হবে না। সাত দিনের মধ্যে খাজনা দিতে না পারলে জমিদারি নিলামে উঠবে।'

অবশেষ বাবার নির্দেশে তাকে দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। বিয়ের রাতে ঘরে নতুন স্ত্রীকে রেখে রোকেয়ার কাছে চলে যেতে চায় ফিরোজ কিন্তু সে পথ রোধ করে সামনে দাঁড়ায় তার বাবা আকরাম চৌধুরী। উপায় না পেয়ে অন্য রুমে চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ে ফিরোজ। চুপি পায়ে আসে রোকেয়া। ঘুমন্ত ফিরোজের পা জড়িয়ে ধরে বিদায়ী ভাষণ রোকেয়ার: 'ওগো আমি চলে যাচ্ছি তুমি সুখী হও।' পায়ের কাছে রেখে যায় ফিরোজের দেয়া উপহার 'গলার হার'। ফিরোজের হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে চোখ মেলে দেখে তার দেয়া উপহার গলার হার পায়ের কাছে পড়ে আছে। ফিরোজ দৌড়ে রোকেয়ার বাড়ি যায়। ঘরে তালা ঝুলছে দেখতে পায়। ফিরোজ দিকবিদিক ভুলে রোকেয়ার পথপানে ছুটে। ফিরোজ গায়ের মেঠো পথ ধরে দৌড়ে নদীর তীরে এসে উপস্থিত হয়। দূরে দেখতে পায় দাদুকে নিয়ে রোকেয়া বসে আছে নৌকার ছাউনি তলে। নৌকা চলছে ঢেউয়ের তালে তালে। প্রিয়জন হারানোর বেদনায় আকাশ, বাতাস, নদীর জল যেন কেঁদে উঠে প্রবল বেদনায়। ফিরোজের অন্তরের মর্মবেদনা প্রকাশিত হয় আবদুল আলীমের নেপথ্য কণ্ঠের পরিবেশিত নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে–

তোর চোখ থেকে তুই অন্ধ কেন
ডাকিস অবেলায়
খাঁচার পাখি বাঁধন কেটে যায় ॥

নারায়ণ ঘোষ মিতার *দীপ নেভে নাই* (১৯৭০) চলচ্চিত্রে বিবেক তাড়িত আরেকটি গান, যা রোজির অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। দৃশ্যায়নে দেখা যায় যে, বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয় রোজির প্রবাসী স্বামী। সম্পত্তির লোভ এড়াতে না পেরে রোজির দেবর চুরির অপবাদে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা বলে। রোজি তার ছোট্ট ছেলেটিকে দেখিয়ে অনেক অনুনয় করে বলে: 'ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু জায়গা করে দাও ভাই।' এ কথার উত্তরে দেবর বলে: 'তোমার মত ছোট ঘরের মেয়ের জায়গা এই বাড়িতে নাই। তুমি চলে যাও এই মুহূর্তে। নইলে আমি চাকর বাকর ডাকতে বাধ্য হবো।' এমন অপমানের দৃশ্য সহ্য করার আগেই '...রোজি বলে বেশ যাচ্ছি তবে যে মিথ্যা অপবাদে তুমি আজ আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছো এর বিচার খোদা একদিন নিশ্চয় করবে।' ছোট্ট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় রোজি। পথে পথে আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। একদিকে স্বামী হারানোর তীব্র শোক, অপরদিকে ছোট্ট ছেলে এবং মিথ্যা অপবাদের কালিমা, তাকে চরমভাবে আহত করে। এছাড়া সহায় সম্বলহীন, আশ্রয়হীন জীবন, এমন পরিস্থিতিতে নিম্নোক্ত গানটির মাধ্যমে ছবির টাইটেল শুরু হয় এবং কাহিনি সামনের দিকে এগিয়ে যায়–

পৃথিবী তোমার কোমল মাটিতে
কেন এত সংঘাত
মানুষের বুকে মানুষেই হানে
নিষ্ঠুর কষাঘাত ॥

গানটিতে আবার মানুষের বেঁচে থাকার প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। শেষ অন্তরায় ব্যক্ত হয়েছে–'মানুষ কেন যে এত অসহায়, আজ আছে কাল সকলই হারায়, 'তবুও তো আশার দীপ নেভে নাই।' পৃথিবীতে সব কিছুই নশ্বর। কোন কিছুরই স্থায়িত্ব নেই। এই পৃথিবীর চির বাসিন্দা কেউ নয়, সবাইকে চলে যেতে হবে কোন না কোন সময়ে। অথচ মানুষে মানুষে কেন এত হানাহানি কেন এত সংঘাত। এই প্রশ্ন রয়েই যায় দর্শকের কাছে। চলচ্চিত্রের নামানুসারে গানটি মূলধারা চলচ্চিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য; এর থিম সং বলেও অভিহিত করা হয়। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে চলচ্চিত্রের যে সামগ্রিক মুড বা ভাব তা অক্ষুণ্ন রাখতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। গানটির গীতিকার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সুরকার সত্য সাহা, নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী আবদুল জব্বার।

একই রকম গানের ব্যবহার অশোক ঘোষ পরিচালিত *নাচের পুতুল (১৯৭১)* চলচ্চিত্রে লক্ষ করা যায়। পৃথিবীকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে যেন প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে এবং তা মানুষের বিবেককে জাগ্রত করার বিশেষ অর্থে। এ ছবির কাহিনি গড়ে উঠেছে শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের নানা সমস্যা নিয়ে। কলেজ পড়ুয়া আদরের মেয়ে লায়লার (শবনম) জন্য তার বাবা বেতন পেয়ে শাড়ি কিনে অপেক্ষা করে কলেজ প্রাঙ্গনে। তারপর দুজনে বাড়ি ফেরার সময় বাস থেকে নামতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে যায় লায়লার বাবা। প্রাণে বেঁচে গেলেও পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়। চাকরিটা ধরে রাখা সম্ভব হয় না। ক্র্যাচে ভর করে চলাচল করে। পরিবারের পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে বড় সন্তান লায়লার উপর। ছোট ভাই কামাল কোন কাজ করে না। বড় লোকের মেয়ের সাথে প্রেম করে, তার টাকায় চলে আর সীমাহীন স্বপ্নের ঘোরে বাস করে।

একদিন পঙ্গু বাবাকে খুশি করার ছলে কামাল দৌড়ে এসে তার চাকরি পাওয়ার সংবাদ জানায়। চাকরির সত্যতা জানতে চাইলে বোন লায়লাকে বলে: 'আমার চাকরি হয়নি মিছে কথা... আমার প্লানটা তোকে খুলে বলি বাবা জানবে তুই কলেজ ঠিকই করছিস আর আমি চাকরি করছি। আসলে চাকরি করবি তুই তোর মতো শিক্ষিত মেয়ের চাকরি পেতে কোন অসুবিধা হবে না। শুধু তোর বেতনের টাকা আমি বাবার হাতে তুলে দেব। 'আপা প্লিজ কাল থেকে তুই চাকরি খুঁজতে বেরিয়ে পর।' লায়লা এ মিথ্যার আশ্রয় নিতে অস্বীকৃতি জানালে কামাল বিভিন্নভাবে প্ররোচিত করে তাকে বলে:'তাহলে সংসারকে ঠ্যাকা। কেন দেখতে পাচ্ছিস না ? একটা ক্ষুধা, বিরাট একটা ক্ষুধা। এই সংসারটাকে গিলবার জন্য কেমন হা করে আছে। মুদির দেনা, বাড়িওয়ালার তাগাদা, বাবলুর লেখাপড়ার খরচা, বাবার পঙ্গু পা, আরো কত অভাব। সব সব ইচ্ছে করলে তুই দূর করতে পারিস আপা। সংসারটাকে তুই বাঁচা... বাঁচা... বাঁচা...।' শেষ পর্যন্ত লায়লাকে রোজগার করার জন্য বাধ্য করে ছোট ভাই কামাল। এমন সংকটাপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিম্নোক্ত গানটি শুরু হয়–

হে পৃথিবী আমার প্রশ্ন শোনো
আমরা মানুষ সে কি শুধু ভুল
তবে ভেঙ্গে চুড়ে দাও, ধুয়ে মুছে দাও
মানুষ তো নয় নাচের পতুল ॥

লায়লার অসুস্থ বাবার বিছানায় শুয়ে থাকার ক্লোজ শট, চুলার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে; শবনমের মুখ হয়ে উর্ধ্বোমুখী ধোয়ার শট। এসব শটের মাধ্যমে গানটি চিত্রায়ণ করা হয়েছে। গানের বাণীর

সাথে সাযুজ্য রেখে জলরাশির শট, শাড়ি পরিহিতা লায়লার হেঁটে চলার শট। আসলে পরিচালক লায়লার মনোজগতকেই বিশেষভাবে চিত্রায়ণ করেছেন। চলচ্চিত্রের নামানুসারে এই গানটি প্রথম গান যার মাধ্যমে টাইটেল শুরু হয়। গানটির বক্তব্য যেন সমগ্র দেশ-জাতিকে বিবেকাতাড়িত করে। এই গানটি দ্বিতীয় বার বিশেষ একটি করুণ মুহূর্তে বেজে উঠতে শোনা যায়। যখন ধর্ষিতার দায়ে আত্মহত্যা করে মদ্যপ পিতার কন্যা। তখন মৃত কন্যার লাশ কোলে তোলে মাদকাসক্ত পিতা উপস্থিত হয় অর্থ পতিপত্তি ধর্ষকের সামনে বিচার নামের মিছে আশায়। এই গানটি এখানেও কঠিন এক প্রশ্ন বানে জর্জরিত করে বিবেকহীন মানুষকে।

মুস্তাফা মেহমুদ-এর *মানুষের মন* (১৯৭২) চলচ্চিত্রের নামানুসারে বিবেক বোধকে জাগ্রত করার প্রয়াস–'তোমার ভুবনে এতো অসহায়, মানুষের মন কেন কেঁদে মরে।' গানটি ব্যবহৃত হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায়, রোজির ভাই আজিজের ষড়যন্ত্রে একটি পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নিঃসন্তান দম্পত্তি আনোয়ার হোসেন এবং রোজির মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এক সময় তারা দুজন দুজনকে হারিয়ে ফেলে। আনোয়ার হোসেন মাতা-পিতা-স্ত্রীকে হারিয়ে শুধু পুরনো স্মৃতিতে নিমজ্জিত হয় যেন তার হৃদয়ে শূন্যতার সুর বাজে। তারই বেদনায় বিবেক গেয়ে ওঠে উপরোক্ত গানটি। মানুষের সীমাহীন কষ্ট, অসহায়ত্ব বিবেকহীনতা ইত্যাদি প্রশ্ন উপস্থাপন করে সৃষ্টিকর্তার নিকট। যা বিবেকের গানেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার সত্য সাহা, কণ্ঠশিল্পী আবদুল জব্বার।

চলচ্চিত্রে মূল কাহিনিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আনুষঙ্গিক কিছু ঘটনার অবতারণা হয়। প্রমোদকারের *সুজন সখী* (১৯৭৫) চলচ্চিত্রে এরূপের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় সুজন (ফারুক) এবং তার বন্ধুরা মিলে গ্রামে যাত্রা পালার আয়োজন করে। সেখানে সুজনের কথায় সখী (কবরী) যাত্রা দেখতে আসে। এক সময় সুজনকে কুসুম ডেকে নিয়ে যায় কথা বলতে। যার সাথে সুজনের বিয়ের কথা হচ্ছে। এবং তা সুজনের বাবা-মায়ের পছন্দে। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুজন কথা বলে কুসুমের সাথে। অপরদিকে বগা (টেলিসামাদ) কবরীকে ভালবাসে। তাকে বশে আনার জন্য ইতোমধ্যে সেও নানা তাবিচ কবজের আশ্রয় নিয়েছে। সখীর কাছে সুজন সম্পর্কে মিথ্যে ধারণা দেয়ার ছলে বগা দূর থেকে সখীকে দেখায় সুজন-কুসুমের কথা বলার দৃশ্য। এতে সখী ভীষণ কষ্ট পায় এবং দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। সেই সময়ে চলচ্চিত্রের কাহিনিতে চলছিল যাত্রা পালা। পরিবেশিত পালায়ও বিবেক বর্জিত ঘটনা ঘটে যার দরুন বিবেক চরিত্রটি আবির্ভূত হয় এবং নিম্নোক্ত গানটি গেয়ে ওঠে। একই সাথে দুটো ঘটনার সমান্তরালে নিম্নোক্ত গানটি পরিবেশিত হয়–

নকল ভেবে আসল যে জন তারে দিলি ফেলে
লোহা ভেবে ওরে বেভুল সোনা গেলি ফেলে ॥

সখীর ভুল বোঝাকে কেন্দ্র করে গানটিতে আসল-নকলের কথা ব্যক্ত হয়। বিবেক বরাবরই সত্যিকার ঘটনার উপস্থাপন করে। তদুপরি দর্শকের বিবেকবোধকে জাগ্রত করাই তার অন্যতম কাজ। বর্ণিত চলচ্চিত্রে আরো একটি গান নিম্নে উল্লেখ করা হলো যা বাউল তার একতারা বাজিয়ে গায়। যাত্রা পালা দেখার রাতে সখী সুজনকে যেভাবে আবিষ্কার করেছিল এবং কষ্ট পেয়েছিল সেই কষ্ট বুকে নিয়ে মামার বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পরের দিন সুজন (ফারুক) সখীর খোঁজ নিতে গেলে দাদির কাছ

থেকে জানতে পারে যে, এই মাত্র সখী তার মামার বাড়িতে রওয়ানা হলো। তখন সুজন দৌড়ে নদীর ঘাটে যায় কিন্তু ইতোমধ্যে নৌকা মাঝ নদী ছাড়িয়ে গেছে। সখীর দেখা মেলে না। হঠাৎ একদিন সখীকে নদীর পারে দেখতে পায় সুজন। তখন দৌড়ে সখীর কাছে আসে। কাছে গিয়ে হাত ধরে জিজ্ঞেস করে: 'কি হইছে না বইলা চইলা আইলি যে? কিন্তু সখী শুধু বলে ছাড়ো। সাথে থাকা ছোট মামাত বোন রানি চিৎকার করে তার মাছ ধরতে আসা বাদশা ভাইকে ডাকে। তারা সুজনকে মারতে আসে সুজনও মারমুখী হয় কিন্তু ওরা সংখ্যায় বেশি থাকায় সুজন ওদের সাথে পেরে ওঠে না। পিছন দিক থেকে একজন বৈঠা দিয়ে পিঠে আঘাত করে সুজনকে। মার খেয়ে সুজন নদীর পারে পড়ে থাকে। ঠিক সেই মুহূর্তে নিম্নোক্ত গানটি বাউল নৌকায় বসে গেয়ে চলে–

যার নয়নে যারে লাগছেরে ভালো ভবে
যার নয়নে যারে লাগছেরে ভালো

গানটিতে গভীর এক প্রেমের আর্তি ব্যক্ত হয়। চণ্ডীদাস আর রজকিনীর প্রসঙ্গ টেনে। তারা একে অপরকে পাওয়ার জন্য কঠিন সাধনার মগ্ন ছিল। তাই বলা হয়েছে–'পাগল চণ্ডীদাসে রজকিনীর আশে, বার বছর বাইল বড়শি শুকনা পুকুরে।' সুতরাং এ গানেও সঠিক নির্দেশনা অর্থাৎ মনের মানুষকে জয় করার জন্য ধৈর্য, সাহস, ত্যাগ প্রভৃতি গুণের অধিকারী হতে হয়। তা না হলে প্রেমে জয়ী হওয়া যায় না। সে কথারই ইঙ্গিত প্রকাশ পায়।

আমজাদ হোসেনের *নয়নমণি* (১৯৭৬) চলচ্চিত্রে–'মনরে কাঁদিস ক্যানে মন।' সাইফুল আজম কাশেমের *সোহাগ* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে–'এ জীবনে কত হাসি কান্না।' প্রভৃতি গানে বিবেকের কথাই প্রতিফলিত হয়। রাজু সিরাজের *আরাধনা* (১৯৭৯) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিও জনৈক বাউল চরিত্রের অভিনয়ে পরিবেশিত হয় এবং তা রূপার (কবরী) জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনারই যেন ইঙ্গিতবাহী। চলচ্চিত্রে দেখা যায় ভালবেসে বিয়ে করে রূপা এবং ডাক্তার আশিক (বুলবুল আহমেদ)। বাসর রাতে ডাক্তার গুরুতর এক রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে ঝড়ের কবলে নৌকা ডুবিতে মারা যায়। রূপার কাছে গোপন রাখা হয়। বলা হয় চিকিৎসার কারণে তার আসতে দেরি হচ্ছে।

কিছুদিন পর আশিকের (বুলবুল আহমেদ) মত হুবহু দেখতে এক ব্যক্তি রূপার গ্রামে আসে। নাম তার মাসুদ (দুই চরিত্রে-বুলবুল আহমেদ) তিনিও পেশায় একজন ডাক্তার। গ্রামে আসে তার এক বন্ধু সাদেকের বাড়ি অর্থাৎ আশিকের মামার বাড়ি বেড়াতে। রূপা তাকে দেখে খুশিতে আত্মহারা এবং তার সাথে স্ত্রীর আচরণ করে। মাসুদ অপ্রস্তুত হয়ে যায়। এক সময় ঢাকার ফিরে গেলে রূপা তার পিছু নেয় এবং প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে নদীর পার ধরে বাউল তার একতারা বাজিয়ে নিম্নোক্ত গানটি গেয়ে যায়–

মনরে ও মনরে আমি না জানিলাম না চিনিলাম রে
তারে কাছে পাইয়াও দূরে রইলাম রে
অতি নিকট পড়শি হইয়া
সে যে ঘরের কাছে ঘর বানাইয়া

আছে লুকাইয়া

রূপার বেদনা অতঃপর তার আশা ভরসার ইঙ্গিত যেন বাউলের গানে উপস্থাপিত। গানটির গীতিকার মুকুল চৌধুরী, সুরকার আলম খান, কণ্ঠশিল্পী ইন্দ্রমোহন রাজবংশী।

চাষী নজরুল ইসলামের *দেবদাস* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি সুবীর নন্দীর কণ্ঠে এবং জনৈক বাউল চরিত্রের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। দেবদাস-পার্বতীর পরিণতি যেন প্রতিফলিত হয় গানটিতে। চলচ্চিত্রে দেখা যায় অতিরিক্ত মদ্যপান, অনিয়ম আর মানসিক যন্ত্রণায় এক সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে দেবদাস (বুলবুল আহমেদ)। চন্দ্রমুখীর কাছ থেকে ফেরার পথে ট্রেন যাত্রায় হঠাৎ গলা দিয়ে রক্ত পড়ে। সঙ্গে থাকা ধর্মদাস (আনোয়ার হোসেন) ঘুমে অচেতন। ডাকলেও কোন সাড়া মেলে না। গলা দিয়ে রক্ত পড়া দেখে দেবদাস আঁতকে ওঠে এবং পার্বতীর (কবরী) কথা মনে পড়ে তার। শেষ দেখায় পার্বতী তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল। সে কথার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল দেবদাস, পার্বতীর মাথা ছুঁয়ে: 'মরবার আগেও এ কথা আমার মনে থাকবে।' এই বলে। হয়তো সে কথা রাখার জন্য ঘুমন্ত ধর্ম দাসকে আর বেশি ডাকাডাকি না করে বরং তাকে ট্রেনে রেখেই সোজা রওয়ানা হয় পার্বতীর বাড়ি। তখন রাত অনেক। গাড়িয়াল প্রথমে যেতে রাজি হয় না। পরে বাবুর অসুস্থতা দেখে এবং বেশি টাকা পাওয়ার আশায় রাজি হয়। অনেকটা পথ। রাতের আঁধারে ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ। গরুর গাড়ি চলে। গাড়িয়াল গেয়ে ওঠে নিম্নোক্ত গান–

মনরে ও ও ওরে মন
সুখ পাখি তোর হইল না
হইল না আপন ॥

চিত্র-১৫: *দেবদাস* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে 'সুখ পাখি তোর হইল না আপন '
গানের একটি স্থিরচিত্রে জনৈক গাড়িয়াল।

গানের মাঝে দেবদাস তার ছোট বেলায় পার্বতীর সাথে নানা ধরনের ঝগড়া ঝাটির স্মৃতিচারণ করে। এবং দেবদাস প্রচণ্ড অসুস্থতায় কাতরায়। ক্ষণে ক্ষণে গাড়িয়ালকে জিজ্ঞেস করে: 'ওরে আর কতদূর? পথ কি ফুরোবে না ?' যখন তার প্রাণ বায়ু প্রায় নিভু নিভু তখন দেবদাস পৌঁছায় পার্বতীর বাড়ির সামনে। তখন ভোর। তবে জীবিত নয় মৃত। কিন্তু তারপরেও পার্বতীর ভাগ্য হয় না তাকে দেখার। তার চৌধুরী স্বামীর কানে পৌঁছামাত্র বাড়ির ফটক ধপাস্ করে বন্ধ হয়ে যায়। গাড়িয়ালের পরিবেশিত

গানের মধ্য দিয়ে দেবদাসের নিজের জীবনের চরম বাস্তবতারই রূপ প্রতিফলিত হয়। যে ভালবাসায় কেটে গেছে জীবন তা এখন শুধুই স্মৃতি বড় জ্বালাময় স্মৃতি। নিম্নোক্ত অন্তরায় সেই বেদনার আর্তি–

মাটির বৃক্ষে জন্মে বৃক্ষ
বাড়ে মাটির প'রে
আপন ছায়া দিয়া বৃক্ষ
মাটি শীতল করে
ওরে পিরিত নামের বিষ বৃক্ষ
জন্মিল তোর বুকে
ওসে না দেয় ছায়া
না দেয় মায়া জ্বালায় সর্বক্ষণ ॥

এমন অসুস্থার সময়ে পাশে কাউকে না পেয়ে বড় নিঃস্ব অসহায় মনে করে দেবদাস। তার করুণ চিত্র রচিত হয় নিম্নোক্তভাবে– 'দিনের বেলা জ্বলে সূর্য বুকে আগুন নিয়া, সেই আগুনে নিশি রাইতে, হাসে চান্দের হিয়া, ওরে এমন আগুন নিয়া, বক্ষে কান্দিলি তুই একা, ও সে তোর যে সুজন তোর যে স্বজন না দেয় দরিশন।'

তমিজ উদ্দিন রিজভীর *আর্শীবাদ* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিও জনৈক বাউল চরিত্রে পরিবেশিত হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় জুলমত আলীর (গোলাম মোস্তাফা) তিন তিনটি স্ত্রী থাকার পরও বিয়ের লোভ কমে না। সানুর বিয়ের দিন সে এবং সানুর (অঞ্জনা) ভাবি দুজনে মিলে সানুর নামে মিথ্যে অপবাদ প্রচার করে। ডাক্তারকে টাকা দিয়ে তাকে মিথ্যে কথা বলাতে বাধ্য করে যে তার পেটে বাচ্চা আছে। তারপর দেখা যায় অভাব অনটনের সংসারে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয় যে, জুলমত নিজেই বিয়ের পাত্র সাজে। এমন দিনে শহর থেকে আসে শিক্ষিত সানুর ভাই সোহেল (জাফর ইকবাল)। সে এসে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়। বোনের এমন অপবাদের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করে না সোহেল। বরং বলে: 'ছোট বেলা থেকে যে সানুকে আমি দেখে এসেছি। যে সানুর পবিত্রতার স্মৃতি আমাকে অনুপ্রাণিত করে। সেই সানু পাপ করতে পারে? আমি বিশ্বাস করি না ভাইয়া। আজ থেকে ওর সুখই আমার সুখ...আমি যেন ওর মুখে হাসি ফোটাতে পারি।' তারপর দেখা যায় সানুকে নিয়ে শহরে রওয়ানা হয় তার ভাই সোহেল। ঠিক সে সময় নেপথ্যে নিম্নোক্ত গানটি বাউল তার দোতরা বাজিয়ে গেয়ে চলে–

সতী মায়ের সতী কন্যা যায় চলে যায় রে
ভাইয়ে কান্দে মায়ে কান্দে কান্দে বনের পাখি রে ॥

গানটিতে সানুর জীবনের এক নিদারুণ চিত্র প্রতিফলিত হয়। যে দোষের ভার তার জীবনে এসেছে তা সে কিভাবে বহন করবে। কিভাবে তার ভারমুক্ত হবে। দয়ালের নিকট তার বিশেষ আকুতি–'কোন দোষেতে হইলাম দোষী, বলো বলো বলো দয়াল, বুক ভরা ব্যথা নিয়ে, থাকব আমি আর কতকাল, কণ্ঠশিল্পী সৈয়দ আবদুল হাদী, এটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করে।

তোজাম্মেল হক বকুল-এর *বেদের মেয়ে জোসনা* (১৯৮৯) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিও বাউল চরিত্রে পরিবেশিত হয়; যা বিবেকের গানেরই বহিঃপ্রকাশ। চলচ্চিত্রে দেখা যায় যে, সাপে কাটা মাতৃহারা ছোট্ট জোস্‌নাকে (অঞ্জু ঘোষ) ভরা নদীতে ভেলা করে ভাসিয়ে দেয়া হয়। 'যদি ভাল ওঝার হাতে পড়ে তাহলে বেঁচে উঠবে' এই আশায়। জোস্‌নার চাচার (শওকত আকবর) কথা থেকে তাই প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন: 'আল্লাহর নাম নিয়ে ওকে ভাসিয়ে দাও, দাও কালো, ভেলা ভাসিয়ে দাও। জোস্‌নার পিতা (প্রবীর মিত্র) চিৎকার করে কেঁদে ওঠে বলে: 'না না না কালো না' আবার ভাইজানের দিকে তাকিয়ে বলে: 'ভাইজান ওকে ভাসিয়ে দিওনা, ও চলে গেলে আমি বাঁচব কি নিয়ে।' ছোট্ট সন্তানটিকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে ছটফট করতে থাকে পিতৃহৃদয়। তারপর গগনবিদারী স্বরে জোস্‌না জোস্‌না বলে ডেকে ওঠে সে। চতুর্দিকে নিস্তব্ধ। এলাকাবাসী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়। কোন মতেই নিজেকে সংবরণ করতে পারে না জোস্‌নার বাবা। ঢেউয়ের তালে তালে ভেসে চলে জোস্‌নাবাহী ভেলা। দিকবিদিক ভুলে পাগল পারা হয়ে ভেলার পিছু পিছু ছুটে জোস্‌নার পিতা। ঠিক এই সময়ে পিতার আর্তনাদের সুরে সুর মিলিয়ে নদীর তীর ধরে বাউল তার একতারা বাজিয়ে নিম্নোক্ত গানটি গেয়ে চলে–

মায়ায় গড়া এই সংসারে
কেউ আসে কেউ যায় রে ফিরে
মিছে কেন কাঁদিস রে তুই নদীর কিনারায় ॥
মনরে...

উপরোক্ত গানটিতে আবির্ভূত বাউল চরিত্রটি বিবেকের একটি বিশেষ রূপ। আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্য দিয়ে নিয়তির নির্মম পরিহাস অপরদিকে আবার আশাবাদ ব্যক্ত হয় গানে। বলা হয়–'জগৎ চলে কার ইশারায়, বাঁচা মরা তার ইশারায়।' গানটির চিত্রায়ণে যে শটগুলোর আশ্রয় নেয়া হয়েছে তা গানটিকে আরো প্রাণবন্ত করে এবং যে অর্থে পরিবেশিত হয় তার যথাযথ রূপ তুলে ধরতে সহায়তা করে। পৃথিবীর সব চেয়ে ভারি বোঝা হলো পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ। চলচ্চিত্রের শুরুর দিকে সন্তানহারা পিতার যে আকুতি তা চিত্রায়ণপূর্বক রথীন্দ্রনাথের দরাজ কণ্ঠের গায়কির মাধ্যমে দর্শকের হৃদয় করুণ রসে সিক্ত হয়। গীতিকার তোজাম্মেল হক বকুল, সুরকার আবু তাহের।

চিত্র-১৬: *বেদের মেয়ে জোসনা* (১৯৮৯) চলচ্চিত্রে 'মায়ায় গড়া এই সংসারে' গানের একটি স্থিরচিত্রে জনৈক বাউল।

এই চলচ্চিত্রে আরেকটি গান এবং বিচ্ছেদ-বেদনার সীমাহীন করুণ রসে সিক্ত। রাজপুত্র শাহজাদার (ইলিয়াস কাঞ্চন) সঙ্গে বেদে কন্যা জোস্‌নার (অঞ্জু ঘোষ) প্রেম-ভালবাসাকে কেন্দ্র করে এর কাহিনি গড়ে উঠেছে। দুজনের ভালবাসা একসময় চূড়ান্ত পর্যায়ে রূপ নিলে ঘটনাক্রমে জোস্‌না তার পুরস্কার স্বরূপ শাহাজাদাকে দাবী করে। এতে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রজাদের দিয়ে রাতের অন্ধকারে বেদে বহরে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুড়ে যায় বেদে বহরের ছোট ছোট ডেরা। ঘাট ছেড়ে চলে যায় বেদে বহর। সংবাদ পেয়ে শাহাজাদা তার ঘোড়া নিয়ে উপস্থিত হয় সেখানে। পড়ে থাকা আসবাব পত্র এবং জোস্‌নার ব্যবহৃত কাপড়, পোড়ার নানা দৃশ্য দেখে শাহজাদার দু'চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রুপাত হয়। মর্মাহত শাহজাদা ঘোড়ার লাগাম টেনে নদীর তীর ধরে ছুটে জোস্‌নার খোঁজে। নেপথ্যে বেজে চলে নিম্নোক্ত গান–

ও তুই ডাকলি যারে আপন করে
সে তো অসহায়
হায়রে মনের মানুষ কেঁদে চলে যায় ॥

মনের মানুষটিকে হারিয়ে সে যে আজ দিশেহারা। শাহজাদার সঙ্গী ঘোড়াটিও যেন সমবেদনায় ব্যথিত। গানটিতে বেদনার যে বহিঃপ্রকাশ তাতে দর্শক হৃদয়ে অশ্রুপাত ঘটায়। কথার সাথে গায়কি এবং চিত্রায়ণের যে মেলবন্ধন তা বেদনার অসীম দরিয়া তৈরি করে। দৃষ্ট হয় গানের দ্বিতীয় অন্তরার চরণযুগলে বলা হয়–'ও তুই ভালবেসে খুঁজলি যারে, সে তো দুঃখের নীল দরিয়ায়, ভেসে ভেসে যায় সে কেঁদে, কোন সে ঠিকানায়।'

নীল দরিয়ার যে বিশালতা এবং সারিবদ্ধভাবে বেদে বহরের নৌকা ভেসে যাওয়ার যে দৃশ্য। কথার সাথে সামঞ্জস্য রেখে লং শট থেকে, জুম ইন শটে ধারণ করা হয়। আবার নৌকা বেয়ে চলে জোস্‌নার দাদু (সাইফুদ্দিন)। ছাউনির তলে দাদির (রওশন জামিল) কোলে কান্নারত জোস্‌নার ফিরে ফিরে পেছন পানে তাকানোর অভিব্যক্তির ক্লোজ শট তুলে ধরেছেন চিত্রগ্রাহক, যা হৃদয় বিদারক দৃশ্য নিমাণ করে।

দিকনির্দেশনা এবং আশা জাগানো হলো বিবেকের গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তা ব্যক্ত হয় গানের শেষ অন্তরায়–'ও তোর আসল প্রেমের নাইরে মরণ, সাধ্য তো নাই কেউ করে হরণ।' ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রথীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গানটি অত্যন্ত দরদের সঙ্গে পরিবেশিত হয়। দীর্ঘ সুরের সহযোগে গানটির সুর আকাশে-বাতাসে যেন ধ্বনিত হয়। এই চলচ্চিত্রের প্রতিটি গান অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং হৃদয়গ্রাহী। ফলে ব্যবসায় সফলতা অর্জনের পেছনে গানগুলোর যথেষ্ট অবদান রয়েছে বলে ধারণা অমূলক নয়।

১২. আধ্যাত্মিক চেতনা ও আত্মোপলব্দির গান

আত্মোপলব্ধি, আত্মশুদ্ধি লাভের অন্যতম উপায়। এমনতর ভাবনা থেকে চলচ্চিত্রে এই গানের সূচনা এবং স্বাধীনতাত্তোর চলচ্চিত্রের গানে তারই উপলব্ধির সঞ্চার হয়। যা চলচ্চিত্রের গানকে বিশেষ মাত্রায় উন্নীত করে। যদিও তা বিবেকের গানের ভাবনাজাত ফসল যা স্বাধীনতাপূর্ব চলচ্চিত্রে বিশেষত সামাজিক কাহিনিনির্ভর চলচ্চিত্রে অধিক মাত্রায় লক্ষণীয়। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালের চলচ্চিত্রে

বিবেকের গান ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক সুরারোপ ধারণ করে এবং আত্মোপলব্ধির দিকে যাত্রা করে। মৃত্যু প্রসঙ্গ বাংলা গানের গোড়া থেকেই নানাভাবে এসেছে এবং চলচ্চিত্রেও এই প্রসঙ্গের আধিক্য লক্ষ করা গেছে। নিম্নোক্তভাবে আত্মোপলব্ধির উল্লেখযোগ্য গান আলোচনা করা হলো। আমজাদ হোসেনের *গোলাপী এখন ট্রেনে* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি পরকালের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়–

আছেন আমার মুক্তার
আছেন আমার বারিস্টার,
শেষ বিচারের হাইকোর্টেতে
তিনিই আমায় করবেন পার
আমি পাপি তিনি জামিনদার

চিত্র-১৭: *গোলাপী এখন ট্রেনে* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে 'আছেন আমার মুক্তার'
গানের একটি স্থিরচিত্রে আনোয়ার হোসেন।

কবিয়াল (আনোয়ার হোসেন) চরিত্রে পরিবেশিত উপরোক্ত গানটিতে পার্থিব-অপার্থিব জগৎ সমন্ধনীয় ভাবনা উপস্থাপিত হয় যা আধ্যাত্মিক চেতনাবাহী। এ জগতে নানা ধরনের অন্যায়, অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সহজেই টাকা-পয়সা কিংবা ক্ষমতার জোরে। কিন্তু পরকালে প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে। পবিত্র কুরআনে 'কিরামান কাতিবিন' (সম্মানিত লেখকগণ) নামের বিশেষ শ্রেণির ফেরেশতার কথা উল্লেখ রয়েছে। যারা প্রতিনিয়ত প্রতিটি মানুষের ভালো-মন্দ কাজের হিসাব রাখে।[২৪] গানেও বলা হয়েছে তাদের কথা–'দুই কান্দে দুই মুহুরি লিখতে আছেন ডাইরি, দলিল দেইখা রায় দিবেন টাকা পয়সার নাই কারবার।' পরকালের কঠিন পথ পাড়ি দিতে হলে পুণ্যতা অর্জন করতে হবে এবং পুণ্যতাই হলো পরকালের মূল চাবি বা টিকেট। যার মাধ্যমে সকল মুশকিল আসান হবে। ধর্মীয় বিশ্বাসের আলোকে রচিত হয়েছে গানটি তাতে বলা হয়েছে–'পারাপারের থাকলে তাড়া, সঙ্গে নিও গাড়ি ভাড়া, জবাবদিহি করতে হবে ধরলে টিকেট কালেক্টার।' মুসলিম অধ্যুসিত এ অঞ্চলের মানুষের কাছে গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার আলাউদ্দিন আলী, সৈয়দ আবদুল হাদী কণ্ঠে পরিবেশিত হয়। মোহাম্মদ মহীউদ্দিন-এর *বড় ভাল লোক ছিল* (১৯৮২) চলচ্চিত্রের কাহিনি বা বিষয় আধ্যাত্মিক চেতনা প্রসূত এবং চলচ্চিত্রের জন্য

রচিত নিম্নোক্ত গানেও ভাবমার্গের বিষয়টি লক্ষণীয়–

হায় রে মানুষ রঙিন ফানুস দম ফুরাইলে ঠুস্
তবু তো ভাই কারোর-ই নাই একটুখানি হুঁশ্ ॥

গানটিতে জীবনের অনিবার্য সত্য উপলব্ধির প্রয়াস বহমান। জন্ম এবং মৃত্যু একে অপরের সহবস্থান। এই চিরন্তন সত্যকে এড়িয়ে চলার কোনো সুযোগ নেই। চলচ্চিত্র পরিচালক তারই অবতারণা করেছেন। এ চলচ্চিত্রের কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ রচয়িতা ও গীতিকার সৈয়দ শামসুল হক তাঁর এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, তিনি পীর বংশের সন্তান ছিলেন ফলে তাঁর গানেও সেই বিষয়টি স্থান পেয়েছে নানাভাবে। উপরোক্ত গানটি সম্পর্কে সৈয়দ হক বলেন–

> আমি পীর বংশের ছেলে। ভেতরে একটা আধ্যাত্মিকতা কাজ করে। এ ছবির চিত্রনাট্য, সংলাপ লেখার সময় আমি অনেকটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। ঘোরের মধ্যেই ছবির গানগুলো লেখা। বিশেষ করে 'হায় রে মানুষ রঙিন ফানুস দম ফুরাইলে ঠুস্।'[২৫]

এই চলচ্চিত্রে আরেকটি গান আধ্যাত্মিকতার রূপবাহী 'তোরা দেখ দেখরে চাহিয়া, রাস্তা দিয়া হাঁইটা চলে, রাস্তা হারাইয়া।' আমজাদ হোসেনের *দুই পয়সার আলতা* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি আধ্যাত্মিক চেতনা প্রসূত। যেখানে পারিবারিক কলহ মানুষের জীবনকে কতটা বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়। এবং এই অন্তহীন বেদনার শেষ কোথায়? কে এর নিয়ন্ত্রক ? তারই জিজ্ঞাবাদের গান গুনাইয়ের (প্রবীর মিত্র) অভিনয়ে পরিবেশিত হয়–

কিবা জাদু জানো
মনের মানুষ তৈরি কইরা
দুঃখ দিয়া মারো রে
তুই বড় পাষাণ বন্ধুরে

যার কৃপা লাভের আশায় এত প্রার্থনা এত আরাধনা। তার বাস কোথায় ? কোত্থেকে সে তার কল কবজা নাড়ে। গুনাইয়ের মনে এসব ভাবনারই উদয়–'কোন বা দেশে থাক তুমি কোথায় তোমার ঘর, কি কারণে পুইড়া দিলা আমারও অন্তর রে তুই বড় নিদয়া বন্ধুরে।' গানে বন্ধুর প্রসঙ্গ এসেছে তা সৃষ্টিকতাকেই প্রতীকী অর্থে বোঝানো হয়েছে। ছোট্ট বেলায় কুসুম (শাবানা) মাকে হারিয়েছে তারপর পিতা। কী এক দুঃখের অকূল পাথার সম জীবন তার। এক মুহূর্তের জন্যেও সুখ নামের পাখিটি তার কাছে ধরা দেয়নি। তারই আকুতি শেষ পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তার নিকট ধ্বনিত হয়। অপরদিকে তার কারণে লাল চাচি (আনোয়ারা) তার স্বামীর হাতে মার খায়। এসব গুনাইকে পীড়িত করে। এই খেলার কোনো হিসেবে মেলাতে পারে না বলে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে তার নিবেদন মর্মরিত হয়। জহিরুল হকের *প্রাণ সজনী* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে আধ্যত্মিক চেতনার গান–'চোখ বুঝিলেই দুনিয়া আন্ধার, কিসের বাড়ি কিসের ঘর কিসের সংসার।' *প্রাণ সজনী* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে–'ডাক দিয়াছেন দয়ার আমারে, রইব না বেশি দিন তোদের মাঝারে।' *অন্ধবধূ* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে রথীন্দ্রনাথ রায়ের কণ্ঠে গীত আত্মোপলব্ধির একটি বিশেষ গান যা পরপারের ইঙ্গিতবাহী–'সবাই বলে বয়স বাড়ে, আমি বলি কমে রে, এই মাটির ঘরটা খাইলো ঘুণে প্রতি দমে দমে রে।' বেলাল আহমেদ পরিচালিত *নয়নের আলো* (১৯৮৪) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানেও একই ভাবের উদয় হয়। গানটি গ্রামীণ পরিবেশে যাত্রার

মঞ্চে জীবনের (জাফর ইকবাল) অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় দর্শক বেষ্টিত মঞ্চে দাঁড়িয়ে দোতারা বাজিয়ে গান করে জীবন।

এই আছি এই নাই ওরে এই আছি এই নাই
দুই দিন পরে কেউবা ধূলো কেউ বা হবো ছাই
দিস্‌নে ব্যথা কারো মনে দিস্‌নে ব্যথা ভাই ॥

গান শেষে উপস্থিত দর্শকেরা তার গানে সন্তুষ্ট হয়ে উপঢৌকন দেয়। গানটিতে একটি মর্মকথা ধ্বনিত হয় যা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। দুই দিনের এই জীবনে কেউ চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং সদ্ভাব-সম্প্রীতির মাধ্যমে সকলের সাথে সুখ-শান্তির বন্ধন গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়। তাই বলা হয়–'দুই দিন পরে কেউবা ধূলো কেউ বা হবো ছাই, দিস্‌নে ব্যথা কারো মনে দিস্‌নে ব্যথা ভাই।' আবদুস সামাদ খোকনের *ঝিনুকমালা* (১৯৮৫) চলচ্চিত্রেও একই ভাবের প্রকাশ নিম্নোক্ত গানে। চলচ্চিত্রে দেখা যায় স্কুল ছুটির পর বই খাতা বগলদাবা করে হাতে লুঙ্গি টেনে বাউলের পেছনে পেছনে ছুটে ঝিনুক। চার পাঁচ বছর বয়সি ঝিনুক বাউলের গানে মুগ্ধ হয়। সে তার বাড়িতে বাউলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোর প্রস্তাব করে। বাউল মনও অল্পতে রাজি হয়। বাড়িতে পৌঁছে বাউল দেখে ভিন্ন চিত্র। যার জন্য সে আজ বাউল, তারই ছেলে ঝিনুক। জাহানারা (সুচন্দা) সুজনকে দেখে চমকে ওঠে, মনে মনে বলে: 'সুজন আইজ আমার বাড়িতে! সুজনের মনেও উচ্চারণ 'জাহানারা...'।

অতঃপর মায়ের কান্না দেখে ঝিনুক বলে: 'তোমার চোখে পানি ক্যান মা ? সংগোপনে নিজেকে সামলে নেয় ঝিনুকের মা জাহানারা। দুজনে বিছানার উপর বসে এক সাথে খায়। ঝিনুক বাউল চাচার প্লেটে খাবার তুলে দেয়। খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঝিনুক বলে: 'বাউল চাচা এই বার একটা গান শোনান।' বাউল চাচা বলে: 'গান তুমি খুব ভালবাস না? হ, আমি আপনার কাছে গান শিখুম।' সুজন বলে: 'যে কোনদিন বড় আঘাত না পায় সে কোনদিন মনের মত সুর খুঁইজা পায় না'। ঝিনুক বলে: 'তাইলে দোয়া কইরেন আমি যেন বড় আঘাত পাই।' ছোট্ট হাতে ঝিনুক দোতারা এগিয়ে দেয় বাউলের দিকে। বাউল সুজন নিম্নোক্তক্ত গান ধরে–

ভবেরই খেলা ঘরে খেলে সব পুতুল খেলা
জানি না এমন খেলা ভাঙ্গে কখন কে জানে ॥

আপাত দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক চেতনা প্রসূত বিষয়ের গান মনে হলেও তা যেন তার নিজ জীবনের অর্থাৎ তার যাপিত জীবনের পরিচয়বাহী। গীতিকার মোহাম্মদ আলমগীর কবির, সুরকার আনোয়ার জাহান নান্টু, কণ্ঠশিল্পী এন্ড্রুকিশোর এবং প্রবীর মিত্রের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। নিম্নে আধ্যাত্মিক ও আত্মোলব্ধি চেতনা বিষয়ক গানের একটি তালিকা দেয়া হলো–

সারণি-২

ক্রম	গানের শিরোনাম	চলচ্চিত্র ও পরিচালক	বিষয়

১.	সবাই বলে বয়স বাড়ে আমি বলি কমেরে	*ফকির মজনু শাহ* (১৯৭৮) দারাশিকো	আত্মোপলব্ধি
২.	এই জীবন তো একদিন চলতে চলতে থেমে যাবে	*মানে না মানা* (১৯৮২)	আত্মোপলব্ধি
৩.	হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস দম ফুরাইলে ঠুস্	*বড় ভালো লোক ছিল* (১৯৮২)	আত্মোপলব্ধি
৪.	তোরা দেখ্ দেখ্ রে চাহিয়া রাস্তা দিয়া হাইটা চলে রাস্তা হারাইয়া	*বড় ভালো লোক ছিল* (১৯৮২	আধ্যাত্মিক
৫.	পাগল পাগল মানুষগুলো পাগল সারা দুনিয়া কেহ পাগলা রূপ দেখিয়া কেহ পাগল শুনিয়া	*বড় ভালো লোক ছিল (১৯৮২*	আধ্যাত্মিক
৬.	ক. ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে রইব না বেশি দিন তোদের মাঝারে খ. চোখ বুজিলেই দুনিয়া আন্ধার	*প্রাণসজনী* (১৯৮৩) জহিরুল হক *ঐ*	ক. আধ্যাত্মিক খ.আত্মোপলব্ধি
৭.	ভবের এই খেলা ঘরে খেলে সব পুতুল খেলা	*ঝিনুক মালা* (১৯৮৫)	আধ্যাত্মিক
৮.	ক. ও তুই ডাকলি যারে আপন করে খ. মায়ায় গড়া এ সংসারে কেউ আসে কেউ যাইরে ফিরে	*বেদের মেয়ে জোসনা (১৯৮)* ঐ	ক. আত্মোপলব্ধি খ. আধ্যাত্মিক

দুই. আধুনিক ধারার গান

এই ধারার গানের মধ্যে অন্যতম হলো রোমান্টিক গান। লোকজ গানের ন্যায় মানব-মানবীর প্রেমকে উপজীব্য করে রচিত গান নানামাত্রিকতায় বিকশিত এবং পরিবেশিত হয়েছে। এই গানের পরিধি চলচ্চিত্রের বিস্তৃত পরিসর জুড়ে লক্ষ করা যায়। নিম্নরূপভাবে তা আলোচনা করা হলো।

১. রোমান্টিক গান

যুক্তবাদী দর্শন এবং নব্য-ধ্রুপদী সাহিত্যাদর্শে ভাববস্তু ও আঙ্গিকের কঠোর নিয়মানুগত্যের বিরুদ্ধে একটি বিকল্প নন্দন ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টাদশ শতকের শুরুতে ইংল্যান্ডে রোমান্টিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।[২৬] সাধারণত ক্লাসিসিজম এবং নব্য-ক্লাসিসিজিমের নিয়মানুবর্তিতা, আদর্শিকতা ভেঙ্গে সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, সমালোচনা কিংবা ইতিহাস লিখনের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে শুরু করে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই আন্দোলন সক্রিয় ছিল।[২৭] রোমান্টিকতার এই যুগান্তকারী আন্দোলনের অগ্রপথিক ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলি, কিট্স, ও বায়রনের মত উজ্জ্বল নক্ষত্রেরা। এবং কিটসের নাইটিঙ্গেলের মধুর সংগীত, শেলির স্কাইলার্কের অবোধপূর্ণ আনন্দ ভাবলোকের প্রতীক। অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের পাশাপাশি সংগীতে রোমান্টিক ভাবের সূত্রপাত হয় জার্মানে–

> Romantic music is a term denoting an era of western classical music that began in the late 18th or early 19th century. It was related to romanticism, the European artistic

> and literary movement that arose in the second half of the 18th century, and romantic music in particular dominated the Romantic Movement in Germany.[২৮]

রোমান্টিক ভাবনা দ্বারা এদেশের সাহিত্যও প্রভাবান্বিত হয়েছে। গবেষকের মতে–যদিও পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিবৃন্দের রোমান্টিক কল্পনায় নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে তবে এর লক্ষণ সূচিত হয় বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাগীতি থেকেই।[২৯] চর্যাপদ বিভিন্ন রাগে ও তালে নিবন্ধিত গান। বাংলা গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কাব্যময়তা কাব্যেই যার সুখ্যাতি এবং রোমান্টিকতার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। রোমান্টিক শব্দটি প্রাচীন ফরাসী 'romanz' (eserire) 'রোমাঞ্চ' থেকে এসেছে।[৩০] আভিধানিক অর্থ দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনি; উগ্র বা অস্বাভাবিক প্রেমের কাহিনি। মধ্যযুগে (সাধারণত ছন্দে) রচিত বীরত্ব কাহিনি। অসাধারণ প্রেমের ঘটনা (কথ্য)। যে কোন প্রণয় ঘটিত ব্যাপার। (মনের) রোমাঞ্চকর অবস্থা; শিহরণ অতিরঞ্জিত বর্ণনা; অলীক কল্পনার রং মাখানো বর্ণনা। কল্পনার রং মিশিয়ে অতিরঞ্জিত করা বা ঐভাবে অতিরঞ্জিত হওয়া।[৩১] রোমান্টিসিজম অথবা রোমান্টিকতার সংজ্ঞা পর্যালোচনার মাধ্যমে রোমান্টিক গান বিষয়ক আলোচনা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

রোমান্টিসিজমের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে জার্মান কবি হাইনে বলেছেন–'রোমান্টিসিজম কাব্যে শিল্প সাহিত্যে মধ্যযুগের পুনর্জাগরণ।[৩২]

অধ্যাপক হাডফোর্ডের ভাষায়–'রোমান্টিকতা' হলো কল্পনাশক্তির এক অভূতপূর্ব বিকাশ।[৩৩] ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম ইতিহাসকার এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট 'রোমান্টিকতা' বলতে বুঝেছেন প্রকৃতির অভিমুখে প্রত্যাবর্তন;'The return to nature' 'an extra addition of strangeness to beauty'[৩৪]

উপরোক্ত সংজ্ঞা এবং নানা কৌণিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদার, উন্মুক্ত, প্রেম-প্রকৃতি ও নিসর্গপ্রীতি, অতীত চারিতা, নিবিড় অনুরাগ ও মমত্ববোধ ইত্যাদি ছিল রোমান্টিক ভাবেব অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেদিক থেকে রোমান্টিক ভাবেব লক্ষণসমূহের সন্ধান মেলে চলচ্চিত্রের গানেও। প্রসঙ্গত, রোমান্স ফিল্ম বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তারমধ্যে অন্যতম হলো এর কাহিনি; যা গড়ে উঠে সাধারণত প্রধান দুটি চরিত্রের ভালবাসাকে কেন্দ্র করে।'Romance is a genre where the plot revolves around the love between two main characters as they endure the highs and lows of love.'[৩৫] চলচ্চিত্র বা ফিল্মের ইতিহাসের ধারা বিবেচনায় এই জাতীয় ফিল্মের অন্যতম বিষয় হলো প্রেম-ভালবাসা। এবং এই ভালবাসারও রয়েছে বিভিন্ন ধরন যার ভেতর দিয়ে চলচ্চিত্রের কাহিনি কখনো মিলনান্তক, কখনো বিয়োগান্তক কখনো বা ধ্বংসাত্মক পরিণতি লাভ করে। এ সম্পর্কে জানা যায়–

> Romantic films often explore the essential themes of love at first sight, young with older love, unrequited romantic love, obsessive love, sentimental love, spiritual love, forbidden love/romance, platonic love, sexual and passionate love, sacrificial love, explosive and destructive love, and tragic love.[৩৬]

রোমান্টিক ফিল্ম বা মুভির কাহিনি নানা শাখা-প্রশাখায় উজ্জীবিত হয়ে বিশেষত রোমান্টিক লাভ, ট্রাজেডি, কমেডি, ইত্যাদি বিষয়ে পরিণতি লাভ করেছে। যদিও পাশ্চাত্যের ন্যায় এদেশে রোমান্টিক মুভির কোনরূপ সুনির্দিষ্ট আঙ্গিক প্রতিষ্ঠিত হয়নি তবে রোমান্টিক ভাবনার প্রভাব পড়েছে এদেশের চলচ্চিত্রের গানে; প্রেম, বিরহ, বেদনা ইত্যাদি বিষয়সমূহের মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটেছে। উল্লেখ্য

যে, চলচ্চিত্রের গান প্রধানত দুটি ধারা–আধুনিক এবং লোকজ ধারার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। উভয় ধারায় রোমান্টিক ভাবের প্রকাশ রয়েছে, উল্লেখযোগ্য গানের বাণী, সুর এবং প্রয়োগ ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে গানসমূহের বিষয় বৈচিত্র্যের অংশে। অন্যান্য বিষয়সমূহের মধ্যেও রয়েছে রোমান্টিক ভাবনার আলোকপ্রভা। ফলে অধিক তথ্য প্রদানের নিমিত্তে তথা আলোচনার চলমানতার গতি বিবেচনা করে প্রথমে তা একটি তালিকার মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

সারণি: ৩

আধুনিক ধারার প্রেমের গানে রোমান্টিকতা। নায়িকার অভিনয়ে পরিবেশিত গানসমূহ:

ক্রম	গানের শিরোনাম	রোমান্টিক ভাবের লক্ষণসমূহ (গানের বাণী, সুর এবং প্রয়োগ ভাবনার আলোকে)	চলচ্চিত্র
১.	মনের বনে দোলা লাগে আসলো দখিন হাওয়া হারিয়ে দিনগুলি মোর হলো ফিরে পাওয়া	নায়িকার অতীতচারিতা, আশা জাগানিয়া অতঃপর প্রেমের সঞ্চারণ।	*মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬)
২.	নয়নে লাগলো যে রং আহা তা কেউ জানে না	নায়িকার মনে প্রেম এবং আশার সঞ্চারণ।	*এদেশ তোমার আমার* (১৯৫৯)
৩.	গান হয়ে এলে মন যেন বলে সারাবেলা এত সুর নিয়ে নিজেকে কেন যে বলো রাখি লুকিয়ে	প্রয়োগ ভাবনায় নায়িকার মনে প্রেমের সঞ্চারণ, রোমান্সের বহিঃপ্রকাশ।	*নীল আকাশের নীচে* (১৯৬৯)
৪.	ফুলের কানে ভ্রমর এসে চুপি চুপি বলে যায়	নায়িকার মনে প্রেমের সঞ্চারণ; ফুল, ভ্রমর, ইতাদি প্রতীকী অর্থের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত।	*পীচ ঢালা পথ (১৯৭০)*
৫.	অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান	নায়িকার মনে গভীর প্রেমানভূতির প্রকাশ যেখানে প্রেম এবং প্রকৃতি একাকার।	*অশ্রু দিয়ে লেখা* (১৯৭২)
৬.	ফুলবিনা কোনদিন মালা হয় না	নায়কের সান্নিধ্য পেয়ে নায়িকার মনে গভীর প্রেমানুভূতির উদয়।	*মধুমিতা* (১৯৭৮)
৭.	ওগো মোর মধুমিতা	নায়কের মনে আশা জাগানোর অন্যতম প্রয়াস নায়িকার গভীর প্রেমানুভূতির প্রকাশের মাধ্যমে।	*মধুমিতা* (১৯৭৮)
৮.	মন আমার ছোট্ট তরী প্রেমের সাগর দিতে পারি	নায়িকার মনে প্রেমের সঞ্চারণ।	*গাংচিল* (১৯৮০)
৯.	আমার মন বলে তুমি আসবে	নায়কের আগমনে নায়িকার ব্যাকুল চিত্ত। অপেক্ষার প্রহরে অধীর হৃদয়।	*আনারকলি* (১৯৮০)
১০.	ফুল যদি ঝরে গিয়ে আজকে রাতে	নায়িকার মনে প্রেমের সঞ্চারণ।	*আনারকলি* (১৯৮০)
১১.	এই হৃদয়ে এত যে কথার কাঁপন	স্বামীর ভালবাসা পেয়ে স্ত্রীর মনে গভীর সুখানুভূতির বহিঃপ্রকাশ।	*চন্দ্রনাথ* (১৯৮৪)
১২.	আবার দুজনে দেখা হলো	নায়কের হঠাৎ সান্নিধ্য অতঃপর নায়িকার মনে নতুন করে ভালবাসা, আশার সঞ্চারণ।	*দুই জীবন* (১৯৮৮)

সারণি: ৩.১

নায়কের অভিনয়ে পরিবেশিত রোমান্টিক গানসমূহ:

১.	তোমারে লেগেছে এত যে ভালো	প্রেম প্রকৃতি এবং কল্পনার বিপুল বিস্তারণ।	*রাজধানীর বুকে* (১৯৬০)
২.	নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তায় চলেছি একা	নায়িকার সাক্ষাৎ পাওয়ার অধীর আগ্রহে নায়কের চঞ্চল মন ; প্রেম, প্রকৃতি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত।	*নীল আকাশের নীচে* (১৯৬৯)
৩.	আয়নাতে ঐ মুখ দেখবে যখন	নায়কের মনে প্রেমের সঞ্চারণ; ফুল, ভ্রমর, প্রকৃতি ইত্যাদি প্রকীতী ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত।	*নাচের পুতুল* (১৯৭১)
৪.	ছবি যেন শুধু ছবি নয় আজ কেন তাই মনে হয় এ যেন ওগো দুটি প্রাণের কথা বিনিময়	নায়িকার প্রতি নায়কের মুগ্ধতা অতঃপর তার মনে প্রেমের সঞ্চার।	*মানুষের মন* (১৯৭২
৫.	ও দুটি নয়নে স্বপনে চয়নে	নায়িকার রূপে মুগ্ধ নায়কের মন; প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ প্রতীকী অর্থে উপস্থাপিত।	*অশ্রু দিয়ে লেখা* (১৯৭২)
৬.	এই আকাশকে সাক্ষী রেখে	নায়কের মনে প্রেমের সঞ্চারণ; প্রকৃতির নানা উপাদান–গাছ পালা, আকাশ, বাতাস ইত্যাদি উপমার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত।	*সোহাগ* (১৯৭৮)
৭.	হায়রে একি সৃষ্টি দেখে এ দৃষ্টি ফেরাতে পারি না তো আর	নায়কের প্রেমের সঞ্চারণ; নায়িকার রূপে মুগ্ধ নায়কের মন; প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যও তার রূপের কাছে যেন হার মানে।	*ঘর সংসার* (১৯৭৯)

সারণি: ৩.২

নায়ক-নায়িকার দ্বৈতাভিনয়ে পরিবেশিত রোমান্টিক গানসমূহ:

১.	আকাশের হাতে আছে একরাশ নীল	গানের বাণী,সুর,শব্দ চয়ন, কাব্যময়তা এবং প্রেম।	*আয়না ও অবশিষ্ট* (১৯৬৭)
২.	তুমি যে আমার কবিতা আমার বাঁশির রাগিণী	গানের বাণী, শব্দ চয়ন, দ্বৈতমনে রোমান্টিকতার বহিঃপ্রকাশ।	*দর্পচূর্ণ* (১৯৭০)
৩.	চাঁদের সাথে আমি দেব না তোমার তুলনা	চাঁদ, ফুল, নদী, অলি ইত্যাদি প্রকৃতির নানা উপাদান প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত এবং কল্পনার অবাধ বিস্তার তদুপরি দ্বৈতমনে প্রেমানুভূতির গভীর প্রকাশ।	*আর্শীবাদ* (১৯৮৩)
৪.	তুমি আমি দুজনে জনমে জনমে ভালবেসে কাছে রবো জীবনে মরণে	দ্বৈতমনে প্রেমের বহিঃপ্রকাশ। ভালবাসার জন্য তারা তাদের জীবন দিতেও সদাপ্রস্তুত।	*লাইলী মজনু* (১৯৮৩)
৫.	আমার বুকের মধ্যেখানে মন যেখানে হৃদয় যেখানে	দ্বৈতমনে প্রেমের বহিঃপ্রকাশ। ভালবাসার জন্য তারা সব করতে প্রস্তুত। ভালবাসার রূপ নির্ণয়ে নদী, সাগর, ঢেউ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে গানের বাণীতে।	*নয়নের আলো* (১৯৮৪)

৬.	সবাইতো ভালবাসা চায় কেউ পায় কেউ বা হারায়	দ্বৈতমনে প্রেমের বহিঃপ্রকাশ। ভালবাসার রূপ নির্ণয়ে ফুল, নদী, অলি ইত্যাদির ব্যবহার তদুপরি প্রকৃতির অন্তরালে আরেক প্রেমের স্বরূপ উন্মোচন।	*স্যারেন্ডার* (১৯৮৭)
৭.	আজ রাত সারা রাত জেগে থাকব	দ্বৈতমনে প্রেমের সঞ্চারণ; ফুল, ভ্রমর পাখি, আকাশ ইত্যাদির উপমায় প্রকাশিত।	*নীতিবান* (১৯৮৮)
৮.	তুমি ছাড়া আমি একা পৃথিবীটা মেঘে ঢাকা	নায়ক-নায়িকার প্রেমের বহিঃপ্রকাশ; মেঘ, খেয়া, তরী ইত্যাদি প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত।	*দুই জীবন* (১৯৮৮)

সারণি: ৩.৩

নায়ক-নায়িকার বিরহে পরিবেশিত রোমান্টিক গানসমূহ:

১.	মন যদি ভেঙ্গে যায় যাক যাক কিছু বলব না	নায়িকার বিরহ, নিবিড় অনুরাগ এবং মমত্ববোধ।	*জোয়ার ভাটা* (১৯৬৯)
২.	গানের খাতায় স্বরলিপি লিখে বল কি হবে	নায়িকার বিরহ, নিবিড় অনুরাগ এবং মমত্ববোধ।	*স্বরলিপি* (১৯৭০)
৩.	অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান	নায়িকার প্রেম, প্রিয়জনকে চিরদিন কাছে পাওয়ার ব্যাকুলতা; ফুল, পাখির গান, মধু ইত্যাদি উপমায় উপস্থাপিত।	*অশ্রু দিয়ে লেখা* (১৯৭২)
৪.	দুঃখ আমার বাসর রাতের পালঙ্ক	নায়িকার বিরহে পরিবেশিত হলেও নিবিড়, অনুরাগ, মমত্ববোধ ইত্যাদি বিষয় অন্যতম।	*অলঙ্কার* (১৯৭৮)
৫.	আমি রজনিগন্ধা ফুলের মতো গন্ধ বিলিয়ে যাই	নায়িকার বিরহে পরিবেশিত এবং ফুল, নদী, চাঁদ ইত্যাদি উপমা হিসেবে ব্যবহৃত।	*রজনীগন্ধা* (১৯৮২)
৬.	এত সুখ সইব কেমন করে	নায়িকার সুখানুভূতিতে পরিবেশিত; অতীতচারিতা, আশা জাগানিয়া ইতাদি।	*শুভদা* (১৯৮৬)
৭.	অনেক সাধের ময়না আমার বাঁধন কেটে যায়	নায়কের বিরহে পরিবেশিত, নায়িকার জন্য সে পাগল পারা। গভীর মমত্ববোধ ভালবাসার প্রকাশ।	*মনের মত বউ* (১৯৬৯)

সারণি: ৩.৪

লোকজ ধারার প্রেমের গানে রোমান্টিকতা নায়িকার অভিনয়ে পরিবেশিত গানসমূহ:

ক্রম	গানের শিরোনাম	রোমান্টিক ভাবের লক্ষণসমূহ (গানের বাণী, সুর এবং প্রয়োগ ভাবনার আলোকে)	চলচ্চিত্র
১.	পরানে দোলা দিল এ কোন ভ্রমরা	নায়িকার মনে প্রেমের সঞ্চারণ; ফুল, ভ্রমরা পাখি, ইতাদির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত।	*সুতরাং* (১৯৬৪)
২.	গুন গুন গুন গান গাহিয়া নীল ভ্রমরা যায়	নায়িকার মনে প্রেমের সঞ্চারণ; নীল ভ্রমরা, ফুল, মধু, গাছ, রাঙ্গা পা ইতাদি উপমা হিসেবে, কল্পনার বিপুল বিস্তারণে পরিবেশিত।	*সুজন সখী* (১৯৭৫)

৩.	চুল ধইর না খোঁপা খুলে যাবে হে নাগর	নায়কের স্পর্শে নায়িকার মনে শঙ্কা, প্রেমের সুখানুভূতির বিস্তার।	*নয়ন মণি* (১৯৭৬)
৪.	আমি যেমন আছি তেমন রবো বউ হবো নারে	নায়িকার মনে প্রেমের সঞ্চারণ; বউ কথা কও পাখির সুর, বাতাস, মেঘ, শাপলা, হাঁস ইত্যাদি উপমার মধ্য দিয়ে পরিবেশিত।	*অশিক্ষিত* (১৯৭৮)
৫.	আইলো দারুণ ফাগুনরে লাগল মনে আগুনরে একা একা ভালো লাগে না	নায়িকার মনে প্রেমের সঞ্চারণ; ফাগুন, আগুন, বন, ফুল, ভ্রমর, বসন্ত ইত্যাদি প্রকৃতির নানা উপমা হিসেবে উপস্থাপিত।	*চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা* (১৯৮৪)
৬.	দিনের কথা দিনে ভালো রাইতে কথা রাইতে	নায়কের প্রতি নায়িকার বিশেষ প্রেমানুভূতির প্রকাশ।	*উজান ভাটি* (১৯৮২)
৭.	বন্ধু লিখেছে আমায় প্রেমের আলাপন মিছে করিস না সখী আমায় জ্বালাতন	নায়কের পত্র পেয়ে নায়িকার মনে প্রেমের সঞ্চারণ।	*আলিফ লায়লা* (১৯৮০)
৮.	আমি একা একা থাকিরে চঞ্চল পাখিরে কারও যে ধার যে ধারি না	নায়িকার মনে প্রেমের সঞ্চারণ।	*উজান ভাটি* (১৯৮২)

সারণি: ৩.৫

নায়কের অভিনয়ে পরিবেশিত রোমান্টিক গানসমূহ:

১.	তুমি আসবে বলে কাছে ডাকবে বলে	নায়িকার অভিনয়ে পরিবেশিত হলেও তা নায়কের কল্পনায় ব্যবহৃত। গানের বাণীতে কল্পনার বিপুল বিস্তারণ, ফুল, জোছনা হাওয়া, বন চাঁদ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে।	*সুতরাং* (১৯৬৪)
২.	তুই যে আমার মিলন মালারে বন্ধু পিরিতের নকশি সুতায় গেঁথে রাখি	নায়কের অভিমান ভাঙ্গাতে নায়িকার প্রয়াস যা নকশি কাঁথা, সুতা, চাঁদ, সূর্য, নিশি রাত, ফুল ভ্রমরা, বনফুল, গাঙ্গের জোয়ার পাখি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। অপরপক্ষে দ্বিতীয় বার পরিবেশিত নায়িকার দেখা পাওয়ার অপেক্ষায় নায়কের মনে কল্পনার বিস্তার।	*নিষ্পাপ* (১৯৮৬)

সারণি: ৩.৬

নায়ক-নায়িকার দ্বৈতাভিনয়ে পরিবেশিত রোমান্টিক গানসমূহ:

১.	নদী বাঁকা জানি চাঁদ বাঁকা জানি	দ্বৈতকণ্ঠে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গান যা প্রেমের বহিঃপ্রকাশ বিশেষভাবে বাণী এবং প্রয়োগ ভাবনায় তা লক্ষণীয়	*সুতরাং* (১৯৬৪)

২.	সব সখীরে পার করিতে নেব আনা আনা	দ্বৈতকণ্ঠে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক প্রেমানুভূতির প্রকাশ। প্রেম নিবেদনের প্রক্রিয়া এবং বাক বিনিময়–প্রেমের ঘাটের মাঝি, বামন, চাঁদ, হাট ইত্যাদি কথপোকথন এবং নায়কের আশ্বস্ত করার প্রকাশ ভঙ্গি রোমান্টিক ভাবধারাকে লালন করে।	*সুজন সখী* (১৯৭৫)
৩.	আকাশ বিনা চাঁদ হাসিতে পারে না	দ্বৈতমনে প্রেম। জাদু এবং পাখি কেউ কাউকে ছাড়া ভাবতে পারে না। প্রতীকী অর্থে আকাশ, চাঁদ, হাসি ইত্যাদির ব্যবহার।	*যাদুর বাঁশি* (১৯৭৭)
৪.	এক নদীর এই উজান ভাটির আমরা দুটি ধারা	দ্বৈতমনে প্রেমের প্রকাশ। নদী, উজান, ভাটি, আকাশ, তারা ইত্যাদি শব্দসমূহ উপমা হিসেবে ব্যবহৃত।	*উজান ভাটি* (১৯৮২)
৫.	কী জাদু করিলা পিরিতি শিখাইলা	দ্বৈতমনে প্রেমানুভূতির গভীর প্রকাশ। একে অপরকে ছাড়া থাকতে না পারার ব্যাকুলতা।	*প্রাণ সজনী* (১৯৮৩)
৬.	ওরে ও বাঁশিওয়ালা	শরৎ, শীত, বসন্ত প্রকৃতির নানা রূপের উপস্থাপন দ্বৈতমনে প্রেমানুভূতি প্রকাশের অন্যতম উপমা হিসেবে।	*নরম গরম* (১৯৮৪)
৭.	তুমি ডুব দিওনা জলে কন্যা	দ্বৈতমনে প্রকৃতি ও প্রেম। যা ঝিনুক, মুক্তা, জল ইত্যাদি প্রকৃতির নানাবিধ উপাদান উপমা হিসেবে ব্যবহৃত।	*ঝিনুক মালা* (১৯৮৫)
৮.	পিরিতের ছোট্ট ঘরে রাখিব আপন করে	দ্বৈতমনে গভীর প্রেমানুভূতির প্রকাশ এবং একটি স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রবল ইচ্ছা।	*নিষ্পাপ* (১৯৮৬)

সারণি:৩.৭

নায়ক-নায়িকার বিরহে পরিবেশিত রোমান্টিক গানসমূহ:

১.	বিদেশ গিয়া বন্ধু তুমি আমায় ভুইল না	নায়িকার বিরহ এবং গভীর মমত্ববোধ তার প্রেমিকের জন্য।	*উজান ভাটি* (১৯৮২)
২.	ওরে নীল দরিয়া আমায় দেরে দে ছাড়িয়া	নায়কের বিরহ-বেদনা এবং গভীর মমত্ববোধ তার প্রিয় স্ত্রীর জন্য।	*সারেং বৌ* (১৯৭৮)
৩.	হায়রে অবুঝ নদীর দুই কিনার	নায়কের বিরহ, নায়িকার বিচ্ছেদ-বিয়োগে	*শুভদা* (১৯৮৬)

গানের প্রয়োগ ভাবনা, বাণী, সুর ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্ণিত তালিকার রোমান্টিক গানসমূহের বিস্তারিত আলোচনা নিম্নোক্তভাবে করা হয়েছে।

প্রেম

কাহিনিরি নানা ঘটনা প্রবাহকে কেন্দ্র করে, সময়ের আবর্তনে আধুনিক প্রেমের গান বিচিত্রভাবে চিত্রিত হয়েছে; কখনো নায়ক-নায়িকার একাকী অথবা দ্বৈতকণ্ঠের অভিনয়ে। ফলে ব্যবহার অনুযায়ী প্রেমের গানসমূহকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়– ক. নায়িকার অভিনয়ে প্রেমের গান খ. নায়কের অভিনয়ে প্রেমের গান গ. নায়ক-নায়িকার দ্বৈতাভিনয়ে প্রেমের গান ঘ. নারী হৃদয়ের শাশ্বত প্রেমের গান ঙ. নায়িকার বিরহে গান চ. নায়কের বিরহে গান জ. চিঠি পত্রে প্রেম-বিরহের গান প্রভৃতি। বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

ক. নায়িকার অভিনয়ে প্রেমের গান

প্রচলিত চলচ্চিত্রের ধারানুযায়ী নায়িকার একান্ত মনের কথা কিংবা নায়কের প্রতি বিশেষ কোন দুর্বলতা অথবা ভালবাসার অভিপ্রায়ে উপস্থাপিত কোন গানকে বর্ণিত শিরোনামের গান বলা যায়। নিম্নোক্ত গানটি তারই রূপবাহী। আব্দুল জব্বার খানের *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬) বাংলাদেশের চলচ্চিত্র মাধ্যমের ইতিহাসে প্রথম সবাক চলচ্চিত্র। এ চলচ্চিত্রের দৃশ্যায়নে দেখা যায় যে, পুকুর ঘাটে থালা-বাসন পরিষ্কার করে কুলসুম (নাজমা)। আলাপ প্রসঙ্গে কুলসুমের সঙ্গী বলে: 'কৈ গোসল করে লন, থালতো মাজা হয়ে গেলো' কুলসুম গোসল করতে পুকুরে নামে বলে: 'আয় সাঁতার কাটি। উত্তরে সঙ্গী বলে: 'কন কি আমার হাত যে ভাঙ্গা।' এরপর দু'হাত বাড়িয়ে জল ভেঙ্গে একাই স্নান করে কুলসুম আর গেয়ে চলে নিম্নোক্ত গানটি–

মনের বনে দোলা লাগে আসলো দখিন হাওয়া
হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর হলো ফিরে পাওয়া ॥

কুলসুমের জীবনে এক কলঙ্কের কালিমা লেপে দিয়েছে শমসের (ইনাম আহমেদ) নামের একজন কুখ্যাত ডাকাত। বিয়ের আসর থেকে তুলে নিয়ে সম্ভ্রম কেড়ে নিয়েছে, করেছে তাকে ভোগের সঙ্গী। ভোগ্য-দাসীর এই জীবন থেকে সে পরিত্রাণ পেতে চায়। অপরদিকে ঘটনাচক্রে শমসের ডাকাতের আশ্রয়ে আফজালের (আবদুল জব্বার খাঁ) জীবন বেঁচে গেলেও এ জীবন তার কাঙ্ক্ষিত জীবন নয় বরং পরিস্থিতির শিকার। দু'জনেই শমসের ডাকাতের নিষ্ঠুর শেকলে বন্দি; কুলসুম আজ নাচনেওয়ালি এবং আফজাল ডাকাত দলের ছোট সর্দার। এক সময় উভয়ের মধ্যে দুঃখ, কষ্টের কথা বিনিময় হয়। তা দৃষ্ট হয় কুলসুম এবং আফজালের সংলাপে। কুলসুম যখন আফজালকে বলে: 'আমিতো তোমাদের হাতের পতুল।' আফজাল তার উত্তরে বলে: 'কেউ যদি তোমাকে এই পাপ জীবন থেকে সরিয়ে নিতে চায়। সংসার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তবে কি তুমি ?' তখন থেকে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোকে আবার ফিরে পাওয়ার তীব্র বাসনা জাগে কুলসুমের মনে। সেই সুবাশে ভালবাসার প্রজাপিত গুনগুনিয়ে সুর তোলে তার মনে। সেই ভালবাসারই প্রকাশ গানটিতে–

চিত্র-১৮: *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬) চলচ্চিত্রে 'মনের বনে দোলা লাগে' গানের একটি স্থিরচিত্রে নাজমা।

গানের বাণীতে সুউচ্চ গুণমানসম্পন্ন ভাষার ব্যবহার এবং কল্পনার বিস্তারে যে কাব্যময়তা তৈরি হয়েছে যা গানের প্রয়োগ ভাবনায় প্রশ্নের উদ্রেক করে। এবং বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বলে অনুভূত হয়। কিন্তু তা রোমান্টিক ভাবধারাকে লালন করে। সেদিক থেকে এই গানটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে রোমান্টিক গানের সাক্ষরবাহী। গানটির গীতিকার আবদুল গফুর সারথী এবং সুরকার সমর দাস, কণ্ঠশিল্পী মাহবুবা হাসনাত (মাহবুবা রহমান)। একই ভাবাবেগের গান এহতেশাম পরিচালিত *এদেশ তোমার আমার* (১৯৫৯) চলচ্চিত্রে লক্ষ করা যায়। দৃশ্যায়নে দেখা যায়, হারুন (খান আতাউর রহমান) তার মাকে জিজ্ঞেস করে: 'তোমার জ্বর নেমে গেছে মা ? উত্তরে তার মা বলে: 'তুই যেভাবে সেবা করছিস তাতে ভালো না হয়ে পারি? আচ্ছা যাই আমি তোমার বার্লিটা নিয়ে আসি।' রান্না ঘরে ঢুকতেই হারুন অবাক হয় শাহানাকে (সুমিতা দেবী) দেখে, চমকে উঠে বলে: 'আপনি? উত্তরে শাহানা বলে: 'জি শুনলাম বার্লি তৈরি করছেন। তাই দেখতে এলাম।' হারুনের মুখের দিকে তাকিয়ে শাহানা বলে: 'আয়নায় গিয়ে নিজের চেহারাটা একবার দেখুন না। 'ও' এই বলে নিজের হাত দিয়ে মুখে লেগে থাকা রান্নার কালি মুছার চেষ্টা করে হারুন। শাহানা বলে: 'হলো না' 'দেখি' বলে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখের কালি মুছে দেয়। তারপর লজ্জা আড়ষ্ঠতা নিয়ে দ্রুত চলে যায় শাহানা হারুনের সামনে থেকে। এমন সুন্দর একটি মুহূর্ত নিয়ে বাড়ি ফিরে শাহানা। তারপর আয়নার সামনে গিয়ে মনের আনন্দে সাজে এবং গুন গুন করে গেয়ে চলে নিম্নোক্ত গানটি–

নয়নে লাগলো যে রং আহা তা কেউ জানে না
পরানে জাগলো যে রং আহা তা কেউ জানে না ॥

চিত্র-১৯: *এদেশ তোমার আমার* (১৯৫৯) চলচ্চিত্রে 'নয়নে লাগলো যে রং'
গানের একটি স্থিরচিত্রে সুমিতা দেবী।

সমাজ জীবনে মানুষ একা থাকতে পারে না। একজন সঙ্গীর কামনা সবাই করে। শাহানার পরিবেশিত গানেও সেই আকাঙক্ষারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। উত্তরাধিকারীসূত্রে জমিদারের একমাত্র কন্যা সন্তান সে। কিন্তু আজ সে পিতা-মাতাহীন জীবনে বড়ই নিঃস্ব, একা। চাচা এবং তার বিলেত ফেরত নেশাগ্রস্ত ছেলে হামিদের অসৎ উদ্দেশ্য আর কর্তৃত্ব পরায়ণের কাছে নিজ গৃহে থেকেও সে পরবাসী,পরাধীন। এমন পরিস্থিতিতে একজন সঙ্গীর প্রয়োজন ভীষণ অনুভব করে সে। গানের বাণীতে তা ব্যক্ত হয়েছে– 'একলা পথে একা যে তার চলতে হবে না'। তাছাড়া উক্ত গানের চরিত্র শাহানা দেশ বিভাগোত্তকালের (১৯৪৭) নারী সমাজের প্রতিনিধি বলে ধারণা অনুভূত হয়। সে

সমাজের নারীরা উপেক্ষিত ছিল। চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা ও গান রচনায় ছিলেন খান আতাউর রহমান। গানটির নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী মাহবুবা হাসনাত (মাহবুবা রহমান)। এই চলচ্চিত্রে একই শিল্পীর কণ্ঠে আরো একটি প্রেমের গান যা রোমান্টিক গানের বৈশিষ্ট্যকে অর্জন করে বিশেষত প্রয়োগ ভাবনার মধ্য দিয়ে–

আমার গানের সুরে তোমার বীণার তারে
কোন কথা নাহি বলে কত কিছু হয়েছে গো বলা
তবু ভাবি সবটুকু হলো না বলা ॥

শাহানার সৎ চাচার ছেলে হামিদ একদিন বিনা অনুমতিতে তার রুমে প্রবেশ করে সিগারেট হাতে। শাহানার বিছানায় বসে বিলেতি মেয়েদের সাথে নানা সম্পর্কের প্রসঙ্গ তোলে এবং অবৈধ,অনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করতে চায়। এতে শাহানা ক্ষিপ্ত হয়ে হামিদকে রুম থেকে বের করে দেয়। এমন পরিস্থিতি কোন মতেই মেনে নিতে পারে না শাহানা। রাগে ক্ষোভে ছটফট করতে থাকে। তারপর হারুনের বাসার দিকে রওয়ানা হয়। হারুন তখন আপন মনে বেহালা বাজাচ্ছে। পেছন দিক থেকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে শাহানা। বেহালার সুর থেমে গেলে শাহানা বলে: 'থামলে কেন? বাজাও' হারুন বলে: 'জানতাম তুমি আসবে।' উক্ত চলচ্চিত্রে একই শিল্পীর কণ্ঠে নিম্নোক্ত আরো একটি প্রেমের গান। প্রকৃতি প্রেম অসাধারণ রূপে বিরাজমান; মানব মানবীর প্রেমের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। গানের বাণীতে চাদঁ, তারার জেগে থাকার প্রসঙ্গ যেন কাঙ্ক্ষিত মিলনের ইঙ্গিতবাহী যা রোমন্টিক ভাবধারাকে লালন করে–'এই জেগে থাকা চাঁদ আর তারাদের মিটি হাসি, সাজানো আমার প্রথম মিলন নিশি।' নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত *নীল আকাশের নীচে* (১৯৬৯) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিও তৃষ্ণার (কবরী) রোমান্সে পরিবেশিত হতে দেখা যায়–

গান হয়ে এলে মন যেন বলে
সারাবেলা এত সুর নিয়ে
নিজেরে কেমনে বলো রাখি লুকিয়ে ॥

বর্ণিত চলচ্চিত্রের উপরোক্ত গান এবং 'নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তায় চলেছি একা' গান দুটো অনেকটা একই ভাবাবেগে ব্যবহৃত। একটি খোলা রাস্তায় প্রকৃতির খুব সন্নিকটে অন্যটি লোকালয় থেকে সরে নারী হৃদয়ের আপন আলোয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায়, গান শেষে তৃষ্ণার রুমে তার বান্ধবী হাসিনা প্রবেশ করে। তৃষ্ণাকে বালিশ জড়িয়ে গান করতে দেখে বলে: 'গান হয়ে কে এলো তোর? দু'জনে মিলে হাসাহাসি করে। বান্ধবী হাসিনা আবারও জিজ্ঞেস করে: 'বলনা গান হয়ে কে এলো তোর জীবনে? তৃষ্ণা বলে বলব চুপি চুপি।' সুরকার সত্য সাহা, নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী ফেরদৌসী বেগম (রহমান)। গানের প্রয়োগ ভাবনায় রোমান্স লক্ষণীয় হলেও গানের বাণীতে রোমান্টিক ভাবের লক্ষণ অনেকটা ক্ষীণ।

এহতেশাম পরিচালিত *পীচ ঢালা পথ (১৯৭০)* চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত রোমান্টিক গান। চলচ্চিত্রে দেখা যায়, আইএ পাশ করে চাকরির খোঁজ করে রাজ্জাক। কিন্তু কোথাও কোন চাকরি পায় না। অবশেষে ঘটনাচক্রে ট্যাক্সি চালানোর কাজ পায়। একদিন রাজ্জাক ট্যাক্সি নিয়ে বের হয়। পেছন থেকে ববিতা ঝাঁকুনিতে 'উহ' করে ওঠে। রাজ্জাক বলে: 'ও তুমি', 'হ্যা আমি। সাহেব ট্যাক্সি ড্রাইভার হয়ে গেছে আর আমাকে নিয়ে একদিনও বেড়াতে গেলো না।' রাজ্জাক হা হা হা করে হেসে বলে: 'দুষ্টু কোথাকার। বাড়ির সামনে ট্যাক্সি দেখে বুঝি চোরের মত উঠে বসে আছো।' ববিতা বলে: 'হ্যা, মাঝে

মাঝে চুরি না করলে মজা লাগে না। আমাকে নিয়ে চলো না। কোথায় যাবে ? যেখানে মন চায়। বেশ চলো।' তারপর শুরু হয় দুজনের পথচলা। ববিতার রোমান্সে পরিবেশিত হয় গান–

ফুলের কানে ভ্রমর এসে চুপি চুপি বলে যায়
তোমার আমার সারাটি হৃদয় নীরবে জড়াতে চায় ॥

গানের বাণী এবং প্রয়োগ ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক রোমান্টিক ধারার গান বলে বিবেচনা করা যায়। কারণ 'ফুল, ভ্রমরের সাথে হৃদয়াবেগের যে প্রতীকী ব্যঞ্জনা তা রোমান্টিক ভাবধারাকেই প্রতিস্থাপন করে। প্রয়োগ ভাবনাতেও দেখা যায়, প্রকৃতির কাছে নিজেকে যেন সমর্পন করে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানোর প্রয়াসে। গানটি রচনা করেছেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সুরারোপ করেছেন রবিন ঘোষ, কণ্ঠশিল্পী শাহনাজ রহমতউল্লাহ।

কামাল আহমেদ পরিচালিত *অশ্রু দিয়ে লেখা* (১৯৭২) চলচ্চিত্রে সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে, সুজাতার অভিনয়ে পরিবেশিত নিম্নোক্ত গানটিও রোমান্টিকতার রূপবাহী। চলচ্চিত্রে গানটির প্রয়োগ ভাবনায় দেখা যায়, পাখি শিকার করতে এসে মৌসুমী (সুজাতা) এবং আসাদ চৌধুরী (রাজ্জাক) দুজনের সাথে পরিচয় হয়। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে দুজনের মাঝে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এক সময় দেখা যায় সবুজ শ্যামল ঘন পরিবেশে মৌসুমীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে আসাদ। দুজনে ভাবে তাদের আনন্দঘন সময়ের কথা। ক'দিন পরেই আসাদকে ঢাকায় চলে যেতে হবে। মৌসুমীকে থাকতে হবে একা। এ নিয়ে মৌসুমী বলে: 'কয়েকদিন পর তুমি যাবে ঢাকায় আর আমি চট্টগ্রামে।' আসাদ মৌসুমীর কষ্টকে অনেকটা দুষ্টমির ছলে আরো বাড়িয়ে দিয়ে বলে: 'আব্বা-আম্মা বেশ কিছুদিন ধরে আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে আমার এই ভবঘুরে স্বভাবটার জন্যে মেয়ে দেখা চলছে এবার বাড়ি ফিরে দেখব হয়তো কোথাও কথাবার্তা পাকা পোক্ত করে বসে আছে।'

এই কথা শোনার পর মৌসুমীর চোখে জল ছল ছল করে। চোখে জল দেখে কোল থেকে উঠে বসে আসাদ। তারপর তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে। তার থুতনি ধরে বলে: 'কি গো হঠাৎ তোমার ডাগর চোখে সাগর কূলে, অমনি ধরে নিলে বাড়ি ফিরে শান্ত সুবোধ ছেলের মত বিয়ে করে, তোমার কথা ভুলে যাব। না মৌসুমী। আমি শুধু তোমার শুধু তোমার।' মৌসুমী কোন কথা বলে না প্রচণ্ড দুঃখবোধ হয় তার। সে শুধু তাকিয়ে থাকে। তারপর আসাদ বলে : 'অমন করে চেয়ে থেকো না, কিছু বলো, বলো লক্ষীটি, মৌসুমী তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে–

অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান
যেন ভুলে যেওনা
একই বন্ধনে বাঁধা দুজনে
এ বাঁধন ছিঁড়ে যেওনা ॥

উপরোক্ত গানটি ক্ষাণিক বিরহে পরিবেশিত হলেও তাতে গভীর প্রেমেরই প্রকাশ এবং তা রোমান্টিক ভাবধারাকে লালন করে। গান শেষে কোকিলের ডাক শুনতে পাওয়া যায়। তা যেন দুজনের ভালবাসারই প্রতীকী রূপ। প্রেম এবং প্রকৃতি যেখানে অবিচ্ছেদ্য রূপে বহমান; প্রিয়জনকে সারাজীবন আপন করে কাছে পাওয়ার ব্যাকুলতায় অধীর প্রেমিকার হৃদয়। ব্যক্ত হয় এভাবে–'ঐ ফুল বনে পাখি

আজ মন জুড়ে যেন গায়, এই হাত জড়ানো হাতে চিরদিন যেন ওগো রয়।' গানটি দ্বিতীয় বার ব্যবহৃত হয় বিরহ বেদনার নিদারুণ রূপ হিসেবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে এই অধ্যায়ের নায়িকার বিরহে পরিবেশিত গানের আলোচনায়। একই গান কেবল সময়ের কঠিন বাস্তবতার নিরিখে ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়। এটি অবশ্য মূলধারার চলচ্চিত্রে অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কখনো স্মৃতি ফিরে পাবার তরে অথবা ভাবের বোধোদয় হওয়ার নিমিত্তে এইভাবে গান ব্যবহারের রীতির প্রচলন লক্ষ করা যায়।

রুহুল আমীনের *গাংচিল* (১৯৮০) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি নীলার (অঞ্জনা) প্রেম সঞ্চারণে ব্যবহৃত যা রোমান্টিক ভাবাবেগে পরিবেশিত। চলচ্চিত্রে দেখা যায় ঘটনাক্রমে সমুদ্র পথে জাহাজের মালিকের (আহমেদ শরীফ) অত্যাচার থেকে নীলাকে রক্ষা করে ডাক্তার আনোয়ারুল কবীর আনু (বুলবুল আহমেদ)। এক পর্যায়ে তার অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে দুজনে জাহাজ থেকে ছোট নৌকা করে আলাদা হয়ে যায়। তারা নির্জন দ্বীপে অপেক্ষা করে গন্তব্যে পৌঁছানোর আশায়। এ সময়ে দুজনের মাঝে এক ধরনের সখ্যতা গড়ে উঠে যা ভালবাসারই রূপবাহী। নীলার মনে অজানা এক ভাললাগার প্রকাশ নিম্নোক্ত গানে–

মন আমার ছোট্ট তরী
প্রেমের সাগর দিতে পাড়ি
লাজেরই নোঙ্গর ছিড়ে যেতে চাইরে
সুখের বাসরে ॥

চিত্র-২০: *গাংচিল* (১৯৮০) চলচ্চিত্রে 'মন আমার ছোট্ট তরী' গানের একটি স্থিরচিত্রে অঞ্জনা।

রোমেনা আফাজ-এর বিখ্যাত উপন্যাস 'প্রিয়ার কণ্ঠস্বর' অবলম্বনে মোস্তাফ মেহ্‌মুদ পরিচালিত *মধুমিতা* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি বিবাহের গুঞ্জরণে নারীর উতলা মনের অভিপ্রায়ে উপস্থাপিত তা এক ধরনের রোমান্টিকতাকে আশ্রয় করে পরিবেশিত। প্রয়োগ ভাবনা তদুপরি গানের বাণীতে তা-ই স্পষ্ট হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় মাসুদ (আলমগীর) তার খালাত বোন আফরোজাকে (মঞ্জু দত্ত) নিয়ে পাখি শিকার করতে বের হয়। ইতোমধ্যে পরিবারে দুজনের সাথে বিয়ের কথা পাকাপোক্ত। আফরোজাকে দিয়ে পাখি শিকার করার চেষ্টা করে সে। কিন্তু শেষ গুলিটাও সে মিস করে। তারপর দুজনে ঘুরে বেড়ায় প্রাকৃতিক সুন্দর পরিবেশে।

আফরোজা তার হবু স্বামী মাসুদকে পেয়ে ভীষণ আনন্দানুভব করে। ছোট ছোট নিশ্বাসে তার মন হারিয়ে যায় অজানা এক ভাল লাগায়। দুজনের কথপোকথনে এমনই ভাবের প্রকাশ। আফরোজা যখন বলে: 'আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে। এই সুন্দর ঝির ঝির হাওয়া, নিরিবিলি পরিবেশ। আকাশে ঐ সাদা সাদা মেঘের খেলা। মনটাকে কেমন জানি উতলা করে দেয়। যদি যুগ যুগ ধরে এমনি পরিবেশে দুজনে হারিয়ে যেতে পারতাম ? মাসুদ বলে: সত্যি! তারপর শুরু হয় নিম্নোক্ত গান–

ফুলবিনা কোনদিন মালা হয় না
প্রেমবিনা হৃদয়ের জ্বালা যায় না
তুমি বিনা আমি একা সেকি তুমি বুঝনা ॥

উপরোক্ত গানটিতে বিবিধ উপমার মধ্য দিয়ে নারীর চিরায়ত মনের বাসনা ব্যক্ত হয়। বলা হয়–'কোকিল না ডাকে যদি আসে না ফাগুন, নিভে না তোমায় বিনা মনেরও আগুন।' আবার প্রথম অন্তরার শেষে বলা হয়–'তুমি বিনা আমি চাঁদ বিনা জোছনা।' যা হবু বরকে একান্তে আপন করে পাওয়ার ব্যাকুলতারই প্রতিফলিত হয়। এই চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিতেও প্রেমের গভীরতম রূপ পাওয়া যায় এবং রোমান্টিক বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে বিকশিত–

ওগো মোর মধুমিতা
গহন স্বপন পথে তুমি এলে
তুমি এলে মোর জীবনে
জীবনে প্রদীপ জ্বেলে ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় বাসর ঘরে অন্ধ স্বামী মাসুদের (আলমগীর) ঘুমন্ত মুখখানি দেখে কেঁদে ওঠে নববধূ হাবিবা (শাবানা)। মাসুদ কান্নার কারণ জানতে চাইলে হাবিবা লুকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু হাবিবার দুঃখবোধ দেখে মাসুদ বলে: 'আমি জানি তোমার মনে কত ব্যথা জট বেধে আছে।' আরো বলে: 'আমি অন্ধ জেনেও তুমি এ বিয়েতে মত দিয়েছিলে কেন ? হাবিবা তার উত্তরে বলে: 'আমি জানি অন্ধ হলেও তুমি মানুষ। তুমি যে আমার আর্শীবাদ। তোমাকে পেয়েছি, এ যে আমার কত বড় সৌভাগ্য।' মাসুদ বলে: 'তোমাকে পেয়ে আমার কোন দুঃখ নেই। তুমি যে আমার অন্ধকারের দীপ শিখা।' বাসর ঘর থেকে কল্পনায় চন্দ্রালোকিত রাতের দৃশ্যায়নে ফেরদৌসী রহমানের কণ্ঠে পরিবেশিত হয় উপরোক্ত গানটি।

সাইফুল আজম কাশেমের *ঘর সংসার* (১৯৭৯) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিও দীর্ঘদিন পর প্রিয় স্বামীর সান্নিধ্য পেয়ে স্ত্রীর (শাবানা) মনে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, তা তার মনের রোমাঞ্চকর পরিস্থিতিরই সাক্ষ্য বহন করে। গানের বাণীতে তা ব্যক্ত হয়েছে নানা রূপ প্রতীকীর আশ্রয়ের মধ্য দিয়ে। চলচ্চিত্রে দেখা যায় স্বামী (বুলবুল আহমেদ) অনেকদিন পর বাড়িতে ফেরে। তার বাড়ি ফেরাকে কেন্দ্র করে সকলের মাঝে আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি হয়। এক সময় ঘরে ঢোকে স্ত্রীকে বলে: 'আচ্ছা সবার জন্য এত কিছু আনলাম। কৈ তুমি তো জিজ্ঞেস করলে না তোমার জন্য কি এনেছি? হাসি মুখে স্ত্রী বলে: 'আমার জন্যে তো তুমি ফিরে এসেছো। এর চেয়ে আর বড় কি চাওয়ার থাকতে পারে ?' এরপর গলার হার দেখিয়ে বলে: 'কি পছন্দ হয়েছে? দাও এটা আমি নিজের হাতে পরিয়ে দেই।' স্ত্রী আনন্দে

বিহব্বল হয়ে হাত দুটো চেপে ধরে বলে: 'এ দুটো হাত যেন সারাজীবন আমার গলার হার হয়ে থাকে। তুমি শুধু এ দোয়াই করো।' তারপর শুরু হয় নিম্নোক্ত গান–

ও দুটি হাত চিরদিন থাক
হয়ে মোর গয়না
ভালবাসার মণিহারের তুলনা হয় না ॥

উপরোক্ত গানটিতে বাংলার চিরায়ত নারী হৃদয়ের শ্বাশত রূপ বিধৃত হয়। স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক জীবনের এক অনাবিল সুখের চিত্র অঙ্কিত হয়। পরবর্তীতে এই গান একই সুরে কেবল কথার কিছু পরিবর্তন এনে ভিন্ন অর্থে পরিবেশিত হতে দেখা যায়।[৩৭] দিলীপ সোমের *আনারকলি* (১৯৮০) চলচ্চিত্রে রওশন আরা (ববিতা) তার প্রেমিক পুরুষের জন্যে অপেক্ষার প্রহর গুণে নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে–

আমার মন বলে তুমি আসবে
হৃদয়ের বসন্ত বাহারে
প্রেমের অভিসারে আসবে ॥

চলচ্চিত্রে এই গান শেষে দেখা যায় রওশন আরা বাগানের আড়ালে লুকতে চায়। শাহাজাদা সেলিম (রাজ্জাক) একটু এগিয়ে বলে: 'মারহাবা মারহাবা' তারপর বলে: 'যার গান এতো সুন্দর তার চেহারা না জানি কত সুন্দর!' এই কথা শুনে রওশন আরা লজ্জায় নিজেকে আড়াল করতে চায়। শাহাজাদা সেলিম আরো কাছে এগিয়ে যায় এবং অভয় দিয়ে বলে: 'আমি চোরও নই, আমি ডাকুও নই, আমি শাহাজাদা সেলিম। তারপর রওশন আরার উড়না কাঁটায় আটকে যায়। শাহজাদা তা ছাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে এবং রওশন আরার আঙুলে আংটি পরিয়ে দেয়, যা প্রেম-সূচনারই ইঙ্গিতবাহী। গানের প্রয়োগ ভাবনা এবং বাণীর মধ্য দিয়ে রোমান্টিকতা প্রকাশ পায়। প্রসঙ্গত, আশির দশকের চলচ্চিত্রে শুধুমাত্র গানকে রঙিন করার প্রবণতা শুরু হয় এই গান তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এই চলচ্চিত্রে সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে এবং রওশন আরার (ববিতা) অভিনয়ে পরিবেশিত আরো একটি গান–

ফুল যদি ঝরে গিয়ে আজকে রাতে
দু'জনারে চায় শুধু লুকিয়ে দিতে
ও পিয়া তুমি ফুলকে বলো ঝরে যেতে ॥

বাঙালি নারী তার জীবনে পরিপূর্ণতা খোঁজে একটি সুখী সুন্দর পরিবার গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে। চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত *চন্দ্রনাথ* (১৯৮৪) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি সরযুর (দোয়েল) বিবাহোত্তর জীবনে মধুর সুখানাভূতিতে পরিবেশিত হয়–

এই হৃদয়ে এত যে কথার কাঁপন
মুখে কেন বলা হয় না
চোখের লজ্জা মুখের লজ্জা মরমে যে আর সয় না ॥

চিত্র-২১: *চন্দ্রনাথ* (১৯৮৮) চলচ্চিত্রে 'এই হৃদয়ে এত যে কথার কাঁপন' গানের একটি স্থিরচিত্রে দোয়েল।

চলচ্চিত্রে দেখা যায় দয়াল পান্ডার দয়ায়, ভিক্ষে বৃত্তি ছেড়ে সুন্দরী কন্যা সরযু (দোয়েল) এবং তার মা (সুচন্দা) তার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ঘটনাক্রমে সরযুকে জমিদার চন্দ্রনাথ (রাজ্জাক) পছন্দ করে এবং তাকে বিয়ে করে। চরম দুঃখের জীবন থেকে সুখের জীবনে পদার্পন। এ এক অভাবনীয় পাওয়া সরযুর জীবনে। সংসারের চাবি, স্বামী চন্দ্রনাথের ভালবাসা এসব কিছু পেয়ে সে গভীর সুখানুভব করে। তারই সুখানন্দে যেন কেঁদে উঠে তার মন। তারই প্রকাশ উপরোক্ত গানে। প্রসঙ্গত নবম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে এটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রসহ সংগীত শাখায় শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক, শ্রেষ্ঠ গীতিকার, শ্রেষ্ঠ নারী কণ্ঠ পুরস্কার অর্জন করে।[৩৮] আবদুল্লাহ আল মামুনের *দুই জীবন* (১৯৮৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি মোস্তাফা (বুলবুল আহমেদ) এবং তাহমিনা (কবরী সারোয়ার) দুজনের হঠাৎ দেখা হওয়াকে কেন্দ্র করে পরিবেশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে দুজনের মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে উঠলেও দীর্ঘদিন তাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ দুজন দুজনকে কাছে পেয়ে সুখস্মৃতি অনুভব করে তারা। নতুন করে ভালবাসার প্রাণ সঞ্চার হয়। সে ভালবাসারই কথকতা সাবিনার ইয়াসমিনের কণ্ঠে ও তাহমিনার হৃদয়ে গভীর সুখানুভূতিতে সুর হয়ে বাজে–

আবার দুজনে দেখা হলো কথা হলো
মনে যে হলো একদিন কিছু আশা ছিল
ভালবাসা ছিল ॥

চিত্র-২২: *দুই জীবন* (১৯৮৮) চলচ্চিত্রে 'আবার দুজনে দেখা হলো' গানের একটি স্থিরচিত্রে কবরী ও বুলবুল আহমেদ।

গানের বাণী এবং এবং প্রয়োগ ভাবনা রোমান্টিক ভাবধারায় পরিস্ফুট। দীর্ঘ প্রতীক্ষার কথা মালা ব্যক্ত হয় গানের প্রথম অন্তরায়–'অনেক ফাগুন এসে দ্বারে ফিরে গেছে অবশেষে, তুমি ছিলে না বলে গাঁথিনি মালা, কত যে ফুল ঝরে গেলো।' দ্বিতীয় অন্তরায় প্রিয়তমর সান্নিধ্য পেয়ে প্রিয়তমার আকুতি প্রবলতর রূপে প্রকাশমান–'কাছে এসেছো বলে জীবনে যেন হারানো সুখ ধরা দিলো।' গানটির প্রয়োগ ভাবনায় দেখা যায় উপহার কিনতে গিয়ে মোস্তাফা এবং তাহমিনার সাথে অনেকদিন পর হঠাৎ দেখা হয়। এক সময় উপহার নিয়ে দুজনেই উপস্থিত হয় তাদের বান্ধবী ডায়নার (টিনা খান) জন্মদিনে। মোস্তাফা উপস্থিত হয় তার হবু বউ ডায়নার উপহার নিয়ে; যার সাথে তার বিয়ের কথা চলছে। অপরদিকে ডায়না হলো তাহমিনার বান্ধবী। ত্রিমুখী প্রেমের টানাপোড়েন এবং উত্তেজনা যেন রোমান্টিক বিষয়কে লালন করে।

খ. নারী হৃদয়ের শাশ্বত প্রেমের গান

দেশ কাল পাত্র ভেদে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যে নারীরা অতি সাধারণ, আবেগপ্রবণ এবং কোমলমতি। ফলে সংবেদনশীল কোন ঘটনায় সহজেই তাদের মন কেঁদে ওঠে। বাস্তবিক অর্থে এটাও ঠিক যে পরিবেশ পরিস্থিতি মানুষের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পুরুষতন্ত্র ও ধর্মীয় প্রভাবে এখনো এদেশের অধিকাংশ নারীরা ঘরের কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এছাড়া সন্তান লালন পালনে ব্যস্ত থাকার কারণে বর্হিজগতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ কম। উপার্জনের জন্যও তেমন কোন চিন্তা করতে হয় না। ফলত দৈনন্দিন জীবনে দুর্বোধ্য কোন কিছু তাদের স্পর্শ করতে পারে না। সুতরাং পুরুষের ন্যায় নারীর মন কঠিন হওয়ার নজির কম রয়েছে বরং সহজ সরল সাদা মাটা জীবন যাপনে তারা অভ্যস্ত। ফলে সংসারের নানা কাজের মধ্যেও নারীরা স্বামীকে জীবনের সর্বস্ব দিয়ে ভাবে এবং ধ্যান জ্ঞান করে। স্বামীর নাম মুখে নেয়াকেও তারা অশ্রদ্ধা, অসম্মানের বিষয় মনে করে। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন চলচ্চিত্রে।[৩৭] তারা বিশ্বাস করে খোদা তায়ালার পরেই স্বামীর স্থান। *আরাধনা* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানে এমনই এক অভিব্যক্তির প্রকাশ–

আমি তোমার বধূ তুমি আমার স্বামী
খোদার প'রে তোমায় আমি বড় বলে জানি ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় বিয়ের রাতে বাসর ঘরে নববধূকে রেখে ডাক্তার আশিক (বুলবুল আহমেদ) রোগী দেখতে যায়। এদিকে বাসর ঘরে বিয়ের সাজে রূপা (কবরী) তার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে। রাত বাড়ে কিন্তু ডাক্তার বাড়ি ফেরে না। কবরীর দু'চোখ বেয়ে ঘুম নেমে আসে। ঢুলুঢুলু চোখে কল্পনায় স্বামীর সাথে রূপা বাসর রাত উদ্‌যাপন করে উপরোক্ত গান গেয়ে। গীতিকার মুকুল চৌধুরী, সুরকার আলম খান, কণ্ঠশিল্পী শাম্মী আকতার। সাইফুল আজম কাশেম পরিচালিত *বৌরানী* (১৯৮০) চলচ্চিত্রে একই রূপের প্রকাশ–

তুমি আছো বলে আমি সোহাগিনী
দুটি পায়ে দিয়ে ঠাঁই করেছে ঋণী ॥

শাবানা ও বুলবুল আহমেদের অভিনয়ে পরিবেশিত হয় গানটির কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন এবং সৈয়দ আবদুল হাদী। উপরোক্ত গানটির সুরের অনুরূপ শুধুমাত্র কথার পরিবর্তন এনে–'তোমাকে হারিয়ে আমি অভাগিনী পায়ে ধরে কাছে রাখি সেতো পারিনি'। সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে এটি আবার নারী হৃদয়ের বেদনার গান হিসেবে শাবানার অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। কাহিনির মিলনান্তক পরিণতি হয় সৈয়দ আবদুল হাদী এবং সাবিনা ইয়াসমিনের গাওয়া–'আমার এ সংসারে তুমি বৌরানী দুটি পায়ে দিয়ে ঠাঁই করেছো ঋণী' গানটির মাধ্যমে। একই ভাবের গান লক্ষ করা যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস *রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত*-এ। এটি ১৯৮৭ সালে চিত্রায়ণ করেন বুলবুল আহমেদ। এ চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটি শত বঞ্চনা, গঞ্জনার পর জীবনের পরম ধনকে কাছে পেয়ে গভীর সুখানুভূতিতে পরিবেশিত হয়–

শত জনমের স্বপ্ন তুমি আমার জীবনে এলে
কত সাধনায় এমন ভাগ্য মেলে ॥

চিত্র-২৩: *রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত* (১৯৮৭) চলচ্চিত্রে 'শত জনমের স্বপ্ন তুমি আমার জীবনে এলে' গানের একটি স্থিরচিত্রে শাবানা ও বুলবুল আহমেদ।

চলচ্চিত্রে দেখা যায় মামার বাড়িতে থাকে পিতৃহারা কিশোরী রাজলক্ষ্মী (শাবানা), তার মা এবং দিদি। একদিন শ্রীকান্তকে ভালবাসার দায়ে রাজলক্ষ্মীকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় তার মামা। তারপর শুরু হয় তাদের জীবনের করুণ অধ্যায়। উপায়ান্তর না পেয়ে মা তাকে বিক্রি করে দেয় কলকাতার নাচ দরবারে। শুরু হয় তার নর্তকীর জীবন। রাজলক্ষ্মী হয় পিয়ারী বাইজি। সারা শহরে ঢোল পড়ে যায় তার নাম। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর সারাক্ষণ মন পড়ে থাকে ছোট্ট বেলার সখা শ্রীকান্তর নিকট। যাকে সে দেবতার আসন দিয়েছে। তা প্রতীয়মান হয় তার কেয়ার টেকার বাবার মত বয়সি রতনের (আনোয়ার হোসেন) সাথে সংলাপ বিনিময়ে। যখন জানতে চায় এত অর্থসম্পদ নাম ডাক থাকার পরও কেন তার মনে এত কষ্ট। তার আপন বলতে কেউ আছে কিনা? এ প্রশ্নের জবাবে রাজলক্ষ্মী বলে: 'একজন আছে, আমার দেবতা কিন্তু সেই দেবতার দেখা আমি কোথায় পাবো?' ঘটনাক্রমে সেই দেবতার যখন দেখা মেলে, স্পর্শ পায় তখন তার হৃদয়ে আনন্দানুভূতির জোয়ার বয়ে যায় যেন। তারই সীমাহীন সুখের প্রকাশ উপরোক্ত গানে ব্যক্ত হয়।

আবার এ কথাও সত্যি বাঙালি সমাজে পারিবারিক জীবনে শুধুমাত্র স্ত্রীর নয় স্বামীরও রয়েছে তার স্ত্রীর প্রতি গভীর প্রেমানুভূডু প্রকাশের নানা ভঙ্গিমা। নারীর ন্যায় সচরাচর তা লক্ষ করা না গেলেও স্ত্রীর ভালবাসা পেয়ে স্বামীর হৃদয় কখনো কখনো ধন্য হয়ে ওঠে। দিলীপ সোম পরিচালিত *সোনা বৌ* (১৯৮৫) চলচ্চিত্রে প্রবাল চৌধুরীর কণ্ঠে ববিতার বিপরীতে রাজ্জাকের অভিনয়ে তারই বয়ান–

আমি ধন্য হয়েছি ওগো ধন্য তোমারই প্রেমেরই জন্য
তোমারই পরশে জানি ওগো সোনা বউ
জীবন হলো যে অনন্য ॥

সুখের সংসার নির্মাণে রমণীর আসন সর্বাগ্রে। ফলত বাঙালি সমাজে সুখের সংসার গড়ার নিমিত্তে ‘সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে’ এই কথা বহুকাল ধরে বিদিত। কথাটি বাস্তবে রূপ নিলে স্বামীর জীবন ধন্য এবং হয় পরিপূর্ণ। তখন সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব প্রিয় স্ত্রীর উপর অর্পন করে স্বস্তি লাভ করতে চায়। সে কথাই ব্যক্ত হয়েছে–‘আঁচল দিয়ে বেঁধে রেখো এ সংসারের চাবি, তোমার মনে রেখো আমার ভালবাসার দাবী, আষাঢ় শ্রাবণ নয় প্রেমের প্লাবনে দুটি হৃদয় হলো পূর্ণ।’

চলচ্চিত্রে দেখা যায় বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে আসে সোনা মণি (ববিতা) তার ভালবাসার মানুষ মাসুদের (রাজ্জাক) কাছে। তারপর নিকট আত্মীয়রা মিলে বিয়ে দেয় এবং বাসর ঘর সাজায়। বাসর ঘরে মাসুদ তার বিবাহিত স্ত্রী সোনা মণিকে বলেঃ ‘তোমাকে এমনভাবে পাবো সোনা বৌ আমি ভাবতেও পারিনি। মাসুদ তুমি খুশি হওনি ? এই মুহূর্তে আমার মনে হয়, আমার মত সুখ নিয়ে বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেউ জন্মায় নি।...আজ কথা বলবে শুধু আমাদের দুটি হৃদয়।’ তারপর দুজনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। দুজনের উপরোক্ত কথপোকথনে প্রেম এবং ভালবাসার গভীরতর অধ্যায় রচিত হয়। আবার দেখা যায় চলচ্চিত্রে এই গানের কথার কিছু পরিবর্তন এনে সোনা বৌ-এর সুখানুভূতিতে পরিবেশিত হয়–‘আমি ধন্য হয়েছি ওগো ধন্য তোমারই প্রেমেরই জন্য’ তোমারই চরণে ওগো দিও মোরে ঠাঁই, যদিও আমি যে নগণ্য।’

বাঙালি নারীর স্বরূপ নির্ণয়ে অনেকেই বলেন শাবানা হলো চিরায়ত বাঙালি নারী হৃদয়ের অন্যতম রূপকার। তার অভিনয় দেখে হল থেকে চোখ মুছতে মুছতে বের হয়নি এমন দর্শক পাওয়া দুষ্কর। চরম ধের্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এরপর দেখিয়েছেন সহ্য ক্ষমতা মানুষকে কত শান্তির রাজ্যে নিয়ে যেতে পারে। তার অভিনীত চলচ্চিত্রগুলো দেখলে সেটাই প্রমাণিত হয়। আবার অনেক প্রগতিশীল নারীবাদীরা এর তীব্র সমালোচনা করে বলেন শাবানার অভিনয়ে অতি পতিভক্তি, ধৈর্য এবং উদারতার যে প্রকাশ তা আসলে সমাজ বদলে কিংবা নারী উন্নয়নে বিশেষ কোনো ভূমিকা রাখেনি বরং বাঙালি নারীদের পশ্চাৎপদতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। বলা যায় এ সমাজে নারীদের যে অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা পুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট। তাই খোদার পরে স্বামীকে স্থান দেয়। বহুমাত্রিক লেখক হুমায়ূন আজাদ তার ‘নারী’ গ্রন্থে এদেশের নারীর অবস্থান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন এভাবে–

> পুরুষতন্ত্র নারীকে নিয়োগ করেছে একরাশ ভূমিকায় বা দায়িত্বে। নারীকে নিয়োগ করেছে কন্যা, মাতা, গৃহিনীর ভূমিকায়; এবং তাকে দেখতে চায় সুকন্যা, সুমাতা, সুগৃহিনীরূপে। কোনো নিম্নপদকে অসার মহিমা

> দিতে হলে পদগুলোকে সুভাষিত করতে হয়; পুরুষতন্ত্র নারীর ভূমিকাগুলোকে সুভাষিত করেছে; সেগুলোর সাথে জড়িয়ে দিয়েছে বড়ো বড়ো ভাব। তবে ওই ভূমিকাগুলো গুঢ় তাৎপর্য একটি শব্দেই প্রকাশ পায়: শব্দটি দাসী।' এ- অঞ্চলে *দেবী* শব্দটি দাসীরই সুভাষণ। [৪০]

বাহুবল, উপার্জনের ক্ষমতা এবং ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে পুরুষরা যুগ যুগ ধরে নারীর হীনাবস্থাকে চিরস্থায়ী করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তবে পশ্চিমের নারীদের সম্পর্কে তুলনা করে বলেন–

> পশ্চিমে নারীরা শোষিত, তবে মানুষ-পুরুষ দ্বারা শোষিত; আমাদের অঞ্চলে নারীরা শোষিত পশু-পুরুষ দ্বারা। এখানে পুরুষেরা পশুরই গোত্রীয় তাই বঙ্গীয়, ভারতীয়, আর পূর্বাঞ্চলীয় নারীরা যে-শোষণ পীড়নের শিকার হয়েছে পশ্চিমের নারীরা তা কল্পনাও করতে পারবে না। [৪১]

তবে এ কথাও সত্যি যে যুগের সাথে সাথে সব কিছুর পরিবর্তন এসেছে এক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের নারীরাও সেই আগের সমাজ ব্যবস্থায় নেই। তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিকায়নে নারীরা এখন শিক্ষা-দীক্ষা এবং নানাবিধ কর্মদক্ষতায় এগিয়ে গেছে। ফলে সেই রোল মডেল এবং চিরায়ত বাঙালি নারীর রূপ এখন আর নেই। কিছুকাল পরে কেবলই তা কল্প নারীর গল্প বলে প্রচার হবে।

গ. নায়কের অভিনয়ে প্রেমের গান

নায়িকার প্রতি প্রেমে আসক্ত হয়ে নায়কের রয়েছে রোমান্টিকতার বহুবিধ প্রকাশ। শবনমের বিপরীতে রহমানের অভিনয়ে পরিবেশিত নিম্নোক্ত গানটি রোমান্টিক ভাবধারার অন্যতম। বাণীতে নিটোল প্রেমের এক অসাধারণ শৈল্পিক অভিব্যক্তির প্রকাশ, যেখানে প্রেম, প্রকৃতি এবং কল্পনা অবিচ্ছেদ্যরূপে বিরাজমান; মানব-মানবীর হৃদয়াবেগের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত।

তোমারে লেগেছে এত যে ভালো
চাঁদ বুঝি তাই জানে
রাতের বাসরে দোসর হয়ে
তাই সে আমারে টানে ॥

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র মাধ্যমের ইতিহাসে ষাট দশককে স্বর্ণসময় বলে অভিহিত করা হয়। এই সময়ে শহরের পটভূমিতে নির্মিত এহতেশাম পরিচালিত *রাজধানীর বুকে* (১৯৬০) চলচ্চিত্র বিশেষভাবে স্মরণীয় হওয়ার অন্যতম কারণ হলো এর গান। এ সম্পর্কে চলচ্চিত্র গবেষক ও ইতিহাসকারের পর্যবেক্ষণ–

> ষাটের দশকে এদেশের চলচ্চিত্র শিল্প লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। এ সময় একদিকে চলে শিল্পশোভন ছবির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। অন্যদিকে চলে নানা বিনোদনের সমাহার ঘটিয়ে সস্তা বাণিজ্যিক ছবি নির্মাণের হিড়িক। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পায় এহতেশামের 'রাজধানীর বুকে' ছবি। এর প্রধান আকর্ষণ ছিল গান ও রোমান্টিকতা।'[৪২]

সংগীতশিল্পী সুমন চৌধুরীর ভাষায়–

> প্লেটোনীয় রোমান্টিসিজমের মূর্তরূপ যেন গানটিকে আশ্রয় করল ... বাংলা গীতিকাব্যে অনেক মহান গীতি-কবি ধন্য করেছেন তাদের কালজয়ী সৃষ্টিতে। এ গানটি তার অন্যতম। গানটি শোনামাত্রই এটি প্রতীয়মান

> হয় যে, এ গানটির জন্যই এ সুরটি হয়েছে। অপরদিকে এ গানটিও যেন রচিত হয়েছে এ সুরটির জন্য অর্থাৎ Made for each other.[৪৩]

কে জি মোস্তফার রচনায়, রবিন ঘোষের সুরারোপিত গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন কলকাতার শিল্পী তালাত মাহমুদ। চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালক হিসেবে রবিন ঘোষের আত্মপ্রকাশ ঘটে এই গানটির মাধ্যমে। এ সম্পর্কে সুরকার ও সংগীত পরিচালক রবিন ঘোষ বলেন–'গানটি তখনকার সময়ে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বর্তমানকালেও এই গানের জনপ্রিয়তা কোন অংশে কমেনি বরং আবেগমূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৪৪] গানের গীতিকার কে জি মোস্তফা বলেন–

> আবু হেনা মোস্তফা কামাল মেধাবী লোক ছিলেন। তিনি একদিন ডেকে আমাকে বললেন তোমার কবিতায় গীতিময়তা এত বেশি তুমি যদি গান লেখো তাহলে ভালো করবে। সম্ভবত সেই দিনই আমার গীতিকার জীবনের বীজ রোপিত হয়েছিল...সেই গানটা মুখ্যত আমার পরিচয় বহন করে।[৪৫]

গানটির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আরো জানা যায় যে, এক সময় একই দিনে বাংলাদেশ বেতারের ৬টি কেন্দ্রে অনুরোধের আসর থেকে শোনানো হতো। সংগীত পরিচালনা করেছেন যৌথভাবে রবিন ঘোষ এবং ফেরদৌসী রহমান। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তিনিই প্রথম নারী সংগীত পরিচালক।[৪৬] নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত *নীল আকাশের নীচে* (১৯৬৯) চলচ্চিত্রে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি রোমান্টিক গান; চলচ্চিত্রের নামানুসারে রচিত।

নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা
এই সবুজের শ্যামল মায়ায় দৃষ্টি পড়েছে ঢাকা ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় হবু বর রাশেদের সঙ্গে তৃষ্ণা (কবরী) দূরে কোথাও বেড়াতে যায়। এক সময় পার্কের নির্জন পরিবেশে বিয়ের আগেই আপত্তিকর সম্পর্ক তৈরি করতে চায় রাশেদ। তৃষ্ণা রাজি না হলে তাকে জোর করে রাশেদ। তৃষ্ণার চিৎকারে ট্যাক্সি চালক মামুন (রাজ্জাক) দৌড়ে ছুটে এসে তৃষ্ণাকে শারীরিক লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করে। তৃষ্ণা মুগ্ধ হয় মামুনের উপকারে। সেদিনের পর দুজনের হঠাৎ দেখা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। মামুন ট্যাক্সি চালক হলেও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ক্ষাণিক কথা হয় দুজনের মধ্যে এবং আগামী সাক্ষাতের কথা ভেবে মামুন হয় আত্মহারা। রোমাঞ্চ তৈরি হয় তার মনে। তারই প্রকাশ গানটিতে লক্ষ করা যায়। যেখানে বলা হয়েছে–'শন শন বাতাসের গুঞ্জন, আহা চঞ্চল করে এই মন।' এবং দ্বিতীয় অন্তরায় বলা হয়েছে–'ঝুর ঝুর বকুলের গন্ধে, এই মৌমাছি দোলে একি ছন্দে' কল্পনার মানুষটিকে আপন করে পাওয়ার ব্যাকুলতায় দিশেহারা। রচয়িতা গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরারোপ করেছেন সত্য সাহা, নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী খন্দকার ফারুক আহমেদ।

অশোক ঘোষ পরিচালিত *নাচের পুতুল* (১৯৭১) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটি রোমান্টিক ভাবনায় আলোকিত। চলচ্চিত্রে দেখা যায়, অসুস্থ পিতার কারণে সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে লায়লার (শবনম) উপর। উপায়ান্তর না পেয়ে লায়লা ফিরোজদের (রাজ্জাক) কসমেটিক্‌সের দোকানে সেল্‌স গার্ল হিসেবে চাকরি নেয়। একদিন ফিরোজ ফোনে ম্যানেজার কাশেমের খোঁজ করতে গিয়ে কথা হয় তার লায়লার সঙ্গে। ফিরোজ লায়লার পরিচয় জানলেও লায়লার কাছে তার পরিচয় গোপন থাকে। প্রথম দিনেই লায়লার কথা ভালো লেগে যায় ফিরোজের। এরপর প্রায়শই ফোন করে ফিরোজ। কিন্তু এতে বিরক্ত হয় লায়লা। যার কারণে ফিরোজ একদিন অচেনা মানুষ সেজে ফোনে নিম্নোক্ত গানটি

গেয়ে শোনায় লায়লাকে। ফোন রিসিভ করে লায়লা বলে:'হ্যালো, কাকে চাই! আপনি! আপনি কে? ফিরোজ বলে: সেই আমি। শুরু হয় নিম্নোক্ত গান–

হিম হিম হিম
আয়নাতে ঐ মুখ দেখবে যখন
কপোলের কালো তিল পড়বে চোখে
ভ্রমর যে এসেছিল জানবে লোকে ॥

চিত্র-২৪: *নাচের পুতুল* (১৯৭১) চলচ্চিত্রে 'আয়নাতে ঐ মুখ দেখবে যখন' গানের একটি স্থিরচিত্রে রাজ্জাক।

গানের মাঝে সংলাপ, দুরু দুরু মনের নিঃশ্বাস খুব যত্নসহকারে তুলে ধরেছেন পরিচালক। আয়নায় স্বরূপের সন্ধান, কপোলের কালো তিল, বকুল শাখে ফুল, ভ্রমরের সান্নিধ্য এই সব প্রতীকী ব্যঞ্জনা কেবল ভালবাসারই অভিব্যক্তি; অন্য হৃদয়ে কাঁপন তোলে। বাংলা গানের মূল ভিত্তি হলো কাব্য এবং সুর। কাব্য এবং সুরের সুললিত মহীমায় গানটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে রোমান্টিক গান হিসেবে। গীতিকার কে জি মোস্তফা, সুরকার রবীন ঘোষ, কণ্ঠশিল্পী মাহমুদুন্নবী।

মুস্তাফা মেহ্‌মুদ পরিচালিত *মানুষের মন* (১৯৭২) চলচ্চিত্রের শুরুতেই ভয়েস ওভারে ব্যক্ত হয় মানুষের মন সংক্রান্ত কথামালা–'রক্ত ধারা প্রবাহিত মাংসপিণ্ডে আবদ্ধ যে মানুষের মন, সে মন বড় বিচিত্র, মানুষ অন্যের মন নিয়ে গবেষণা করে অথচ নিজের মনের হদিস সে কখনই খুঁজে পায় না।' চলচ্চিত্রে গানটির প্রয়োগ ভাবনায় দেখা যায় অসুস্থ স্কুল শিক্ষকের একমাত্র উপার্জনক্ষম মেয়ে ববিতা। দীর্ঘদিন ধরে আলসারে অসুস্থ হয়ে বিছানা সঙ্গী তার বাবা। আর্ট কলেজের ছাত্রী ছিল। বর্তমানে টাকার অভাবে লেখা-পড়া বন্ধ। ঘরে বসে আর্ট করে, সাইনবোর্ড লিখে যা আয় হয় তাই দিয়ে কোনমতে সংসার চলে তাদের।

ফরমায়েশী সাইবোর্ড নিতে এসে ববিতার সঙ্গে রাজ্জাকের মিষ্টি মধুর বাগ্‌-বিতণ্ডা হয়। চলে যাওয়ার আগ মুহূর্তে ববিতা রাজ্জাককে একটু শুশুন বলে দাঁড়াতে বলে, পরক্ষণেই আবার না বলে। এ রকম ভাবের পুনরাবৃত্তি হয় বেশ কয়েকবার। অবশেষে লজ্জা আড়ষ্ঠতার মাথা খেয়ে, ঘরে থেকে ছবি বাঁধাই করা একটা ফ্রেম রাজ্জাকের হাতে তুলে দেয়। রাজ্জাক জিজ্ঞেস করে: 'এটা কি?' উত্তরে

ববিতা বলেঃ 'বাড়ি গিয়ে দেখো।' এই প্রথম রাজ্জাকের সাথে 'তুমি' সম্বোধন করে কথা হয় ববিতার। তারপর বারান্দা থেকে দৌড়ে রুমে প্রবেশ করে। ববিতার চলে যাওয়ার পথপানে, ছবি বাঁধাই করা ফ্রেমের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রাজ্জাক। তারপর বাসায় গিয়ে খুলে দেখে ববিতার আঁকা ছবিটি আসলে তার নিজের অর্থাৎ রাজ্জাকেরই প্রতিকৃতি। নিজের ছবি দেখে সে মুগ্ধচিত্তে আপন মনে নিম্নোক্ত গানটি গেয়ে চলে যা রোমান্টিক ভাবেরই প্রকাশ–

ছবি যেন শুধু ছবি নয়
আজ কেন তাই মনে হয়
এ যেন ওগো দুটি প্রাণের কথা বিনিময় ॥

চিত্র-২৫: *মানুষের মন* (১৯৭২) (১৯৮৮) চলচ্চিত্রে 'ছবি যেন শুধু ছবি নয়' গানের একটি স্থিরচিত্রে রাজ্জাক।

রাজ্জাক তার নিজের ছবিটি নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। নিজের ছবি যেন ববিতার প্রতীকী রূপ হয়ে ধরা দেয়। গানের স্থায়ীতে তাই ব্যক্ত হয়–'এ যেন ওগো দুটি প্রাণের কথা বিনিময়' আবার বলা হয়–'এতদিন কেন আড়ালে ছিলে, রঙের ছোঁয়াই যদি ধরাই দিলে।' দ্বিতীয় অন্তরায়–'আমার জীবনে তুমি একি বিস্ময়' এ সবই প্রেমের ইঙ্গিত যা নানামুখী ভাব; ইশারায় প্রকাশিত হয়।

তোমার মত যদি শিল্পী হতেম
ভাষার তুলিতে সব এঁকে দিতেম ॥
ওগো সঞ্চারিণী মোর মনোহারিণী
আমার জীবনে তুমি একি বিস্ময়

একটি চমৎকার শট ধারণ করা হয়েছে যা প্রশংসার দাবীদার। প্রপ্‌স হিসেবে ব্যবহৃত আঁকা ছবিটির জুম আউটের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্জাক ফ্রেমে প্রবেশ করেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ক্যামেরায় কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সকলে। গানটির গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার সত্য সাহা, কণ্ঠশিল্পী খুরশীদ আলম। প্রেমের আরেকটি গান কামাল আহমেদ পরিচালিত *অশ্রু দিয়ে লেখা* (১৯৭২) চলচ্চিত্রে নায়কের (রাজ্জাক) রোমান্সে পরিবেশিত হয়–

ও দুটি নয়নে স্বপনে চয়নে
নিজেরে যে ভুলে যায়
তুলনা খুঁজে না পাই
আজ মন রাখা হলো দায়
হায়রে ॥

উপরোক্ত গানে লক্ষ করা যায় নায়িকার (সুজাতা) রূপে মুগ্ধ নায়কের মন। নায়িকার সুনয়ন পৃথিবীর সব কিছুকে ভুলিয়ে দেয় এমনকি সে নিজেকে হারায়ে খুঁজে ফেরে বার বার। এমন চঞ্চলতারই প্রকাশ গানের স্থায়ীতে। আবার ভালবাসা প্রকাশের নানা উপমা প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গে উপস্থাপিত গানটির নিম্নোক্ত অন্তরায়–

দখিনা ফোটায় যখন ফুলের বনে মুঞ্জরি
তোমার কথাই বলে যেন গুঞ্জরি
ভ্রমরা উড়ে এসে মুখে বসে ছল করি
ফুলের পরাগ রেণু ভেবে ভুল করি
হৃদয় তোমার কারে দেবে গো
সে কথা বলো না হয় ॥

খুরশীদ আলমের কণ্ঠে পরিবেশিত হয় উপরোক্ত গানটি। সাইফুল আজম কাশেমের *ঘর সংসার* (১৯৭৯) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিও একই শিল্পীর কণ্ঠে, সুচরিতার বিপরীতে রাজ্জাকের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। এ গানটিতেও রোমান্টিকতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। নায়িকার রূপে মুগ্ধ নায়কের মন। একবার দৃষ্টি পড়লে চোখ ফেরানো কঠিন হয়ে যায় নায়কের। বর্ণিত গানে সে ভাবেরই প্রকাশ–

হায়রে একি সৃষ্টি দেখে এ দৃষ্টি
ফেরাতে পারি না তো আর
তুলনা মেলে না তার ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় শাবানা তার ঘরে হো হো করে হাসছে। বুলবুল আহমেদ এসে জিজ্ঞেস করে:‘কি ব্যাপার হাসছো যে? শাবানা বলে:‘না হেসে উপায় আছে? তোমার ভাই দিন দিন যতো বড় হচ্ছে ততোই বাঁদর হচ্ছে। এবার ওর একটা বিয়ে দিয়ে দাও। হা হা করে হাসিতে সুর মেলায় বুলবুল আহমেদ বলে: ‘বিয়েতো দিতেই হবে। ওর পরীক্ষাটা হয়ে যাক...।’ তারপর দেখা যায় সুচরিতা রাজ্জাকের ছবি আঁকে। এরপর কল্পনার চোখে রাজ্জাক হে হে হে হো হো হো লা লা লা সুরে নায়কোচিত ভঙ্গিমায় গেয়ে ওঠে উপরোক্ত গান। সাইফুল আজম কাশেম পরিচালিত *সোহাগ* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত প্রেমিকের (রাজ্জাক) গানে প্রেম-ভালবাসার সাক্ষ্য প্রমাণের নানাদিক উপস্থাপিত হয়; বহুবিধ উপমার মাধ্যমে। ভালবাসার সাক্ষ্য হিসেবে গানটিতে–গাছপালা, আকাশ, বাতাস প্রভৃতি প্রকৃতির নানা উপাদান উপমার অনুষঙ্গ হয়ে বর্ণিত হয় রোমান্টিকতার প্রয়াসে–

এই আকাশকে সাক্ষী রেখে
এই বাতাসকে সাক্ষী রেখে
তোমাকে বেসেছি ভালো
তুমি মোর নয়নের আলো ॥

চিত্র-২৬: *সোহাগ* (১৯৮৮) চলচ্চিত্রে 'এই আকাশকে সাক্ষী রেখে' গানের একটি স্থিরচিত্রে রাজ্জাক ববিতা।

গানটির প্রয়োগ ভাবনায় দেখা যায় প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের মাঝে রাজ্জাক এবং ববিতা পাশাপাশি বসে আছে। তারা তাদের অতিবাহিত সময়ের স্মৃতি চারণ করে এবং সম্পর্কের পরিণতি নিয়ে কথা বলে। তা দৃষ্ট হয় দুজনের কথপোকথনে। একটি গাছের দিকে তাকিয়ে রাজ্জাক বলে: 'আমরা প্রথম দিকে এখানে আসি তখন ঐ গাছটা ছিল না।' টিল্ট ডাউন শটের মাধ্যমে গাছটিকে দেখানো হয়। এরপর ববিতা বলে: 'তারপর গাছ লাগানো হলো, সে গাছ বড় হলো, এবার ফুলও ফুটবে।' তিন বছরে বাগানটার কত পরিবর্তন হয়েছে বলে রাজ্জাক।' ববিতা সম্পর্কের পরিণতি টেনে বলে: 'এবার আমাদেরও পরির্বতন দরকার।' আরেক দৃশ্যে দেখা যায়, সবুজ ঘাসের উপর বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে দুজন। রাজ্জাকের কোলে ববিতা গা এলিয়ে এবং তার কাঁধে হাত রেখেছে রাজ্জাক। ববিতা রাজ্জাকের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলে: 'আচ্ছা তুমি চিরদিন এমনই থাকবে ? রাজ্জাক 'হিম' স্বরে উত্তর দেয়। ভুলবে নাতো ? প্রশ্নই আসে না। কোনদিন হারিয়ে যাবে নাতো? হিম না।
যদি হারিয়ে যাও, তোমার ভালবাসার সাক্ষী কে দেবে? রাজ্জাক বলে: 'কেন এই আকাশ, বাতাস, ববিতার আস্থা মেলে না তাতে তাই বলে: 'যাহ্ বিশ্বাস করি না।' তারপর নায়কের বিশ্বাস স্থাপনের অন্যতম প্রচেষ্টা শুরু হয় উপরোক্ত গানের মাধ্যমে।

গ্রাম বাংলার পটভূমিতে নির্মিত হয় রাজু সিরাজের *আরাধনা* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিতেও রোমান্টিক ভাবাবেগের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। নায়ক তার নায়িকার কাছ থেকে তুমি সম্বোধন প্রত্যাশা করে। প্রত্যাশা পূরণের মুহূর্তে নায়কের মন জুড়ে চঞ্চলতার হাওয়া বয়ে যায়। সেই আনন্দেরই প্রকাশ ব্যক্ত হয় গানটিতে এবং তা রোমান্টিক বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে–

তুমি বলে ডাকলে বড়ো মধুর লাগে
আজ থেকে আর আপনি বলে ডেকো না আমাকে ॥

চলচ্চিত্রে গানটির প্রয়োগ ভাবনায় দেখা যায় বুলবুল আহমেদকে একদিন সিগারেট খেতে দেখে কবরী বলে: 'আচ্ছা আপনি নিজে একজন ডাক্তার সব জেনে শুনেও এতো সিগারেট খান কেন? আর যদিও বা খান তার জন্য তো ভাল কিছু খাওয়া উচিত।' উত্তরে বুলবুল আহমেদ বলে: 'পাবো কোথায় ? কবরী তার দুধের কলসি সামনে এগিয়ে দিয়ে বলে: 'এই যে আমার ছাগলের দুধ খেতে দিলাম আপনাকে।' বুলবুল কাছে গিয়ে বলে: 'হিম না।' তারপর আরো কাছে গিয়ে, দু'হাতে কাঁধ ধরে বলে: 'আপনাকে নয় তোমাকে।' কবরী লজ্জায় হাত দুটো সরিয়ে দৌড়ে চলে যায়। বুলবুল পিছু নেয় কবরীর পথপানে। তারপর শুরু হয় উপরোক্ত গান। খুরশীদ আলমের কণ্ঠে, গানটির গীতিকার মুকুল চৌধুরী, সুরকার আলম খান।

ঘ. নায়ক-নায়িকার দ্বৈতাভিনয়ে প্রেমের গান

সাধারণত নায়ক-নায়িকার প্রেম কিংবা অব্যক্ত মনের কথা প্রতিষ্ঠিত করার চূড়ান্তে লক্ষ্যে এই গানের অবতারণা হয়ে থাকে। চলচ্চিত্রে গানের বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে এই গানের বিস্তৃতি। গভীর প্রেমের সুখানুভূতির প্রকাশ ঘটে বর্ণিত এই গানের মাধ্যমে। রোমান্টিক ভাবনাজাত গান সুভাষ দত্ত পরিচালিত *আয়না ও অবশিষ্ট* (১৯৬৭) চলচ্চিত্রে আজিম ও সুজাতা'র অভিনয়ে পরিবেশিত হয়–

আকাশের হাতে আছে একরাশ নীল
বাতাসের আছে কিছু গন্ধ
রাত্রির গায়ে জ্বলে জোনাকি
তটিনীর বুকে মৃদৃ ছন্দ ॥

এই গানটিও সাধারণ প্রেমের সীমানা ছাড়িয়ে রোমান্টিক অনুপ্রেরণায় উদ্ভাসিত, বাংলা গানের আদর্শতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বাণীতে অসাধারণ শব্দ চয়ন রয়েছে যা গীতিময়তায় অনন্য। সঞ্চারীতে লক্ষণীয়–'ভেবে তো পায়নি আমি, কি হলো আমার, লজ্জা প্রহরী কেন খোলে নাকো দ্বার।' লজ্জা আড়ষ্ঠতায় মনের কথা যেন মনেই অস্ফুট রয়ে যায়। গাজী মাজহারুল আনোয়ারের রচনায়, সত্য সাহার সুরে, দ্বৈতকণ্ঠে গেয়েছেন বশীর আহমেদ এবং আঞ্জুমান আরা বেগম। গানটি সম্পর্কে গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার স্মৃতিচারণ করেন এভাবে–

> যার হাত ধরে আমি এসেছি সেই বিখ্যাত লোকটির নাম সত্য সাহা এবং তার হাত ধরে আমি প্রথম যে গানটি লিখেছিলাম সেটি হলো 'আকাশের হাতে আছে একরাশ নীল' একটা অভিনব ব্যাপার আমার সেখানে হয়েছে। সুভাষ দত্ত মূলত একজন রাশভারী পরিচালক ছিলেন। উনি ভেবেছেন উনার মাত্রায় উনার ছবিতে গান লেখার যোগ্যতা আমার হবে না। অতএব ভ্রু কুঁচকে থাকলেন, নাক কুঁচকে থাকলেন...সত্য সাহা বললেন ওকে যখন নিয়ে এসেছি একবার ট্রায়াল দিয়ে দেখি না? ...উনি দূরে বসে আছেন। আমি বললাম অন্তত সিচুয়েশনটা বলুন আপনি? হ্যা, কি সিচুয়েশন? একজন গানের ছাত্রী। ওস্তাদ গান শেখাতে আসল। তারপর ছাত্রী গান গাইল। এইটার আবার সিচুয়েশন কি? সুন্দর একটা গান হবে। তো বসলাম নিজের উপর একটু জেদ লাগলো এখানে কেন এলাম ? ...উনি কিছুক্ষণ পরে এসে বললেন সত্য একটু সুর করে শোনাও তো? শোনার পর উনি জড়িয়ে ধরে আমাকে বললেন, আমি তো এরকমই একটা গান চেয়েছি।[৪৭]

একই ভাবাবেশের আরেকটি সুমধুর প্রেমের গান। যে গানে রোমান্টিক ভাবের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। নজরুল ইসলাম পরিচালিত *দর্পচূর্ণ* (১৯৭০) চলচ্চিত্রে দেখা যায়, শাহাদাত চৌধুরী (রাজ্জাক) একজন সাহিত্যিক। বাসন্তীপুরের জমিদার সালাহউদ্দিন চৌধুরীর একমাত্র নাতি সে। ঘটনাচক্রে টিকে

থাকার লড়াইয়ে পরিচয় গোপন করে ঝরনাদের (কবরী) বাসায় কাজের বিনিময়ে আশ্রয় নেয়। একদিন ফাঁকা বাড়িতে শাহাদাত লিখছে কিন্তু তার মন পড়ে আছে ঝরনার রুমে। তা দৃষ্ট হয় শাহাদাতের লেখায়–'এখন অনেক রাত বাড়িটা একদম ফাঁকা। অধ্যাপক সাহেব তার স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে গেছে। আমার মানসী তার পড়বার ঘরে।' এক সময় পেছন থেকে ঝরনা নিজেকে আড়াল করে শাহাদাতের লেখাগুলো নিয়ে যায় তার ঘরে। ঝরনা বিছানায় বসে একটি লেখা সুরে পড়ার চেষ্টা করে। শাহাদাত তার রুম থেকে শুনতে পায় তার লেখার সুরারোপিত পাঠ। লেখাটি খুঁজতে থাকে শাহাদাত, না পেয়ে ঝরনার রুমের দিকে যায়, বলে:'হিম না ওভাবে নয়।' তারপর শাহাদাত গেয়ে শোনায় তাকে নিম্নোক্ত গানটি–

তুমি যে আমার কবিতা আমার বাঁশির রাগিণী
আমার স্বপন আধো জাগরণ
চিরদিন তোমারে চিনি ॥

সাথে সাথে গেয়ে চলে ঝরনাও এবং গানে গানে ভালবাসার রূপ চিত্রিত্র হয় তাতে রোমান্টিক ভাবেরই প্রকাশ ঘটে। এছাড়াও প্রিয়জনকে কবিতা এবং গানের রাগিণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এটিও রোমান্টিক ভাবেরই লক্ষণ বলে বিবেচিত। গীতিকার আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সুরকার সুবল দাস, কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন এবং মাহমুদুন্নবী। ইবনে মিজান পরিচালিত *কত যে মিনতি* (১৯৭০) চলচ্চিত্রে রোমান্টিক ভাবাবেগে পরিপূর্ণ নিম্নোক্ত গান। যদিও গানটি ভাই-বোনের অভিনয়ে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। কিন্তু তা রোমান্টিক বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে বিকশিত। বাণীতে নানাবিধ শব্দ চয়নের মাধ্যমে কল্পনার অপার রাজ্য তৈরি করা হয়েছে। তা ব্যক্ত হয়েছে–সাত সাগরের ওপার হতে দেখা, মন ভ্রমরা, ময়ূরপঙ্খী, প্রবাল দ্বীপ প্রভৃতি শব্দ চয়নের মাধ্যমে।

তুমি সাত সাগরের ওপার থেকে আমায় ডেকেছো
আর মন ভোমরের কাজল পাখায় ছবি এঁকেছো
আমি ময়ূরপঙ্খী নাও ভিড়িয়ে তোমায় দেখেছি
আর প্রবাল দ্বীপের পান্না ভেবে চেয়ে থেকেছি ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায়, ঘটনাচক্রে হাসান (রাজ্জাক) হিরোকে (আনোয়ার হোসেন) চলচ্চিত্রে গান গাওয়ার জন্য সংগীত পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। ফোনের মাধ্যমে হাসান তার মিউজিক ডিরেক্টর বন্ধু সাহাবকে বলে: 'তোদের ছবির প্লেব্যাকের জন্য নতুন সিঙ্গার নিতে পারিস? খুব ভালো গায়। দু'ভাই বোন। বোনটি অলরেডি রেডিওতে চান্স পেয়েছে। হেনা খন্দকার (কবরী)। হ্যা হ্যা সেই হেনা।' তাহলে ওদেরকে পাঠিয়ে দিস্।' অপর প্রান্ত থেকে বলে তার বন্ধু সাহাব। তারপর চলচ্চিত্রের জন্য শুরু হয় গানটির রেকর্ডিং। গানটির গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার আনোয়ার পারভেজ, কণ্ঠশিল্পী শাহনাজ রহমতউল্লাহ এবং আবদুল জব্বার। চলচ্চিত্রে আনোয়ার হোসেন এবং কবরীর অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। কামাল আহমেদের র*জনীগন্ধা* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে আসাদ (আলমগীর) এবং বহ্নির (অঞ্জনা) অভিনয়ে পরিবেশিত নিম্নোক্ত গানটিতে রোমান্টিকতার প্রকাশ–

নায়ক: যদি ভালবেসে কাছে এলে বন্ধু
যদি জীবনেরই সাথী হলে বন্ধু
বলো তুমি বলো আরো আগে কেন তুমি এলে না
নায়িকা: যদি দুটি চোখে এঁকে দিলে স্বপ্ন
যদি এতো সুখে ভরালে লগ্ন
বলো তুমি বলো আরো আগে কেন দেখা দিলে না ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় ভালোবেসে বিয়ে করে বহ্নি এবং আসাদ অনেকটা পরিবারের অজান্তে এরপর তারা মধুচন্দ্রিমা করতে যায় কক্সবাজার। সেখানে তারা ভালবাসার সুখ রচনা করে উপরোক্ত গানের মাধ্যমে। গান শেষে বহ্নি বলে: 'আচ্ছা আজকে রাতটা দুজনে সমুদ্রে কাটালে কেমন হয় ? আলমগীর বলে: 'মন্দ নয়।' কিন্তু...বাড়ি ফিরে মার কাছে কি কৈফিয়ত দেব ? মা মা মা, সকালে ঘুম থেকে উঠেও মা, নাস্তার সময়ও মা, রাতে খাওয়ার সময়ও মা, তারপর এখানে এসেও মা! তাহলে বিয়ে করেছিলে কেন?' আসাদ বলে: তাহলে তোমার আঁচলে গিট দিয়ে রাখো।' বহ্নি বলে: দরকার হলে গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে আমার গলায় আটকে রাখব।' গীতিকার মাসুদ করিম, সুরকার আলম খান, কণ্ঠশিল্পী কাদেরী কিবরিয়া এবং সাবিনা ইয়াসমিন। তমিজ উদ্দিন রিজভী পরিচালিত *আর্শীবাদ* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত দ্বৈতকণ্ঠে রোমান্টিক প্রেমের গান–

নায়ক: আ আ আ
নায়িকা: আ আ আ
নায়িকা: হে হে হে
নায়িকা: হো হো হো

নায়ক: চাঁদের সাথে আমি দেব না তোমার তুলনা
নায়িকা: নদীর সাথে আমি দেব না তোমার তুলনা
নায়ক: তুমি চাঁদ হতে যদি দূরে সরে যেতে
নায়িকা: তুমি নদী হতে যদি দূরে চলে যেতে
সে কথা যেন ভুলো না
তুমি যে তোমারই তুলনা

গানটিতে চাঁদ, ফুল, অলি, নদী প্রভৃতি প্রকৃতির নানা বিষয় নায়ক-নায়িকার প্রেমানুভূতি প্রকাশের অন্যতম উপমা হিসেবে উপস্থাপিত হয়, যা রোমান্টিক কথকতারই প্রতিফলন ঘটায়। নায়কোচিত ভঙ্গিমায় আ আ আ এবং নায়িকার হো হো হো স্বর প্রক্ষেপণে শুরু হয় গান যা রোমান্টিক ভাবধারাকে উপস্থাপন করে এবং ভিন্নমাত্রা যোগ করে। সুরকার আলম খান, কণ্ঠশিল্পী এন্ড্রুকিশোর ও রুনা লায়লা, জাফর ইকবাল এবং অঞ্জু ঘোষের অভিনয়ে পরিবেশিত হয় উপরোক্ত গানটি। ইবনে মিজানের *লাইলী মজনু* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানে কায়েস (রাজ্জাক) এবং লাইলীর (ববিতা) গভীর প্রেমের সোপান রচিত হয়। জীবনে মরণে তারা একে অপরের পাশে থাকার জন্য প্রতীজ্ঞাবদ্ধ–

কায়েস: তুমি আমি দুজনে জনমে জনমে
ভালবেসে কাছে রবো জীবনে মরণে

লাইলী: তারা হয়ে গগনে ফুল হয়ে কাননে
রইব অমর হয়ে প্রেমেরও ভুবনে

চিত্র-২৭: *লাইলী মজনু* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে 'তুমি আমি দুজনে জনমে জনমে' গানের একটি স্থিরচিত্রে রাজ্জাক এবং ববিতা।

চলচ্চিত্রে খালেদ আমরি খানদান (আহমেদ শরীফ) এবং কাশেম আমরি খানদান (শওকত আকবর) দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘকালের চরম বিরোধ লক্ষ করা যায়। খালেদ আমরি খানদান পরিবারের ছেলে কায়েস এবং কাশেম আমরি পরিবারে মেয়ে লাইলী। কায়েসের বাবা বন্ধুত্বের বন্ধন পুনর্নির্মাণ করতে চাইলেও কাশেম আমরি খানদান ভীষণ কঠিন, সে কোন মতেই মিল মহব্বতের পক্ষে নয়। ছোট বেলায় মক্তবে মাওলানা সকলকে আল্লাহ নাম লিখতে দেয় কিন্তু কায়েস লাইলীর নাম লিখে। তা দেখে মাওলানা কায়েসের শরীরে বেত্রাঘাত করে। কিন্তু তার সমস্ত আঘাতের চিহ্ন লাইলীর শরীরে দেখা যায়। এরপর থেকে লাইলীকে মক্তবে যাওয়া বন্ধ করে দেয় তার বাবা। কায়েসের কাছ থেকে দূরে রাখার জন্য এক সময় কাশেম সপরিবারে ভিন্ন এলাকায় পাড়ি জমায়।

ঘটনাক্রমে এক সময় কায়েস লাইলীর এলাকায় আসে। দুজনের সাথে পুনরায় দেখা হয়। চোখাচোখি হয় কিন্তু কেউ কাউকে চিনতে পারে। তবে একে অপরের মাঝে প্রচণ্ড আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। গোপনে রাতের অন্ধকারে কায়েস তার বেড রুমে দেখা করে। কায়েসের বড় ইচ্ছে চাঁদনি রাতে লাইলীকে কাছে পাওয়ার। একদিন কথা মত চাঁদনি রাতে তারা দেখা করে এবং একে অপরকে আবিষ্কার করে তারা। এতদিন পর দুজন দুজনকে কাছে পেয়ে হতবাক হয়ে যায়। প্রবল আবেগ আর ভালবাসায় জড়িয়ে রাখে। কায়েস বলে: 'যদি মৃত্যু নেমে আসে যেন লাইলীর বুকে মাথা রেখে কায়েসের মরণ হয়।' লাইলী বলে: 'না না আল্লাহ যেন তোমার আগে আমার মরণ দেয়। স্বামী আমার, আমার জীবন তো তোমাকেই উৎসর্গ করেছি। তোমাকে ঘিরেই যে আমার সব কিছু। ছোট বেলায় তোমাকে হারিয়ে বড় দুঃখের সাগর পেরিয়ে তোমাকে ফিরে পেয়েছি। 'ইয়া খোদা'। পেয়ে হারানোর দুঃখ যেন আর পেতে না হয়। সারা জনম যেন দুজনে এক হয়ে থাকতে পারি।'তারপর শুরু হয় উপরোক্ত গান। সাহিত্য জগতে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান হিসেবে লাইলী মজনু বহুল জনপ্রিয় কাহিনি এবং ইতিহাসের অন্যতম প্রেমিক যুগল হিসেবে। গানেও তা ব্যক্ত হয়–'রইব অমর হয়ে প্রেমেরও ভুবনে।' মূলত গানটির যে অন্তর্নিহিত ভাব; ইতিহাস রচনার পরিচয়বাহী; বর্ণিত বিষয়সমূহ রোমান্টিক ভাবধারাকেই উপস্থাপন করে।

বেলাল আহমেদের *নয়নের আলো* (১৯৮৪) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিতে ভালবাসার গভীর সুখ রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। গ্রামীণ ও শহরের প্রেক্ষাপটে এর কাহিনি গড়ে উঠেছে। চলচ্চিত্রে দেখা যায় জীবন (জাফর ইকবাল) একটি খেজুর গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার বুকে মাথা রেখে আছে আলো (কাজরী)। এক সময় আলো বলে: 'কাল রাতে আমাকে দেখে পালিয়ে গেলে কেন? ভেবেছো আমার কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে?' উত্তরে জীবন বলে: 'আলো... এমনি করে আমাকে সারা জীবন তোমার কাছে, তোমার বুকের মাঝে ধরে রাখতে পারবে?' তারপর আলো তার কথার উত্তর দেয় নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে–

নায়িকা: আমার বুকের মধ্যেখানে মন যেখানে হৃদয় যেখানে
নায়ক: আ...
সেইখানে তোমাকে আমি রেখেছি কত না যতনে
নায়ক: আ...
তোমার বুকের মধ্যেখানে মন যেখানে হৃদয় সেখানে
নায়ক: আ...
সেইখানে আমাকেও রেখো আর কোথাও যাব না জীবনে

গানটিতে আলোর আশা-ভালবাসার প্রবল রূপ প্রেমিক জীবনকে ঘিরে চিত্রায়িত হয়। ভালবাসার ঘর বানিয়ে সে তার প্রেমিককে নিয়ে দেশান্তরী হতে চায়। আলো তার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা জীবনের জন্যে উজার করে দেয়ার ব্যাকুলতা নানা রকম উপমার আশ্রয়ে প্রকাশ করে। তা গভীর ভালবাসারই রূপ নির্ণয় করে; গানের দ্বিতীয় অন্তরায় তা প্রবলভাবে লক্ষণীয়–

সাগরেরই টানে যেমন নদী ছুটে যায়
তেমনি করে আমার এ মন তোমায় পেতে চায়
তুমি আমার জীবন তরী
তুমি আশার আলো নয়নে ॥

গীতিকার ও সুরকার আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, কণ্ঠশিল্পী সামিনা চৌধুরী। এই গানটি আবার দ্বিতীয় বার শহরের মঞ্চে এন্ড্রুকিশোরের কণ্ঠে জীবনের (জাফর ইকবাল) অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। দর্শক সারিতে বসে মন্টু (প্রবীর মিত্র) এবং তার বোন নয়ন (সুর্বণা) উপভোগ করে; জীবনের প্রতি নয়নেরও ভালবাসার প্রকাশ ঘটে। ত্রিমুখী প্রেমের স্বরূপ নিরূপণে গানটি ব্যবহৃত হয়। একদিকে আলো, অপরদিকে নয়ন। তবে গানে যে নারী কণ্ঠে আ আ আ স্বর ধ্বনি শোনা যায় তা কেবলই নয়নের কল্পনার সুর। অপরদিকে আলোর বিয়ে অনুষ্ঠানের আনন্দঘন পরিবেশে লোকজনের কোলাহল তৈরি হয়। আলো বিষ পানে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয় কিন্তু হঠাৎ রেডিওতে গানটি বেজে ওঠে। এক সময় বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে শহরের দিকে রওয়ানা হয় তার প্রেমিক জীবনের খুঁজে। গানটির প্রয়োগ ভাবনায় নানাবিধ দিক প্রস্ফুটিত হয়। চলচ্চিত্রের কাহিনি এগিয়ে নেয়া এবং সংশ্লিষ্ট চরিত্রের মানসিক অবস্থার রূপ নির্ণয়ের প্রাসঙ্গিকতার লক্ষ্যে। জহিরুল হকের *স্যারেন্ডার* (১৯৮৭) চলচ্চিত্রে রোমান্টিক প্রেমের গান–

নায়ক: সবাইতো ভালবাসা চায় কেউ পায় কেউ বা হারায়
তাতে প্রেমিকের কি আসে যায়
নায়িকা: সবাইতো ভালবাসা চায়
কত কাল কত সাধনায় তারে একদিন কাছে পাওয়া যায় ॥

গানটিতে প্রেমানুভবের এক চঞ্চল রূপের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। প্রেমিক যুগলের ভালবাসার প্রকাশ নির্ণয়ে প্রকৃতির অন্তরালে বিরাজমান আরেক প্রেমের স্বরূপ উন্মোচন করে। ফুল, অলি, নদী ইত্যাদি প্রতীকী ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রেম শক্তিকে দুর্বার শক্তিতে রূপান্তরিত করার পদক্ষেপ লক্ষণীয় মাত্রায় উপস্থিত। নিম্নোক্ত অন্তরায় তা ব্যক্ত হয়–

নায়িকা: ঐ ফুল চায় গানে গানে ফাগুন আসুক
নায়ক: অলি চায় রঙে রঙে ফুলেরা হাসুক
নায়িকা: আমি চাই তুমি আসো
চুপি চুপি ভালবাসো এই নিরালায়

পারিবারিক জীবন এবং সমাজ-সংস্কৃতির নানা ঘটনা প্রবাহ নিয়ে নির্মিত হয় মইনুল হোসেন পরিচালিত *যোগাযোগ* (১৯৮৮) চলচ্চিত্র। এ কাহিনিচিত্রে নিম্নোক্ত রোমান্টিক প্রেমের গান; প্রতিটি লগ্নে একে অপরকে আপন করে পাওয়ার ব্যাকুলতায় অধীর প্রেমিক যুগল। ফুল, পাখি, ভ্রমরা, আকাশ, ঋতুরানি বসন্ত প্রভৃতি প্রেমানুভূতি প্রকাশে নানা মাত্রিকতায় উপস্থাপিত, এ সব কিছু রোমান্টিক ভাবধারাকেই প্রতিস্থাপন করে।

নায়ক: এই সকালটা যে তোমার
বিকেলটা যে আমার ॥
নায়িকা: রাত্রিটা যে দূরে বসে শুধু জল্পনার
বলো কবে বলো কবে
দুজনে: বলো কবে প্রতিটি লগ্ন শুধু তোমার আমার হবে
নায়িকা: সকালটা যে তোমার
নায়ক: বিকেলটা যে আমার

চলচ্চিত্রে দেখা যায় কাকতালীয়ভাবে ট্রেন যাত্রায় জাফর আহমেদ (জাফর ইকবাল) এবং কেয়া চৌধুরী (চম্পা) দুজনে একই কামরায় অবস্থান করে। শ্রীমঙ্গল এসে ট্রেন থামে। ট্রেন থেকে নেমে হরতালে আটকে যায় দুজন। তবে আলাপ প্রসঙ্গে জানতে পারে দুজনের গন্তব্য একই স্থানে। উদ্দেশ্য দুজনেরই নতুন চাকরি–নায়কের চা বাগানে এবং নায়িকার স্কুলে শিক্ষকতা। গন্তব্য একই হওয়ায় আবার চলতে থাকে দুজনে পাশাপাশি। চলতি পথে দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গানের মাধ্যমে সে অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। কণ্ঠশিল্পী এন্ড্রুকিশোর, সাবিনা ইয়াসমিন। গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার আলাউদ্দিন আলী।

শিবলি সাদিকের *নীতিবান* (১৯৮৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি নায়ক-নায়িকার বিশেষ পরিস্থিতিতে অর্থাৎ লাকি (ইলিয়াস কাঞ্চন) এবং লিজার (চম্পা) প্রেমের রূপ নির্ণয়ে পরিবেশিত হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় চোরাকারবারি জনের (খলিল) পরিকল্পনানুযায়ী জয় অর্থাৎ লাকি (ছোট বেলায় হারিয়ে যাওয়ার পর তার নাম হয় লাকি) লিজাকে শেষমেশ নানা রকম কৌশল অবলম্বন করে আটকে রাখে। এর মাঝে বেশ কবার দুজনের সাথে তুমি আপনি সম্বোধনে কথা হয়। রাত হয়ে এলে ঘুমানোর জন্য লিজাকে রেখে লাকি কম্বল নিয়ে অন্য রুমে শুতে যায় এবং বলে: 'শুয়ে পড়ুন সকালে পৌঁছে দেব। পেছন থেকে লিজা বলে: শোনো। হা হা হা করে হেসে ওঠে লাকি বলে: ভালোই হলো। সেই সকাল থেকে এবার আপনি একবার তুমি। বুঝেই উঠতে পারছিলাম না। আমিই বা কি বলে ডাকি। কেন লিজা। তাহলে লাকি বলতে তোমার তো সংকোচ রইলো না। লিজা বলে: না।' মিষ্টি হেসে চলে যায় লাকি। লিজাকে রুমে রেখে লাকি দরজার পাশে মশা তাড়াই আর ঘুমানোর চেষ্টা করে। খানিক বাদে লিজা এসে দাঁড়ায় লাকির পাশে। বলে: লাকি ঘুম যে আসছে না। লাকি বলে: তাহলে? লিজা বলে তাহলে কি করব বলো? তারপর চাঁদের শট এবং দুজনের রোমান্টিক ভাবাবেগের শটের পর শুরু হয় নিম্নোক্ত গান–

নায়িকা: আজ রাত সারা রাত জেগে থাকব
দু'চোখের ইশারাতে কাছে ডাকব
লাজ যদি ভেঙ্গে যায় দুষ্টুমিতে
ভালবাসা তারে আমি বলব
নায়ক: আজ রাত সারা রাত জেগে থাকব
ছোঁয়া দিয়ে হৃদয়ের দ্বার খুলব
ভুল যদি হয়ে যায় অজান্তে
ভালবাসা তারে আমি বলব ॥

উপরোক্ত গানটিতে মাফিয়া জনের (খলিল) পরিকল্পিত অপারেশন সম্পন্ন করতে এসে দুজনের মাঝে প্রেমের সোপান রচিত হয়। এক সময় দেখা যায় লিজাকে পেয়ে লাকি জনের ফোন রিসিভ করতে ভুলে যায়। লাকি লিজাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার কথা বললে, লিজা অবাক হয়ে বলে: 'সত্যি বলছো? তারপর বলে: 'লাকি আমি তোমাকে ভালবাসি। আই লাভ ইউ লাকি। আই লাভ ইউ।' লিজার কোমর জড়িয়ে আকাশে পাখির মত উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গিমায় লাকিও বলে: 'আমিও তোমাকে ভালবাসি লিজা। আমিও তোমাকে ভালবাসি।' লাকির ভালবাসার উচ্ছ্বাস ধ্বনি এবং লিজার অট্ট হাসি গগন বিদারী স্বরে প্রতিধ্বনিত হয় যেন। এক সময় দেখা যায় লিজা তাকে ভালবাসেনি কেবল জয়ী হওয়ার জন্য লাকির সাথে ভালবাসার অভিনয় করেছে মাত্র। আবদুল্লাহ আল মামুনের *দুই জীবন* (১৯৮৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি মোস্তাফা (বুলবুল আহমেদ) এবং কুলসুমের (নিপা মুনালিসা) বিবাহ বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে পরিবেশিত হয়, যা তাদের বিবাহিত্তোর জীবনের সুখ রচনারই প্রয়াস–

নায়িকা: তুমি ছাড়া আমি একা
পৃথিবীটা মেঘে ঢাকা ॥
জীবন আমার পাইগো জীবন

তুমি যখন দাও দেখা ॥
নায়িকা: দুটি চোখে নেই ভাষা নেই সবই যেন বলা হয়েছে
নায়ক: খরা বুকে নেই আশা নেই সবই যেন মিটে গিয়েছে
নায়িকা: আমি খেয়া তরী যেন তুমি তুমি তুমি কিনারা

চলচ্চিত্রে দেখা যায় তাহমিনাকে (কবরী সারোয়ার) বিয়ে করার কথা থাকলেও ঘটনাক্রমে মোস্তাফা (বুলবুল আহমেদ) বিয়ে করে গরীব ঘরের মেয়ে কুলসুমকে (নিপা মুনালিসা) এবং উপরোক্ত গানটি দুজনের বিবাহ বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে পরিবেশিত হয়। কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন ও সৈয়দ আবদুল হাদী। এ চলচ্চিত্রে দ্বৈতকণ্ঠে পরিবেশিত আরো প্রেমের গান যা সাবিনা ইয়াসমিন এবং এন্ড্রুকিশোরের কণ্ঠে এবং রবিন (আফজাল হোসেন) ও মৌসুমীর (দিতি) অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। যথাক্রমে–'আমি একদিন তোমায় না দেখিলে, তোমার মুখের কথা না শুনিলে, পরান আমার রয়না পরানে।' এরপর 'তুমি আজ কথা দিয়েছো, বলেছো ও দুটি ঘর মন বাঁধবে।' প্রভৃতি গানসমূহ নায়ক-নায়িকার নানাবিধ রোমান্সে পরিবেশিত হয়। চলচ্চিত্রে গানগুলো রচনা করেছেন মনিরুজ্জামান মনির এবং সুরারোপ ও সংগীত পরিচালনায় আলম খান।

প্রসঙ্গত, ১৯৮৮ সালে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক মন্দা এবং মহা প্লাবনের ফলে চলচ্চিত্রশিল্প বিপর্যস্ত হয়। সরকার ক্যাপাসিটি ট্যাক্স প্রত্যাহার করে নেয়ায় চলচ্চিত্র শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় শুরু হয় আন্দোলন।[৪৮] ছবি মুক্তির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যহত হয়। এ বছর সামাজিক ছবির প্রাধান্য বেশি হলেও সমাজ সচেতন এবং শিল্পমান সম্মত ছবির অভাব বেশি ছিল বলে অনেক চলচ্চিত্র সমালোচকের ধারণা। ১৯৮৮ সালে এটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রসহ, সংগীত শাখায় শ্রেষ্ঠ গীতিকার এবং কণ্ঠশিল্পী মোট ছয়টি বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করে।[৪৯]

বিরহ-বেদনার গান

প্রেম এবং বিরহ একে অপরের পরিপূরক। বাস্তবিক জীবনে বিরহ-বেদনায় কাতর হয়ে যখন তখন গান গেয়ে উঠার রীতি না থাকলেও, চলচ্চিত্রশিল্পের জন্য এটি স্বাভাবিক বিষয় এবং এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অমিত সম্ভাবনা এবং না বলা কথা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সাধারণত নায়ক কর্তৃক প্রেমে ব্যর্থ কিংবা অন্য কারো প্ররোচনায় নায়িকা বেদনাহত হয়; সে রূপের চিত্রায়ণে রচিত হয় গান।

ক. নায়িকার বিরহে গান

চলচ্চিত্রে গানের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বিরহ-বেদনা। প্রেম চূড়ান্তে লক্ষ্যে পৌঁছানোর পূর্বে এই গানের সূচনা লক্ষ করা যায়। খান আতাউর রহমানের *জোয়ার ভাটা* (১৯৬৯) চলচ্চিত্রে নায়িকার বিরহে পরিবেশিত নিম্নোক্ত গান–

মন যদি ভেঙ্গে যায় যাক যাক কিছু বলব না
তোমার যাবার বেলা
আমার প্রেমের কথা তুলব না ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায়, রোকেয়াদের (শবনম) বাড়িতে থেকে গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে ডা. রহমান। এক সময় রোকেয়া এবং ডাক্তারের মাঝে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গ্রামের প্রভাবশালী বিশ্বাস মোড়ল তা সহ্য করতে পারে না। ষড়যন্ত্র করে পরোপকারী ডা. রহমানকে অন্যত্র বদলি করে দেয়। ডাক্তারের চলে যাওয়াকে কোন ভাবেই মেনে নিতে পারে না রোকেয়া; খুব ভেঙ্গে পড়ে সে। তারই গভীর বেদনার রূপ প্রতিফলিত হয় উপরোক্ত গানে। গানটিতে রোমান্টিক ভাবের আলোকে বিরহ-বিচ্ছেদের সরব উপস্থিতি বিদ্যমান। গীতিকার ও সুরকার খান আতাউর রহমান, কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন। আরেকটি মিষ্টি মধুর বিরহ প্রেমের গান নজরুল ইসলাম পরিচালিত *স্বরলিপি* (১৯৭০) চলচ্চিত্রে। স্বরলিপি লিখে গানের খাতা পূর্ণতা পেলেও গানের পাখিটিকে অর্থাৎ ভালবাসার মানুষটিকে কাছে না পাওয়ার ব্যাকুলতায় সব আয়োজন যেন মিছে হয়ে যায়। তাই ব্যথিত হৃদয় গেয়ে ওঠে–

গানের খাতায় স্বরলিপি লিখে বলো কি হবে
জীবন খাতায় ছিন্ন পাতা
শুধু বেহিসাবে পড়ে রবে ॥

গানের বাণী, সুরে কাব্যময় বিরহ-বেদনার উপস্থাপনা, শব্দ চয়নের সুকুমার্য এবং শিল্পীর গায়কি রোমান্টিক ভাবের প্রকাশ ঘটায়; দর্শকের হৃদয়ে গভীর মমতায় নাড়া দেয়। নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লা, চলচ্চিত্রে ববিতার অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার সুবল দাস। অশোক ঘোষ পরিচালিত *নাচের পুতুল (১৯৭১)* চলচ্চিত্রে বিরহের গান–

আমি আমার এ গান ওগো দিলাম তারে
কত নিঝুম রাতের মধু স্বপ্নে গেঁথে ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় মা তার মেয়ে রুবিকে (কামালের প্রেমিকা) পাত্রস্থ করার জন্য ভাবী বর অর্থাৎ ফিরোজের (রাজ্জাক) বড় ভাইকে খুশি করার জন্যে গান শোনাতে বলে। রুবি গান শোনাতে অস্বীকৃতি জানালে রুবির হয়ে গান শোনাতে বাধ্য হয় আশ্রিতা লায়লা (শবনম)। ঘটনাচক্রে পাত্রের বদলে তার ছোট ভাই ফিরোজ (রাজ্জাক) যাকে ভালবাসে লায়লা (শবনম) সে অপর প্রান্ত থেকে ফোনে রিসিভ করে এবং গান শোনে। এমন পরিস্থিতিতে গান গায় লায়লা যা তার বেদনারই অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। গানের কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন। কামাল আহমেদ পরিচালিত *অশ্রু দিয়ে লেখা* (১৯৭২) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি আসাদের হবু স্ত্রী নাজমার (সুচন্দা) জন্মদিনে সুলতানার (সুজাতা) বেদনায় পরিবেশিত হয় নিম্নোক্ত গান–

অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান
সে তো ভুলে গিয়েছে
একই বন্ধনে বাঁধা দুজনে
সে বাঁধন খুলে গিয়েছে ॥

এই গানটি ছিল সুলতানা এবং আসাদের প্রেমের প্রথম গান। সুর ঠিক রেখে শুধু কথায় পরিবর্তন এনে পরবর্তীতে গানটি বিরহের আবেদনে ব্যবহৃত হয়। বেদনার অপার জগৎ তৈরি হয়; গানের প্রথম অন্তরায় তা ব্যক্ত হয়–'যত সুর ছিল প্রাণে, সবই তারে দিলাম, বিনিময়ে বেদনা ভরা, এ আঘাত শুধু যে পেলাম, আশা মঞ্জুরি গেলো যে ঝরি,পায়ে সে দলে গিয়েছে।' চলচ্চিত্রে দেখা যায় ভালবেসে বিয়ে

করে আসাদ (রাজ্জাক) এবং মৌসুমী (সুজাতা)। বিয়ের দিন বাস অ্যাকসিডেন্টে আহত হয় আসাদ। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশ পাঠানো হয়।

এদিকে মৌসুমীকে অন্যত্র বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে তার চাচা। মৌসুমী বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় এবং খোঁজ করে আসাদের। এক সময় আশ্রয় নেয় জামাল গুন্ডা (আনোয়ার হোসেন) নামের একজনের বাসায়। ঘটনাক্রমে সুলতানাকে প্রাইভেট পড়াতে দেখা যায় নাজমার ছোট বোনকে। এদিকে চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসাদ। চাচাত বোন নাজমার সাথে বিয়ে ঠিক হয় আসাদের। একই জায়গায় প্রায় সকলের বিচরণ। কিন্তু কারো সাথে কারো দেখা হয় না। নাজমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সকলের উদ্দ্যেশে নাজমা বলেঃ 'আমার বান্ধবী সুলতানা আক্তার আপনাদের এখন একটা গান গেয়ে শোনাবে।' হঠাৎ মৌসুমী আসাদের মুখোমুখি হয়। আসাদ তাকে দেখে আঁতকে ওঠে। নাজমার জন্মদিনে মৌসুমীর অপার বেদনায় সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে পরিবেশিত হয় উপরোক্ত গান। তাতে বিরহের প্রবল আর্তি প্রতিফলিত হয়।

মুশতাকের *বন্দিনী* (১৯৭৬) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানে সোনিয়ার (ববিতা) বিরহ-বেদনার চিত্র প্রতিফলিত হয়। অঢেল সহায় সম্পত্তির মালিক হাবিব চৌধুরী (গোলাম মোস্তাফা)। তার একমাত্র কন্যা সোনিয়া। বাবার অর্থ সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য ছোট বেলা থেকেই নিকট আত্মীয় দ্বারা চক্রান্তের শিকার হয় সোনিয়া; তারা চরম নির্যাতন করে। ঘটনাক্রমে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে দানেশের (ওয়াহিদ) সঙ্গে। সেও একজন ফেরারি আসামি। ফলত দুঃখে ভরা জীবন তার। বর্ণিত গাটিতে তার জীবনেরই বাস্তব চিত্র চিত্রায়িত হয়। গানের মাধ্যমে তার প্রেমিকের কাছে ব্যক্ত করতে দেখা যায় এভাবে–

গান নয় জীবন কাহিনি
সুর নয় ব্যথার রাগিণী
কি হবে শুনে কি পাইনি ॥

মোস্তাফা মেহ্মুদ পরিচালিত *মধুমিতা* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিও বেদনার করুণ রূপে পরিবেশিত হয়। ঘটনা চক্রান্তে কোন ধরনের প্রমাণ সাপেক্ষের তোয়াক্কা না করে মিথ্যে চুরির অপবাদে ছেলের বউ হাবিবাকে (শাবানা) বাড়ি থেকে বের করে তালুকদার (খলিল)। তার অন্ধ স্বামী মাসুদও (আলমগীর) বাবার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারে না। কেবল অসহায়ের মত ঠাঁই দাড়িয়ে থাকে। যদিও সে এখন অন্ধ অসহায়। হাবিবার সাথে বিবাহের পূর্বেই প্রচণ্ড জ্বরে ভোগে অন্ধ হয়ে যায়। অনেক অনুনয়ের পরও তার স্বামীর বাড়িতে ঠাঁই হয় না। অবশেষে হাবিবা তার বাবার বাড়ি চলে যায়। তারই প্রেক্ষিতে অসহায় গরীব ঘরের মেয়ে হাবিবার অন্তরের বেদনা নিম্নরূপ শেফালী ঘোষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়–

তুমি যে আমার জীবনের উপহার
কী করে তোমায় আমি ভুলব

যতো দিতে চাও যাতনা দিয়ে যাও
তবুও তোমায় আমি ভালবাসব ॥

নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত *অলঙ্কার* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটি সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে, শিরিন শবনমের (শাবানা) অভিনয়ে বিরহ-বেদনার করুণরূপে পরিবেশিত হয়। ভালবেসে বিয়ে করে কবি মামুন (রাজ্জাক) এবং নীলু (শাবানা)। নীলুর ছোট বোন রিতার (নূতন) বিয়ে হয় অর্থশালী পরিবারে। বিয়ের অনুষ্ঠানে নীলু গান গেয়ে চলচ্চিত্র পরিচালক মি. খানের (খলিল) নজর কাড়ে এবং বেশ প্রশংসা অর্জন করে। একদিন তাদের পার্টিতে আমিন্ত্রত হয় মামুন এবং তার স্ত্রী নীলু। মামুনের সাধারণ বেশ এসব কিছু নিয়ে তাচ্ছিল্য করা হয়। বাসায় ফিরে এ নিয়ে দুজনের মাঝে কলহ তৈরি হয়।

এরপর দেখা যায় মামুন চলন্ত বাসে উঠতে গিয়ে হঠাৎ করে পড়ে গিয়ে পঙ্গু হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে নীলু অর্থাভাবের কথা ভেবে মি. খানের প্রস্তাবে অর্থাৎ চলচ্চিত্রে গান গাওয়ার জন্য রাজি হয়। সংগীতাঙ্গানে শিরিন শবনব নামে, ছদ্ম নাম ব্যবহার করে। কিন্তু পূর্বে থেকেই উচ্চবিত্তের সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি জীবন বোধের কবি মামুনের আদর্শিক সংঘাত লক্ষ করা যায়। ফলে আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালি সমাজে গড়ে উঠা এসব জীবনাচরণ সে ঘৃণার চোখে দেখে। দীর্ঘ দিনের লালিত বাঙালি জীবন-সংস্কৃতি থেকে সরে গিয়ে মানুষ অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে; এ নিয়ে সে ভীষণ বিচলিত। ফলে নীলুর গান করা এবং খানের গাড়িতে রাত করে বাসায় ফেরা এসবে তার ভীষণ আপত্তি; সব কিছু মিলে তার মনে নানা সন্দেহের জাল বিস্তার হয়।

এক সময় চলচ্চিত্রে গান গেয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে শিরিন শবনম; সংবাদ পত্রিকাতে ছাপা হয়। মামুনের চোখে পড়ে। একদিন গান গেয়ে খানের গাড়িতে বাড়ি ফিরলে তাকে চরম অপবাদ দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয় মামুন। একমাত্র ছোট কন্যা সন্তান লুবনাকে রেখে আশ্রয় নেয় তার ছোট বোন রিতার বাসায়। শুরু হয় দীর্ঘ বিচ্ছেদ। এ সময়ে দুজন-দুজনার স্মৃতিচারণ করে। লুবনার জন্য মন কাঁদে শবনমের। একসময় কবিতার জন্য অ্যাওয়ার্ড পায় মামুন। তার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার প্রস্তাব আসে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী শবনমের। এই ভেবে রাজি হয় যে, অনন্ত গান গাওয়ার কারণে তার স্বামীকে একবারের জন্যে হলেও সে দেখতে পাবে। দেখা যায় উক্ত অনুষ্ঠানে কবি মামুনের বক্তব্য প্রদান শেষে উপস্থাপক ঘোষণা দেয়–'মঞ্চে আসছে সেই প্রখ্যাতা কণ্ঠশিল্পী মিস শিরিন শবনম।' এরপর শুরু করে নিম্নোক্ত গান–

দুঃখ আমার বাসর রাতের পালঙ্ক
নিন্দা আমার প্রেম উপহার
সাতনরী হার কলঙ্ক ॥

গানটিতে শবনমের বিরহ-বেদনার কথা উঠে এসেছে নানাভাবে। ভালবেসে বিয়ে করেছিল অথচ এখন শাসন বারণের বেড়াজালে বন্দি সে। ব্যক্ত হয়েছে–'শাসন বেড়ির দুই পায়ে মল পড়েছি, অপবাদে কালি আছে দুই চোখে তাই পড়েছি।' দ্বিতীয় অন্তরায় দুঃখ বেদনার মর্মকথা আরো বড় পরিসর তৈরি করে নিম্নোক্তভাবে–

সুখের সাথে ঘর করা তাই হলো না
এই বুকে বিঁধা কাঁটাটাকে পর করা তাই হলো না ॥
কপালের লিখন এখন বসন হয়ে জড়িয়ে আছে অঙ্গ

উপরোক্ত গানটি আসলে কবি মামুনের রচিত কবিতা। এক সময় কবিতাটি রচনার পর পরই নীলু এটি পড়েছিল। গীতিকার মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, সুরকার সত্য সাহা। কামাল আহমেদ পরিচালিত *রজনীগন্ধা* (১৯৮২) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটি সুধার (শাবানা) জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনারই চিত্রবাহী। বাসর রাত থেকে স্বামী তপনের (রাজ্জাক) নানা অপমান অবিচার সহ্য করেও সে হাল ছাড়েনি। বরং শাশুড়ির সহযোগিতায় জীবন যুদ্ধে এগিয়ে চলে এবং নীরবে নিভৃতে রজনিগন্ধার মত সে গন্ধ বিলিয়ে যায়; গানটিতে সে কথারই প্রকাশ–

আমি রজনিগন্ধা ফুলের মতো গন্ধ বিলিয়ে যাই
আমি মেঘে ঢাকা চাঁদের মতো জোছনা ঝরিয়ে যাই
আমি গানে গানে প্রাণের যতো বেদনা লুকাতে চাই ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় আমেরিকা ফেরত ওয়াহিদ মল্লিক তপন সর্বদা নারী, মদ আর পার্টিতে মেতে থাকে। এসবের বিরোধিতা করলে মায়ের সাথে প্রচণ্ড খারাপ ব্যবহার করে তপন। এমনকি ঘটনাচক্রে স্ত্রী সুধার গায়েও হাত তুলে। এ নিয়ে মায়ের সাথে প্রায়শ মনোমানিল্য হয়। একসময় তপন মায়ের (আয়েমা আক্তার) গায়ে হাত তুলতে যায়। একমাত্র ছেলের এমন আচরণে মা প্রচণ্ড কষ্ট পায় এবং সিভিয়ার হার্ট এটাকে মারা যায়। অতঃপর তপনের মনে প্রচণ্ড অনুশোচনা হয়। মায়ের গায়ে হাত তুলতে যাওয়া, মায়ের মৃত্যুর কথা ভেবে সে দিনে দিনে ভীষণ অনুতপ্ত হয় এবং ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে ঘরে বসে থাকে সারাক্ষণ। সুধার ক্লাব পার্টি এসবে চরম বিরোধিতা থাকলেও কেবলমাত্র তার স্বামীর মনে প্রাণ সঞ্চার করার জন্যে শেষ পর্যন্ত বাড়িতে মদের পার্টির আয়োজন করে। সেখানে তাকে নিম্নোক্ত গানটি পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করতে দেখা যায়। প্রতিটি প্রহর চরম ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করে সুধা এবং পতি পরায়ণের দিকটিও লক্ষণীয় মাত্রায় উপস্থাপিত হয়। গানে যে রজনিগন্ধার উল্লেখ রয়েছে তা তারই প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত এবং উদারতার রূপ নির্ণয়ে রচিত। এটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করে। গীতিকার মাসুদ করিম, সুরকার আলম খান।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস *শুভদা* (১৯৮৬) অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন চাষী নজরুল ইসলাম। এ চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি ললনার (জিনাত) বিবাহোত্তার জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত সুখ প্রাপ্তির আনন্দানুভূতিতে পরিবেশিত হয়। চরম দুঃখে ভরা জীবনে ঘটনাক্রমে কলকাতার জমিদারের সাথে বিয়ে হয় ললনার। ভাবনাতীত অর্থ-প্রাচুর্যের জীবন, স্বামীর সোহাগ এমন সুখের জীবন ললনার কাছে স্বপ্নের মত মনে হয়; দ্বিধা আর সংশয় যেন তার পিছু ছাড়ে না ঘিরে থাকে সর্বক্ষণ। দু'চোখ বেয়ে জল নেমে আসে তার, সে বেদনারই রূপায়ণ নিম্নোক্ত গানে–

এত সুখ সইব কেমন করে
বুঝি কান্নাই লেখা ছিল ভাগ্যে আমার ॥
সুখেও কান্না তাই দু'চোখ ভরে ॥

চিত্র-২৮: *শুভদা* (১৯৮৬) চলচ্চিত্রে 'এত সুখ সইব কেমন করে' গানের একটি স্থিরচিত্রে জিনাত।

চলচ্চিত্রে দেখা যায় হারানের (গোলাম মোস্তাফা) দুই মেয়ে ললনা এবং ছলনা। ললনা বিয়ের এক মাসের মাথায় বিধবা হয় এবং বাড়ি ফিরে আসে। ছলনা বয়সে ছোট খুব চঞ্চল স্বভাবের। ছোট ছেলে মাধব দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। টাকার অভাবে তার চিকিৎসা হয় না। সেই সাথে বিধবা বোন এবং তার কোমলমতি স্ত্রী শুভদাকে (আনোয়ারা) নিয়ে তার সংসার। জুয়া, গাঁজার প্রতি প্রবল আসক্তি থাকার কারণে অভাব হলো হারান পরিবারের নিত্যসঙ্গী। বিয়ের আগে ললনার সাথে প্রেম ছিল সারদার (আঃ সাত্তার)। সমাজের কথা ভেবে এবং অর্থলোভীর পিতার কারণে সে ললনাকে বিয়ে করতে অপারগতা প্রকাশ করে। এসব প্রতিবন্ধকতার সাথে তার ভীরুতাও অনেক বেশি দায়ী। সদানন্দ (রাজ্জাক) অত্যন্ত পরোপকারী, প্রাণবন্ত, মিশুক ললনাকে ভালবাসে কিন্তু সে কখনো তা মুখ ফুটে বলতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে ললনা আত্মহত্যা করতে নদীতে ঝাঁপ দেয়।

ঘটনাক্রমে কলকাতার জমিদার তার ভ্রমণ পথে তাকে উদ্ধারপূর্বক কলকাতায় নিয়ে যায় এবং বিয়ে করে। হারান পরিবার তথা গ্রামের লোকজন জানে যে ললনা নদীতে ডুবে মারা গেছে। কিন্তু ললনা জমিদারের বউ। অভাবনীয় সুখী সুন্দর জীবন তার। কিন্তু তা উৎযাপন করতে পারে না। কারণ তার দু'চোখ জুড়ে বহমান অসুস্থ ছোট ভাই, তার মা, এবং সংসারের যত সংকট। বড় সন্তান হয়ে কোন প্রকার আবদারই মেটাতে পারেনি সে। এ সব কিছু তাকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে। তার এত সুখ কেবলই বেদনায় রূপান্তরিত হয় বার বার। তারই মর্মকথা কথা নিলুফার ইয়াসমিনের কণ্ঠে ব্যক্ত হয় উপরোক্ত গানে। এই চলচ্চিত্রটি ১৯৮৬ সালে শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক, শ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পী, শ্রেষ্ঠ গীতিকারসহ মোট ১১টি বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করে।[৫০]

খ. নায়কের বিরহে গান

নায়িকার পাশাপাশি নায়কেরও রয়েছে বিরহ বেদনার প্রকাশ। বিরহ প্রেমের গান বশীর আহমেদের কণ্ঠে রহিম নওয়াজের *মনের মত বউ* (১৯৬৯) চলচ্চিত্রে–'আমাকে পোড়াতে যদি এতো লাগে ভালো, জ্বালো আগুন আরো জ্বালো, ঢালো আরো ব্যথা ঢালো'। প্রিয়া যখন অন্য কারো ঘরে চলে যায় সামাজিক নিয়মের বেড়াজালে পড়ে। তখন অপার বেদনায় মর্মাহত হয়ে কেঁদে উঠে প্রেমিক হৃদয়। কাজী জহিরের *ময়নামতি* (১৯৬৯) চলচ্চিত্রে নায়ক রাজ্জাকের অভিনয়ে পরিবেশিত নিম্নোক্ত গানটি সে কথারই চিত্রায়ণ–

অনেক সাধের ময়না আমার বাঁধন কেটে যায়
মিছে তারে শিকল দিলাম রাঙা দুটি পায় ॥

চিত্র-২৯: *ময়নামতি* (১৯৬৯) চলচ্চিত্রে 'অনেক সাধের ময়না আমার বাঁধন কেটে যায়' গানের একটি স্থিরচিত্রে রাজ্জাক।

গীতিকার সৈয়দ শামসুল হক, সুরকার ও নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী বশির আহমেদ। চলচ্চিত্র পরিচালক সম্পর্কে গানটির গীতিকার সৈয়দ শামসুল হক বলেন–'গানটি কাজী জহিরের গ্রীন রোডের বাসায় বসে লিখেছিলাম। তাঁর একটা কায়দা ছিল সুরকারদের তাঁর বাসায় গিয়ে সুর করতে হতো। সুর পছন্দ হলে তিনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়তেন। আর পছন্দ না হলে দাঁড়িয়ে যেতেন।'[৫১]

আজিজুর রহমানের *অমর প্রেম* (১৯৭৭) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি শাবানার বিপরীতে রাজ্জাকের অভিনয়ে পরিবেশিত হয় বিরহ-বেদনার করুণ রূপে। চলচ্চিত্রে দেখা যায় শামীম (শাবানা) এবং মাসুমের (রাজ্জাক) মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং পরিণতি পাওয়ার আগেই ঘটনাক্রমে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঘটনাচক্রে দেখা যায় ধনাঢ্য পরিবারের মেয়ে সিমা (আনোয়ারা) তার বাসায়

আয়ার কাজ নেয় শামীম। মূলত তার ছোট্ট কন্যা সন্তানের লালন পালন করে সে। মাসুমও ঘটনাচক্রে একই বাসা অর্থাৎ সিমার বাসায় আশ্রয় পায় এবং বাগানের দায়িত্ব পালন করে। এর আগে বৈবাহিক সম্পর্কে না জড়িয়ে মাহমুদ (গোলাম মোস্তাফা) ভালবাসার মিথ্যে আশ্বাস দেখিয়ে সিমার সাথে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করে। এক সময় মাহমুদ বিদেশ যাবার নাম করে সিমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। এদিকে সিমার কোল জুড়ে আসে সুমন। সমাজে কলঙ্ক রটে যাওয়ার পূর্বে সিমার মায়ের বিশেষ অনুরোধে সুমনের পিতৃপরিচয়ের সংকট দূর করতে রাজি হয় মাসুম। একদিন

শামীম আয়ার কাছে সুমনকে রেখে সিমা তার মায়ের কাছে যায়। অপরদিকে মাসুম আসে সিমার বাড়িতে। বাড়িতে ঢুকতেই সুমন ড্যাডি বলে দৌড়ে কোলে উঠে মাসুমের। ওপাশ থেকে শামীম তা দেখে। এ নিয়ে উভয়ের মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এর মাঝে হঠাৎ উপস্থিত হয় সিমা। শুরু হয় ত্রিমুখী সংকট। দুজনের আচরণ দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে সিমা বাসা থেকে বের করে দেয় শামীমকে। শামীম চলে যায় মাসুম গানের সুরে 'প্রিয়তমা একা একা যেওনা' বলে দৌড়ে ছুটে যায় তার পিছু–

প্রিয়তমা একা একা চলে যেওনা
ভালোবেসে ভুল বোঝে দূরে যেওনা ॥

রাজ্জাক পরিচালিত *বদনাম* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটিও রাজার (রাজ্জাক) বিরহে পরিবেশিত হয়। সদ্য ভালবাসা ফুটে ওঠার আগেই ঝরে যায়। সে ফুল যখন আবার নিজ পরিবারে এসে পাপড়ি মেলে এবং ঘটনাচক্রে কারো প্ররোচনায় হাসিখুশির পরিবারে কেউ তাকে নিয়ে আবার সন্দেহের জাল বিস্তার করে। তখন তার মন বেদনায় ভারাকান্ত হয়। তারই মর্মধ্বনির প্রকাশ নিম্নোক্ত গানে–

হয় যদি বদনাম হোক আরো
আমি তো এখন আর নই কারো ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় ছোট বেলা থেকেই কেয়া (ববিতা) এবং রাজা দুজন-দুজনার খেলার সাথী। গ্রামীণ পরিবেশে দুজনের বেড়ে ওঠা। কারোরই কোন লেখা পড়া নেই। গেছো মেয়ে নামে কেয়া সকলের কাছে পরিচিত। ইতোমধ্যে কেয়ার প্রতি রাজার ভালবাসা তৈরি হয়। সে ভালবাসা পরিণতি পাওয়ার আগেই কেয়াকে বিয়ে করে রাজার বড় ভাই রাশেদ (বুলবুল আহমেদ)। অর্থশালী রাশেদের বাসায় অজপাড়া গ্রামের মেয়ে কেয়া বউ হয়ে ঘরে আসে। শহরের পরিপাটি পরিবেশ সে সহসা মানিয়ে চলতে পারে না। রাজার এবং কেয়ার দুজনের মধ্যে ছোট বেলার সেই খুনশুটি লেগেই থাকে। এক সময় কাজের লোকেরা এবং রাজার মামা এটি এম শামসুজ্জামান দুজনের এমন হৈই হুল্লোড়, হাসি তামাসাকে কেন্দ্র করে কলহ বিবাদ তৈরি করে। এদের প্ররোচনায় অন্তঃসত্ত্বা কেয়ার সন্তানকে নিয়ে রাশেদ সন্দেহ করে। এমন পরিস্থিতিতে রাজা বাসা থেকে চলে যায় এবং যাবার আগে তার ভাইয়ের প্রতি বিশেষ অনুরোধ করে বলে যায়: 'বিশ্বাস করো তোমার স্ত্রী নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক। ওর চরিত্রে এতটুকু দাগ নেই ভাইয়া। তোমার সমস্ত সন্দেহ, ঘৃণা সমস্ত বদনাম বুকে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি ভাইয়া। ওকে তুমি কোন বদনাম দিওনা ভাইয়া।'

যে সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখে তার অনুপস্থিতিতে সারা বাড়ি বড় শূন্য বলে মনে হয়। রাজার জন্য তার মা অস্থির হয়ে পড়ে। বড় ছেলে রাশেদকে বলে আমার পাগলটাকে খুঁজে দাও। দিনরাত মদের আসরে পড়ে থাকে রাজা। মদের দোকানদার এ অন্ধকার জগৎ থেকে ফিরে যেতে বলে তাকে। এর বদনাম যেন তার গায়ে না লাগে। কিন্তু রাজার কাছে একমাত্র মদ্যপানের এই আসরটিই সবচেয়ে প্রিয়। এমতাবস্থায় শুরু হয় উপরোক্ত গান। হাসি খুশির সংসার ফেলে এখন সে অন্ধকার জগতে নিমজ্জিত। গানে তা ব্যক্ত হয় এভাবে–'জীবন ভরে ছিল শুধু হাসি শুধু গান কোথা যে হারালো কেঁদে

বলে প্রাণ।' এবং এই জগতই তার সবচেয়ে আপন তা ব্যক্ত হয় –'অন্ধগলির যে আঁধার বন্ধু হলো আজ আমার।' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালনা করেন *চন্দ্রনাথ* (১৯৮৪)। এ চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি চন্দ্রনাথের (রাজ্জাক) বিরহ-বেদনায় পরিবেশিত হয়–

ফুলের বাসর ভাঙ্গল যখন
স্মৃতি কেন বেদনার বাসর সাজায়
সুখের সে দিনগুলি ফিরে ফিরে কেন যে কাঁদায় ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় জমিদার চন্দ্রনাথের সাথে সরযুর বিবাহিত জীবনে বাসর রাতের মধুর রেশ কাটতে না কাটতেই ভয়ঙ্কর ধব্বনি বেজে ওঠে। এক সময় জানা যায় যে, সরযুর (দোয়েল) মা বিধবা, কুলটা। এমন মায়ের মেয়ের সঙ্গে ঘর করা যাবে না। চন্দ্রনাথের কাকা (গোলাম মোস্তাফা) তালাক দিতে বলে সরযুকে। এলাকায় বিষয়টি জানাজানি হলে চন্দ্রনাথের নিকট অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় সরযুকে। এক সময় বিষ পানে আত্মহত্যা করার কথা ভাবে সে। চন্দ্রনাথও যেন সম্মতি দেয়। কিন্ত অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কারণে সে আত্মহত্যা করতে পারে না। কাকার মেয়ে নির্মলা চন্দ্রনাথের এমন আচরণে বিরোধিতা করে। ফিরে আসে চন্দ্রনাথ। ঘরে প্রবেশ করতেই দৌড়ে এসে চন্দ্রনাথকে গলা জড়িয়ে ধরে সরযু বলেঃ 'আমি পারলুম না বিষ খেতে। ওগো আমি যে মা হতে চলেছি।' সরযু বলে তাকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতে। পরনের সকল অলঙ্কার খুলে রেখে দেয় চন্দ্রনাথ। তারপর ঘোড়ার গাড়িতে করে পাঠিয়ে দেয়া হয় তাকে তার মা'র বাড়ি। সরযুর সাথে বিবাহিত জীবনের সকল সুখ-স্মৃতির কথা মনে পড়ে চন্দ্রনাথের। তার বেদনা প্রবল আর্তিতে প্রবাল চৌধুরীর কণ্ঠে পরিবেশিত হয় উপরোক্ত গানে।

গ. চিঠি পত্রে প্রেম-বিরহের গান

চিঠি বা পত্র বার্তা বিনিময়ের মাধ্যম। এক সময় বার্তা প্রেরণের একমাত্র মাধ্যমই ছিল চিঠি বা পত্র। যার মাধ্যমে মনের কথা, অফিস আদালতের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণ করা হতো। সময়ের হাত ধরে চলচ্চিত্রের গানে চিঠি-প্রত্রের প্রসঙ্গ এসেছে বিভিন্নভাবে। দিলীপ বিশ্বাসের *অনুরোধ* (১৯৭৬) চলচ্চিত্রে কবরীর অভিনয়ে উজ্জ্বলের বিপরীতে নিম্নোক্ত গানটি পরিবেশিত হয় চিঠি পাওয়ার ব্যাকুলতা নিয়ে। চিঠি না পেলে প্রেয়সীর রাত নির্ঘুম হবে। প্রাণ বন্ধুর কাছে তার বিশেষ নিবেদন প্রতিদিন যেন সে চিঠি দেয়; তা না হলে তার যেন বেঁচে থাকাই দায়। তারই প্রকাশ–

চিঠি দিও প্রতিদিন চিঠি দিও
নইলে থাকতে পারব না ॥

উপরোক্ত গানে নারী হৃদয়ে বন্ধুর প্রতি তার ভালবাসার রূপ এভাবেই প্রতিফলিত হয়। গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার সত্য সাহা, কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন। রাজু সিরাজের *আরাধনা* (১৯৭৯) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটি রূপার (কবরী) অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। তার স্বামী আশিকের (বুলবুল আহমেদ) কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার অপেক্ষায়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় বাসর রাতে গুরুতর অসুস্থ রোগীকে দেখতে যায় তার ডাক্তার স্বামী আশিক। নদী পথে ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকা

ডুবিতে মারা যায় সে। রূপার কাছে বিষয়টি গোপন রাখা হয়। তাকে জানানো হয় চিকিৎসার কারণে আসতে দেরি হচ্ছে তার। এদিকে রূপা তার বড় ভাই আবুলকে (আনোয়ার হোসেন) দিয়ে আশিকের জন্য চিঠি লিখিয়ে নেয়। অতঃপর আশিকের কাছ থেকে চিঠির উত্তর পাওয়ার আশায় প্রতীক্ষার প্রহর গুণে। অপেক্ষার প্রহরে আশার মালা গাথলেও কিন্তু তার জীবনে আর কখনো চিঠি পাওয়া হয় না। এ এক নির্মম সত্য রূপার জীবনে।

ও ও ও চিঠি আসবে জানি আসবে
বন্ধু আমায় কেমন করে ভুলে থাকবে
তোমরা সবাই দেখো সে যে ফিরে আসবে ॥

সি বি জামান-এর *উজান ভাটি* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানে চিঠির প্রসঙ্গ রয়েছে চাকরির খোঁজে বন্ধুর শহরে যাওয়াকে কেন্দ্র করে–'বিদেশ গিয়া বন্ধু তুমি আমায় ভুইল না, চিঠি দিও পত্র দিও জানাইও ঠিকানা রে।' কবীর চৌধুরীর *আলিফ লায়লা* (১৯৮০) চলচ্চিত্রে হাসানের (ওয়াসিম) রেশমি উড়না এবং প্রেম পত্র পেয়ে লায়লার (শাবানা) মনে প্রেমানুভূতির প্রকাশ ঘটে এবং সখীর সাথে বিনিময় করে নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে–

বন্ধু লিখেছে আমায় প্রেমের আলাপন
মিছে করিস না সখী আমায় জ্বালাতন ॥

তথ্যপ্রযুক্তির এই সময়ে এসে চিঠির প্রচলন নেই বললেই চলে। কোন এক সময় হয়তো চিঠি থাকবে না কিন্তু তার আবেদন রয়ে যাবে যুগ যুগ ধরে বর্ণিত এই গানসমূহের মাধ্যমে। নব্বই দশকের চলচ্চিত্রের গানেও চিঠি বা বার্তার প্রসঙ্গ এসেছে। ছটকু আহমেদের *সত্যের মৃত্যু নাই* (১৯৯৬) চলচ্চিত্রে আবদুল মান্নান রানার কণ্ঠে–'চিঠি এলো জেল খানাতে অনেক দিনের পর।' মাসুদ করিমের লেখা ও আলাউদ্দিন আলীর সুরে সালমান সাহ'র অভিনয়ে পরিবেশিত গানটিতে।

২. অভিমানের গান

প্রেমের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো অভিমান। চলচ্চিত্রে এই আবেশে রচিত হয়েছে অনেক গান এবং দর্শক মহলেও তা বিশেষভাবে সাড়া জাগিয়েছে। নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত *এতটুকু আশা* (১৯৬৮) চলচ্চিত্রে দেখা যায় শহরের বড় ঘরের ছেলে কবি (রাজ্জাক) শৌখিন, উদার, শিল্প মনা। সারাদিন ছবি এঁকে দিন কাটে তার এবং নিজেকে বাউন্ডুলে বলতেই স্বাচ্ছন্দবোধ করে। এমন স্বাধীন জীবনে সময়ের হেরফের হর হামেশাই হয়ে থাকে। কিন্তু প্রিয়জন যদি হয় তার উল্টো তাহলে অভিমানের ভার দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। চলচ্চিত্রে মান ভাঙ্গাতে এমন গানের সূচনা–

অ্যাই শোনো রাগ করবার
আরো যে কত সময় আছে যে পড়ে
অনেক আশার এইটুকু ক্ষণ
খুশিতে দাও না গো ভরে ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় সুজাতার অভিমান ভাঙ্গানোর জন্যে নানা রকমের ছল চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করে কবি (রাজ্জাক)। তা গানের দ্বিতীয় অন্তরায় লক্ষ করা যায়–'যদি তুমি ভাবো রাগ করলেই তোমাকে দেখায় খুব ভালো, আসলে তা নয় দেখতে লাগে ঠিক হুতুম পেঁচার মত কালো।' তাতে নায়িকা (সুজাতা) প্রবলভাবে ক্ষেপে গেলেও একটু পরে তার শীতল রূপ পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্ট হয় গানের শেষ অন্তরায় নায়িকার হাসি মাখা মুখ দেখে নায়ক যখন আনন্দিত হয়ে বলে–'এইতো বেশ হাসলে পরে মধুর মধুর লাগে, ঝিলমিলিয়ে ঝিলের জলে কাঁপন যেন জাগে।' নায়িকার রাগ পশমিত করার জন্য নায়ক তার হাসিকে ঝিলের জলের কাঁপনের সাথে তুলনা করে। গানটির নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন খন্দকার ফারুক আহমেদ। গীতিকার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সুরকার সত্য সাহা। সুভাষ দত্তের *আবির্ভাব* (১৯৬৮) চলচ্চিত্রে অভিমানের জনপ্রিয় একটি গান। রাশেদ (রাজ্জাক) এবং শাহানার (কবরী) অভিনয়ে পরিবেশিত হয় এবং নায়ক তার মনের কথা প্রকাশ করে নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে–

কাছে এসো যদি বলো তবে দূরেই কেন থাকো
ভালো লাগে যদি বলো তবে তোমার পাশেই রাখো
আমি থাকব নাকি চলেই যাবো তুমি নতুন করে ভেবে দেখো ৷৷

চিত্র-৩০: *আবির্ভাব* (১৯৬৮) চলচ্চিত্রে 'কাছে এসো যদি বলো'
গানের একটি স্থিরচিত্রে রাজ্জাক ও কবরী ।

গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার সত্য সাহা, কণ্ঠশিল্পী খন্দকার ফারুক আহমেদ। নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত *দীপ নেভে নাই* (১৯৭০) চলচ্চিত্রে কবরীর অভিমান ভাঙ্গাতে রাজ্জাকের অভিনয়ে পরিবেশিত হয় নিম্নোক্ত গান–

আমার এ গান তুমি শুনবে
হয়তো বা আজ নয় আর কোনদিন
আমার কথা তুমি রাখবে

চলচ্চিত্রে দেখা যায় একদিন ব্যাচেলর ভারাটে রাজ্জাকের রুমে বাড়ির মালিকের মেয়ে কবরী প্রবেশ করে। কবরীকে দেখে আঁতকে উঠে রাজ্জাক এবং মা মা বলে ডাকতে থাকেন। কবরী বলে: 'আমি

আপনাকে উজবুক টুজবুক বলেছি বাড়ি থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করেছি। ওসব কথা খালাম্মাকে বলেছেন কেন?' রাজ্জাক বলে: 'বারে মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বুঝি?...সত্যবাদী পুরুষ।' রেগে যায় কবরী। রাজ্জাক তোষামোদের সুরে বসতে বলে কবরীকে। কিন্তু কবরী বলে: 'আপনার এখানে বসতে আসেনি।' রাজ্জাক বলে: 'বসবেন না ? চা-ও খাবেন না? তাহলে একটা গান শুনুন। কবরী 'না' বলে সরে যায়। তারপর শুরু হয় উপরোক্ত গানটি। কামাল আহমেদ পরিচালিত *অশ্রু দিয়ে লেখা* (১৯৭২) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত নাজমার (সুচন্দা) পরিবেশিত গানে অভিমান ভাঙ্গানো তদুপরি তার ভালবাসা পাওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। প্রিয়জনের সান্নিধ্য পাওয়ার আশায় মিথ্যার আশ্রয় নেয় নাজমা। ফলে আসাদের (রাজ্জাক) মনে অভিমান জন্ম নেয়। সে অভিমান ভাঙ্গানোর প্রয়াসে পরিবেশিত হয় নিম্নোক্ত গান–

না সরে যেওনা এসো কাছে এসো
অভিমানে ওগো বলো না ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় নাজমা ভালবাসে আসাদকে। কিন্তু আসাদ তার হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী মৌসুমীকে (সুজাতা) খুঁজে বেড়ায় প্রতিনিয়ত। নাজমা আসাদের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য তার বাবার কাছে মিথ্যে কথা বলে যে, আসাদ তাকে ঘুরতে নিয়ে যাবে। আসাদ ঐ মুহূর্তে কিছুটা বিব্রতবোধ করলেও বেশি কিছু বলতে পারে না কেবল মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করে। তারপর দেখা যায় দুজনে পার্কের একটি বেঞ্চে বসে আছে। এক সময় আসাদ জিজ্ঞেস করে: 'আব্বার কাছে মিথ্যে কথা বললে কেন?' সুচন্দা বলে: 'ভালোবাসাবাসির ব্যাপারে একটু আধটু মিথ্যে কথা বলতে হয় হ্যা গো হ্যা'। অবাক হয়ে আসাদ বলে: 'ভালবাসা!' কারণ সেতো ভালবেসেছিল কেবল মৌসুমীকে। তাকে বিয়েও করেছিল। কিন্তু একটি দুর্ঘটনায় সব এলোমেলা হয়ে যায়। তারই স্মৃতিচারণ করে সে। কিন্তু এসব ঘটনা জানে না নাজমা। আসাদ কেবল তাকে পাশ কাটিয়ে চলতে চায়। কিন্তু নাজমা তার মন পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। উপরোক্ত নাজমার পরিবেশিত গানে তারই রূপায়ণ লক্ষ করা যায়।

জহিরুল হক পরিচালিত *রংবাজ* (১৯৭৩) চলচ্চিত্রে নায়কের (রাজ্জাক) আসাকে কেন্দ্র করে নায়িকার (কবরী) মনে অভিমান দানা বাঁধে। চলচ্চিত্রে দেখা যায় নায়কের পথ চেয়ে বসে থাকে নায়িকা। দীর্ঘ অপেক্ষার পর নায়কের আসতে দেরি হওয়ায় নায়িকার মনে অভিমান জন্ম নেয়। কোন উপায়ান্তর না পেয়ে নায়িকা রাগে-অভিমানে একা একা যেন কেঁদে মরে এবং বলে: 'ধুর ছাই, কখন সে আসবে! ইস একটুও ভাল্লাগছে না। দেখা পেলে হয়, আচ্ছা করে মজা দেখাব।' তারপর গেয়ে ওঠে নিম্নোক্ত গান–

সে যে কেন এলো না
কিছু ভালো লাগে না
এবার আসুক তারে আমি মজা দেখাবো ॥

গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার আনোয়ার পারভেজ, কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন। আজিজুর রহমানের *অমর প্রেম* (১৯৭৭) চলচ্চিত্রে শামীম (শাবানা) তার মনের মানুষ মাসুমকে (রাজ্জাক) নিয়ে কল্পনার চোখে মান-অভিমানের ছবি আঁকে নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে–

আমি কারো জন্যে পথ চেয়ে রবো
আমার কি দায় পড়েছে
আমার অনেক কাজ ছিল
তাই তো আসতে দেরি হয়েছে
কিছু মনে করো না ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় একমাত্র মাকে নিয়ে শামীমের ছোট্ট সংসার। অপরদিকে পিতৃহীন-মাতৃহীন মাসুমেরও আপন বলতে কেউ নেই। অফিস করে বাসায় ফেরার পথে বিভিন্ন সময়ে মহল্লার বখাটে ছেলেরা শামীমকে উত্ত্যক্ত করে। এ নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ নেই শামীমের মা'র। ঘটনাক্রমে মা-মেয়ের সংসারে আশ্রয় হয় মাসুমের। একদিন রাত করে বাসায় ফেরার পথে বখাটে যুবকেরা মাসুমের গায় সিগারেট ছুড়ে মারে এবং শামীমকে জড়িয়ে আজে-বাজে কথা বলে। এ নিয়ে মাসুম ওদেরকে বেশ শায়েস্তা করে বাসায় ফেরে।

দরজা খোলে দেয় শামীম। গালে রক্ত জমে আছে দেখে আঁতকে ওঠে শামীম এবং তার আঁচল দিয়ে মুছে দেয়। মাসুম বলে: 'এটা কি করছেন? শামীম বলে: বারে রক্তগুলো পরিষ্কার করতে হবে না। তাই বলে শাড়িটা নষ্ট করবেন! শামীম বলে: নষ্ট করেছি বেশ করেছি।' এই বলে লজ্জা পেয়ে সরে যায়। এরপর তার রুমে গিয়ে শুয় আবার উঠে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে। কী এক চঞ্চলতা যেন ভর করে তার মনে। তারই প্রকাশ কল্পনার চোখে অভিমানের সুর হয়ে বাজে উপরোক্ত গানে। সাইফুল আজম কাশেমের *বৌরানী* (১৯৮০) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি স্ত্রীর মান ভাঙ্গাতে পরিবেশিত হয়। অফিসের কাজের চাপে স্বামীর দেরি করে বাসায় ফেরাকে কেন্দ্র করে স্ত্রীর মনে অভিমান তৈরি হয়। ফলে স্ত্রীর মান ভাঙ্গাতে স্বামীর প্রচেষ্টা নিম্নোক্ত গানে–

হে অভিমানী মান করো না যখন তখন
দূরে সরে গেলে বুকে লাগে যে আগুন ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় রাগে ক্ষোভে অস্থির হয়ে আছে অঞ্জনা। রাজ্জাক কাছে যায় অঞ্জনা কোনো কথা বলে না। রাজ্জাক বলে: 'বাপরে বাপ খুব রেগে আছো বলে মনে হচ্ছে? আরো রেগে গিয়ে বলে: 'রেগে আছি বলে মনে হচ্ছে? এদিকে বাজে ৩ টা। আমি সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি।' রাজ্জাক বলে: 'কি করবো বলো এত চেষ্টা করেও সময় মত বের হতে পারলাম না। বুঝোই তো এত দায়িত্ব।' অঞ্জনা বলে: 'সব দায়িত্ব অফিসের জন্য আমার জন্য বুঝি কোন দায়িত্ব নেই।' নেই মানে? বলে হাত ধরতেই ছাড়ো বলে টান মেরে সরে যায়। তারপর রাজ্জাক শুরু করে উপরোক্ত–মান ভাঙ্গানোর গান। আজিজুর রহমান বুলির *নেপালী মেয়ে* (১৯৮৫) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটিতেও মান ভাঙ্গানোর প্রসঙ্গ রয়েছে–'আমি নেপালি মেয়ে, ও বাবুজি বাঙালি মন বুঝি না, যদি দোষ হয়ে যায়

ক্ষমা করো গো আমায়, তুমি রাগ করে চলে যেওনা।' সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে ববিতার অভিনয়ে মাহমুদি কলির বিপরীতে পরিবেশিত হয়।

৩. একে অপরের (নায়ক-নায়িকার) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ বা মন জয় করার গান

বিশেষত প্রেমের আগ মুহূর্তে এই গানের সূত্রপাত ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই গান নায়কের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়-নায়িকাকে কাছে পাওয়া কিংবা তার কাছ থেকে ভালবাসা আদায়ের অন্যতম কৌশল হিসেবে। প্রায় সব বয়সি মানুষের মধ্যে নায়কোচিত ব্যাপার রয়েছে। সেদিক থেকে এ গান তাদের একান্ত মনের বাসনাকেও পূর্ণ করে; যা তার ব্যক্তিগত জীবনে ঘটাতে পারে না তা সে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পায়। ফলত চলচ্চিত্রে এই গানের ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে এবং স্বাধীনতাত্তোর চলচ্চিত্রে ক্রমশ এই গানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। এর আরেকটি কারণ রয়েছে তা হলো এই গানের বিষয় এবং গায়কি। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে সুরশৈলী অধ্যায়ের গায়কি প্রসঙ্গে। গায়কির কারণে এই গান সব বয়সি শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই গানের দর্শক তরুণেরা। ক্ষণকালের জন্য হলেও এই গানের মাধ্যমে তাদের সুপ্ত নায়োকচিত ভাব জেগে উঠে এবং এক ধরনের রস আস্বাদন হয়। নিম্নোক্তভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত *দীপ নেভে নাই* (১৯৭০) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিতে বর্ণিত বক্তব্যের রূপ প্রতিফলিত হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায়, রাজ্জাক বেতারের শিল্পী; অনুষ্ঠানের জন্য সে রিহার্সেল করে। কবরীর বাবা-মা বাড়িতে নেই। কয়েকজন বান্ধবী মিলে বারন্দায় দাঁড়িয়ে রাজ্জাকের রুমের দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করে। রাজ্জাকের এক বন্ধু জানালার পর্দা সরিয়ে হাসাহাসির দৃশ্য দেখে। তারপর রাজ্জাককে বলে: 'নে হারমোনিয়ামটা নে।' হারমোনিয়ামটা নিয়ে রাজ্জাক রাগসংগীত শুরু করে–

বনে বনে গাহিছে পাখি
সুরভিতে সমীরণ গিয়েছে ঢাকি
নিশি ভোরে মেলো গো আঁখি ॥

গান শোনার পর কবরী এবং তার বান্ধবীরা হাঁড়ি পাতিল বাজিয়ে তাচ্ছিল্য করে। তার বন্ধু বলে: 'না 'তোর কোন কাণ্ড নেই দেখছি। ওখানে বসে আছে সব আধুনিকেরা আর তুই ধরলি কিনা সেকেলে গান। যত সব।...আই তুই একটা আধুনিক গান ধরতো।' রাজ্জাক বলে: 'বল্‌ছিস তো? হ্যা, রাজ্জাক গিটার নিয়ে ওদেরকে লক্ষ্য করে শুরু করে নিম্নোক্ত গানটি–

ঐ দূর দূর দূরান্তে দিন দিনান্তে নীল নীলান্তে
কিছু জানতে না জানতে শান্ত শান্ত মন অশান্ত হয়ে যায় ॥

গান শুনে কবরীর বান্ধবীরা বলে: 'কি নাম বলতো লোকটার' কবরী বলে: 'কি যেন কামরুল না জামরুল' এক বান্ধবী বলে: 'সত্যি লোকটা খুব ভালো গান করে।' রাজ্জাকের বন্ধুরা বলে: 'কামরুল (রাজ্জাক) এবার থেকে সংগীত চচার্র রাস্তা একেবারে ক্লিয়ার। মানে তোর গান শুনে বাড়িওয়ালার মেয়ে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।' হা হা হা হা সবাই হাসিতে ফেটে পড়ে।

স্বাধীনতাত্তোরকালের চলচ্চিত্রে এই গান ব্যাপক পরিসর তৈরি করে। মুস্তাফিজের *মায়ার বাঁধন* (১৯৭৬) চলচ্চিত্রে–'প্রেম যদি লুকিয়ে রাখো, তবে কেমন প্রেমিক তুমি বলো, সুর যদি ছড়িয়ে না দাও, তবে কেমন সাধক তুমি বলো।' দাদুর পাশে বসে লায়লা (শাবানা) সেতার বাজায়। আর রাশেদ (রাজ্জাক) পাশে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানটি করে। উক্ত গানে যে বিষয়টি প্রকাশ পায় তা আসলে লায়লার মনোযোগ আকর্ষণ করারই ইঙ্গিতবাহী। অশোক ঘোষের *মতিমহল* (১৯৭৭) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক গান আবদুল জব্বারের কণ্ঠে প্রেমিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যে প্রেমিকের অর্থাৎ হীরার (মাহমুদ কলির) অভিনয়ে পরিবেশিত হয়–

হীরা (মাহমুদ কলি)ঃ ওরে পান্না যৌবন তোর বৃথা যাবে
দূরে থাকিস নারে
আমার মত সুজন রসিক কোথাও পাবি না
আমার কাছে ধরা দিলে মান যাবে না

কাহিনিতে লক্ষ করা যায় যে, বেদে কন্যা পান্নার প্রেমে পড়ে হীরা। কন্যার ভালবাসা পাওয়ার জন্য হীরা নিজেকে নানাভাবে উপস্থাপন করেঃ 'আমার মত সুজন রসিক কোথাও পাবি না, আমার কাছে ধরা দিলে মান যাবে না।' কিন্তু দেখা যায় পান্না ভালোবাসে শমসের ডাকুকে (রাজ্জাক)। এই চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত আরো একটি গান ফিরোজা বানুর (কবরী) দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক তার ভালবাসা পাওয়ার আশায় শমসের ডাকুর (রাজ্জাকের) অভিনয়ে খুরশীদ আলমের কণ্ঠে পরিবেশত হয়–

শমসের ডাকু: বকশিষ না চাইরে এই ইনাম আমি চাইরে
সুন্দরীদের হাসির দামে নিজেকে বিকায়রে ॥

এরপরেও যখন ফিরোজা আকৃষ্ট না হয়। তখন তার মনোযোগ লাভের আশায় প্রশংসা আরো বাড়িয়ে দেয় এবং প্রেমিকার রুপে মুগ্ধ হয়ে গোলাম হতেও তার কোন দুঃখবোধ নাই। ব্যক্ত হয় এভাবে–

যার বিছরি চোখে আছে হীরের ধার
যার বাঁকা ঠোঁটে কথার তলোয়ার
সে যদি দয়া করে হঠাৎ করে প্রেমে পড়ে
তার প্রেমেরই গোলাম হতে কোন দুঃখ নাইরে ॥

শমসের ডাকু তার ভালবাসা পাওয়ার আশায় অধীর। তার দৃঢ় বিশ্বাস, আজ না হোক দুদিন আগে কিংবা পরে সে তার ভালাবাসা পাবেই। তা প্রকাশ পায় এভাবে–

সে ভালবাসা করবে সমর্পণ
মুখে যত করুক না না
তাতে কিছুই যায় আসে না
এমন একটা মেজাজওয়ালা মেয়েই আমার চাইরে

চলচ্চিত্রে দেখা যায় মিথ্যে ধর্ষণ এবং হত্যার অপবাদ দিয়ে ইমরানকে মতিমহল থেকে বের করে দেয় তার সৎ রানি মা। এরই বদলা নিতে এবং নিরীহ গ্রামবাসীকে তার সৎ ভাই জামশেদের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে ইমরান (রাজ্জাক) পরবর্তীতে নাম হয় শমসের ডাকু। সকলের কাছে হয়ে উঠে ভয় আর আতঙ্কের নাম। একদিন নায়ের কন্যা ফিরোজা বানু (কবরী) ঘোড়ার গাড়িতে করে মতিমহলে যাচ্ছে। এ সময় শমসের ডাকুর আসার কথা শুনে পথিমধ্যে তাকে ফেলে ভয়ে সবাই দৌড়ে পালায়। তখন শমসের তার ঘোড়ায় করে ফিরোজা বানুকে মতিমহলে পৌঁছে দেয়। ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে ফিরোজা পড়ে গেলে শমসের বলে: 'চোট লাগেনি তো ? ফিরোজা বলে: না। শমসের বলে: এই যে শরীরটা তো নরম। মেজাজটা এত গরম কেন? বেয়াদব। আদবটা শিখিয়ে দাও না? এই নাও তোমার বকশিষ বলে ফিরোজা। শমসের বলে: ওগো সুন্দরী এই সামান্য বকশিষে আমার আশা মিটবে না। ফিরোজার কাছ থেকে রুমাল নিয়ে যায় এবং তার চোখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উড়িয়ে বেড়ায়। ফিরোজা পিছনে পিছনে ছুটে এবং বলে: 'আমার রুমাল ফিরিয়ে দাও।' তারপর শুরু হয় উপরোক্ত গান।

মোস্তফা মেহমুদের *শাপমুক্তি* (১৯৭৬) চলচ্চিত্রে নায়িকাকে আকৃষ্ট করার পায়তারা নিম্নোক্ত গানে ব্যক্ত হয়–'ধীরে ধীরে চল ঘোড়া সাথী বড় আনকোড়া, রূপনগরের পরি হয়েছে আজ সোয়ারী।' গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার সত্য সাহা, নেপথ্যকণ্ঠশিল্পী খুরশীদ আলম। এছাড়া দেওয়ান নজরলের *দোস্ত দুশমন* (১৯৭৭) চলচ্চিত্রে একই ধরনের গান; নায়িকার ভালবাসা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয় নায়কের হৃদয় নিম্নোক্ত গানে–

চুমকি চলেছে একা পথে
সঙ্গী হলে দোষ কি তাতে
হার মেনেছে দিনের আলো
রাগলে তোমায় লাগে আরো ভালো ॥

চিত্র-৩১: *দোস্ত দুশমন* (১৯৭৭) চলচ্চিত্রে 'চুমকি চলেছে একা পথে' গানের একটি স্থিরচিত্রে ওয়াসিম ও শাবানা।

চলচ্চিত্রে দেখা যায় ঘোড়ার গাড়ি টানে চুমকি (শাবানা) তাকে ভালবাসে রাজা (ওয়াসিম) কিন্তু তখনো চুমকি তাকে ভালবাসার কথা নিশ্চিত করেনি। একদিন চুমকি গাড়ি ছাড়ার আগে গাড়ি ঠিক ঠাক করে নেয়। এই সময় রাজা দৌড়ে এসে বলে: 'এই চুমকি দাঁড়া। চুমকি বলে: আমার মনে হচ্ছে

তোমার মাথায় কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। বোকা, গর্দভ। আরে আমাদের গ্রামে একটা নিয়ম আছে, পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের কথা বলতে মানা। বেশি পট পট করলে সিধা খালার কাছে নিয়া যাব।' তারপরও রাজা আশা ছাড়ে না বরং গাড়িতে উঠার চেষ্টা করে। চুমকি গাড়ি ছাড়ে। কিন্তু রাজা নাছোড়বান্দা সেও তার পিছু ছুটে। দেখা যায় কোন এক পথচারীর সাইকেল কেড়ে নিয়ে এবং উপরোক্ত গানটি গায় তার ভালবাসা পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায়।

দৃশ্যায়নে দেখা যায় রাজা সজোরে সাইকেল চালায় তাকে ধরার জন্য। এদিকে চুমকি ঘোড়াকে চাবুক মারে দ্রুত বেগে চলার জন্যে। তারপরেও রাজা যখন পিছু ছাড়ে না তখন চুমকি রাগে এবং বিরক্তির সুরে বলে ধুত। তখন রাজা বলে–'মুখেতে গালি মিঠা মিঠা হেয়ালি, যতখুশি গালাগালি করো লাগে ভালো। আমাকে পাশে নিয়ে চলো না, মিষ্টি করে তুমি বলো না। তোমাকে যে আমি ভালবাসি।' এক সময় রাজা সাইকেল রেখে কৌশলে গাড়িতে ওঠে বসে। এতে চুমকি আরো রেগে যায় বলেঃ 'চোর, বদমাস।' রাজা বলে–'ও ট্যাঙ্গেওয়ালী হাত করো খালি, চাবুক রেখে আমার হাত ধরো সেই ভালো, একা একা এই পথে চলো না, আর কারো নজরে পড়ো না, তাহলে যে মরে যাব আমি।'

এত গালাগালি শুনেও নায়ক পিছপা হয় না বরং তার প্রেমিকাকে পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। গীতিকার দেওয়ান নজরুল, সুরকার আলম খান, নেপথ্যকণ্ঠশিল্পী খুরশীদ আলম। অশোক ঘোষের *বাদল* (১৯৮১) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি মাহমুদ কলির অভিনয়ে এবং খুরশীদ আলমের কণ্ঠে পরিবেশিত হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় নবাব বাদল (মাহমুদ কলি) মেহবুবাকে (শাবানা) ভীষণ ভালবাসে কিন্তু কোনভাবেই মেহবুবার মন সে পায় না বরং তার ভালবাসাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে সে। কিন্তু তারপরেও বাদলের ভালবাসার গতি একইরূপে বহমান থাকে। তারই প্রকাশ নিম্নোক্ত গানটিতে–

প্রেম করো আর নাই করো
হাত ধরো আর নাই ধরো
সালামে মুহাব্বত কবুল করো
সালামে মুহাব্বত কবুল করো ॥

মোস্তফা আনোয়ারের *আঁখি মিলন* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে একই ভাবাবেগের গান। ভাবি যখন অন্তঃসত্ত্বা এবং বাসায় কোন মেয়ে মানুষ নাই তাকে সাহায্য করার। তখন একমাত্র দেবর মিলনের (ইলিয়াস কাঞ্চন) উপর দায়িত্ব অর্পিত হয় ছোট বোন আঁখিকে (সুচরিতা) নিয়ে আসার জন্য। পথিমধ্যে দেবর তার বোনটিকে ঘিরে ভালবাসার গান গায়, যা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের সামিল–

হো হো হো হো হুম হুম হুম
আমার গরুর গাড়িতে বউ সাজিয়ে
তুত্তুর তুত্তুর তুত্তুর তু সানাই বাজিয়ে
যাব তোমায় বাড়ি নিয়ে ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় নয়নের (প্রবীর মিত্র) স্ত্রী অর্থাৎ রানি অন্তঃসত্ত্বা। বাড়িতে দেখাশুনা করার কেউ নেই। একমাত্র চাচা বশির (সাইফুদ্দিন) এবং ছোট ভাই মিলনকে নিয়ে তাদের সংসার। রানিকে

দেখভাল করার জন্য একজন মেয়ে মানুষ দরকার। রানি তার ছোট বোন আঁখিকে নিয়ে আসতে বলে। দেখা যায় মিলন তার গরুর গাড়ি নিয়ে হাজির হয় সখীপুরে ভাবির বাড়ি। রানির বাবা-মা আদরের ছোট মেয়ে আঁখিকে ভদ্রতা শিষ্টাচারের বাণী শুনিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে দেয়। মিলন তাকে নিয়ে গরুর গাড়ি হাঁকায় হট হট করে আর বলে...'আরে পক্ষী রাজের মত চল।' হাসি ঝরে আঁখির মুখ থেকেও। সেও আনন্দে পাগল পারা। এদিকে মিলনও আঁখির সঙ্গ পেয়ে দিশেহারা। কথা বলে তার গাড়ির সাথে: 'আরে এমন সোয়ারী পাবি কোথায়। আরে যা...। গ্রামের লোকজন বলে: কিরে আঁখি বাড়ি যাচ্ছিস না কিরে? ওটা কি তোর বর? আঁখি লজ্জায় মাথা নিচু করে। মিলনও তার লজ্জার অংশীদার হয় খুশি মনে। গাড়ি হাঁকানোর ফাঁকে মিলন ফিরে ফিরে পেছন পানে অর্থাৎ আঁখির দিকে তাকায়। এতে আঁখি বলে: 'আই তুমি অমন করে বার বার তাকাচ্ছো কেন? উত্তরে মিলন বলে: 'দেখছি তুমি কাঁদছো কি না? কাঁদব কেন? মেয়েরা বাপের বাড়ি ছেড়ে স্বামীর বাড়ি যাওয়ার সময় কাঁদে কিনা তাই। যাহ্। আবার মিলন বলে: 'অবশ্য তোমার যদি মন খারাপ হয়ে থাকে আমাকে বলতে পারো।' আঁখি বলে ধ্যাৎ। তারপর শুরু হয় দ্বৈতকণ্ঠে উপরোক্ত উত্তরপ্রত্যুত্তরমূলক গান। নায়ক তার পছন্দের মানুষের মন জয় করার জন্য শুরু করলেও নায়িকাও তার জবাব দিতে ভুল করে না। সেও তার মনের কথা প্রকাশ করে গানের মাধ্যমে।

বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় সকল নারী-পুরুষের মধ্যে কৌতূহলের অন্যতম বিষয়। ফলত গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বর্তমান চলচ্চিত্রে এই গানের ব্যবহার থাকলেও বাহনের পরিবর্তন এসেছে। তথ্য প্রযুক্তির আবির্ভাবে গরু কিংবা ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন নেই। ফলে উপরোক্ত গান তার কালের সাক্ষী বহন করবে। এছাড়া দেশ-বিদেশের কাহিনি নিয়ে নির্মিত আজিজুর রহমান বুলির *লাভ ইন সিংগাপুর* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে দৃষ্টি আকর্ষণমূলক গান–'ওগো সিংগাপুরী ম্যাম, তুমি করবে নাকি প্রেম' মাহমুদ কলি এবং ববিতার অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। ইকবাল আখতার এবং মোঃ জিয়াউদ্দিন আসলাম পরিচালিত *মিস লংকা* (১৯৮৫) চলচ্চিত্রে খুরশীদ আলমের কণ্ঠে এবং ফয়সালের অভিনয়ে ববিতার বিপরীতে পরিবেশিত হয়–'চুরি করেছো আমার মনটা, হায়রে হায় মিস লঙ্কা।' প্রভৃতি দৃষ্টি আকষর্ণের গান হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪. মনোরঞ্জনমূলক গান

রাজা-বাদশাদের বিনোদন লাভের জন্য দরবারে নর্তকী কিংবা বাইজিদের দ্বারা আসরকেন্দ্রীক পরিবেশিত বিশেষ এক ধরনের গানকে মনোরঞ্জনমূলক গান বলা যায়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ শুরু হলে ঢাকার সাংস্কৃতিক জীবন স্তিমিতি হয়ে পড়ে। এ সময়ে কলকাতা হয়ে পড়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্র। তখন ঢাকা মেতে থাকে নাটক, যাত্রা, পালাগান এবং বাইজিদের আসর নিয়ে। থিয়েটার মঞ্চ ছাড়াও ঢাকার সে সময়ে বিনোদনের আরেক উৎস ছিল 'নাচঘর'। এসব নাচঘরে ঢপকীর্তন, খেমটা আর বাইজিদের নাচ-গান পরিবেশিত হতো। এসব বাইজি ও খেমটাওয়ালীরা হিন্দি বা উর্দু গানের সঙ্গে নাচতেন।[৫২]

লক্ষ করা যায় যে, সেই সময়ে নাচঘরসমূহে ধনাঢ্য জমিদারের অধিকাংশ তরুণ সম্প্রদায় চিত্ত বিনোদন লাভের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করতো। তাছাড়া অবিভিক্ত বাংলায় প্রায় প্রতিটি জমিদার বাড়িতে বাইজি তথা খেমটাওয়ালীদের নাচ-গান উপভোগের জন্য নাচঘর কিংবা নাচমহল, রঙমহল প্রভৃতি

বিদ্যমান ছিল। ফলে বাংলা চলচ্চিত্রে যে বাইজি কিংবা নর্তকী দ্বারা পরিবেশিত নাচ-গানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়, তা অবিভক্ত বাংলার জমিদারদের বিনোদন লাভের উৎস থেকে আহরিত। চলচ্চিত্রে মনোরঞ্জনমূলক গান বিভিন্নভাবে চিত্রিত হলেও সাধারণত দুই ধরনের পরিবেশনা অধিকমাত্রায় লক্ষণীয়। প্রথমত. বাইজি দ্বারা পরিবেশিত আসরকেন্দ্রীক গান; যেখানে ঝলকানো রূপ আর নৃত্যের ঝংকারে ধ্বনিত রাজমহল। দ্বিতীয়ত.পার্টি বা ক্লাবে; দেশীয় ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংমিশ্রনে ঝলকানো রূপের পরিবেশনা। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

ক. আসরকেন্দ্রীক মনোরঞ্জনের গান

সাধারণত জলসা বা আসরে বাইজি দ্বারা পরিবেশিত কোন মনোরঞ্জনের গানকে আসরকেন্দ্রীক মনোরঞ্জনের গান বলা যায়। বাইজির পায়ে ঘুঙুর, পরনে ঝলকানো সাজের পোশাক, তবলা, হারমোনিয়াম, সেতার ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে পরিবেশিত হয়ে থাকে এই ধরনের গান। খান আতাউর রহমান পরিচালিত *নবার সিরাজদ্দৌলা* (১৯৬৭) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি নর্তকী আলেয়ার (আনোয়ারা) চরিত্রে রাজদরবারে পরিবেশিত হয়–

বেদরদী তুমি রসিকের কদর জানো না
মিনতিরে পায় ঢালো প্রেম জানো না
আমি দীপ হয়ে নিজেরে পোড়ায়

চিত্র-৩২: *নবার সিরাজদ্দৌলা* (১৯৬৭) চলচ্চিত্রে 'বেদরদী তুমি রসিকের কদর জানো না' গানের একটি স্থিরচিত্রে আনোয়ারা।

গানের বাণীতে প্রমোদ জীবনে বাইজি এবং খেমটাওয়ালীদের দুঃখ-বেদনার কথা প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে–'আমি দীপ হয়ে নিজেরে পোড়ায়, মাটির পিদিম তুমি আগুনের জ্বালা জানো না'। বাইজি জীবন সম্পর্কে সত্যেন সেন লিখেছেন–'এদের অনেকের জীবনের পিছনেই করুণ ও মর্মান্তিক কাহিনি জড়িত ছিল এবং এদের ব্যক্তিগত জীবনে হাসির চেয়ে অশ্রু ছিল বেশি। কিন্তু সত্যিকারের ছবিটা লোক নয়নের আড়ালে।'[৫৩] এ থেকে অনুমেয় হয় যে, বিনোদিনীদের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ গাথাও তাদের নাচ-গানের বিষয় হয়ে পরিবেশনার অনুষঙ্গ হয়েছে। এই ধারার আরেকটি গান এহতেশাম পরিচালিত *এদেশ তোমার আমার* (১৯৫৯) চলচ্চিত্রে দেখা যায় যে, কানুবাবু (সুভাষ দত্ত) এবং জমিদার পুত্র হামিদ (রহমান) মদ্যপানরত। নর্তকীর নূপুরের ঝংকারে জেগে উঠে মদ্যপানের আসর। শুরু হয় নিম্নোক্ত গান–

চুপিসারে এত করে কামিনী ডাকে
শরমে জড়ানো নূপুর বাজে থেকে থেকে ॥

উপরোক্ত গানটিতে বিনোদন লাভের উদ্দেশ্যে যারা এসব গানের আসরে যাতায়াত করে তাদেরকে আকৃষ্ট কিংবা আনন্দানের জন্য বলা হয়েছে–'চুপিসারে এত করে কামিনী ডাকে, শরমে জড়ানো নূপুর বাজে থেকে থেকে।' মনোরঞ্জনের আরেকটি গান কামাল আহমেদ পরিচালিত *অবাঞ্ছিত* (১৯৬৯) চলচ্চিত্রে পরিবেশিত হতে দেখা যায়, রোকেয়ার (সুজাতা) প্রেমে ব্যর্থ হয়ে মদ্যপান করে আনোয়ার হোসেন। মন খারাপ দেখে মদ্যপানের সঙ্গী জিজ্ঞেস করে: 'কি রে কথা বলছিস না যে? উত্তরে বলে: 'বিরক্ত করিস না ভালো লাগছে না। আহা হা হা হা লাগবে লাগবে ভালো লাগবে, মনে রঙও ধরবে। চল না ঘুরে আসি। কোথায়? চ্যালো আ হা হা হা... তেরে কেটে তাক...' এরপর ঘুঙুর পরা পায়ের ঝংকারের ক্লোজ শটের মাধ্যমে শিল্পী শাহনাজ বেগমের কণ্ঠে শুরু হয় নিম্নোক্ত গান–

মন তুমি কেড়ে নিলে এ কি বিষম দায় রে
কুল বধূর মান বুঝি যায় যায় রে ॥

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস অবলম্বনে চাষী নজরুল ইসলাম চিত্রায়ণ করেন *দেবদাস* (১৯৮২)। এ কাহিনিচিত্রে নিম্নোক্ত গানটি মনোরঞ্জনমূলক গান হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য–

নিজের বুকে আগুন জ্বেলে
রঙিন আলো হয়ে
জ্বলি এই আমি যখন দিলে...
রঙ লাগিয়ে দেই আমি
হায় পায়ের এই নূপুর আমার জাদু জানে
নয়নে নেশার কাজল কাছে টানে ॥

উপরোক্ত গানটির প্রয়োগ ভাবনায় লক্ষ করা যায় পার্বতীর (কবরী) বিয়ের পর দেবদাস (বুলবুল আহমেদ) খুব বিষণ্ন হয়ে পড়ে। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি এবং গায়ে চাদর জড়িয়ে এক সময় উপস্থিত হয় চুনিলালের বাড়ি। দেবদাসের এ অবস্থা দেখে অবাক হয়ে চুনিলাল বলে: 'কি হয়েছে তোমার দেবদাস?' দেবদাস কোন কথা বলে না। ক্ষাণিক পর বলে: 'চুনি দা আমাকে তোমার সঙ্গে নেবে?' চুনিলাল বলে: 'কোথায়?' দেবদাস বলে: 'রোজ সন্ধ্যায় তুমি যেখানে যাও।' প্রথমে ইতস্তত বোধ করলেও পরে দেবদাসের অনুরোধ ভঙ্গিমা দেখে 'বেশ' বলে সম্মতি প্রকাশ করে চুনিলাল। তারপর নারী কণ্ঠে হাসির উচ্ছ্বাস শোনা যায়। জলসা ঘরের সিড়ি বেয়ে দুজনে উপরে ওঠে। চুনিলাল কোল বালিশ জড়িয়ে বসে থাকে এবং পাশে দেবদাস। চন্দ্রমুখী (আনোয়ারা) প্রস্তুত। চুনিলালের চাহনিতে সম্মতি প্রকাশ করে চন্দ্রমুখী। তারপর তবলার দিকে ইশারা এবং তেহাইয়ের শট। চন্দ্রমুখীর ঘুঙুর পরা পায়ের শট। শুরু হয় উপরোক্ত গান। তবলার তেহাই এবং ঘুঙুরের ঝংকারে মুখরিত হয়ে ওঠে চন্দ্রমুখীর আসর। গানটির কণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লা। গীতিকার মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, সুরকার

খোন্দকার নূরুল আলম। এই চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটিও একই গীতিকার ও সুরকারের, সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে পরিবেশিত এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হয়। যে গানে মনোরঞ্জনীর নিজের জীবনেরই এক দীর্ঘ বেদনার কথা প্রতিফলিত হয়–

জনম জনম ধরে প্রেম পিয়াসী
দুটি আঁখি নিশি জাগে
দূরের চাঁদের পরশ লাগি
কাঁদে চকরী অনুরাগে ॥

গানটির পরিবেশনায় ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। নাচ পরিহার করে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গেয়ে শোনায় চন্দ্রমুখী। উক্ত পরিবেশনা ভঙ্গি থেকে এই অনুমেয় হয় যে, দেবদাসকে ভালবাসে চন্দ্রমুখী কিন্তু সে আশা পূরণ হবার নয়। তা প্রকাশ পায় গানটির দ্বিতীয় অন্তরায় যেখানে ব্যক্ত হয়–'শত কলঙ্কের দাগেও ভালবাসা সুখের বাসর রচিব বুকে, সে তো দারুণ দূরাশা, কেঁদে কেঁদে ও আশা নেভে না, হায়রে অবুঝ ভালবাসা, এই হৃদয় কাঞ্চন যায় না তো ঢাকা, শত কলঙ্কের দাগে।' কেবল বাইজি জীবনের বেদনা প্রলম্বিত হয় যা কিনা বিরহ-বিচ্ছেদেরই বহিঃপ্রকাশ। মোহাম্মদ মহীউদ্দিন পরিচালিত *বড় ভাল লোক ছিল* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে রুনা লায়লার কণ্ঠে গীত নিম্নোক্ত গানটি আপাত দৃষ্টিতে মনোরঞ্জনমূলক মনে হলেও প্রয়োগ ভাবনায় কিছুটা ভিন্নতর দিক উপলব্ধ হয়–

পাগল পাগল মানুষগুলা পাগল সারা দুনিয়া
কেহ পাগল রূপ দেখিয়া কেহ পাগল শুনিয়া ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় একদিন রজব মিয়া বাইজি পাড়া থেকে রাত করে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ ফকির বাবার ছেলে ইয়াসিন হুজুরের (রাজ্জাক) সামনে পড়ে। ইয়াসিন জানতে চায় এত রাতে কোত্থেকে সে ফিরলো। লজ্জায় সে মাথা নত করে সহজে বলতে চায় না, গোপন করার চেষ্টা করে। অতঃপর তার দুঃখের কথা জানায় হুজুরকে। তার সব আছে কিন্তু সংসার নাই, শান্তি নাই; মনোবেদনা ভুলে থাকার জন্য সে বাইজির ঘরে যায়। নানা ধরনের মানুষ সেখানে আনোগোনা করে। রজব মিয়ার কথা থেকে ইয়াসিন সেখানে যাওয়ার কথা ভাবে। তার ধারণা এইসব মহলে তার বাবার হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

রজব মিয়া বাইজির আসর সম্পর্কে নেতিবাচক কথা শোনালেও ইয়াসিন বলে: 'আমি যাব রজব মিয়া আমি যাব। আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন। আমার বাবাকে কে মেরেছে আমাকে জানতেই হবে।' ট্রাক চাপায় যে তার বাবাকে মেরেছে তাকে সে খুঁজে বের করবেই। সে তার দৃঢ়তা প্রকাশ করে। হারমোনিয়ামে সুর, নূপুরের আওয়াজ এবং তবলার তাল বেজে ওঠে সমছন্দে। তেহাইয়ের পর কাট এরপর শুরু হয় উপরোক্ত গান। গীতিকার সৈয়দ শামসুল হক, সুরকার আলম খান, কণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লা। ইবনে মিজানের *চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা* (১৯৮৪) চলচ্চিত্রে সিপাহশালার মুরাদ ষড়যন্ত্রের জাল বুনে শাহজাদি দিলরুবার (অঞ্জু) বিয়ের ব্যাপারে; রাজ্য কায়েম করার অপচেষ্টায়। তারপর নিম্নোক্ত গানটির মাধ্যমে নাদিরা বাইজির পরিবেশনা উপভোগ করে সে মনের আনন্দে–

চাঁদনি রাতে তোমারই সাথে
মিলন হবে গো আজ
তোমারে পাওয়ার আকুল আশায়
বুকেতে কাঁপন লাগে মন যমুনায় ॥

কিন্তু সে চক্রান্ত পরিণতি পাওয়ার আগেই নর্তকী নাদিরা টের পায়। সে গোপনে সব কথা খুলে বলে শাহজাদিকে এবং তার পিতার শরনাপন্ন হয়। পিতা রাজ কৌশলে তা সম্পাদন করেন। প্রসঙ্গত রাজনর্তকীরা শুধু বিনোদনই নয়, মহৎ কাজেও অবদান রাখত। রাজ্যের গুপ্তচর হিসেবে বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিল করার ক্ষেত্রেও তাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। উপরোক্ত গানটিতে সে রূপের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। গানের শেষে দেখা যায় দিলরুবা বাইজি রাতের অন্ধকারে কঠোর পাহাড়া অতিক্রম করে শাহজাদি দিলরুবার নিকট যায় এবং তার কাছে সব চক্রান্তের কথা খুলে বলে: 'প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে অনেক কষ্টে এসেছি। রাজাকে ভালবাসি রাজকন্যাকেও। সবার উপরে ভালোবাসি এই দেশকে। তাই জানাতে এসেছি এক সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রের কথা। সিপাহশালারের মনোরঞ্জনের জন্য নাচতে গিয়েছিলাম। সেখানে আড়াল থেকে সব শুনলাম।' ইবনে মিজানের *লাইলী মজনু* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি শাহেন শাহ'র (আলমগীর) বিপরীতে আঞ্জুমানের (নূতন) অভিনয়ে পরিবেশিত হয় মনোরঞ্জনের বিশেষ অনুষঙ্গ হিসেবে–

জান্নাতে হুর আমি
তোমারই মেহবুবা
চোখেরও নূর আমার হুজুরেওয়ালা

চলচ্চিত্রে দেখা যায় বেশ ক'দিন ধরে শাহেন শাহ (আলমগীর) বেশ চিন্তাগ্রস্ত, বিচলিত। কিছু ব্যাপারে রাজকার্যে বেশ বিরক্ত সে। আঞ্জুমান (নূতন) এসে তার মন ভালো করার জন্য হাতে সরাব তুলে দেয়। বলে: 'নিন আপনার আঞ্জুমানের হাতের এক পেয়ালা সরাব পান করুন। সব চিন্তা, সব অস্থিরতা দূর হয়ে যাবে।' শাহেন শাহ বলে: 'না আঞ্জুমান তোমার ঐ সরাবের পেয়ালায় আমার চিন্তা আমার চিত্ত চাঞ্চল্য দূর হবে না। কিন্তু এসবে তার কোন লাভ হবে না।' বরং সে একা থাকতে চাই। বলে: 'তুমি যাও আমাকে একা থাকতে দাও।' কিন্তু আঞ্জুমান নাছোড়বান্দা কোন মতেই সে তাকে একা থাকতে দিতে চাই না। বলে: 'আমিতো আপনাকে একা থাকতে দিতে চাই না।' এই বলে উপরোক্ত গানটি গাওয়ার মধ্য দিয়ে শাহেন শাহর মন ভালো করার চেষ্টা করে। গানটি সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে পরিবেশিত হয়। এফ কবীর চৌধুরীর *নরম গরম* (১৯৮৪) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি জনৈকা বাইজির অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। বরাবরের মত শাহজাদা মারুফের (ওয়াসিম) মনোরঞ্জনের জন্যে–

লাল পানিতে রঙিন হলো রাঙা জমিদার
নেশার পানি তার পরানে রসেরই জোয়ার
এই রূপসির মনের ঘরে তুমি তালুকদার ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় জমিদার রহমত আলী খাঁর অবাধ্য পুত্র শাহজাদা মারুফ তার পিতাকে কয়েদ খানায় আটকে রেখে জমিদারি দখল করে। এবং প্রতিদিনকার মত সে মদ্য পানের আসরে এবং

বাইজির নাচের ঝংকারে মেতে থাকে। এমতাবস্থায় পুত্রের হাতে বন্দি অসহায় জমিদার পিতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এবং তা প্রকাশ পায় ঘুঙুরের শব্দ পেয়ে তার বেগমকে যখন বলে: 'আমার রাজ মহলে বাইজির ঘুঙুরের শব্দ এ আমি পারব না বেগম। পারব না। কেঁদো না ওগো ধৈর্য ধরো।' বলে শান্ত করার চেষ্টা তার বেগম। কিন্তু পিতা-মাতাকে বন্দি করে বাইজির নাচে-গানে মত্ত থাকে অবাধ্য শাহজাদা মারুফ। এই চলচ্চিত্রে আরো একটি গান যা বাইজি গানের অনুরূপ। রুনা লায়লার কণ্ঠে মধুর (অঞ্জু) অভিনয়ে এবং ওয়াসিমের বিপরীতে পরিবেশিত হয়। গানটি ভিন্ন চরিত্রে পরিবেশিত হলেও মনোরঞ্জনের বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত–

এই বৃষ্টি ভেজা রাতে চলে যেওনা
বৃষ্টিরও ছন্দে বকুলের গন্ধে
আমায় তুমি ফেলে যেওনা ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় একদিন আবদাল জমিদারের টাকা চুরি করতে আসে। মধুর বাবা নায়েব সালামত আলী তা দেখে ফেলে। নায়েবকে গোপন করতে বলে কিন্তু সৎ নির্ভীক নায়েব রাজি হয় না। ছুরিকাঘাতে তাকে হত্যা করে। এবং জমিদার রহমত আলী খাঁর (আনোয়ার হোসেন) নিকট তার নামে মিথ্যে চুরির অপবাদ দেয়। প্রতিবাদী মধু এবং তার মা-বোনকে গ্রাম ছাড়া করতে চায় আবদাল। মধুকে তার কুঠিবাড়িতে ধরে নিয়ে যায়। কেবলমাত্র ভোগ্য দাসী বানানোর জন্যে। এদিকে প্রেমিক সুজন (জাভেদ) আসে মধুকে উদ্ধার করতে। প্রচণ্ড মারামারির পর আবদালের লোক পেছন দিক থেকে পা কেটে দেয় সুজনের। মধু জানে সুজন মারা গেছে। অবশেষে মধু পালিয়ে যায় এরপর নিঃস্ব অসহায় হয়ে নানা ঘটনাচক্রে জমিদারের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চায়। সৎ জমিদার তার নেশাগ্রস্ত পুত্রকে সুপথে ফিরিয়ে আনার আশায় প্রতিবাদী, নির্ভীক সাহসী কন্যা মধুকে পুত্রবধূ করে। কিন্তু শাহজাদা তা মেনে নেয় না। বরং বাসর রাতটিও সে পূর্বের ন্যায় বাইজির ঘরে কাটায়। পরের দিনও যখন শাহজাদা বেরিয়ে যায় তখন মধু জিজ্ঞেস করে: 'কোথায় যাচ্ছো?' উত্তরে শাহজাদা বলে: 'প্রতিদিন যেখানে যাই। বাইজির ঘরে?' মধু বলে: 'কিন্তু আমি যদি এ ঘরে জলসা বসাই। মদ পরিবেশন করি। তাদের মত নাচি, গাই?' শাহজাদা বলে: 'তোমার নারীত্ব আছে। কিন্তু বাইজির ছলা কলা নেই।' মধু বলে: 'সে ছলা কলা যদি আমি শিখি?' শাহজাদা বলে: 'বাইজি বাইজিই। স্ত্রীকে দিয়ে কখনো বাইজির কাজ চলতে পারে না।' মধু বলে: 'পারে নারী সব পারে।' তারপর শুরু করে উপরোক্ত গান। অর্থাৎ সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী মধু নিজেই এক ধরনের প্রচেষ্টা চালায় বাইজির অনুরূপ নাচ-গান গেয়ে স্বামীকে বাইজির ঘর থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে।

মদ এবং নারী এতই ভয়ঙ্কর নেশা যে, উপরোক্ত গানটির মাধ্যমেও স্ত্রী তার স্বামীর মন জয় করতে পারে না। গান শেষে দেখা যায় বৃষ্টিতে ভিজেই বাইজির ঘরে উপস্থিত হয় শাহজাদা। তার প্রমাণ পাওয়া যায়, বাইজি যখন শাহজাদার গা মুছিয়ে দেয় আর বলে: 'এই বৃষ্টি রাতে একলা ঘরে বউকে রেখে এখানে কেন ছোট সাহেব?' শাহজাদা বলে: 'বউ সে শুধু ঘরে কাজ কর্ম করার জন্য। বউ হইলো কুয়োর পানি। আর তুমি সাগর।' মনোরঞ্জনের বেশ কটি গানের ব্যবহার রয়েছে এ চলচ্চিত্রে তারমধ্যে–'জলসা ঘরে মাতাল হাওয়ার তুফান জেগেছে, তাই তো আমার বুকের মাঝে আগুন লেগেছে, এই রূপ আছে প্রেমে আছে, নেবে কি বলো? আরে নাচ নাচ নাচ সখী প্রাণ খুলে নাচ, আরে বাহ্ বাহ্ বাহ্ সখী চুকু চুকু নাচ।' গানটি উল্লেখযোগ্য। জলসা ঘরে পরিবেশিত হলেও গানের নৃত্য ভঙ্গিমা এবং পোশাক পরিচ্ছদে পাশ্চাত্য উপস্থাপনা কৌশল লক্ষণীয়। চাষী নজরুল ইসলামের *শুভদা* (১৯৮৬) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি বুলবুল আহমেদের মনোরঞ্জনের নিমিত্তে পরিবেশিত হয় এবং গানটিতে বাইজি জীবনের এক মর্মকথা প্রতিফলিত হয়–

আমি বাজুবন্ধ হলাম না
ঝুমকা চুড়ি হলাম না
হলাম না তো কারো গলার হার
পায়ে পায়ে পায়েল হলাম
আমি বারে বার ॥

জমিদারের (বুলবুল আহমেদ) মনোরঞ্জনের জন্য পরিবেশিত হয় উপরোক্ত গানটি। স্ত্রী বিয়োগের দুঃখ ভুলে থাকার জন্য সে বাইজি জয়ার নাচে গানে বিভোর থাকে প্রায় সর্বক্ষণ। এমনকি যাত্রা পথের সঙ্গী করে জয়াকে। যেন তারে নাচ-গানে ভুলিয়ে রাখে। জল থেকে ললনাকে (জিনাত) কুড়িয়ে পাওয়ার পর দুজনের সংলাপ থেকে তাই জানা যায়। উপরোক্ত মনোরঞ্জনের গানটির আসর পরিকল্পনায় ভিন্নতা লক্ষ করা যায়; নৌকার ছাদের উপরে হারমোনিয়াম এবং তবলার সহযোগে পরিবেশিত হয় গানটি। বুলবুল আহমেদ পরিচালিত *রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত* (১৯৮৭) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি এক বাইজি জীবনের সূচনা করার গান। চলচ্চিত্রে দেখা যায় মামার বাড়িতে থাকে পিতৃহারা কিশোরী রাজলক্ষ্মী (শাবানা), তার মা এবং দিদি। একদিন শ্রীকান্তকে ভালবাসার দায়ে রাজলক্ষ্মীকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় তার মামা। তারপর শুরু হয় তাদের করুণ জীবন। টাকার অভাবে মা তাকে বিক্রি করে দেয় কলকাতার নাচ দরবারের ম্যাথ্যারজির নিকট। ওস্তাদের কাছে তালিম শুরু হয়। তবলার তালে নাচের মুদ্রা দেহ মনে আত্মস্থ করে সে। কিশোরী রাজলক্ষ্মী নাচ শেখার মধ্য দিয়ে বড় (শাবানা) চরিত্রে রূপলাভ করে নিম্নোক্ত গানটির মাধ্যমে–

মোরা ঘুঙঘাট না খোলো সাবারিয়া
ও লুট গায়ে মোরে ॥

চিত্র-৩৩: *রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত* (১৯৮৭) চলচ্চিত্রে 'মোরা ঘুঙঘাট না খোলো সাবারিয়া' গানের একটি স্থিরচিত্রে শাবানা।

উপরোক্ত গানটির মধ্য দিয়ে শুরু হয় তার নর্তকীর জীবন। রাজলক্ষ্মী হয় পিয়ারী বাই। সারা শহরে তার নাম বাজে। সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে পরিবেশিত হয় উপরোক্ত গানটি। যেহেতু একটি বাইজি চরিত্রের ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের কাহিনি এগিয়ে যায়। ফলে বেশ ক'টি মনোরঞ্জনের গানের ব্যবহার রয়েছে। যেমন: 'যমুনা বড় বেইমান, হায়রে যমুনা বড় বেইমান' এছাড়া নিম্নোক্ত গানটিতে পিয়ারী বাইয়ের জীবন সংগ্রামের নির্মম ইতিহাসে রচিত হয়। এটি এই চলচ্চিত্রে মনোরঞ্জনের জন্য পরিবেশিত তার শেষ গান-

আমি জলসা ঘরে নূপুর পরা বন্দিনী
চিরদিনই চোখের জলে সঙ্গিনী
মনের মন্দিরও ছেড়ে দেবতা গেলে ফিরে
কার পূজা দেবে এই পূজারিণী ॥

প্রতিটি বাইজির জীবনে রয়েছে করুণ ইতিহাস। নিম্নোক্ত গানটিও সে ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর এক সময় পিয়ারী বাই ঘটনাক্রমে ট্রেন থেকে অসুস্থ শ্রীকান্তকে বাসায় নিয়ে যায়; সেবা যত্ন করে সুস্থ করে তোলে তাকে। শ্রীকান্ত চিনতে না পারলেও পিয়ারী বাই অর্থাৎ রাজলক্ষ্মী ঠিকই চিনতে পারে তাকে। এক সময় পরিচয় হয় দুজনের। পিয়ারী সিদ্ধান্ত নেয় সে আর বাইজি জীবনে ফিরে যাবে না। দীর্ঘ সাধনার পর শ্রীকান্তকে পেয়ে সে চায় সুখের সংসার গড়তে। পিয়ারী বাই একদিন পূজা দিতে গেলে জোর করে তাকে ধরে নিয়ে যায় ম্যাথারজি। যে তাকে এক সময় নর্তকী হিসেবে আশ্রয় দিয়েছিল। তারপর তাকে নাচতে বলে। মনোরঞ্জনের বাজারে বাইজি কেনা বেচার প্রচলন ছিল সে কথাও ব্যক্ত হয় তাদের সংলাপে। ম্যাথারজির সহচর বলে: 'নাচ হোবে তারপর সওদা হোবে দস হাজার।' হা হা হা করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে সে। নাচ গান উপভোগের পর দশ হাজার টাকার বিনিময়ে তাকে অন্যত্র বিক্রি করে দেয়া হবে।

কিন্তু পিয়ারী আর নাচতে চায় না। সে এই জীবন থেকে মুক্তি পেতে চায়। তাই ম্যাথারজির পায়ে পড়ে বলে: 'তোমার দুটি পায়ে পড়ি ম্যাথারজি। আমাকে আর নাচতে বলো না। আমার দেবতাকে (শ্রীকান্ত) আমি কথা দিয়েছি। তার কাছে আমাকে ছোট করো না।' তারপর তাকে লাথি মেরে ফেলে দেয়। পিয়ারী ঘুঙুরের উপরে গিয়ে পড়ে। উপায়ান্তর না পেয়ে সে তার গায়ে নাচের পোশাক জড়িয়ে নেয় এবং উপরোক্ত গানটি দিয়ে তার নাচ শুরু করে। বাধ্যবাধতার চরম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে শুরু হয় উপরোক্ত গান। জীবন বাস্তবতার কঠিন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে পিয়ারী বাই বাইজি জীবন বেছে নিলেও এই জীবন থেকে সে পরিত্রাণ পেতে চায়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর তার মনের দেবতা শ্রীকান্তর সাক্ষাৎ পাওয়ার পর সে আর তাকে হারাতে চায় না। সে নর্তকী জীবন থেকে ফিরে গিয়ে সুন্দর জীবন গড়ার আশা প্রকাশ করে। সে কথা ব্যক্ত হয় এভাবে–

মনের মন্দিরও ছেড়ে দেবতা গেলে ফিরে
কার পূজা দেবে এই পূজারিণী

তাই ম্যাথারজির নিকট করোজোড় মিনতি তার–'লক্ষ্মীরে করো না আর কলঙ্কিনী' দেবতার দেখা পাওয়ার পর সে এই জীবন থেকে মুক্তি পেতে চায় এবং কপালে সিঁদুর নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে শ্রীকান্তর সাথে। সে কথা প্রকাশ পায় এভাবে–'কপালে সিঁদুর দিয়ে চরণের ধূলো নিয়ে বাঁচতে যে চায় এই অভাগিনী।' গান শেষে দেখা যায় ম্যাথারজি তাকে আরো নাচতে বলে কিন্তু পিয়ারী বাই আর নাচতে চায় না। এক সময় সাহস সঞ্চয় করে সে বলে: 'পিয়ারী বাই মরে গেছে।' মাথা উঁচু করে বলে: 'আমি রাজলক্ষ্মী।' এ নিয়ে তাচ্ছিল্য করে ম্যাথারজি। এক সময় পিয়ারীকে ভোগ করতে চায়। পিয়ারী তার মাথায় আঘাত করে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে দ্রুত পালিয়ে আসে নিজ বাসায়।

এদিকে অপেক্ষা করে শ্রীকান্ত। বাসায় এসে পিয়ারী নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। অপ্রস্তুত হয়ে পিয়ারী বলে: 'আমি পূজো দিয়ে এলাম।' শ্রীকান্ত বলে: 'পূজো না বিসর্জন?' যাকে পাওয়ার সাধনায় প্রতীক্ষার দীর্ঘ জীবন বেছে নিয়েছে অথচ তার এমন প্রশ্নে প্রিয়তমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। এক সময় বলে: 'আমার গানের মধ্যে আমার কান্না আছে। আমার নাচের মধ্যে আমার যন্ত্রণা আছে।...কেউ বিশ্বাস করবে না। কোন দেবতার জন্যে আমি এ দেহটাকে আজও মন্দির করে রেখেছি।' বাইজি জীবনের এক নিদারুণ চিত্র প্রতিফলিত হয়। গানটির কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন। জহিরুল হকের *স্যারেন্ডার* (১৯৮৭) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানেও জলসা ঘর কিংবা এই ঘরের নর্তকীর জীবনের নানা রূপ প্রতিফলিত হয়। নারী আর মদের আসরে মেতে থাকতে দেখা যায় এক শ্রেণির মানুষদের।

রঙের মাস্তুলে দিলাম পিরিতের বাদাম রে
এইখানে মনের চেয়ে রূপের বেশি দাম ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় জসিমের এক বন্ধু উপায়ান্তর না পেয়ে জীবন-জীবিকার কঠিন প্রয়োজনে রাস্তায় বসে মানুষের ভাগ্য রেখা দেখে আয় রোজগার করে। জসিম তার হাত দেখাতে এসে হঠাৎ পরিচয় হয় তার বন্ধুর সাথে। জসিমও কিছু করে না। অন্যান্য বন্ধুদের খোঁজ খবর নেয় জসিম। জানা যায় মূলধন ছাড়াই অনেকে বড় ব্যবসায়ী হয়েছে। বন্ধুর সংলাপেও তা দৃষ্ট হয়–'সবাই বড় বড় ব্যবসা করছে বাট উইথ আউট ক্যাপিটাল।' জসিম যেমন জিজ্ঞেস করতেই বলে: 'যেমন সেলিম বাইজি পাড়ার সব চেয়ে বড় মাস্তান।' তারপর শুরু হয় উপরোক্ত গান। উপরোক্ত গানটিতে জলসা ঘরের ক্ষাণিক আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে বাইজি জীবনের চরম বাস্তবতার চিত্র উঠে এসেছে। বর্ণিত গানের ক্ষেত্রেও তাই লক্ষ করা গেছে। এ গানের প্রথম অন্তরায় বলা হয়েছে–

ধান ছিটাইলে কাক যে আসে
ফুল ছিটাইলে আসে ভ্রমর
নেশার আশে ভালবাসে
রাত ফুরাইলে কেউ নেয় না খবর
রাধাকে খুঁজে মরে কলিকালের শ্যাম ॥

অর্থাৎ রূপ এবং যৌবন যতদিন আছে ততদিন এসবের কদর আছে। জলসা কিংবা আসর থেকে বেরিয়ে পড়ার পর সব মিছে। মোহ এবং নেশার তোপে মনের দাম নেই, কেবল রূপের দাম ব্যতীত। এতে করে মনোরঞ্জনকারীর নিজের জীবনের না বলা কথাগুলোরই যেন বহিঃপ্রকাশ ঘটে। গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার আলম খান, কণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লা।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এক ধরনের অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র নির্মিত হতে থাকে। *রংবাজ* নামক চলচ্চিত্র দিয়ে এই ধারার সূচনা হয়। উক্ত ধারারসমূহের চলচ্চিত্রের কাহিনিতে মনোরঞ্জনের বিষয়টি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কারণ চলচ্চিত্রের কাহিনি জুড়ে ক্ষমতা এবং অর্থ দুটোই প্রকটমান। এর সাথে মনোরঞ্জনের দিকটিও অধিক মাত্রায় লক্ষণীয়। আশির দশকে অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণ বেড়ে যায়। ফলশ্রুতিতে মনোরঞ্জনের গানও বিস্তৃতি লাভ করে। অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্রের মধ্যে

জহিরুল হকের *রংবাজ* (১৯৭৩), মোহাম্মদ সাঈদের *সাধু শয়তান* (১৯৭৫),আকবর কবীরের *বাদশা* (১৯৭৫), আজহার ও শেখ আতাউর রহমানের *স্মাগলার* (১৯৭৬) দেওয়ান নজরুলের *দোস্ত দুশমন* (১৯৭৭), আজিমের *বদলা* (১৯৭৯) মমতাজ আলীর *নালিশ* (১৯৮২), রাজ্জাকের *বদনাম* (১৯৮৩), মমতাজ আলীর *নসীব* (১৯৮৪) ও *উসিলা* (১৯৮৬) শিবলী সাদিকের *নীতিবান* (১৯৮৮) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জমিদার কিংবা রাজ পরিবারকেন্দ্রীক সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রচলিত-অপ্রচলিত বিভিন্ন রাজকাহিনিকে উপজীব্য করে নানা রকম কল্পনার সংমিশ্রণে এক ধরনের চলচ্চিত্র নির্মিত হতে দেখা যায় যে সব চলচ্চিত্রসমূহকে পোশাকি বা ফ্যান্টাসি চলচ্চিত্র নামে অভিহিত করা হয়। অলৌকিক বিষয় আশয় জাদু শক্তি এবং জমিদারি দখলদারিত্বকে কেন্দ্র এসব কাহিনি বিকশিত হয়। ফলত ক্ষমতা আর ভোগ্য জীবনের সঙ্গে আসর বা দরবারকেন্দ্রীক মনোরঞ্জনের বিষয়টি অনিবার্যরূপে স্থান পায়। সরাব, নর্তকীর ঝলমলে রূপের বাহারে নাচ এবং গানে ভরে ওঠে রঙমহল। প্রসঙ্গত, বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে রূপকথা-কল্পকথা বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে আগাগোড়াই ছিল। তারই সূত্রধরে সত্তর দশকের মাঝামাঝিতে কিংবা শেষের দিকে এসব বিষয়ের চলচ্চিত্র নির্মাণে পরিচালকগণ বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের চলচ্চিত্রের একটি তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সারণি-৪

ক্রম	চলচ্চিত্রের নাম	পরিচালক	মুক্তির সাল
১.	রাজদুলারী	শফি বিক্রমপুরী	১৯৭৮
২.	রাজমহল	এফ কবীর চৌধুরী	১৯৭৯
৩.	রাজকুমারী চন্দ্রবান	শহীদুল আমিন	১৯৭৯
৪.	বিজয়িনী সোনাভান	ফয়েজ চৌধুরী	১৯৭৯
৫.	রাজবন্দী	আলমগীর কুমকুম	১৯৭৯
৬.	রূপের রানী চোরের রাজা	শহীদুল আমিন	১৯৭৯
৭.	রাজ নন্দিনী	এফ কবীর চৌধুরী	১৯৮০
৮.	তাজ ও তলোয়ার	ইবনে মিজান	১৯৮০
৯.	রাজকন্যা	এফ কবীর চৌধুরী	১৯৮০
১০.	শাহী দরবার	ফকরুল হাসান বৈরাগী	১৯৮০
১১.	শাহজাদি গুলবাহার	শহীদুল আমিন	১৯৮১
১২.	রাজ নর্তকী	ইবনে মিজান	১৯৮১
১৩.	রাজা সাহেব	খসরু নোমান	১৯৮২
১৪.	শাহী চোর	এম এ. মালেক	১৯৮৩
১৫.	রাজবাড়ী	কাজী হায়াৎ	১৯৮৪
১৬.	রাজকুমারী	ইবনে মিজান	১৯৮৫
১৭.	চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা	ইবনে মিজান	১৯৮৪
১৮.	নকল শাহজাদা	শামসুদ্দীন টগর	১৯৮৫
১৯.	পাতাল বিজয়	ইবনে মিজান	১৯৮৫
২০.	রাজ ভিখারী	শামসুদ্দীন টগর	১৯৮৫
২১.	যাদুমহল	স্বপন সাহা	১৯৮৮

উপরোক্ত সারণির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ২১টি চলচ্চিত্র রাজপারিবারিক জীবন সংস্কৃতি নির্ভর। এবং তা কল্পনা এবং বাস্তবতার মিশেলে বিভিন্নভাবে চিত্রিত হয় এবং নামের সঙ্গেই মিশে আছে তার বিষয় আশয়। এ সব চলচ্চিত্রে নানাবিধ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে মনোরঞ্জনের গান বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। এছাড়া ঐতিহাসিক কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্র দীলিপ বিশ্বাসের *আনার কলি* (১৯৮০) এবং বিদেশি বা পারস্য কাহিনি অবলম্বনে এফ কবীর চৌধুরীর *আলিফ লায়লা* (১৯৮০) ও ইবনে মিজানের *লাইলী মজনু* (১৯৮৩) প্রভৃতি চলচ্চিত্রে মনোরঞ্জনের গান বিভিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

খ. পার্টি বা ক্লাবে পরিবেশিত মনোরঞ্জনের গান

মনোরঞ্জনের গান ক্রমশ আসরকেন্দ্রীক পরিবেশনা থেকে সরে গিয়ে পার্টি বা ক্লাবে উঁচু মঞ্চে প্রধানত বিদেশি বা পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র সহযোগে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এর কারণ হিসেবে বিশেষভাবে আকাশ সংস্কৃতি অর্থাৎ পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব বলা যায়। গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র তারই সাক্ষ্য দেয়। আশির দশকে এর প্রভাব অধিক মাত্রায় লক্ষণীয়। মিউজিকোলজিস্ট সাইম রানার ভাষায়–

> আশির দশকের কিছু আগে অথবা সত্তর থেকেই বাংলা গান নতুন প্রবণতার দিকে এগুতে থাকে, একদিকে ইউরোপিয়ান বা পাশ্চাত্য সংগীতের বিভিন্ন ধারা যেমন–রক, পপ, জ্যাজ, হিপ-হপ, র‍্যাপ, টেকনো, ব্লুইজ-এর প্রভাব বাংলা গানের তারুণ্যে সংযুক্ত হয়। ফলে বাংলা গানের সাথে পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বাংলা গানের জগতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। [৫৪]

শহরে মহল্লায় মহল্লায় তরুণদের ব্যান্ডদল গড়ে ওঠে। মাসুদ পারভেজ-এর *মাসুদ রানা* (১৯৭৪) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানগুলো পার্টি বা ক্লাবে পরিবেশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তা-ই প্রতীয়মান হয়–'ও ডার্লি ফুল তো ঝরে যাবে, দিনতো চলে যাবে, মিছে কেন ভাবনা, তুমিও তো থাকবে না, আমিও তো থাকব না, ও মাই লাভ ইজ ডার্লিং', 'মধুর এই রাতে আমি তো তোমার হয়েছি দিওয়ানা','লোকে বলে ভালো বেসো না, আমি তো ভালবেসেছি।' মোস্তাফা মেহমুদের *জয় পরাজয়* (১৯৭৬) চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত নিম্নোক্ত গানটি মনোরঞ্জনের বিশেষ গান। নীতিহীন, ঘুষখোর পিতার সাথে সৎ চরিত্রবান পুত্র শহিদের (প্রবীর মিত্র) সততা এবং আদর্শের সংঘাত হয়। পরবর্তীতে বাড়ি থেকে চলে যায় শহিদ। কলেজের বন্ধু জীবনের (আলমগীর) কাছে আশ্রয় নেয়। জীবন কলুষিত সমাজের সাথে গা ভাসিয়ে চলে। চতুর্দিকে যখন ঘুষ আর দুর্নীতিতে সমাজ কলুষিত তখন তার লেখা-পড়ায় মন বসে না। তাই সে রংবাজি আর আড্ডায় মেতে থাকে সারাক্ষণ। মদ, নারী, পার্টি এসব মহলেই তার বিচরণ। টেলিসামাদের সংলাপ থেকে তা-ই প্রতীয়মান হয়। এক সময় সে জীবনকে বলে: 'ওস্তাদ নতুন নাচনেওয়ালী আইয়া পড়ছে...আশীষ কুমার লোহ বলে: 'চেহারা নকশা বদল কইরা চলো জলদি যাই।' তারপর কঙ্গো এবং গিটারের সুরে-তালে শুরু হয় নিম্নোক্ত গান–

দুনিয়ায় যারা অন্ধ
তারাই খোঁজে ভাল মন্দ
আমি কিছু খুঁজি না ভালো মন্দ বুঝিনা
এসো এসো করি আনন্দ ॥

ভ্রমর তোমার যৌবন আছে
ফুলের বুকেও মধু আছে
যা হবার হোক যে যা বলুক
এসো এসো আরো কাছে
দেবে নেবে মন রাঙাবে
মিছে কেন দ্বন্দ্ব
এসো এসো করি আনন্দ

গানটি সমসাময়িককালের চিত্রবাহী। কলুষিত সমাজের রূপ নির্ণীত হয় তাতে এবং অসৎ জগতে নিমজ্জিত হওয়ার চিত্র লক্ষ করা যায়। গানেও ব্যক্ত হয়–'ছোট বড় সবাই এ সংসারে চুরি করে।' কামাল আহমেদের *রজনীগন্ধা* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে পাশ্চাত্যের সাথে দীর্ঘ দিনের লালিত বাঙালি সংস্কৃতির আদর্শিক সংঘাত লক্ষ করা যায়। কেটির (টিনা খান) অভিনয়ে, রুনা লায়লার কণ্ঠে, ক্লাবে পরিবেশিত নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে তাই প্রকাশমান–

এই মনটা যদি চায় পেতে মন
নীল স্বপ্নে যদি ভরে দু'নয়ন
বলো দোষ কি এমন দোষ কি এমন ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় আমেরিকা ফেরত বড় ব্যবসায়ী তপনকে (রাজ্জাক) দিনরাত মদ আর ক্লাব-পার্টির নাচ গানে মেতে থাকতে দেখা যায়। মা আয়েশা আক্তার তার একমাত্র ছেলে তপনকে এসব থেকে মুক্ত করার জন্য তার বান্ধবীর উচ্চ শিক্ষিত ভদ্র-নম্র বাঙালি আচারণে পরিপূর্ণ সুধার (শাবানা) সঙ্গে বিয়ে দেয় তাকে। মায়ের কথামত বিয়ে করলেও স্ত্রীকে সে মেনে নেয় না; প্রতিনিয়ত দুর্ব্যবহার করে। বাসর রাতে সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে রেখে প্রতিদিনের মত সে রাত কাটায় পার্টি, ক্লাবে। সেখানে নারী আর মদ্যপানের আড্ডায় মেতে থাকে সারাক্ষণ। সুধা তার বাবার কথা ভেবে ধৈর্যের পরীক্ষা দেয়। কিন্তু তবুও স্বামীর মন পেতে ব্যর্থ হয়। চরম অযত্ন, অবহেলায় বিবাহিত জীবন কাটে তার। স্বামীর মনোযোগ পাওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত শাশুড়ির অনুমতি নিয়ে তথাকথিত নব্য গড়ে ওঠা আধুনিক সমাজের আনন্দ বিনোদনের আড্ডায় অর্থাৎ তপনের সঙ্গে ক্লাবে যায়। সেখানে সকলের সাথে পরিচয় পর্ব শেষে রুহি চরিত্রে পরিবেশিত নিম্নোক্ত গানটি দুজনে পাশাপাশি বসে উপভোগ করে–

তুমি আমার আমি তোমার
এ মায়ারাত ভালবাসার
দেখ না যায় যায় যায় চলে যায় রে
হায় হায় হায় মরি হায়রে ॥

গান শেষে দেখা যায় পার্টিতে আসা তপনের অন্যান্য বান্ধবীরা সুধার (শাবানা) রূপ সৌন্দর্য নিয়ে কথা বলে। এত সুন্দর রূপ নিয়ে কেন সে ঘর কোণো হয়ে আছে। এক সময় একজন মদের গ্লাস

এগিয়ে দেয় সুধার দিকে। কিন্তু ওতে সুধার অভ্যেস নেই বলে সে দুঃখ প্রকাশ করে। এ নিয়ে তিরস্কার করে কেটি বলে: 'ক্লাবে এসেছেন স্বামীর হাত ধরে। প্রিন্সেস রুহির নাচ দেখলেন মুগ্ধ চোখে। মদের টেবিলে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। তবু আপনার মদ খেতে আপত্তি? এ আবার কোন জাতীয় সতীপনা।' সবাই হাসিতে ফেটে পড়ে। এর তীব্র প্রতিবাদ করে সুধা বলে: 'মুখ সামলে কথা বলুন।' কেটি (টিনা খান) বলে: 'হোয়াট? সুধা বলে: 'বাজারের মেয়েদের মুখে সতীপনার কথা শোভা পায় না।' কেটি বলে: 'কী আমি বেশ্যা ? ইউ ডেয়ার টু কল মি প্রস্টিটিউট ? সুধা বলে: 'ইউ আর এ প্রস্টিটিউট। তপন এগিয়ে এসে বলে: 'এসব কি?' এবং সুধাকে গালে থাপ্পড় মারে। সুধা বলে: 'এই তোমার ক্লাব? যেখানে ঢুকতে গেলে সভ্যতা, ভব্যতা ঐ দরজার বাইরে রেখে আসতে হয়।' আবার কেটির দিকে তাকিয়ে বলে: 'অ্যা হুর ইজ অল ওয়েজ অ্যা হুর। বেশ্যার অন্য কোন পরিচয় নেই।' বলে বেরিয়ে যায় সুধা। তপনও সরি বলে সুধার সাথে বেরিয়ে যায়। গানটিতে দুটো প্রসঙ্গ ওঠে আসে। পাশ্চাত্য এবং চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতির মাঝে চরম সার্ঘষিকতার দ্বন্দ্ব। আশির দশকের সমাজে ব্যাপকভাবে তা প্রভাব বিস্তার করে।

বেলাল আহমেদের *নয়নের আলো* (১৯৮৪) চলচ্চিত্রে দেখা যায় গ্রাম থেকে শহরে আসে আলো (কাজরী) তার ভালবাসার মানুষ জীবনের (জাফর ইকবাল) খোঁজে। কিন্তু পপ শিল্পী রাসেল (রাইসুল ইসলাম আসাদ) তাকে জীবন সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা দেয়। রাসেল আলোর মনে আশা জাগায় ভিন্নভাবে, ঘুরে ঘুরে গানের মঞ্চ দেখিয়ে বলে: 'এখানে শহরের নামি-দামি লোকেরা আসে বিনোদনের আশায়। চোখ ঝলসানো রূপ-রস আর গন্ধ নিয়ে আবার চলে যায়। এখানেই শুরু হবে তোমার জীবন। ভুলে যাবে তোমার অতীত। নতুন নামে, নতুন রূপে তোমাকে দেখবে জানবে। আজ থেকে তুমি মিস রুমেলা। কী পারবে না? মৃদু স্বরে আলো বলে: হুম।'

এক সময় দেখা যায় গিটারের গ্যাং গ্যাং শব্দ এবং ড্রামসের বিটে শুরু হয় গান–'এসো এসো আহা আহা কাম অন ডান্স উইথ মি, বড় চেনা চেনা লাগছে তোমায়, কোথায় যেন দেখেছি।' শিবলি সাদিকের *নীতিবান* (১৯৮৮) চলচ্চিত্রে ঘটনাচক্রে লাকি (ইলিয়াস কাঞ্চন) ক্রিমিনাল কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তারসূত্র ধরে লিজার (চম্পা) সাথে প্রেমের সর্ম্পক গড়ে ওঠে। লিজার প্রবল সম্মতি থাকলেও পরে তা জানা যায় যে, এ ছিল তার জয়ী হবার কৌশলী অভিনয় মাত্র। লিজা কর্তৃক প্রত্যাখাত হয়ে ভীষণ ভেঙ্গে পড়ে লাকি এবং মর্মাহত হয়ে পার্টিতে যায়। সেখানে জুলি (নূতন) নিম্নোক্ত ডিস্কো নাচ-গান পরিবেশন করে এবং আনন্দে মাতিয়ে রাখে সকলকে–

একবারই প্রেম জীবনে আসে
একবারই মানুষ ভালবাসে
প্রেম আছে তো সবই আছে
প্রেম ছাড়া বেঁচে থাকা যেন মিছে...

কিন্তু গান শেষে দেখা যায় লাকি অঝোরে কাঁদে। নারী এবং তাদের ভালবাসা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে সে। আখতারুজ্জামান নির্মিত *প্রিন্সেস টিনা খান* (১৯৮৪) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটিও মনোরঞ্জনের জন্য পার্টিতে পরিবেশিত এবং জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার এক অন্যতম মাধ্যম হিসেবে

রচিত। চলচ্চিত্রে দেখা যায় গ্রামের সাধারণ ঘরের এক স্কুল শিক্ষকের মেয়ে তসলিমা খাতুন (টিনা খান) এবং মুক্তিযোদ্ধা মজিদ (ওয়াসিম) একে অপরকে ভালবাসে। বেকারত্বের কারণে মজিদ তসলিমাকে বিয়ে করতে অপারগতা প্রকাশ করে। অপরদিকে কলেজ শিক্ষক প্রবীর মিত্র তাকে পছন্দ করে। দুজনের বিয়ে হয়। একদিন তার বোন এবং স্ত্রীকে ছিনতাইকারীর হাত থেকে রক্ষা করতে যেয়ে প্রবীর মিত্র মারা যায়। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে তসলিমা অসহায় হয়ে পড়ে। অপরদিকে তার বাবাও মারা যায়। এমতাবস্থায় জীবন-জীবিকার কঠিন যুদ্ধে তার স্বামীর বন্ধু আসাদ (রাইসুল ইসলাম আসাদ) এবং তার স্ত্রী রানুর (সূচন্দা) সহযোগিতায় শহরে চলে আসে এবং চাকরি নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রানুর স্বামী আসাদের কুনজর এড়িয়ে সেখানেও তার থাকা সম্ভব হয় না। অবশেষে উপায়ান্তর না পেয়ে 'মনোরঞ্জন অপেরায়' নাম লেখায় সেখানে নেচে গেয়ে তসলিমা খাতুন রাতারাতি হয়ে উঠে প্রিন্সেস টিনা খান। সে কাজেও ছেদ পড়ে। অতঃপর চলচ্চিত্রে মক্কি রানি। এই চরিত্রে পরিবেশিত হয় নিম্নোক্ত গান। যে গানটি টিকে থাকার সংগ্রাম নির্ভর; চলমান স্রোতধারার পরিচয়বাহী–

টাকার পিছে দুনিয়া ঘুরে আমি ঘুরলে দোষ কি
সুখের আশা সবাই করে আমি করলে দোষ কি

মূল্য আমার কতটুকু জানি না তো আমি
ওরা তবু ভাবে আমায় সোনার চেয়ে দামি
একটু হাসি তাতে খুশি কাছে ডাকলে দোষ কি
প্রেমাগুনে সবাই পোড়ে আমি পুড়লে দোষ কি ॥

চিত্র-৩৪: *প্রিন্সেস টিনা খান* (১৯৮৪) চলচ্চিত্রে 'টাকার পিছে দুনিয়া ঘুরে আমি ঘুরলে দোষ কি' গানের একটি স্থিরচিত্রে টিনা খান।

সকলে যখন টাকা এবং রূপের নেশায় মত্ত তখন তসলিমা খাতুনও টিনা খান নামধারী হয়ে টিকে থাকার লড়াই-সংগ্রামে সংকোচহীনভাবে কালের হাওয়ায় গা মেলাতে চায়। সে কথাই ব্যক্ত হয় উপরোক্ত গানে। পার্টিতে কঙ্গো, গিটার, ড্রামস ইত্যাদি পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে রুনা লায়লার কণ্ঠে এবং প্রিন্সেস টিনা খানের অভিনয়ে পরিবেশিত হয় গানটি। উপরোক্ত গানটির ন্যায় *সত্য মিথ্যা* (১৯৮৯) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটিও টাকা, নারী, লোভ-লালসা এসব বিষয় আশয় নিয়ে রচিত; একক ও সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয় গানটি–

টাকার খেলা বড় খেলা

রূপের খেলা খোলামেলা
লোভের নেশা হয় এমন নেশা
মেটে না সে পিয়াসা
হো হো হো

চলচ্চিত্রে এই গানের ব্যবহার ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত হয়। কখনো কাহিনির সূত্রধরে অথবা ব্যবসায়িক সাফল্য লাভের আশায়। ফলত এই গানের বিষয় কিংবা প্রয়োগ ভাবনায় এসেছে বাহুল্যতা। ব্যহত হয়েছে গানের প্রয়োগ কিংবা রচনা শৈলীর। শেষ পর্যন্ত এই বিষয়ক গানকে আশ্রয় করে চলচ্চিত্রের গানে অশ্লীলতা প্রবেশ করেছে এবং আইটেম সং নাম ধারণ করে ভিন্ন একটি গানের ধারা তৈরি হয়েছে যা বাংলা গানের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে।

যদিও এক সময় ধনিক শ্রেণি বা রাজা বাদশাদের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে এই গানের সূচনা হয়েছিল। যা ছিল মূলত আসরকেন্দ্রীক পরিবেশনা। কিন্তু পরবর্তীতে তা পার্টি বা ক্লাবে আশ্রয় নেয়। বর্তমানে এই গানের বিবর্তিত রূপ হলো আইটেম সং যা বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিশেষত ভারতীয় হিন্দি চলচ্চিত্রে তা লক্ষণীয়। সারা পৃথিবী জুড়ে একছত্র আধিপত্ত বিস্তার লাভ করেছে এবং প্রচুর মুনাফা আয় করছে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র এবং তার গান মূলত ঐতিহ্য হারানোর অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটিও একটি অন্যতম কারণ। এক শ্রেণির অসাধু চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সস্তা কথা জনপ্রিয় গানের সুরের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এক শ্রেণির দর্শককে হলমুখী করতে এই পন্থা বেছে নিয়েছিল। বিশেষত আশির দশকে এই গান প্রকট আকার ধারণ করে। যাত্রা পালা যেমন আজ বিলুপ্তির পথে। তেমনি চলচ্চিত্রও তার অতীত ঐতিহ্য ক্ষুণ্ন করেছে এই গানের মাধ্যমে। এই গান সম্পর্কে অভিনেত্রী শাবানা আজমির অভিমত–

> আইটেম গান নিয়ে আমার কিছুটা আপত্তি রয়েছে। যখন কোন অভিনেত্রী বলবেন–'আমি তন্দরী মুরগী, আমাকে অ্যালকোহলের সঙ্গে উপভোগ করো' তখন অবশ্যই আমি এর প্রতিবাদ করব। কারণ এই কথাগুলো কোটি কোটি মানুষ শুনছে। একটি পাঁচ বছরের বাচ্চাও সেই গান শুনছে, কথা শুনে মজা নিচ্ছে। এটা সত্যিই কি আমাদের সঠিক শিক্ষা দিচ্ছে ? আমাদের চলচ্চিত্র ব্যক্তিদের কি কোনো দায়বদ্ধতা নেই? [৫৫]

যাত্রাপালা আজ বিলুপ্তির পথে তার অন্যতম কারণ হলো অপ্রাসঙ্গিক গান ও অশ্লীল নাচ। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গানের যে দুর্দিন অবস্থা তা এই গান থেকে উৎসারিত। জানা যায় আশির দশক থেকে চলচ্চিত্র ভাটা পড়ে। এই সময়ের চলচ্চিত্রে এবং এর গানে নকলের প্রবণতা বেড়ে যায় এবং নকলের সঙ্গে যুক্ত হয় অশ্লীলতা। চলচ্চিত্র সমালোচক মাহমুদা চৌধুরীর পর্যবেক্ষণ–

> খেউড় সম্বল করে এখানে গানের কথা লেখা হয়। সুরের জন্যে হিন্দি ছবি অক্ষত ভাণ্ডার। বস্তুত দর্শকের যৌন ইন্দ্রিয়ে সুড়সুড়ি জাগিয়ে তোলাই হচ্ছে এসব গানের মূখ্য উদ্দেশ্য। সংলাপের মাধ্যমে যা করা কঠিন চিত্রনির্মাতার গানের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে সেগুলো চতুরভাবে উপস্থিত করছেন দর্শকের শ্রবণেন্দ্রিয়ে। একই সাথে দৃষ্টিগোচরে আনা হচ্ছে নর-নারীর যৌবন চিহ্নগুলো। চোখে দেখার সঙ্গে কানে যুক্ত হয়ে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে এসব। [৫৬]

গান ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা ভুলে গিয়ে ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য একদল অসাধু লোক তার মনের কুপ্রবৃত্তিগুলোকে এই গানের মাধ্যমে প্রশ্রয় দেয়। ফলে চলচ্চিত্রে গান তা ব্যবহারিক মর্যাদার সংকটে পড়ে।

৫. পারিবারিক বন্ধনের গান

বাঙালি সমাজে যৌথ পরিবার কাঠামোর সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বন্ধন। সৃষ্টির আদি থেকে আজ অবধি হৃদয়ের স্পন্দনে নাড়ির বন্ধনে রক্তের ধারায় যে অমৃত বহমান তার নাম: 'পিতা-মাতা-সন্তান' এই সম্পর্ককে ঘিরে পারিবারিক বন্ধন গড়ে উঠেছে এবং তা বিকশিত হয়েছে যুগ যুগ ধরে। নর-নারীর ইহ জাগতিক প্রেম-ভালবাসা ছাড়াও চলচ্চিত্রে গান বিচিত্র বিষয় বৈভবের মধ্য দিয়ে অগ্রগামী। এর মধ্যে পারিবারিক জীবনে নানা সম্পর্ক দাদা-দাদি, নানা-নানি, মা-বাবা, ভাই-বোন, ভাই-ভাবি, দেবর-ভাবি, ননদ-ভাবি, শ্বশুর-শাশুড়ি প্রভৃতি সম্পর্কগুলোকে আঁকড়ে ধরে রচিত গান অন্যতম এবং তা চলচ্চিত্রের বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে। এই সম্পর্কগুলোকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে অনেক চলচ্চিত্র। যে সব চলচ্চিত্রের নামের গায়েই জড়িয়ে আছে পারিবারিক ও সমাজ জীবনের গন্ধগন্ধী। নিম্নরূপ তালিকায় তা দৃষ্ট হয়।

সারণি-৫

ক্রম	চলচ্চিত্র	পরিচালক	মুক্তি কাল
১.	দুই ভাই	আমজাদ হোসেন, নুরুল হক বাচ্চু, মুস্তফা মেহমুদ ও রহিম নওয়াজ	১৯৬৮
২.	সাত ভাই চম্পা	ইবনে মিজান	১৯৬৮
৩.	পারুলের সংসার	সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া	১৯৬৯
৪.	মনের মত বউ	রহিম নওয়াজ	১৯৬৯
৫.	মায়ার সংসার	মোস্তফা মেহমুদ	১৯৬৯
৬.	সন্তান	ই আর খান	১৯৭০
৭.	পিতা পুত্র	আমজাদ হোসেন	১৯৭০
৮.	সাধারণ মেয়ে	ই আর খান	১৯৭০
৯.	বড় বউ	নূরুল হক বাচ্চু	১৯৭০
১০.	আমার বউ	আকরাম	১৯৭১
১১.	গাঁয়ের বধূ	আলি কওসার	১৯৭১
১২.	রাঙ্গা বউ	দারাশিকো	১৯৭২
১৩.	বধূ মাতা কন্যা	আলি কওসার	১৯৭৩
১৪.	ভাই বোন	আলি কওসার	১৯৭৪
১৫.	মামা ভাগ্নে	আকবর কবির পিন্টু	১৯৭৪
১৬.	মা	বাবুল চৌধুরী	১৯৭৭
১৭.	জননী	সিরাজুল ইসলাম সিরাজ	১৯৭৭
১৮.	বধূ বিদায়	কাজী জহির	১৯৭৮
১৯.	সারেং বউ	আবদুল্লাহ আল মামুন	১৯৭৮
২০.	ঘর সংসার	সাইফুল আজম কাশেম	১৯৭৯
২১.	ছোট মা	তমিজ উদ্দিন রিজভী	১৯৭৯

২২.	দি ফাদার	কাজী হায়াৎ	১৯৭৯
২৩.	আপন ভাই	মতিউর রহমান	১৯৮০
২৪.	ভাই ভাই	স্বপন সাহা	১৯৮০
২৫.	বৌরানী	সাইফুল আজম কাশেম	১৯৮০
২৬.	পুত্র বধূ	কামাল আহমেদ	১৯৮১
২৭.	স্বামী	নূরুল আলম	১৯৮১
২৮.	মা ও মেয়ে	গোলাম নবী	১৯৮১
২৯.	সৎ মা	অগ্রগামী	১৯৮২
৩০.	স্বামীর সোহাগ	মুস্তফা মেহমুদ	১৯৮২
৩১.	বড় বাড়ীর মেয়ে	আবদুস সামাদ	১৯৮২
৩২.	নাত বৌ	ছটকু আহমেদ	১৯৮২
৩৩.	ঘরের বউ	মালেক আফসারী	১৯৮৩
৩৪.	বড় মা	দেলোয়ার হোসেন দুলাল	১৯৮৩
৩৫.	অন্ধবধূ	সুভাষ সোম	১৯৮৩
৩৬.	স্বামীর ঘর	ফকরুল হাসান বৈরাগী	১৯৮৪
৩৭.	বউ কথা কও	টি আই চৌধুরী	১৯৮৪
৩৮.	গৃহলক্ষ্মী	কামাল আহমেদ	১৯৮৪
৩৯.	ঘরে বাইরে	নাজমুল হুদা মিন্টু	১৯৮৪
৪০.	সোনা বৌ	দিলীপ সোম	১৯৮৫
৪১.	মা ও ছেলে	কামাল আহমেদ	১৯৮৫
৪২.	সৎ ভাই	রাজ্জাক	১৯৮৫
৪৩.	তিন কন্যা	শিবলী সাদিক	১৯৮৫
৪৪.	বধূবরণ	রাসেল কবীর	১৯৮৫
৪৫.	মায়ের দাবী	আওকাত হোসেন	১৯৮৬
৪৬.	ধর্ম আমার মা	দেওয়ান নজরুল	১৯৮৬
৪৭.	মা বাপ	নূর মোহাম্মদ মণি	১৯৮৬
৪৮.	চাঁপা ডাঙ্গার বউ	রাজ্জাক	১৯৮৬
৪৯.	ভাই বন্ধু	দারাশিকো	১৯৮৬
৫০.	চাচা ভাতিজা	নূরুল ইসলাম মঙ্গল	১৯৮৬
৫১.	রাজবধূ	ইবনে মিজান	১৯৮৬
৫২.	রাজ মাতা	এম এ মালেক	১৯৮৬
৫৩.	লক্ষ্মীবধূ	তাহের চৌধুরী	১৯৮৭
৫৪.	ভাগ্যবতী	হারুন অর রশীদ	১৯৮৭
৫৫.	স্বামী স্ত্রী	সুভাষ দত্ত	১৯৮৭
৫৬.	বাপের বেটা	আজিজুর রহমান বুলি	১৯৮৮
৫৭.	স্ত্রী	ইকরাম বিজু	১৯৮৮
৫৮.	ভাই আমার ভাই	দেলোয়ার জাহান ঝন্টু	১৯৮৮
৫৯.	পরিবার	শাহজাহান আকন্দ	১৯৮৮
৬০.	বউ শাশুড়ী	শেখ নজরুল ইসলাম	১৯৮৮
৬১.	বিরাজ বৌ	মহিউদ্দিন ফারুক	১৯৮৮
৬২.	জেলের মেয়ে	তমিজ উদ্দিন রিজভী	১৯৮৯
৬৩.	সংসার সীমান্তে	তারিক মাহমুদ	১৯৮৯
৬৪.	আমার সংসার	অশোক ঘোষ	১৯৮৯
৬৫.	বিরাজ বৌ	মহিউদ্দিন ফারুক	১৯৮৯
৬৬.	রাঙা ভাবী	মতিন রহমান	১৯৮৯
৬৭.	বৌমা	আলমগীর	১৯৮৯
৬৮.	বড় ভাই	নুরুল ইসলাম মঙ্গল	১৯৮৯

৬৯.	ভাই জান	রায়হান মুজিব	১৯৮৯
৭০.	ছেলে কার	আজহারুল ইসলাম খান	১৯৮৯
৭১.	দুই বোন	এইচ আকবর	১৯৮৯
৭২.	সহধর্মিনী	সুভাষ দত্ত	১৯৮৯
৭৩.	বোনের মত বোন	দারাশিকো	১৯৮৯
৭৪.	দেবর ভাবী	আজিম	১৯৮৯

উল্লেখ্য যে, গবেষণার নির্ধারিত সময়কালে (১৯৫৬-১৯৮৯) মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সংখ্যা ১০৬৬ টি (এক হাজার ছেষট্টি)। তন্মধ্যে ৫৩ টি ছিল উর্দু ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্র।[৫৭] বাংলা ভাষায় নির্মিত অধিকাংশ চলচ্চিত্র সামাজিক ও পারিবারিক জীবন কাহিনি নির্ভর। উপরোক্ত (সারণি-৫) পর্যালোচনা করলে লক্ষ করা যায় যে, নির্মিত এসব চলচ্চিত্রের মধ্যে ৭৪ টি পারিবারিক জীবন কাহিনি নির্ভর; এসব চলচ্চিত্রে পারিবারিক বন্ধনের নানাবিধ বিষয় বিচিত্রভাবে গীত এবং চিত্রিত হয়েছে। এ ধারণা অমূলক নয় যে, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে পারিবারিক বন্ধনে টানাপোড়েন তৈরি হয়। এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বজন হারানোর বেদনা পারিবারিক বন্ধনকে আরো বিশেষভাবে নাড়া দেয়। ফলে ক্রমশ এর পরিধি বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য হলো একত্রে বসবাস করার প্রবণতা। এক্ষেত্রে আড্ডা প্রিয় বাঙালি অন্যতম। বিভিন্নভাবে এর নমুনা লক্ষণীয়। পারিবারিক সম্পর্কের ভীত সমন্ধে ফেরদৌসী রহমানের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়–

> আব্বাসউদ্দিন সাহেবের বাবা মরহুম জাফর আলী আহম্মেদ ছিলেন কোচ বিহারের বাসিন্দা।...নানা উৎসব ও ছুটিছাটায় কলকাতা থেকে নিজেদের বাড়িতে আসতেন আব্বাসউদ্দিন সাহেব। মূল লক্ষ্য ছিল পিতার সাথে সাক্ষাৎ ও স্ত্রী পুত্র কন্যাদের নিয়ে দেশে বাড়িতে কয়েক দিন কাটানো।... আব্বা এলেই আমাদের কোচ বিহার শহরের বাড়িতে বেশ একটা জমজমাট গানের আসর বসে যেত। আব্বা গাইতেন, মা ও গাইতেন।...আমাদের বাগানটি সে সময়ে গানের ওই পারিবারিক জলসায় যেন ঝলমলে হয়ে উঠত।

উপরোক্ত এমন সাংগীতিক পরিবেশের চিত্রায়ণ সত্তর দশকের নারায়ণ ঘোষ মিতার *আলোর মিছিল* (১৯৭৪) চলচ্চিত্রেও লক্ষ করা যায় এবং এ চলচ্চিত্রে সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে ববিতার অভিনয়ে পরিবেশিত গান তার চিত্রবাহী–'এই পৃথিবীর 'পরে কত ফুল ফুটে আর ঝরে, সে কথা কি কোনদিন কখনো কারও মনে পড়ে।' তবে বক্ষ্যমাণ আলোচনায় লক্ষ করা যায়। সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনের অন্যতম রূপকার 'বাড়ি'। এই বাড়িকেই ঘিরে সমস্ত সম্পর্কের সূত্রপাত। এ সম্পর্কে বিদেশি গবেষক হেলি উসিকালার মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়–

> গ্রামীণ পরিবারের প্রাথমিক ঐক্যের সূত্র খুঁজেছি আমি। দেখলাম সেটা "বাড়ি" তবে আমাদের পশ্চিমের "হোম" ও আপনাদের "বাড়ি" এক নয়। আপনাদের দেশে বাড়ি পাড়া এবং সমাজ পরস্পরের সংলগ্ন। এ জন্যই বাড়ির গুরুত্ব কেবল বাড়ির মানুষের জন্য নয়। পাড়ার মানুষের জন্যও। বাংলাদেশ প্রধানত গ্রামীণ ও কৃষি প্রধান দেশ। শতকরা নব্বই জনের বাড়ি গ্রামে। সেখানে তাদের দাদা-দাদি, বাবা-মা, স্ত্রী, সন্তান রয়েছে। বিভিন্ন উৎসবকে উপলক্ষ্য করে শহর ছেড়ে গ্রামে যাওয়া এই যাত্রা শুধু পরিবারের সঙ্গে দেখা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং পাড়া প্রতিবেশী কিংবা সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে কুশল বিনিময়ের দিকটাও অধিক মাত্রায় লক্ষ্যণীয়।[৫৮]

বাঙালি সমাজে পারিবারিক জীবনে বন্ধনই হলো অমূল্য সম্পদ। বন্ধনের ঐক্যের সূত্র 'বাড়ি' এবং পরিবারে সকল বন্ধনের শীর্ষ বিন্দুতে অবস্থান করে 'মা'। মাকে ঘিরে সম্পর্কের জাল বিস্তার। মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোন, দেবর-ভাবি, নানি-নাতনি বিবিধ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পারিবারিক বন্ধন বিস্তার লাভ করে। এবং মাতৃভক্তি বা মাতৃবন্দনা, মাতৃত্ববোধ ইত্যাদির প্রকাশ নানা মাত্রিকতায় উপস্থাপিত। পারিবারিক বন্ধনের গান উল্লেখযোগ্য বিষয় এবং বন্ধনসমূহের মাধ্যমে নিম্নোক্তভাবে দেখানো যেতে পারে।

ক. মাতৃত্ববোধের গান
খ. মাতৃভক্তি বা মাতৃবন্দনার গান
গ. পারিবারিক বন্ধনে বিচ্ছেদের গান

ক. মাতৃত্ববোধের গান

মাতৃত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা পৃথিবীর সকল নারীর অন্তর জুড়ে বহমান। নারী হৃদয়ের এমন প্রতিচ্ছবির চিত্রায়ণ লক্ষ করা যায় সামাজিক কাহিনি নির্ভর সুভাষ দত্তের *আবির্ভাব* (১৯৬৮) চলচ্চিত্রে। দৃশ্যায়নে দেখা যায় স্বামী মাসুদকে (আজিম) অফিসে বিদায় দেয় স্ত্রী লুনা (শর্মিলী)। তারপর একাকী সময়ে মাতৃত্ববোধ জেগে উঠে তার। বিবাহ বার্ষিকীতে উপহার পাওয়া পুতুলটিকে নিয়ে লুনা নানা রকম কল্পনায় মেতে উঠে। পুতুলটি আসলে তার ভাবী সন্তানেরই প্রতীকী রূপ। তাই সে আবেগে আহ্লাদিত হয়ে ভেবে পাচ্ছে না তার পুতুলটিকে কোন রং-এ সাজাবে–

সাতটি রঙের মাঝে আমি মিল খুঁজে না পাই
জানি না সে কেমন করে কি দিয়ে সাজাই ॥

গানের বাণীতে প্রথম অন্তরায় ব্যক্ত হয়েছে–'সাদা রঙের জামা সেতো ভালো নয়, হলুদ না হয় নীলে কেমন জানি হয়।' গাজী মাজহারুল আনোয়ারের রচনায়, সত্য সাহার সুরে, আঞ্জুমান আরা বেগমের কণ্ঠে গানটি দর্শক মহলে বেশ সমাদৃত হয়েছে। এই চলচ্চিত্রের আরেকটি গান যা শিশুর প্রতি নারী হৃদয়ের স্নেহ-মমতারই বহিঃপ্রকাশ। নিম্নোক্ত গানটি পরিবেশনার আগ মুহূর্তে দেখা যায় মাসুদের (আজিম) স্ত্রী লুনা (শর্মিলী) বই পড়ছে। পাশে সিড়ির কাছে খেলা করছে গাড়িতে পাওয়া শিশুটি। মাসুদ মনে করেছিল যে, এই শিশুটির দিকে তাকিয়ে কিছুটা হলেও মা হতে না পারার কষ্ট লাঘব হবে তার স্ত্রী লুনার। কিন্তু সে চেষ্টা যখন সফল হচ্ছিল না। তখন মাসুদ খুব ভেঙ্গে পড়েছিল।

একদিন শিশুটি খেলতে গিয়ে হঠাৎ সিড়ি থেকে পড়ে যায়। আশে পাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে লুনার মনে মমত্ববোধ জেগে উঠে এবং শিশুটিকে কোলে নিয়ে আদর করে। আয়াকে ডেকে রাগান্বিত স্বরে বলে: 'কোথায় থাকো তোমরা? ছেলেটা পড়ে যেতো না! আয়া বলে: 'দুধ আনতে।' 'দাও' বলে দুধের বোতলটি নিয়ে শিশুটিকে খাওয়ায়। আবহসংগীতে বেজে উঠে পূর্বে ব্যবহৃত–'সাতটি রঙের মাঝে আমি মিল খুঁজে না পাই' গানটির সুর। যে সুর বেজে উঠেছিল একদিন তার মাতৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায়। এই দৃশ্য দেখে বাসার সকলের মনে আনন্দের জোয়ার নেমে আসে। শিশুটিকে দোলনায় শুইয়ে মাতৃস্নেহে নিম্নোক্ত গানটি গেয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করে সে।

অপরদিকে শিশুটির সত্যিকারের মা শাহানা (কবরী) তার সন্তানকে ফিরে পাওয়ার জন্যে দিশেহারা হয়ে খুঁজছে। যেখানে সমবেত স্বরে বলা হয়েছে–'আয়রে এক দুঃখিনী মায়ের অশ্রু ভরে যায়, নিষ্পাপ পথের ধূলায়, দীর্ঘ নিঃশ্বাস দেখে যা আয়রে আয়রে ফিরে আয়।' অন্যদিকে শিশুটির পিতা রাশেদ (রাজ্জাক) ভুল বোঝে একদিন শাহানাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল; সেও আজ ভুল বুঝতে পেরে তাকে খুঁজছে। এমনই এক পরিস্থিতিতে গানটি পরিবেশিত হয়। গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার সত্য সাহা, শিল্পী আঞ্জুমান আরা বেগমের কণ্ঠে শর্মিলী আহমেদ, রাজ্জাক এবং কবরীর অভিনয়ে পরিবেশিত হয়।

খান আতাউর রহমান পরিচালিত *জোয়ার ভাটা* (১৯৬৯) চলচ্চিত্রে মাতৃত্বকামনার অশেষ বেদনার গান। সন্তান জন্মদানে অক্ষমতার জন্য শাশুড়ি ছেলে রুস্তমকে (খান আতা) অন্যত্র বিয়ে দিতে চায়। তাই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে চায় রোজি। তার বোন এসে তাকে সান্ত্বনা দেয় এবং নিজের ছেলেকে দেখিয়ে বলে: 'আমার খোকারে না তুই প্যাটের ছেলের মতন দ্যাখস্ ? ওরে ছাইড়া মরতে পারবি? মনরে বুঝ দে। নে ধর।' এই বলে চার-পাঁচ বছরের খোকাকে রোজির কোলে দিয়ে বলে: 'দুপুর থিক্যা চেষ্টা করতেছি ঘুমই আসে না শয়তান।' রোজি খোকাকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করে। আঁচলের গিট থেকে আংটি বের করে খোকার হাতে পরিয়ে দিয়ে বলে: 'সুন্দর না?' খোকা বলে: 'হ সুন্দর' 'তাইলে এবার ঘুম আসো' খোকা বলে: 'তাইলে তুমি একটা গান গাও।' 'গান গামু ক্যামনে? আমার গলা যে কান্তে কান্তে ভাইঙ্গা গেছে।' 'তাইলে আমি ঘুম আসুম না।' আচ্ছা আসো' এই বলে রোজি খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে পায়চারী করে নিম্নোক্ত গানটি গেয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করে।

যে মায়েরে মা বলে কেউ ডাকে না
সে মায়ের বুকেরইকি আগুন কেউ তো জানে না রে মানিক ॥

গানটির গীতিকার ও সুরকার খান আতাউর রহমান, কণ্ঠশিল্পী নীলুফার ইয়াসমিন। একই আবেদনের গান নজরুল ইসলাম পরিচালিত *দর্পচূর্ণ* (১৯৭০) চলচ্চিত্রে সালেহার (আনোয়ারা) ভাবাবেগে পরিবেশিত হয়। গানের কিছু পূর্বে দেখা যায় স্ত্রী সালেহার আদর যত্নে মুগ্ধ হয়ে স্বামী ডা. অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী (আনোয়ার হোসেন) বলে: 'জানো সালেহা বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরগুলো শত অভাব অনটনে টিকে আছে কী জন্যে।' উত্তরে সালেহা বলে: 'অতশত বুঝিনা।' মতিন বলে: 'টিকে আছে তোমাদের মত ঘরনিদের জন্যে। এতো অভাব অনটনেও যাদের মুখে হাসি মুছে যায় না। কষ্টের মধ্যেও যারা সুখের জোয়ার ডেকে আনে।' সালেহার অনুশোচনা হয় এবং বলে: 'সুখ! তোমাকে তো আমি সুখ দিতে পারিনি। আমারই জন্যে তুমি সব হারিয়েছো।' ভালবেসে বিয়ে করার জন্যে পরিবার পরিজন থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। মতিন চৌধুরী বলে: 'সব হারালেও তুমি আছো। তাই আমি আছি। এটাই তো আমার সব চাইতে বড় সুখ।' সালেহা জানতে চায় ফিরছো কখন মতিন চৌধুরী বলে: 'রোগী পত্তর দেখতে দেখতে রাত দশটা বেজে যায়।' এরপর সালেহার একাকীত্ব নিয়ে ব্যথিত হয় এবং বলে: 'একা একা তোমার খুব কষ্ট হয় তাই না? সালেহা হাসিমুখে উত্তর দেয়: 'একা একা বেশি দিন নয়।' মতিন চৌধুরী বলে: 'মানে?' সালেহা বলে: 'আ-হা জানো না যেন?' মতিন

বলে: 'সত্যিই সালেহা যতই দিন ঘনিয়ে আসছে...।' সালেহা লজ্জা পেয়ে বলে: 'যাহ, চুপ।' মতিন বলে: 'যাই' সালেহা বলে: 'যেতে নেই, এসো।' উপরোক্ত স্বামী-স্ত্রীর সংলাপে পারিবারিক সুখের চিত্র অঙ্কিত হয়। স্বামী ডা.আব্দুল মতিন চৌধুরীকে বিদায় দিয়ে হারিকেনের আলো বাড়িয়ে দেয় সালেহা। তারপর সেলাই কাজ করে এবং একলা ঘরে আপন মনে গেয়ে চলে অন্তঃসত্ত্বা চিরায়ত বাঙালি নারীর মাতৃহৃদয়–

ভাবতে আমার লাগছে ভালো আপন মনে বসে
সোনা আমার জাদু আমার আসবে অবশেষে
মিষ্টি মধু মুখে দেবো দু'চোখ ভরে কাজল দেবো
কপাল জুড়ে চুমু দেবো ভাববো সোনার দেশে ॥

(ঘরে টাঙানো শিশুর ছবি হয়ে সালেহার অভার দি শোল্ডারের শট। কুল বালিশ নিয়ে তার উপর পুতুলের ঘুম পাড়ানি আদরের শট ধারণের মধ্য দিয়ে চিত্রায়িত হয়েছে)

কোলের মাঝে তুলে নেবো বুকটি আমার জুড়ে নেবো
আদর করে দোল দেবো ডাকবো ভালোবেসে
খোকন যখন বড় হবে ঘটা করে বিয়ে দেবো
বউটি হবে হলুদ বরণ চলবে হেসে হেসে ॥

গান শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে স্বামী ডা. আব্দুল মতিন চৌধুরী চুপি পায়ে স্ত্রী সালেহার ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ দেখে ফেলে। এক সময় টের পেয়ে ভীষণ লজ্জা পায় সালেহা। উপরন্তু গানটিতে উঠে এসেছে বাঙালি নারী হৃদয়ের শাশ্বত রূপ। তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা ঘরের কাজ করতো। শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর থাকার কারণে ঘর সামলানো এবং স্বামীর সেবাই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। বিয়ের পর স্বামী অফিসের কাজে ব্যস্ত হলে স্ত্রী ভীষণ একাকীত্ব অনুভব করতো। আর এই সময়টাতে তাদের মাতৃত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হতো। তারই রূপ বিধৃত হয়েছে গানটিতে। গানটির গীতিকার আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সুরকার সুবল দাস এবং কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন।

সুভাষ দত্ত পরিচালিত *সুতরাং* (১৯৬৪) চলচ্চিত্রে দেখা যায়, হাতে সেলাই করছে জরিনা (কবরী)। পাশে বসে আছে সাত/আট বছরের ভাইয়ের মেয়ে সালমা এবং তার বান্ধবী আমেনা। সালমা জিজ্ঞেস করে: 'এটা কি হবে রে বুবু'? উত্তরে ফুফু জরিনা বলে: 'তোর জব্বার ভাইকে (সুভাষ দত্ত) দেব। কেন দেবে? জরিনা বলে: 'আব্বা রাজি হয়েছে। (জব্বারের সঙ্গে বিয়ের জন্য সম্মতি জানিয়েছে তার বাবা) ও কাল শহরে যাচ্ছে চাকরি করতে। আমার কথা মনে রাখার জন্যে এটা দেব।' সালমা বলে: 'সত্যি বলছো ফুফু! কি মজা, কি মজা।' মজার সংবাদটি শুনে সালমা তার ফুফু এবং বান্ধবী আমেনার সামনে মনের আনন্দে নেচে নেচে গায় নিম্নোক্ত গানটি–

এমন মজা হয় না গায়ে সোনার গয়না
বুবু মণির বিয়ে হবে বাজবে কত বাজনা ॥

বান্ধবী আমেনাও মাথা নেড়ে নেড়ে গানে তাল দেয়। বিয়ের সংবাদে ফুফু এবং ভাইঝির মাঝে আনন্দময় মুহূর্ত তৈরি হয়; পারিবারিক জীবন সংসারে মধুর সম্পর্কের রূপবাহী। গীতিকার সৈয়দ শামসুল হক, সুরকার সত্য সাহা, নেপথ্য কণ্ঠে গেয়েছে শিশুশিল্পী আলেয়া শরাফী।

প্রতিটি নারী তার জীবনের পূর্ণতা খোঁজে মাতৃত্ব লাভের মধ্য দিয়ে। এই সাধ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অতৃপ্তে রয়ে যায় তার জীবন। আবার কোনো কোনো নারীর জীবনে এই সাধ পূর্ণ হওয়ার পেছনে এমন কিছু ঘটনা থাকে যা শেষ পর্যন্ত কলঙ্কের দিকে নিয়ে যায়। ভালবাসার প্রলোভনে কেউ যদি অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানের মা হয়। তাহলে সন্তান কামনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ম্লান হয়ে যায়। বরং সন্তানের পিতৃপরিচয়হীনতার কারণে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়। কলঙ্কের বোঝা মাথায় এসে পড়ে। এমনই এক ঘটনা দেখা যায় আজিজুর রহমানের *অমর প্রেম* (১৯৭৭) চলচ্চিত্রে। বাস অ্যাকসিডেন্ট করে রাস্তায় পড়েছিল মাসুম (রাজ্জাক) তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে সিমার (আনোয়ারা) মা (মায়া হাজারিকা)। নিজের ছেলে নেই একটি মাত্র কন্যা সন্তান সিমাকে নিয়ে তার সংসার। ছেলের শূন্যতা পূরণ করার আশায় সুস্থ করে মাসুমকে বাড়িতে নিয়ে যায়। অর্থশালী অনেক পতিপ্রত্তির মালিক মায়া হাজারিকা। তার বাগানের দেখভালের দায়িত্ব দেয় মাসুমকে। তার ভাইয়ের ছেলে মাহমুদ (গোলাম মোস্তাফা) বিয়ে করার প্রলোভনে সিমার সাথে সম্পর্ক করে, বিদেশ যাওয়া নাম করে উধাও, তার কোনো হদিস পাওয়া যায় না। মাহমুদের ঔরশজাত কন্যা সুমনের কথা জানিয়ে অনেক যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায় না।

সিমার কন্যা সুমনের পিতৃ পরিচয়ে সংকট তৈরি হয়। সমাজে পারিবারিক ঐতিহ্য, বংশ মর্যাদা রক্ষার জন্য সিমার মা (মায়া হাজারিকা) মাসুমকে পিতৃত্বের ভার নিতে করোজোড় অনুরোধ করে। বলে: 'চুপ করে রইলে কেন বাবা। আমি যে তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি। আমাকে করুণা করো। আমি চিরদিন তোমার কাছে ঋণী হয়ে রবো।' প্রথমে রাজি না হলেও তার বিশেষ অনুরোধ এবং অনুগ্রহের কথা ভেবে শিশু সন্তানের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়। সিমাও মায়ের এমন প্রস্তাবে লজ্জাবোধ করে। বলে: 'আমার লজ্জা আমারই থাক।' মাসুম ভুলের এ ফসলকে কোলে তুলে নেয় এবং সিমার আড়ষ্ঠতাকে সহজ করার জন্য বলে: 'আপনার লজ্জাকে সমানভাবে ভাগ করে নেব বলেই তো আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।' পিতৃপরিচয়ের সংকট দূর হলে সুমনের জন্মদিনকে ঘিরে সিমার মাতৃহৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে তার প্রকাশ–

আমার খুকু মনি পরির দেশের রানি
ফুল বলে তারা বলে সবাই তাকে চিনি ॥

বিয়ের কিছু দিন পর থেকেই মাতৃত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়। এমন বাসনার রূপায়ণ দেখা যায় আবদুল্লাহ আল মামুন পরিচালিত *এখনই সময়* (১৯৮০) চলচ্চিত্রে আবিদা সুলতানার কণ্ঠে এবং ববিতার অভিনয়ে পরিবেশিত নিম্নোক্ত গানটিতে। চলচ্চিত্রে দেখা যায় মেরি (ববিতা) তার স্বামী তালুকদারকে (আবদুল্লাহ আল মামুন) বলে: 'অনেকদিন আমরা কোথাও বেড়াতে যাই না। চলো না কোথাও বেড়াতে যাই।' দেখা যায় তারা পার্কে বেড়াতে গেছে। পার্কের দোলনায় শিশুদের আনন্দে দুলতে দেখে তার মাতৃত্ববোধ জেগে ওঠে এবং গানের মাধ্যমে সে রূপেরই প্রকাশ–

একটা দোলনা যদি কাছে পেতাম
তারে মনের মত করে সাজাতাম
মিষ্টি হাতে দুষ্টুমিতে স্বপ্নের দোলায় দোলাতাম ॥

মাতৃত্ববোধের আরেক রূপ লক্ষ করা যায় গ্রামীণ এবং শহরের পটভূমিতে নির্মিত মতিন রহমানের *লাল কাজল* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে। পাঁচ বছরের বৈবাহিক জীবনে নিয়ামত (প্রবীর মিত্র) এবং ফুলজান (শাবানা) নিঃসন্তান দম্পতি। সন্তানের মা না হওয়ার কারণে নিয়ামত তার মার কথায় ফুলজানকে তালাক দেয়। কিছুদিন পর ফুলজানের দ্বিতীয় বিয়ে হয় বাদশার (ফারুক) সাথে। এ সংসারেও তার শাশুড়ি (রওশন জামিল) যেদিন জানতে পারে প্রথম ঘরে তার সন্তান হয়নি। সেদিন থেকে এ সংসারেও তার ওপর নেমে আসে চরম অশান্তি। এখানেও একই পরিস্থিতির শিকার হয় ফুলজান। শাশুড়ি রওশন জামিল তার ছেলেকে (বাদশা) তালাক দিতে বলে। বাদশা তালাক না দিয়ে সে নিজেই একদিন গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে।

মা হারা ফুলজান বাড়িতে ফিরে গেলে জানতে পারে ছয়মাস আগে তার বাবা সেও চলে গেছে না ফেরার দেশে। এমতাবস্থায় উপায়ান্তর না পেয়ে বাল্য সই হুরজানের প্রস্তাবে রাজি হয়ে ঢাকায় চলে যায়। হুরজান সেখানে এক বড় লোকের বাসায় বুয়ার কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। ছোট্ট এক মেয়ে সন্তানকে লালন পালনই হলো তার কাজ। একদিন গোসল করিয়ে মেয়েটির গা মুছে দেয় ফুলজান। তারপর কপালে কাজলের টিপ এঁকে দেয় এবং তার মাতৃহৃদয় গেয়ে চলে আপন মনে–

নজর লাগব বলে
কাজলের টিপ দিয়া দিলাম মা
তোমারই এই কপালে ॥

চিত্র-৩৫: *লাল কাজল* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে 'নজর লাগব বলে'
গানের একটি স্থিরচিত্রে শাবানা।

চিরায়ত নারীর মাতৃত্ববোধ অর্থাৎ ফুলজানের মাতৃহৃদয় কিছুটা হলেও পশমিত হয় উপরোক্ত গানটি গাওয়ার মাধ্যমে। নিজে সন্তানদানে অক্ষম হলেও তার মাতৃহৃদয় অক্ষম নয় বরং সে তার কাজ করে যায় আপন মনে। উপরোক্ত গানটি সে কথারই প্রমাণ করে। গানটির গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার সত্য সাহা, কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন। মায়ের কোল সকল শিশুর জন্য উন্মুক্ত

এবং তার অন্যতম কারণ হলো নারীর মাতৃত্ববোধ। এমনই ভাবের প্রকাশ আজিম-এর *প্রতিনিধি* (১৯৭৬) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানে। যেখানে এতিম সন্তানেরা এক মায়ের হারানো সন্তানের শূন্যতা দূর করে দেয় এবং বেঁচে থাকার প্রেরণা খুঁজে পায় তাদের মাঝে।

মা (সুজাতা): সবাই বলো মা
সমবেতকণ্ঠে শিশু: মা
মা (সুজাতা): মায়ের দাম কি হয়
সমবেতকণ্ঠে শিশু: না
মা (সুজাতা): পৃথিবীতে মায়ের নেই তুলনা
মাগো তোমার নেই তুলনা ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় ভালবেসে বিয়ে করে কাইসার (রাজ্জাক) এবং শুচি (সুজাতা)। কাইসারকে বিয়ে করার কারণে শুচিকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় (সুজাতা) তার মা। দুজনে আশ্রয় নেয় কাইসারের বসের বাসায়। এক সময় অন্তঃসত্ত্বা হয় শুচি। বসও অসদাচরণ করে কৌশলে শুচির সাথে। ঘটনাচক্রে খুনের অপরাধে কাইসারকে জেলে যেতে হয়। এদিকে শুচির মার কাছেও ঠাঁই হয় না। আশ্রয় হয় তার এক এতিমখানার পরিচালকের কাছে। বাবার মত আগলে রাখে সে। এক সময় শুচি তার সন্তানটিকে হারিয়ে ফেলে। সব হারিয়ে আশাহত, নির্বাক নিশ্চল শুচি। কান্নাই তার জীবনের একমাত্র সঙ্গী। তখন তাকে বেঁচে থাকার জন্যে প্রাণ সঞ্চার করে সর্বজনীন এতিম খানার পরিচালক বলে: 'চেয়ে দেখ আমার এতিম খানার এই সন্তানদের প্রতি। এদের কি মা ছিল না ? এরা কি কোনো মায়ের সন্তান নয় ? কপালে যদি সুখ থাকে সেই সুখ তুই ফিরে পাবি মা। আমি দোয়া করছি মা। আমার এতিম খানার সন্তানদের নিজের সন্তান ভেবে নে মা। ওদের আশ্রয় দে, ওদের স্নেহ দে, ওদের মা হ।' তারপর শুচির কানে এতিম খানার সন্তানদের ডাক ভেসে আসে যেন। এগিয়ে যায় সে ধীরে ধীরে তার মাতৃহৃদয় জেগে ওঠে এবং উপরোক্ত গানটি সকলে মিলে গায়।

খ. মাতৃভক্তি বা মাতৃবন্দনার গান

চলচ্চিত্রে পারিবারিক গানের বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে 'মা' তাকে ঘিরে সব রকম সুখ-দুঃখ আনন্দ আহলাদের প্রকাশ এবং স্বাধীনতাত্তোর চলচ্চিত্রে এর বিস্তার আরো বেশি লক্ষ করা যায়। কণ্ঠশিল্পী খুরশীদ আলমের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় এ পর্যন্ত তিনি ৪৩৫ টি চলচ্চিত্রে প্রায় আড়াই হাজার গান গেয়েছেন। তারমধ্যে শুধু মাকে নিয়েই গেয়েছেন ২৫ টি গান।[৫৭] মায়ের প্রতি মর্যাদার নানাবিধ প্রকাশ ভঙ্গি রয়েছে এবং নির্মিত হয়েছে *ধর্ম আমার মা* (১৯৮৬) *মায়ের দাবী* (১৯৮৬) প্রভৃতি চলচ্চিত্র এবং এমন অনেক চলচ্চিত্র রয়েছে যার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'মা'-এর ভালবাসা, সুখ-দুঃখের কথকতা। নিম্নরূপ তালিকার মাধ্যমে দেখানো হলো:

সারণি-৬

ক্রম	চলচ্চিত্র	পরিচালক	মুক্তি কাল
১.	বধূ মাতা কন্যা	আলি কওসার	১৯৭৩
২.	মা	বাবুল চৌধুরী	১৯৭৭

৩.	ছোট মা	তমিজ উদ্দিন রিজভী	১৯৭৯
৪.	মা ও মেয়ে	গোলাম নবী	১৯৮১
৫.	সৎ মা	অগ্রগামী	১৯৮২
৬.	বড় মা	দেলোয়ার হোসেন দুলাল	১৯৮৩
৭.	মা ও ছেলে	কামাল আহমেদ	১৯৮৫
৮.	মায়ের দাবী	আওকাত হোসেন	১৯৮৬
৯.	ধর্ম আমার মা	দেওয়ান নজরুল	১৯৮৬

দিলীপ বিশ্বাস পরিচালিত *সমাধি* (১৯৭৬) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানে মায়ের প্রতি সন্তানের চরম ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়; মাকে পরম আনন্দ আহলাদে বন্ধুর মত তুই বলে সম্বোধন করা হয়। দুই ছেলে তার মাকে ঘিরে ভালবাসার চিত্র এঁকেছে নিম্নরূপভাবে−

মা গো মা ও গো মা
আমারে বানাইলি তুই দিওয়ানা
আমি দুনিয়া ছাড়ি যেতে পারি
তোকে আমি ছাড়ব না ॥

মায়ের কাছে সন্তান যেমন তার প্রাণ সমতুল্য, সন্তানের কাছেও মা ছাড়া পৃথিবী মিছে, অচল। গানেও ব্যক্ত হয়েছে−'দুনিয়া ছাড়ি যেতে পারি তোকে আমি ছাড়ব না।' গানটি গাজী মাজহারুল আনোয়ারের কথায়, সত্য সাহার সুরে, কণ্ঠশিল্পী খুরশীদ আলম। বাঙালি সমাজে মায়ের প্রতি সন্তানের অগাধ শ্রদ্ধা-ভক্তি, ভালবাসা এতোটাই প্রবল যে, প্রতিটি মুহূর্তে সন্তানের অস্তিত্ব নিরূপণে মা'র কথাই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। গানেও তা দৃষ্ট হয়, যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে মায়ের অবদান কর্তব্যপরায়ণ, নিষ্ঠা প্রভৃতি যখন গভীর উপলব্ধিতে নাড়া দেয় তখন সন্তান আপন মনে গেয়ে ওঠে নিম্নোক্তভাবে−

হীরা: মাগো তোর চরণ তলে বেহেশত আমার
ইমরান: মাগো তুই খোদাতালার সেরা উপহার ॥

চিত্র-৩৬: *মতিমহল (১৯৭৭)* চলচ্চিত্রে 'মাগো তোর চরণ তলে বেহেশত আমার' গানের একটি স্থিরচিত্রে রাজ্জাক, মিনারা জামান ও মাহমুদকলি।

উপরোক্ত গানটি অশোক ঘোষ পরিচালিত *মতিমহল (১৯৭৭)* চলচ্চিত্রে খুরশীদ আলমের কণ্ঠে মিনারা জামানের বিপরীতে রাজ্জাক এবং মাহমুদ কলির অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় মিথ্যে নারী ধর্ষণ অতঃপর তাকে হত্যার দায়ে ইমরানের (রাজ্জাক) সৎ মা অর্থাৎ রানি মা তাকে মতিমহল থেকে বেরে করে দেয়। হাসিনার আসল হত্যাকারী কে তা জানে হাসিনার মা এবং ভাই হীরা (মাহমুদ কলি)। চারিদিকে ইমরানের সুনাম থাকা সত্ত্বেও এমন কঠিন পরিস্থিতির শিকারে তারা ভীষণ মর্মাহত হয় এবং ইমরানের মনে বেঁচে থাকার আশা সঞ্চার করে; আপন ভাই এবং মায়ের মত করে। হীরার মার কাছ থেকে আদর, স্নেহ ভালবাসা এবং দিকনির্দেশা পেয়ে মাতৃহারা ইমরানের মায়ের শূন্যতা দূর হয়ে যেন। মা মা বলে ডাকে তাকে। তা প্রকাশ পায় গানটিতেও। মায়ের হাসির যে মূল্য বা শক্তি তার স্বরূপ উৎঘাটনে বলা হয়–'মরা গাছে ফুল ফোটে মাগো তুই হাসলে।' আবার এর বিপরীতে বলা হয়েছে–'দুনিয়া বিরান লাগে মাগো তুই কাঁদলে।' প্রমোদকার গোষ্ঠীর পরিচালনায় *দিন যায় কথা থাকে* (১৯৭৯) চলচ্চিত্রে যথাক্রমে রুমানা ইসলাম এবং সুবীর নন্দীর কণ্ঠেও নিম্নোক্ত মাতৃবন্দনার গান–

মায়ের মতন আপন কেহ নাই
মা জননী নাই রে যাহার
ত্রিভুবনে তাহার কেহ নাই রে ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় শহর থেকে গ্রামে বাবার সাথে বেড়াতে আসে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী রিতা। একই গ্রামের খেটে খাওয়া দরিদ্র পরিবারের বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান খোকা তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে। টাকার অভাবে আর স্কুলে যাওয়া হয়নি। সারাদিন নৌকা করে মাছ ধরে দিন কাটে তার। রিতার শখ হয় খোকার সাথে নৌকা করে ঘুরে বেড়াবার। বাবার কাছে অনুমতি নিয়ে খোকার সাথে নৌকায় ঘুরতে যায়। দুজনের মাঝে পাখি নিয়ে কথা হয়। রিতা পাখি খুব পছন্দ করে। খোকাকে পাখি ধরে দেয়ার কথা বললে সে তার মায়ের প্রসঙ্গ টেনে বলে: 'মায় কয় বনের পাখিরে খাচার বন্দি করলে ও কষ্ট পায়।' এই কথা শুনে রিতা বলে: 'তোমার মা তোমাকে খুব আদর করে তাই না খোকা ভাই?' খোকা বলে: 'হ, আপনার মা আপনারে আদর করে না?' রিতা বলে: 'না' খোকা এর কারণ জানতে চাইলে রিতা বলে: 'আমার যে সৎ মা।' খোকা বলে: 'আমার আপন মা' তারপর বলে: 'সে বারে যাত্রায় একটা খুব সুন্দর মায়ের গান অইছিল। তুমি জানো? রিতা বলে: 'হ গাও না।' খোকা নৌকা বেয়ে উপরোক্ত গানটি গেয়ে শোনায় রিতাকে।

সত্যিকার অর্থে মা ছাড়া দুনিয়া বড় নিদারুণ, কঠিন। এটা রিতার জীবনে যেমন তেমনি এই কথাটি সবর্ত্র বিরাজমান 'মা নাই যার দুনিয়াতে কিছু নাই তার'। পৃথিবীতে একমাত্র 'মা' সন্তানের চরম সুখ-দুঃখের সাথী। রাজ্জাক পরিচালিত *চাপা ডাঙার বউ* (১৯৮৬) চলচ্চিত্রে বাপ্পারাজের অভিনয়ে সে কথাই ধ্বনিত হয়। মায়ের কাছে তার দুঃখ বেদনার বয়ান এভাবে প্রতিফলিত হয়–'মা আমার সাধ না মিটিল, আশা না ফুরিল, সকলই ফুরায়ে যায় মা।'

মায়ের পাশাপাশি ভাই-বোনের সম্পর্কেরও মধুর চিত্রায়ণ রয়েছে। সুভাষ দত্ত পরিচালিত *সবুজ সাথী* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে ভাই-বোনের খুনশুটি শাবানা এবং জসিমের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়; তারই চিত্র লক্ষ করা যায়। বোন তার ভাইকে বলে–'চোখ জুড়ানো মনের মত ভাবি এনে দাও, ও আমার

ভাইয়ারে, উত্তরে ভাইটি বলে–'আমার কথা ভাবিস নারে বিয়ে দেব আগে তোরে' যেদিন যাবি স্বামীর ঘরে, ভাইয়ার কথা ভুলিস নারে।' দ্বিতীয় অন্তরায় ভাইটি বলে–'শাশুড়িকে করলে আপন মায়ের দুঃখ ভুলবি তখন।' বোনটি ভাইকে উত্তরে বলে: 'ভাবি না এলে পরে যাব না পরের ঘরে।' গানে গানে ভাই-বোনের মধ্যে পারবারিক সুখের চিত্র নির্মিত হয়; যেখানে ভাই-বোন একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করে। গানটির কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন ও খুরশীদ আলম। অনুরূপ চিত্রের প্রকাশ নূর হোসেন বলাই-এর *সিকান্দার* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রেও দেখা যায়। 'ল তে লক্ষ্মী বতে বোন, আলোরে তুই আমার একটি কথা শোন, গানটিতে। গীতিকার ও সুরকার আলাউদ্দিন আলী, কণ্ঠশিল্পী সৈয়দ আবদুল হাদী, ফারুকের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। দিলীপ বিশ্বাসের *অস্বীকার* (১৯৮৫) চলচ্চিত্রে বুবুর প্রতি এক ভাইয়ের ভালবাসা মূর্ত হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় ভাই তার বোনের সামনে খাবার তুলে ধরে খাইয়ে দেয়ার জন্যে। বোন তখন বলে: 'ওরে দুষ্টু বিদেশ যখন যাবি তখন কে খাওয়াবে?' গানের মাধ্যমে জবাব দেয় তার ভাই–'বুবু আমার বুবু জান, তুই যে আমার প্রাণের প্রাণ, বোন হয়েও তুই যে আমার মায়েরই সমান।' পারিবারিক সমাজে বড় বোন, ছোট ভাই-বোনের কাছে মায়ের সমতুল্য। শাবানার বিপরীতে ইমরানের অভিনয়ে পরিবেশিত গানটি সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। গীতকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার সত্য সাহা।

বোন-ভাই, কিংবা ভাই-বোনের স্নেহ ভালবাসা প্রকাশের পাশাপাশি দুই বোনের ক্ষেত্রেও রয়েছে একে অপরের প্রতি ভালবাসার চিত্র। আমজাদ হোসেনের *দুই পয়সার আলতা* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে দেখা যায় অনেকদিন পর শহর থেকে ঝরনা (নূতন) আসে তার গ্রামের বাড়িতে। শহরে থেকে সে লেখাপড়া করে। বাড়িতে এসে পিতৃহীন চাচাত বোন কুসুমের (শাবানা) চেহারা দেখে সে অবাক হয়।

মাকে বলে: 'মা কুসুমের এ কী অবস্থা হয়েছে? চাচা-চাচি নাই বলে তোমরা ওকে দিয়ে বাড়ির কাজ করাচ্ছো।' কুসুমের উপর তার মায়ের অবিচার, অত্যাচার বুঝতে পেরে সে ভীষণ রাগান্বিত হয়। সে এর প্রতিবাদ করে। কুসুমের প্রতি তার ভালবাসা বেড়ে যায়। নানা সাজে সাজিয়ে তার বুবুকে পায়ে আলতা পরিয়ে দেয়। শহর থেকে আনা ক্যামেরা দিয়ে তার নানা ভঙ্গিমার ছবি তোলে। সুন্দর বোনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আর বলে: 'ইস্ তোর চেহারাটা যদি আমার হইতো। লজ্জা পেয়ে কুসুম মুখ সরিয়ে নেয়। এক সময় গানে গানে আনন্দানুভূতি প্রকাশ করে নিম্নরূপভাবে–

নূতন: আঙ্গুল কেটে আলতা করে
ইচ্ছে করে সাজাই তোরে
হয় না এমন তোর মত বোন
সবারই ঘরে
শাবানা: এত বেশি তুই বলিস না আর
পূর্ণিমার চাঁদ তুই আমি আঁধার ॥

চিত্র-৩৭: *দুই পয়সার আলতা* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে 'আঙ্গুল কেটে আলতা করে '
গানের একটি স্থিরচিত্রে নূতন ও শাবানা।

গীতিকার আমজাদ হোসেন, সুরকার আলাউদ্দিন আলী, কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন। আমজাদ হোসেনের *দুই পয়সার আলতা* (১৯৮২) চলচ্চিত্রে লাল চাচির (আনোয়ারা) অভিনয়ে পরিবেশিত নিম্নোক্ত গানটিতে মাতৃত্ববোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিয়ের পর মা হারা ছোট্ট ভাসুরের মেয়ে কুসুমকে (শাবানা) বউয়ের সাজে সাজিয়ে লাল চাচি তার মনের অনুভূতি প্রকাশ করে এভাবে–

আমি হব পর যেদিন আসবে রে তোর বর
আমার এ ঘর শূন্য করে যাবি অন্য ঘর
ওরে পাষাণী আমার চোখেরও পানি
আঁচল দিয়ে মুছে দিয়ে যাস মামনি ॥

উপরোক্ত গানটিতে মাতৃহারা সন্তানের প্রতি সদ্য বিবাহিত জীবনে চাচির মাতৃত্ববোধ জেগে ওঠে যেন। শত দুঃখ, কষ্টের পরও সন্তানের প্রতি মায়ের আদর, ভালবাসা কোনদিন ম্লান হয় না। তা ব্যক্ত হয় উক্ত গানেও–'ওরে মায়ের আদর থাকে জীবন ভর, সন্তানেরা দুঃখ দিলে হয় না মলিন।' বড় বোনের বিয়ের সংবাদে ছোট বোন খুশিতে আধখানা; মোস্তফা আনোয়ার-এর *আঁখি মিলন* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে দুই বোনের মনের আনন্দে তারই প্রকাশ। তাদের মধুর আলাপন গানে ব্যক্ত হয়; ছোট বোন তার বড় বোনকে বলে–

সুচরিতা: শোন রে বুবু শোন তুই আমার কথা শোন
মধুপুরের ঐ নয়ন, চোখে চোখে চেয়ে তোর কেড়ে নিল মন কেড়ে নিল মন
বোনের জবাব
রানি: না না রে বোন না, ওরে অত সস্তা না, ও তুই আমার কথা শোন,
সখীপুরের রানির মন হাটে বিকায় না, হাটে বিকায় না ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় মধুপুরের নয়ন (প্রবীর মিত্র) তার চাচার জন্য ওষুধ নিতে আসে সখীপুরের ডাক্তার হেকমত আলীর বাড়িতে। হেকমত আলী তাকে ওষুধ খাওয়ার নিয়ম বুঝিয়ে দেয়। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তার স্ত্রী অর্থাৎ রানির মা খেয়ে যেতে বলে কিন্তু নয়ন তার চাচার অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে দ্রুত চলে যায়। রানির বাবা-মার সামনে দিয়ে নয়ন বের হওয়ার সময় রানির বাবা এবং মা

দুজনেই নয়নের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তারা তার মেয়ের জন্য এমনই একজন পাত্র চেয়েছিল বলে ভীষণ খুশি হয়। হেকমত আলী তার স্ত্রী অর্থাৎ রানির মাকে কনুই দিয়ে খোচা মেরে বলে: 'কী এখন স্বীকার করো আমার পছন্দ আছে?' আঁখির মা বলে: 'সত্যি ছেলেটাকে দেখে মনে হলো ও যেন আমারই সন্তান।' হেকমত আলী তার স্ত্রীর কথায় হাসতে থাকে। দেরি না করে তাড়াতাড়ি বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

অপর দিকে আঁখি (সুচরিতা) ও তার বড় বোন (রানি) নয়নকে নিয়ে রসিকতা করে। নয়ন তার বাড়ির দিকে রওয়ানা হলে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে আঁখি এবং রানি। কাছাকাছি এলে আঁখি দুষ্টুমির আশ্রয় নেয়। কৌশল করে নয়নের বুকে ধাক্কা লাগিয়ে তার বোন রানিকে ফেলে দেয়। নয়ন তাকে তুলে ধরে। চোখে চোখ পড়ে। সরে না। দূরে দাঁড়িয়ে আঁখি মিট মিট করে হাসে। নয়ন বলে: 'কোথাও লাগেনি তো? রানি লজ্জায় নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করে এবং বলে: 'না না। নয়ন বলে: 'না বললেই হলো?' নিশ্চয় লেগেছে। দেখি দেখি হাতটা দেখি। হাত ধরতেই আঁখি ছি ছি বলতে বলতে এগিয়ে আসে। বলে: 'দিনে দুপুরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব কি হচ্ছে?' নয়ন ইতস্ততবোধ করে বলে: 'না না মানে।' আঁখি বলে: 'না মানে? দেখাচ্ছি মজা।' তারপর জোরে জোরে তার বাবাকে ডাকতে থাকে। নয়ন লজ্জা আর লোকভয়ে দৌড়ে পালায়। হাসিতে ফেটে পড়ে দুজন। এরপর বড় বোনকে ঘিরে আঁখির দুষ্টুমির মাত্রা আরো বেড়ে যায় এবং উপরোক্ত গানটির মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়।

পারিবারিক জীবনে আরেকটি মধুর সম্পর্ক রয়েছে যার কাছেও একান্ত মনের কথাগুলো প্রকাশ করা যায়। সে হলো নানি এবং নাতনি। আমজাদ হোসেনের *নয়নমণি* (১৯৭৬) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি রওশন জামিল এবং ববিতার নানি-নাতিনের অভিনয়ে পরিবেশিত তেমনই একটি গান; যে গানে বাঙালি সমাজে নানি-নাতনির মাঝে চিরায়ত মধুর সম্পর্কের একটি বিশেষ রূপ বিধৃত হয়–

নানি গো নানি বলি যে আমি
আমারে নি লইয়া যাইবা ভাই সাহেবের বাড়ি ॥

চলচ্চিত্রে নানি যখন তার নাতনির কাছে 'ভাইসাব' প্রসঙ্গ নিয়ে কাছে ডাকে ঠিক তখনই নাতনির মনে চঞ্চলতা শুরু হয় তা যেন দীর্ঘদিনের লালিত কোন বিষয় যা নানা রকম হাস্যরসের দ্যোতনা তৈরি করে। তা ব্যক্ত হয় গানের বাণীতে যেখানে নাতনিকে বলা হয়েছে–'ভাইসাব আমার আন্ধার রাইতের পুণ্যি মাইসার চান' আবার বলা হয়–'ভাইসাব যদি ভ্রমর হইতো, ফুলে বইসা মধু খাইতো, খাঁটি এমন পদ্ম মধু আরতো পাইব না।' আবার হতাশার সুরে আরো বলা হয়–'হায়রে এমন মধু ঝইরা গেলো ভাইসাব আইল না।' গানের দ্বিতীয় অন্তরাতেও যৌবনবতী হয়ে উঠা এবং প্রেম প্রসঙ্গ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যখন বলা হয়–'ভাইসাব আমার নয়নমণি, ভাইসার আমার প্রেমের খনি, তারে বিনে এই যৌবনে জোয়ার আসেনা।' গানটি ঢোলের প্রবল ছন্দে-তালে শুরু হয়। এই ছন্দ-তালের যে সূচনা তা যেন নাতনির মনের চঞ্চলতারই বহিঃপ্রকাশ। গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নানা রূপ ওঠে এসেছে। বাঁশের সাকো, বট বৃক্ষের ডালা ঝাপটানো শাখা-প্রশাখা ইতাদি চিত্রায়ণের মাধ্যমে।

গীতিকার আমজাদ হোসেন, সুরকার আলাউদ্দিন আলী। পারিবারিক বন্ধনের উল্লেখযোগ্য গানের একটি তালিকা নিম্নরূপভাবে দেখানো হলো।

সারণি–৭

ক্রম	গানের শিরোনাম	চলচ্চিত্র ও পরিচালক	বিষয় ও সম্পর্ক
১.	এমন মজা হয় না গায়ে সোনার গয়না	*সুতরাং* (১৯৬৪) সুভাষ দত্ত	ফুফু ও ভাইঝি
২.	আমরা এক বোন দুটি ভাই অরুণ বরুণ কিরণ মালা	*অরুণ বরুণ কিরণ মালা* (১৯৬৮) খান আতাউর রহমান	ভাই-বোন
৩.	ভাবি যেন লাজুক লতা ছলাকলা	*আবির্ভাব* (১৯৬৮) সুভাষ দত্ত	ভাবি/দেবর
৪.	আমার জাদু লক্ষ্মী দাদু ঘুম আয় রে	*দীপ নেভে নাই* (১৯৭০) নারায়ণ ঘোষ মিতা	দাদু
৫.	আমার ছোট্ট ভাইটি মায়ায় ভরা মুখটি	*বাবলু* (১৯৭০) মুস্তাফিজ	ভাই/বোন
৬.	মা গো মা ওগো মা আমারে বানাইলি তুই দিওয়ানা	*সমাধি* (১৯৭৬) দিলীপ বিশ্বাস	ছেলে- মা
৭.	নানি গো নানি বলি যে আমি আমারে নি লইয়া যাইবা ভাই সাবের বাড়ি	*নয়ন মনি* (১৯৭৬) আমজাদ হোসেন	নাতনি-নানি
৮.	মাগো তোর চরণতলে বেহেশত আমার	*মতিমহল* (১৯৭৭) অশোক ঘোষ	মাতৃভক্তি
৯.	মায়ের মত আপন কেহ নাই রে	*দিন যায় কথা থাকে* (১৯৭৯) প্রমোদকার গোষ্ঠী	মাতৃভক্তি
১০.	আমার বউ কেন কথা কয়না	*লাল কাজল* (১৯৮২) মতিন রহমান	স্বামী-স্ত্রী
	ভাইটি আমার তুমি কেঁদোনা	*দূরদেশ* (১৯৮৩)	ভাই-বোন
১১.	ল তে লক্ষ্মী ব তে বোন আলোরে তুই শোন আমার একটি কথা শোন	*সিকান্দার* (১৯৮৩) নুর হোসেন বলাই	ভাই-বোন
১২.	মা আমার সাধনা মিটিল আশানা ফুরিল	*চাপা ডাঙ্গার বউ* (১৯৮৬)রাজ্জাক	মা-ছেলে

১৩.	ভাইয়া তোমার বর আমি যে দেবর	*সৎ ভাই* (১৯৮৫) রাজ্জাক	দেবর-ভাবী

পারিবারিক জীবনে আরেকটি সম্পর্ক দেবর-ভাবি। যে সম্পর্কটিকে ঘিরে নানা গুঞ্জন যেমন রয়েছে। অনুরূপভাবে মধুর গল্পেরও দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। আবদুল লতিফ বাচ্চুর *যাদুর বাঁশি* (১৯৭৭) চলচ্চিত্রে দেবর-ভাবির খুনশুটির তেমনই একটি চিত্রের প্রকাশ। চলচ্চিত্রে দেখা যায় দরিয়ার পাড়ে জাদু কাকে যেন খুঁজছে। পরনে শার্ট, লুঙ্গি আর গলায় গামছা। জাদুর মন যাচাই করার জন্য তার ভাবি একটু কৌশলের আশ্রয় নেয়। চুপি পায়ে লুকিয়ে লুকিয়ে জাদুর পিছু নেয় এবং আচমকা ভয় দেখানোর অভিনয় করে বলে: 'আসে নাই।' জাদু উত্তরে বলে: 'না না আমি পাখিরে খুঁজতেছি না।' ভাবি বলে: 'হুম চোরের মন ক্ষিরাই খেতে। এই সব খোঁজাখুঁজি ছাড়।' এরপর পাখিকে নিয়ে নানা নেতিবাচক কথা বলে তার ভাবি এবং তা আসলে জাদুর মন যাচাই করার জন্যই বলে: 'মাইয়াটা খুব সুবিধার না।' ক্যামন জানি দেমাইক্যা। মাথায় চুল নাই। চোখ দুইডাও ছোড ছোড। আমার মনে হয় সোয়ামিরে বহুত জ্বালাইবো।' জাদু বলে: 'হুম এইডা আমি বুঝুম।' এই কথা বলতেই দেবরের কান ধরে ভাবি বলে: 'হুম তুই বুঝবি?' তারপর শুরু হয় দেবর-ভাবির নিম্নোক্ত গান–

সাধের দেওরা তুই হইলি কবে পাকা শেয়ানা
কাঁচা বয়সে কার পরশে
হইলি কবে বলরে সোনা এত দিওয়ানা ॥

উপরোক্ত কথপোকথন থেকে ভাবি-দেবরের সম্পর্ক নির্মিত হয়। যেখানে খুনশুটির পরেও দায়িত্বের কথা প্রকাশ পায়। এক সময় মায়ের পরে বড় ভাবির স্থান ছিল। মায়ের অকাল মৃত্যুতে সন্তানের লালন পালন ভাবির কাঁধে এসে পড়ত। সময়ের আবর্তনে তা এখন বদলে গেছে। এ গানেও সে কথার নমুনা ব্যক্ত হয়েছে। দেবর বড় হয়ে উঠছে তাই ভাবির মনে দুশ্চিন্তার প্রকাশ: 'দেওরা আমার হইছে জোয়ান, ডরে আমার কাঁপে পরান, নয়া যৌবন হায়রে শরম, মানে না সে কোন ধরন, সব জায়গাতে করিস না তুই এত আনাগোনা।' গীতিকার আহমদ জামান চৌধুরী, সুরকার আজাদ রহমান, নেপথ্যকণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লা, অলিভিয়ার অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। রাজ্জাক পরিচালিত *সৎ ভাই* (১৯৮৫) চলচ্চিত্রে নতুন ভাবির আগমনে দেবর তার আনন্দের প্রকাশ করে নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে। দেবর-ভাবির দুষ্টুমির নানা রূপে আনন্দমুখর পরিবেশ তৈরি হয় গানে গানে–

ভাইয়া তোমার বর আমি যে দেবর
ভেবে দেখ ভাবি কার বেশি দাবী
কারে তুমি করবে আপন করবে কারে পর ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় বড় ভাই-ভাবির (রাজ্জাক-নূতন) বাসর রাতের পর সকালে নতুন ভাবির সঙ্গে দেবর দুষ্টুমির ছলে মিষ্টি মধুরালাপের দারুণ পরিবেশ তৈরি করে। দেবর বেলাল (আলী রাজ) তার ভাবিকে বলে: 'জানালার কাছে একটু কান পেতেছিলাম।' নূতন লজ্জায় দাঁত কাটে। ভাবির

লাজ্জামাখা মুখ দেখে বলে: 'ইস্‌রে আমার লাজুক লতা ভাবি। শোনো শুধু ভাইয়ার কন্ডিশন মানলে চলবে না। আমারও কিছু কন্ডিশন আছে। এ বাড়িতে যা কিছু আছে সব আমাদের দু'ভাইয়ের সমান সমান। এ বাড়িতে একটাই মা আছে। সে আমারও মা, ভাইয়ারও মা। একটাই বাবা আছে সে আমারও বাবা, ভাইয়ারও বাবা। এখন এ বাড়িতে একটাই বউ এসেছে সে যেমন ভাইয়ারও...' বলতেই 'অসভ্য বদমাস বলে দেবরকে কান মলে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। দেবর বলে–'আরে রে রে রে ও লজ্জাবতী ভাবি শোনো শোনো বলে উপরোক্ত গানটি শুরু করে।

গ. পারিবারিক বিচ্ছেদের গান

পারিবারিক বন্ধনে যেমন সুখের গল্প রয়েছে তেমনি ভাঙ্গনের ভয়ঙ্কর ধ্বনিও আছে। প্রমোদকার নির্মিত *সুজন সখী* চলচ্চিত্রে (১৯৭৫) তারই চিত্র লক্ষ করা যায়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় দাদি (রওশন জামিল) তার ছোট্ট নাতি সুজনকে জানালা দিয়ে ইশারায় ডাকে। ঘুমন্ত বাবা-মার কাছ থেকে সুজন চুপিচুপি দাদির কাছে ছুটে আসে। দাদি আদরে আহলাদে চটজলদি কোলে তুলে নিয়ে বলে: 'আমার কলজার টুকরা আসছো আমার বুকে ? চলো ঘুমাই গা।' সুজন বলে: 'দাদি কিচ্ছা শুনাইবা না? তারপর টিনের ঘরের সাথিরে টাঙানো একটি বোর্ডে লেখা দেখা যায়–'ভাই বড় ধন রক্তের বাঁধনে, যদিও পৃথক হয় নারীর কারণে'লেখাটি ক্লোজ থেকে জুম আউট হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা দাদি-নাতির উপর মিড শটে এসে স্থির হয়। দাদি তার নাতিকে আগলে রেখে নিম্নোক্ত গানটি গেয়ে শোনায়–

আগুন জ্বলেরে নিভানোর মানুষ নাই
কাইজার বেলায় আছে মানুষ মিলের বেলায় নাই ॥

এ গানটি চলচ্চিত্রে বেশ কয়েকবার বেজে উঠতে শোনা যায়। বিশ বছর পর হঠাৎ সুজনের (ফারুক) সাথে দাদির যেদিন দেখা হয় সেদিনও গানটি বেজে ওঠে। দুই ভাইয়ের মধ্যে দীর্ঘ বিরোধ লক্ষ করা যায় তার পেছনে সুজনের মা দায়ী বলে প্রতীয়মান হয়। চলচ্চিত্রের শুরুর দিকে লেখাটির মাধ্যমে অবশ্য তার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। এছাড়া কাহিনির শেষেও দেখা যায় সুজনের বাবা তার মাকে ছাতা দিয়ে মারদোর করে এবং সুজনের দাদির পা ধরে ক্ষমা চাওয়ার মধ্য দিয়েও তা স্পষ্ট হয়। এছাড়া এ ছবির আরেকটি গান–

ও কি ও নিদয়া বিধিবাম হইলিরে
কোন দোষে হিয়ায় হিয়ায় জোড়া না দিলিরে ॥

এই গানটি বহুল জনপ্রিয় 'ও কি ও বন্ধু কাজল ভ্রমরারে' ভাওয়াইয়া গানের সুরের আদলেই রচিত এবং এ গানটিতেও পারিবারিক বিচ্ছেদের সুর ধ্বনিত হয়। গানটির গীতিকার খান আতা, কণ্ঠশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়।[৬০] চলচ্চিত্রে দেখা যায় সখীর (কবরী) বাবা (খান আতা) এবং সুজনের বাবা সম্পর্কে দুই ভাই। কিন্তু দুজনের মধ্যে চরম; বিরোধ বিশ বছরেও তা শিথিল হয়নি। ইতোমধ্যে সুজন এবং সখী বড় হয়েছে এবং মনের অজান্তেই তারা একে অপরকে ভালোবাসে। বিরোধ থাকা সত্ত্বেও মায়ের (রওশন জামিল) বিশেষ অনুরোধে সুজন (ফারুক) এবং সখীর ভালবাসার দিকে তাকিয়ে বড় ভাইয়ের বাড়িতে বড় মুখ করে মিষ্টি নিয়ে যায় সখীর বাবা। দুজনের ভালবাসার যেন বিবাহের

মাধ্যমে পরিণতি পায় এবং দুটি পরিবারের মধ্যেকার সম্পর্ক যেন পুনরুদ্ধার হয় সেই আশায়। কিন্তু সেখানে সে আগের মতই চরম অপমানের শিকার হয়ে ফিরে আসে সখীর বাবা।

সুজনকে সখীর সাথে মিশতে মানা করে দেয়। সখীর বাবার বড় শঙ্কা তার স্ত্রী অর্থাৎ সখীর মাকে যেভাবে ওরা নির্যাতন করে মেরে ফেলেছে তেমনি তার একমাত্র সখীকেও যেন না মেরে ফেলে। এই আশঙ্কাবোধ থেকে তার মাকে (রওশন জামিল) বলে: 'ওরা সখীরে বাঁচতে দিব না। তুই ওরে নিয়া পালা মা। ওর মামার বাড়িতে যা।' নৌকা করে দাদি-নাতনি দুজনে সখীর মামার বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। এমনতাবস্থায় উপরোক্ত গানটি বেজে চলে। যেখানে প্রশ্ন করা হয়েছে বিধিকে কি দোষে দোষী হলাম মিলন নয় বরং বিচ্ছেদই জীবন। পারিবারিক জীবনের মূল সেতু হলো বন্ধন। সেই বন্ধনই কেন দুরাশা হয়ে যায়।

রাজ্জাক পরিচালিত *সৎ ভাই* (১৯৮৫) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি পারিবারিক বিচ্ছেদ-বেদনায় রচিত এবং তা রাজ্জাকের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় ঘটনাচক্রে প্রথম ঘরের বড় ছেলে দুলালকে (রাজ্জাক) সব সম্পত্তি তার বাবা মৃত্যুর সময় উইল করে দেয়। এক সময় দুলালের স্ত্রীর (নূতন) বাবা (খলিল) এবং তার ভাই (ব্ল্যাক আনোয়ার) পরিবারে আশ্রয় নেয়। পরিবারে এসে তারা একে অপরের সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি করে-কখনো সৎ মা, ভাই প্রসঙ্গ টেনে কখনো বা সহায় সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে। এক সময় পারিবারিক কলহ চরমে পৌঁছে। অবশেষে মা এবং ছোট ভাই বেলাল (আলী রাজ) দুলালের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। এ সময় দুলাল তার মাকে ধরে রাখার জন্য মা মা বলে চিৎকার করে এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। দুলাল গাড়োয়ানকে গাড়ি দাঁড় করাতে বলে। দৌড়ে যায় মায়ের সামনে। বলে: 'আমাকে পর করে দিওনা মা... বাবাতো তোমাকে আমার কাছে রেখে গেছিল।...যেওনা মা যেওনা। মা কোন কথা বলে না। নির্বাক, নিস্তব্ধ। তবুও গাড়ি চলে থামে না। দুলালের কান্না দীর্ঘ হয়। অতঃপর নিম্নোক্ত গানটি বেজে ওঠে–

আমার ভাগ্য বড় আজব জাদুকর
ও সে এক পলকে শূন্য করে দিল সাধের ঘর
বড় নিঠুর জাদুকর ॥

গানে বিচ্ছেদ বেদনার করুণরসে ব্যক্ত হয়েছে–'আমি তিলে তিলে গড়ে ছিলাম, সাজানো বাগান, মমতারই ফুল ফুটিয়ে, গাইত পাখি গান, সেই সুখ পাখি আজ গেল ছেড়ে, বুকেরই পিঞ্জর।' তথ্য প্রযুক্তির আবির্ভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে এদেশের মানুষ প্রতিনিয়ত নগর সভ্যতার দিকে আগ্রহী হয়ে পড়ে। ফলে পারিবারিক বন্ধন ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে পড়ায় তারই ভাঙ্গন রোধকল্পে সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে ধরে রাখার প্রচেষ্টায় এমন চিত্রের অবতারণা। আবার পরিচালকগণের ব্যবসায়িক সাফল্যের বিষয়টিও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। ফলে পারিবারিক জীবনের নানা কাহিনিচিত্রের ব্যবহৃত গানেও পারিবারিক সম্পর্কের নানা রূপ এসেছে বিচিত্র ভঙ্গিমায়। যদিও অনেক সমালোচকের মতে, পারিবারিক জীবন নিয়ে নির্মিত এসব চলচ্চিত্রের কাহিনি আসলে কোন সমাজ থেকে আহরিত এবং এমন চিত্রের আদৌ কোনো অবকাশ আছে কিনা? কিংবা এর উৎপত্তি কোত্থেকে? এই প্রশ্নের জবাবে

একটি কথা বলা যায় যে, চলচ্চিত্রের বিষয়-আশয়ে কল্পনার আশ্রয়ে নানামাত্রিকতায় প্রকাশ ঘটে থাকলেও তা কোনো না কোনোভাবে এই সমাজের অন্তর্গত। আবার এও সত্যি যে, চলচ্চিত্র না বলা কথা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম।

৬. জীবনমুখী গান

জীবনের চরম বাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কোনো গানকে জীবনমুখী গান বলা যায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারের টানাপোড়েনের কাহিনি নিয়ে নির্মিত হয়েছে নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত *এতটুকু আশা* (১৯৬৮) চলচ্চিত্র। কাহিনিতে লক্ষ করা যায় গ্রামীণ সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা হয় শহরের মানুষের। ফলে স্বাভাবিক কারণেই দুই পরিবারের মানুষের মধ্যে আচরণগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। একটু সুখের আশায় যে পিতা তার ছেলেকে জীবনের সর্বস্ব দিয়ে শিক্ষিত করেছিলো। সেই ছেলে স্ত্রীর কাছে বন্দি হয়ে আছে। এমন পরিস্থিতিতে চরম অর্থকষ্টে পড়ে পিতা। ক্ষুধা দারিদ্রতার জ্বালায় তাকে বেছে নিতে হয় ফেরিওয়ালার জীবন, ছোট ছেলে সালাম (আলতাফ) খুড়িয়ে হাঁটে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তাকেও দৈনিক খবরের কাগজ বিক্রি করে সংসার চালানোর কাজে সহায়তা করতে হয়। ফলে তার চিকিৎসা করে সুস্থ সুন্দর জীবনের কথা মিছে ভাবনায় পরিণত হয়। এমন সংকটাপূর্ণ মুহূর্তে সালামের বুকের চাপা কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণার গভীর আর্তি নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়–

তুমি কি দেখেছো কভু জীবনের পরাজয়
দুঃখের দহনে করুণ রোদনে
তিলে তিলে তার ক্ষয়।

গানের কথায় জীবন বাস্তবতার এক নিদারুণ রূপ প্রতিফলিত হয়। সঞ্চারীতে লক্ষ করা যায়–'প্রতিদিন কত খবর আসে যে, কাগজের পাতা ভরে, জীবন পাতার অনেক খবর রয়ে যায় অগোচরে।' কত জীবনের কত খবর কিংবা গল্পই না সে ফেরি করছে। কিন্তু নিজের জীবনের অতলে যে সীমাহীন দুঃখের পলি জমেছে তার কথা কেউ জানে না। বুকের কান্না হিম হয়ে অস্ফুট রয়ে যায়। গানটির গীতিকার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সুরকার সত্য সাহা এবং নেপথ্যকণ্ঠশিল্পীআবদুল জব্বার। চলচ্চিত্রে সালামের (আলতাফ) অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। জীবন বাস্তবতার আরেকটি ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয় *পীচ ঢালা পথ* (১৯৭০) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানে। কোন উপায় না পেয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষকে কতো কিছুই না করতে হয়। জীবন ধারণের জন্য পকেটমারের মত নিকৃষ্ট কাজকেও বেছে নিতে হয় কখনো কখনো। তারই রূপ চিত্রায়িত হয়েছে চলচ্চিত্রের গানে–

পিচ ঢালা এই পথটারে ভালোবেসেছি
তার সাথে এই মনটারে বেঁধে নিয়েছি ॥

শহরের ব্যস্ততম জীবন-জীবিকার কঠিন সংগ্রামে সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। তা ব্যক্তও হয়েছে–'সারি সারি জনতার এই যে ভিড়ে...কারো পানে কেউ চায় না ফিরে।' আবার টিকে থাকার সংগ্রামে কিংবা অর্থ-সম্পত্তি লোভের কারণে অনেকেই নীতি নৈতিকতা, মানবিকতা বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে

না। যার দরুন বলা হয়েছে–'নিরীহ গরীব মানুষের প্রাপ্যতা কেড়ে নিয়ে তাদের পয়সায় বেড়ে উঠেছে দালান।' দৃশ্যায়নে দেখা যায়, রাজ্জাকের পকেট মারতে এসে মানিব্যাগে টাকাকড়ি না পেয়ে দু'জনের মধ্যে ঘটনাচক্রে কথা হয়। গান শেষে দুজনের কথপোকথনে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার নিদারুণ চিত্র প্রতিফলিত হয়। তখনকার সময়ে একটি চাকরি যে সোনার হরিণ সেই রূপও বিধৃত হয় উভয়ের সংলাপে।

রাজ্জাক যখন বলে: 'ছোট বেলায় বাপ-মা হারিয়ে এতিমখানার পয়সায় আই এ পাস করে এখন চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছি...আশা নিয়েই তো ঘুরে বেড়াচ্ছি। তখন অভাব অনটনের তীব্র কষ্টে, ক্ষোভে আর দুঃখ যন্ত্রণায় পকেটমারের হাসি অন্তর্ভেদী হয়। 'হা হা হা করে হেসে বলে: 'চাকরি! তা তুমি পাবে বলে আশা করো? রাজ্জাক বলে: 'আশা নিয়েই তো ঘুরে বেড়াচ্ছি।' পকেটমার বলে: 'আশা! বলি একটু আগে আমি যখন তোমার পকেট মারতে গিয়েছিলাম তখন আমার আশা ছিল না? 'ওসব আশা ছাড়ো। আমাকে দেখো আশা ধরে থাকলে আমি দারোগার ছেলে হয়ে চাকরি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত পকেটমার হতাম ?'

সমাজের বেকারত্বের যে সংকট তা প্রতীয়মান হয় উপরোক্ত সংলাপে। রাজ্জাককে যখন পকেটমারের কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তাব দেয়। রাজ্জাক তা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করে এবং বলে: 'নিজের ঘৃণ্য পেশায় আমায় জড়াতে তোমার লজ্জা করছে না?' পকেটমার কথার উত্তরে বলে: 'অত নাক শিটকোওনা দুনিয়াটা কি বাটপারের নয় শুনি? কেউ উপরে, কেউ ফুটপাতে, কেউ ধরা পড়ে, কেউ ধরা পড়ে না।' সংলাপে তখনকার সমাজপতিদের আসল চেহারা উঠে আসে। পকেটমার যাবার বেলায় বলে যায় রাজ্জাককে: 'যাচ্ছো খালেদ (রাজ্জাক) মিয়া যাও দুনিয়াটা গোল হলে বোকা পকেটমারের সাথে দেখা হবে স্লালামালাইকুম।' গানটির গীতিকার আহমদ জামান চৌধুরী, সুরকার রবীন ঘোষ, কণ্ঠশিল্পী আবদুল জব্বার। চলচ্চিত্রের নামানুসারে গানটি পকেটমারের অভিনয়ে পরিবেশিত হয় জীবন বাস্তবতার সূত্রধরে। যা মূলধারার চলচ্চিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে প্রতীয়মান হয়। এই চলচ্চিত্রের আরেকটি গান যা টেলপ-এ ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা ছবির মূল বার্তাবরণকে উপস্থাপন করে–

রোদে পুড়ে পিচ গলে এই যে পথে
মন পুড়ে আশা কাঁদে তারই সাথে সাথে
কত মানুষের হাহাকার ॥

নগর জীবনের যে রূঢ় বাস্তবতা তা পিচ ঢালা পথের সাথে প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে–'রোদে পুড়ে পিচ গলে এই যে পথে।' মানুষের জীবনে প্রত্যাশ এবং প্রাপ্তির যে ব্যবধান তা শেষ পর্যন্ত তীব্র হাহাকারে ধ্বনিত হয় গভীর বেদনায়। আবদুল জব্বার এবং সমবেত কণ্ঠের হামিং-এর মাধ্যমে যে আবেশ তৈরি হয় তা সত্যিকার অর্থে মর্মভেদী হয়ে বাজে হৃদয়ে। উপরোক্ত গানটির মাধ্যমে চলচ্চিত্রের কাহিনি এগিয়ে যায়।

৭. দেশ-মাতৃকার গান

এ ভূ-খণ্ডের মানুষ জন্ম লগ্ন থেকেই নানা রকম চক্রান্তের শিকার হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের পর পাকিস্তানি শোষণ শাসন শুরু হয়। বিভিন্ন দিক থেকে বঞ্চিত হওয়া এদেশের মানুষ শত ঝঞ্ঝার পরও বার বারই জেগে উঠার তাড়নাবোধ করেছে। এবং এই আন্দোলন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে জয় পরাজয়ের নিশান উড়িয়েছে বার বার। যার কারণে দেশপ্রেমে নিবেদিত হয়ে যেমন নির্মিত হয়েছে অনেক চলচ্চিত্র, তদ্রুপ এই বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে অনেক গান। এহতেশাম পরিচালিত *এদেশ তোমার আমার* (১৯৫৯) চলচ্চিত্রে তা দৃষ্ট হয়। দেশ গড়ার গান, স্বাধীনতার গান প্রভৃতি গান উঠে এসেছে বিভিন্ন রূপে। ১৯৬৮-৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরচারী আইয়ুবীয় শাসনের পতনের পটভূমিতে নির্মিত জহির রায়হানের *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০) বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথম ও সার্থক গণ-আন্দোলনের চলচ্চিত্র এটি। এ চলচ্চিত্রে ভাষার আন্দোলনের গান, ব্যক্তি স্বাধীনতার অর্থে দেশ-জাতির মুক্তির গান, বীররসের গান বা বিদ্রোহী চেতনার গান, কৃষক বিদ্রোহের গান প্রভৃতি বিশেষভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

ক. স্বাধীনতার গান
খ. দেশাত্ববোধক গান
গ. ভাষার গান বা প্রভাতফেরির গান
ঘ. মুক্তির গান
ঙ. বিদ্রোহী চেতনার গান
চ. কৃষক বিদ্রোহের গান

ক. স্বাধীনতার গান

দেশ বিভাগের পর সমাজ গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গড়ে উঠেছে এহতেশাম পরিচালিত *এদেশ তোমার আমার* (১৯৫৯) চলচ্চিত্রের কাহিনি। চলচ্চিত্রের শুরুতেই জানিয়ে দেয়া হয় '১৯৪৭ সাল। সুন্দর স্বাধীন এক ভবিষ্যতের শুরু।' '...আজ থেকে এদেশ তোমার আমার এবং নবাগত লক্ষ বাস্তু হারাদের।' ভয়েস ওভার শেষে ডাককা সেন্ট্রাল জেলের ফটক দিয়ে মুক্তির আনন্দ বার্তা নিয়ে বের হয়ে আসে দেশ প্রেমে নিবেদিত হারুন (খান আতাউর রহমান)। এদিকে আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে হারুনের মায়ের প্রার্থনা–'যে দেশের দুঃখ ঘুচাতে আমার স্বামী প্রাণ দিয়েছে সে দেশ আজ স্বাধীন। খোদা তুমি রহিম, তুমি রহমান, পরাধীন দেশে জন্মেছিলাম...আমিন।' মোনাজাত শেষে হাতের তস্‌বি দেয়ালে রাখতেই মা মা বলে হারুনের প্রবেশ এবং পরম স্নেহলাভে মাতৃমমতায় দীর্ঘদিন পর ছেলে মাকে মা ছেলেকে চরম আহলাদে জড়িয়ে ধরে বলেঃ 'মা 'শুনেছো আজ আমরা স্বাধীন। তারপর দেয়ালে টাঙ্গানো বাবার ছবির দিকে বীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেঃ 'বাবা তোমার আত্মহত্যা বৃথা যায়নি। লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত দানও বিফল হয়নি। আজ আমিও পথভ্রষ্ট হইনি।'

দেশ-বিভাগোত্তরকালে স্বাধীন দেশে মা-ছেলের এমন আনন্দ ঘরে ঘরে এভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। স্কুলের স্বাধীনতা অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়ে হারুনের বক্তব্যে আরো উঠে আসে আনন্দ বার্তার চিত্র'...বন্ধুগণ...আজাদী যে সংগ্রামের শেষ এ কথা ভুল। আজ থেকে আমাদের এক

নতুন সংগ্রামের শুরু। কাল পর্যন্ত এদেশের বুকে যা কিছু ঘটেছে তার জন্য দায়ী ছিল এক বিদেশি শক্তি। কিন্তু আজ সমস্ত দায়িত্ব আপনাদের আমাদের সবার। তবে আমাদের মনে রাখা উচিত যে আজাদীর পতাকা বহন করার জন্য জাতির মেরুদণ্ডে শক্তির সঞ্চার করাতে হবে। ঝড় ঝঞ্ঝা ও দুর্যোগে আমাদের নুইয়ে পড়লে চলবে না। তাই আজকে বলার দিন এসেছে: 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।' এরপর শুরু হয় স্বাধীনতার আনন্দে সমবেত কণ্ঠের গানে কিশোর-কিশোরীদের পরিবেশনায় নৃত্য। যে গানে স্বাধীনতার আনন্দধ্বনি উচ্ছ্বসিত হয়েছে তাল-ছন্দের বিশেষ বোল-বাণীর মাধ্যমে–

ওরে ধিনিতা ধিনিতা ধিন ধিনিতা তাক ধিধি তাক
আজ এলোরে এলো স্বাধীনতার তাক ধিধি তাক
আমরা মত্ত উচ্ছল জনতা নেচে যাই জীবনের ছন্দে
আমরা গেয়ে যাই নতুনের জয়গান
উজ্জ্বল মুক্ত আনন্দে ॥

এ সংগ্রাম এখানেই শেষ নয়, আরেকটি সংগ্রাম অপেক্ষা করছে যা আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এমনই যুদ্ধ সংগ্রামের ইঙ্গিত পাওয়া যায় হারুনের উপরোক্ত বক্তব্যে। যে যুদ্ধ সংগ্রাম আমাদের বাঙালি জীবনে এনে দিয়েছিল প্রাণের ভাষা বাংলা, এনে দিয়েছিল ১৯৭১ সালের মহান বিজয় নিশান। গানের শেষ অন্তরায় স্বাধীনতা লাভের পর এদেশের মানুষের সম্মান বিনির্মাণের এক তীব্র খুশির বার্তা প্রকাশ পেয়েছে–

আমরা পেয়েছি মানুষের সম্মান
দুনিয়ার মানুষের সাথে
আমরা পেয়েছি কওমের একতান দুর্গম সম্মুখ পথে
জাতির জীবন হতে কেটে গেছে কেটে গেছে
নিষ্প্রাণ জড়তা

উপরোক্ত চলচ্চিত্রের নামানুসারে দেশ গড়ার নিম্নোক্ত গানটি নারী-পুরুষের সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয়েছে। গানের প্রয়োগ ভাবনায় দেখা যায় বলিষ্ঠ হাতে কাস্তে কাঁধে একজন নারী ও একজন পুরুষের বীরদর্পোচিত ভঙ্গিমার স্থিরচিত্র।

এই দেশ এই মাটি বুক ভরা এই নদী
এই আকাশ এই বাতাস ফুলে ফলে ধন্য এই মাটি
এদেশ তোমার আমার ও ভাই এদেশ তোমার আমার ॥

স্থিরচিত্রটি উদ্ভাসিত রেখে একক কণ্ঠে তালবিহীন দীর্ঘ সুরের আবেশে গানের প্রথম লাইন দুটি গীত হয়। মূর্তিমান মানব-মানবীর এই ছায়া দুটি যেন সমগ্র দেশ-জাতির প্রতিনিধির প্রতীকী রূপ; নারী-পুরুষের সম্মিলিতভাবে দেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়েরই প্রয়াস। ধীরে ধীরে এই মূর্তিমান দেহের ছায়া দুটি

আলোকিত হয়। এবং তাতে দৃষ্ট হয় হারুন এবং শাহানার অবয়ব। 'ও বন্ধু ও ভাইরে' গানের এই অংশটি আহবানের সুরে এককভাবে পরিবেশিত হয় আবদুল আলীমের কণ্ঠে; দেশ গড়ার প্রয়াসকে আরো বেগমান করে তোলে।

খ. দেশাত্ববোধক গান

দেশাত্ববোধের নিম্নোক্ত গানটি জহির রায়হানের *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০) চলচ্চিত্রে লক্ষ করা যায়। ছবির শুরুতে টেলপ-এ একের পর এক নিম্নোক্ত শ্লোগানধর্মী শব্দাবলী–একটি দেশ... একটি সংসার ...একটি চাবির গোছা...একটি আন্দোলন...একটি চলচ্চিত্র...এক এক করে প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমবেত কণ্ঠে নিম্নোক্ত গানটি পরিবেশিত হয়–

ও আমার স্বপ্নঝরা আকুল করা জন্মভূমি
তোমার এই মাটির কোলে জন্ম নিয়ে ধন্য হলাম আমি ॥

গীতিকার এবং সুরকার খান আতাউর রহমান। ১৯৬৭ সালে খান আতাউর রহমান নির্মিত *নবাব সিরাজদ্দৌলা* (১৯৬৭) চলচ্চিত্রেও দেশপ্রেমের গান হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। দেশপ্রেমের আরেকটি গান উক্ত চলচ্চিত্রে দৃষ্ট হয়। দৃশ্যায়নে দেখা যায় দেশপ্রেমে নিবেদিত প্রাণ আনোয়ার তার বোনদের নিয়ে শহরের যান্ত্রিকতা ছেড়ে একদিন গ্রামে বেড়াতে যায়। গ্রামের মেঠোপথ ধরে সকলে মিলে হাঁটছে। আনোয়ার তার বোন সাথী (রোজি সামাদ) এবং বিথীকে (সুচন্দা) মাতৃভূমির অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত করে:'জানিস একদিন এদেশে ঘরে ঘরে গোলা ভরা ধান ছিল, পুকুর ভরা মাছ। আর এই মাটি ভরা থাকতো সোনার ফসলে। মধু (আমজাদ হোসেন) বিরক্ত হয়ে বলে:'আবার এখানে এসে বক্ বক্ শুরু করলে? নাহ, খালি দেশ আর মাটি, মাটি আর দেশ। দেশ আর মাটি জাহান্নামে যাক্। এবার নিজের কথা ভাবো।' হাতের মুঠোয় মাটি তুলে নিয়ে মধুর দিকে তাকিয়ে বলে: 'এই মাটি আমার। এ আমার দেশের মাটি মধু। তোর আমার সবার জন্ম হয়েছে এই মাটিতে। এই মাটিতে ভর করেই তো আমরা বেঁচে আছি। এই মাটি আমার মায়ের মত, বড় আদরের, বড় পবিত্র।' মাটি ভর্তি হাতের মুঠোয় চুমু খেয়ে বলে বোন আমার সোনার দেশের, সোনার মাটিকে কলঙ্কিত হতে দিতে চাই না বলেই তো, দেশ দেশ করি। মাটির কথা বলি।' তারপর সমবেত কণ্ঠে নিম্নোক্ত গানটি গীত হতে দেখা যায়–

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

বর্তমানে এই গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃত। প্রসঙ্গত ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় এফ ডিসি প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭০ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত প্রায় পাঁচশ চলচ্চিত্রের মধ্যে মাত্র দুটি চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহৃত হয়েছে। একটি সালাহ্উদ্দিনের *ধারাপাত* (১৯৬৩) এবং অপরটি *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০) চলচ্চিত্রের উপরোক্ত গানটি। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পূর্ব পাকিস্তানি শাসন আমলে এই অঞ্চলে (বাংলাদেশে) রবীন্দ্র চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বাংলার শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তির কাছে রবীন্দ্রনাথের গল্প, কবিতা, গান, নাটক ইত্যাদি অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল

বটে। এই নিষেধাজ্ঞার কারণে নির্মাতারা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহার করার সাহস পেতেন না।[৬১]

গ. ভাষার গান বা প্রভাতফেরির গান

নিম্নোক্ত গানটিও *জীবন থেকে নেয়া* চলচ্চিত্রে সমবেত কণ্ঠে ব্যবহৃত হয়েছে প্রভাতফেরির গান হিসেবে। দৃশ্যায়নে দেখা যায় আনোয়ার হোসেন, আমজাদ হোসেনকে ডেকে পাঠায় (বিথী) সুচন্দা এবং রোজিকে (সাথী) তার ঘরে আসতে। সুচন্দা এবং রোজি এলে আনোয়ার হোসেন হারমোনিয়ামটা কাছে টেনে বলে: 'শোন্ এদিকে আয়। কাল একুশে ফেব্রুয়ারি মনে আছে তো ? ভোর রাতে উঠতে হবে। ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখিস্। আমরা সবাই একসঙ্গে প্রভাতফেরিতে যাব। আমজাদ হোসেন বলে:'যেতে হয় তুমি যাও ওরা যাবে কেন?' আনোয়ার হোসেন বলে: 'শুধু ওরা না তোকেও যেতে হবে।' বিথী (সুচন্দা) এদিকে আয়তো। প্রভাতফেরির গানটা একবার ধর তো দেখি তোর মনে আছে কিনা।' বিথী শুরু করলে অন্যরাও সাথে গায়–

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

এরপর আ আ আ সুরের হারমোনাইজের অংশটি থেকে শট পরিবর্তন হয় এবং বাকি অংশটি শহীদ মিনারে প্রভাতফেরির ব্যানারের সাথে রোজি ও সুচন্দার মাঝে আনোয়ার হোসেনসহ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো অন্যান্য জনতার সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম একটি গান। শত শত ছেলে হারা মায়ের আকুতির অপরিসীম বেদনা সমগ্র দেশজাতিকে মুহ্যমান করে তোলে। প্রসঙ্গত ১৯৫২ সালের ভাষা শহীদদের স্মরণে আবদুল গাফফার চৌধুরী কবিতা রচনা করেন–'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি।' কবিতাটিতে প্রথম সুরারোপ করেন আবদুল লতিফ। তা ১৯৫৩ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা কলেজের অনুষ্ঠানে আবদুল লতিফ ও আতিকুল ইসলাম পরিবেশন করেন। গানটি শহীদ মিনার নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করে। সে উপলক্ষ্যে ঢাকা কলেজের ছাত্ররা কবিতাটি নিয়ে 'একুশের গান' শিরোনামে একটি লিফলেট প্রচার করে। পরবর্তীতে গানটির আধুনিক সুরারোপ করেন আলতাফ মাহমুদ। সেই থেকে প্রভাতফেরির গান হিসেবে গীত হয়ে আসছে।[৬২] গানটি সম্পর্কে সংগীত পরিচালক শেখ লুতফর রহমান বলেন–'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি সুর করার সময় ওকে বলেছিলাম–'কতগুলো তাজা তরুণ ছেলে বুকের রক্ত দিয়ে, মায়ের সম্মান, ভাষার সম্মান রাখতে চেয়েছে। কাজেই ঘটনার সঙ্গে গানের সুরটার কেমন মিল আছে দেখেছ ? অনেকটা চার্চ মিউজিকের মতো।' আলতাফ ওর গানের সুর সম্পর্কে আমার মন্তব্য শুনে বলেছিল, 'দাদা, তাহলে এই গানটা কিছু হবে একদিন।'[৬৩]

ঘ. মুক্তির গান

এদেশের মানুষ সব সময়ই কোন না কোন বৈরি শক্তির শিকার হয়েছে। এই বৈরিতার অপঘাত থেকে মুক্তি লাভের জন্য নিরন্তর চেষ্টা অব্যহত রেখেছে। এবং প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে গানকে মুক্তির অন্যতম শক্তি হিসেবে বেছে নিয়েছে। ফলে রচিত হয়েছে অনেক গান। এমন চিত্রেরও প্রকাশ

উল্লেখিত (*জীবন থেকে নেয়া*) চলচ্চিত্রে। দৃশ্যায়নে দেখা যায় কাজের লোকদের বকা ঝকা করছে গৃহকত্রী (রৌশন জামিল)–'এজন্যে কি? তোদের এই সংসারে রাখা হয়েছে। আজ দুধ পুড়বে। কাল বেড়ালে মাছ খাবে। পরশু ভাঙ্গবে পেয়ালা। তরশু করবে চুরি যত্তসব।' তেলের বোতল হাতে নিয়ে বলে:'একি একসের তেল দু'দিনেই শেষ! যে বাড়িতে রাত আটটার পরে বাতি জ্বলে না। যে সংসারে এক ফোটা চিনি একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত খেতে পারে না।...এই দুধ আর তেলের দাম তোমাদের বেতন থেকে কাটা গেলো।' এই গ্লাস কে এনেছে এখানে?...আর কোনদিন ছুঁয়েছিস তোর হাত কেটে দিব বলেদিলাম।' এরপর ছাদের উপর থেকে তবলার তাক তাক তাক তাক তেহাই-এ গানের সুর ভেসে আসে তার কানে–

এ খাঁচা ভাঙ্গব আমি কেমন করে
বাঁশি বাজবে-সেতার বাজবে ॥

চিত্র-৩৮: *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০) চলচ্চিত্রে 'এ খাঁচা ভাঙ্গব আমি কেমন করে' গানের একটি স্থিরচিত্রে খান আতা।

গৃহকত্রী ছাদে উঠে আসে বড় বড় চোখে। তাকে দেখেই আঁতকে উঠে গৃহকর্তা (খান আতা)। দোষামোদের সুরে বলে: 'আমি ভাবছিলাম কি ছাদের উপর বসে গান গাইলে তোমার সংসারে ডিস্টার্ব হবে না। তার মানে ছাদের উপর এসে গান গেয়ে আশে পাশের লোকদের জানাতে চাও যে, বউয়ের যন্ত্রণায় ঘরে বসে গান গাইতে পারোনা?'...এতবার হারমোনিয়াম তবলা ভেঙ্গে দেয়ার পরও কি তুমি বুঝতে পারছো না যে, এ সংসারে গান গাওয়া চলবে না?' উক্ত সংলাপে ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হবার মধ্য দিয়ে পাকহানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায় অর্থাৎ পরিবার এবং রাষ্ট্রের কোথাও স্বস্তি নেই বা শান্তি নেই। এখানে রাষ্ট্রের সাথে পরিবারের একটি প্রতীকী রূপ লক্ষ করা যায়। বাড়ির গৃহকর্তাসহ কাজের লোকদের সঙ্গে গৃহকর্ত্রীর এমন আচরণ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিল্পী খান আতার কথায়, সুরে, কণ্ঠে এবং অভিনয়ে এ গানটি চলচ্চিত্রে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

ঙ. বিদ্রোহী চেতনার গান

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বীররসের নিম্নোক্ত গানটি বর্ণিত (*জীবন থেকে নেয়া*) চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। এই গানটি ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জোগাতে অপরিসীম ভূমিকা রেখেছিল। গানটির প্রয়োগ ভাবনায় দেখা যায় সদ্য বিবাহিতা সাথীর

(রোজি সামাদ) বাড়িতে বেড়াতে যায় ছোট বোন বিথী (সুচন্দা) এবং মধু (আমজাদ হোসেন)। দু'জনকে দেখে ভীষণ আনন্দিত হয় সাথী। তারপর ভাইয়ার (আনোয়ার) কথা জিজ্ঞেস করে সাথী। বিথী বলেঃ 'সে খবর দিতেই তো এসেছি। ভাইয়া জেল খানা থেকে চিঠি লিখেছে।' (সাথীর বিয়ের দিন পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল কলকারখানার শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করার কারণে।) মধু চিঠি বের করে দেয় সাথীর হাতে। সাথী পড়ে চিঠিঃ 'স্নেহের সাথী তোর নতুন জীবন কেমন চলছে? আশাকরি সুখেই আছিস্। তোরা সুখী হ। তাইতো আমি চাই। বিথীটাকে সামলে রাখিস্। আমার জন্যে চিন্তা করিসনে। আমাকে আর ক'দিন ওরা জেলে পুড়ে রাখবে। আজ না হয় কাল ছাড়তেই হবে।' জেল খানার লৌহ কপাটের দ্রুত গতির প্যান শট, এরপর আনোয়ারের লৌহ দণ্ড ধরা দীপ্ত অভিব্যক্তির জুম আউটশট ধারণের মাধ্যমে শুরু হয় সমবেত কণ্ঠের গান–

কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল করলে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী
ওরে ও তরুণ ঈশান বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান উঠুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি ॥

চ. কৃষক বিদ্রোহের গান

কৃষক-শ্রমিক-মজুরদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে প্রতিবাদী হয়ে উঠার এক অদম্য শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে গানটি *জীবন থেকে নেয়া* চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। মিউজিকোলজিস্ট সাইম রানার ভাষায়–১৯৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রায় দুই'শ বছরের ইতিহাস হলো কৃষক নিপীড়ন–কৃষক আন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যত বিদ্রোহ হয়েছে, তার মূলে কৃষকেরাই গর্জে উঠেছে বার বার।[৬৪] গানের দৃশ্যায়ন পূর্বে দেখা যায় আনিসের (শওকত আকবর) সঙ্গে সাথীর (রোজি) বিয়ে প্রায় চূড়ান্ত। কেবল আনিসের পারিবারিক সমস্যার কারণে দেরি হচ্ছে। হবু বর একদিন ফুলের তোড়া নিয়ে বেড়াতে আসে সাথীদের বাড়িতে। মধু (আমজাদ হোসেন) আনিসকে ড্রইং রুমে একা বসে থাকতে দেখে সাথী ও বিথীকে (সুচন্দা) ডাকতে থাকে এবং আনিস কে শুনিয়ে বলেঃ 'বুঝলে বাবা মেয়েটা আমাদের বড় সংসারী, আল্লাহ তায়ালার যদি ইচ্ছে হয়, আর তোমার সংসারে যদি যেতে পারে। তখন দেখবে, তোমার সংসারটাকে কী সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। সাজাবে না কেন ? ঐ যে দুটি বোন ওরা আমার কথার বাইরে যায় না।' তারপর বলেঃ 'শুনে না শুধু ঐটা পলিটিশিয়ানটা (আনোয়ার হোসেন)। এত বকা বকি করি। তবু দিন রাত শুধু ঐ দেশ দেশ বলে চ্যাচাবে।' আনিস বলেঃ'উনি এখন কোথায় গেছেন? মধু বলেঃ 'কোথায় আবার ঐ যে কি যেন বলে, ইয়ে মানে হরতাল হরতাল কলকারখানার লোকদের নিয়ে হরতাল করছেন।' এরপর শ্রমিকদের কাঁস্তে ধরা হাতের শট। মিউজিকের তালে তালে গতি ত্বরান্বিত হওয়ার মাধ্যমে শট পরির্বতন হয়।

দাও দাও দাও দাও দাও
দুনিয়ার সব গরীবকে আজ জাগিয়ে দাও
ওমরাহদের সিংহদারের ভিত্তি কাঁপিয়ে দাও ॥

গানটির অনুবাদক ও সুরকার খান আতাউর রহমান। গীত হয়েছে সমবেত কণ্ঠে। গানটি আল্লামা ইকবালের 'উট্কো মেরী দুনিয়াকে গরিবোঁকো জাগা দো' কবিতার বাংলা রূপান্তর।[৬৫]

অন্যান্য বিষয়ের গান

১. শিক্ষা প্রসারের গান

শিক্ষা বিস্তারের বিষয়টিকে উপজীব্য করে যে গান রচিত বা পরিবেশিত এবং নিরক্ষর মুক্ত সমাজ গঠনে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে সাধারণভাবে সেই গানকে শিক্ষা প্রসারের গান বলা যেতে পারে। আজিজুর রহমানের *অশিক্ষিত* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি শিক্ষা বিস্তারের প্রেরণামূলক গান বলা যায়। একজন নিরক্ষর পাহাড়াদারের শিক্ষিত হয়ে উঠার যে বাসনা এবং তা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তারই রূপ বিধৃত হয়। গানটি রাজ্জাক এবং মাস্টার সুমনের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়।

রহমত: মাস্টার সাব আমি নাম দস্তখত শিখতে চাই
কোনদিন কেউ যেন বলতে না পারে তোমার ছাত্রের বুদ্ধি নাই
মাস্টার সাব
মানিক: রহমত ভাই তোমার নাম দস্তখত আমি শেখাতে চাই
কোনদিন কেউ যেন বলতে না পারে তোমার কোন বিদ্যা নাই
ও রহমত ভাই ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় রহমত (রাজ্জাক) একজন গ্রাম পাহাড়াদার। লাঠি হাতে ডাকাত পাহাড়া দেয় সে। তার দোস্ত কালো (টেলিসামাদ) শহরে বেয়ারার কাজ করে। শহর থেকে গ্রামে এসে রহমতকে নানা ধরনের গল্প শোনায় বলে: 'আমি অফিসের দুয়ার খুইলা না দিলে আমার সাহেব ঢুকতেই পারে না। আমি চেয়ার মুইচ্ছা না দিলে আমার সাহেব বসতেই পারে না। ফাইলিং-এ সিলিং না দিলে আমার সাহেব সই করতে পারে না।' রহমত বলে: 'বাপরে এত্ত কাম তুই করস?' গল্প শুনতে শুনতে অনুপ্রাণিত হয় রহমত এবং তার মনেও শহরে যাবার স্বপ্ন তৈরি হয় এবং বলে: 'আচ্ছা দোস্ত শহরে তোর মত একখান চাকরি দিতে পারবি? কালো বলে: 'পারি কিন্তু তুই তো লেখাপড়া জান্স না। লেখাপড়া না জানলে শুধু চাকরি কেন ? মানুষই হউন যায় না। লেখাপড়া জীবনের সব রে'। লেখাপড়া শেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে রহমত। তার প্রিয়তমা লাইলীকেও (অঞ্জনা) লেখাপড়া শিখে শহরে যাবার স্বপ্ন দেখায়। পাহাড়া দেয়ার সময় দেখে ছোট্ট ছেলে মানিক (মাস্টার সুমন) মাটির ঘরের বারান্দায় বিছানা পেতে লেখাপড়া করছে। মানিকের মা সেলাই কাজ করছে পাশে বসে। মানিকের পাশে গিয়ে রহমত বসে এবং বলে আমি লেখাপড়া শিখতে চাই। মানিক প্রথমে হাসে। পরে বলে লেখাপড়া শিখতে হলে বই খাতা কিনতে হবে। পরের দিন রহমত বই, সিলেট, পেন্সিল নিয়ে মানিকের কাছে লেখাপড়া শিখে। মানিককে সে ওস্তাদ বলে ডাকে আর মানিক তাকে দোস্ত বলে সম্বোধন করে।

রহমত তার প্রথম পাঠ শুরু করে ওস্তাদের মুখে মিষ্টি তুলে দেয়ার মাধ্যমে এবং ওস্তাদও তার মুখে মিষ্টি তুলে দেয়। তারপর শুরু হয় পড়ালেখা 'স্বর-অ, স্বর-আ।' ঠিকমত বলতে না পারার কারণে মানিক এবং তার মা দুজনেই হাসে। এক সময় লজ্জা এড়ানোর জন্য মাঠের মধ্যে বাঁশের টঙ ঘর তৈরি করে এবং সেখানে গিয়ে লেখাপড়া শেখে। পড়তে লিখতে পারলেও রহমতের তখনো দস্তখত শেখা হয়নি। তাই সে একদিন ওস্তাদকে উঁচু আসনে বসিয়ে নিজে নিচে বসে বলে: 'আমি হইলাম গিয়া তোমার ছাত্র, এতদিন তোমারে উঁচু জায়গায় বসাই নাই দেইখ্যা আমার লেখাপড়া কিছুতেই আগাইতে ছিল না। সেই জন্যে আইজ থাইকা নতুন ব্যবস্থা...'তুমি আমারে তাড়াতাড়ি নাম দস্তখত শিখাইয়া দাও। ওস্তাদ বলে: 'নাম দস্তখত? জ্বি মাস্টার সাব নাম দস্তখত।' তারপর উপরোক্ত গানটির মাধ্যমে ব্যক্ত হয় ওস্তাদ এবং সাগরেদের মনের যত কথা।

গান শেষে দেখা যায় দুজনে রেল লাইনে হাত ধরে হাঁটে এবং উভয়েই শহরে যাবার স্বপ্ন দেখে। কিশোর সন্তান মানিক তার মাকে সাথে নেয়ার কথা ভুলে না বরং কথার মাঝে বলে: 'মারে কিন্তু আমাগো লগে রাখুম।' রহমত বলে: 'একশবার রাখুম।' গানটিতে অনেকগুলো শিক্ষণীয় বিষয় প্রতিফলিত হয়। তারমধ্যে একটি বিষয় খুবই গুরুত্ববহ যে, শিক্ষার কোনো বয়স নেই। যে কারো কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। চলচ্চিত্রের গানটিতে যে রহমতকে দেখা যায় এ রহমত যেন দেশের সকল নিরক্ষর রহমতের প্রতিনিধিত্ব করে। চলচ্চিত্র মুক্তি পাওয়ার পর এর কাহিনি এবং গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। 'একটি সুস্থ সাবলীল কাহিনির চিত্ররূপ হিসেবে ১৯৭৮ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা রাজ্জাক এবং শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পীর সম্মাননা অর্জন করে মাস্টার সুমন। ছবিটি মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হয় এবং সার্টিফিকেট অব মেরিট সম্মাননা লাভ করে।[৬৬]

শিক্ষা ও বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম গান। গান-বাজনা মানুষের আত্মোপলব্দি অতঃপর আত্মশুদ্ধি অর্জনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। সমাজে সকলের সাথে সদ্ভাব-সম্প্রীতি বজায় রাখতেও গানের ভূমিকা রয়েছে। মানুষের মাঝে নীতিবোধ জাগ্রত করতে এবং জাতির ক্রান্তিকালে জনমত তৈরি করার ক্ষেত্রেও গান অগ্রগণ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ। কিন্তু আমজাদ হোসেনের *নয়ন মণি* (১৯৭৬) চলচ্চিত্রে যখন গান বাজনা কে হারাম বলে আখ্যায়িত করে গ্রাম্য মোড়ল (এ টি এম শামসুজ্জামান) ও তার দল। তখন নিম্নোক্ত গানটির মাধ্যমে তার জবাব দেয়া হয়–

ফারুক: কোন কিতাবে লিখা আছে গো হারাম বাজনা গান
হাসান ইমাম: দাউদ নবীর বাঁশির সুরে চমকে পাখির প্রাণ ॥

চিত্র-৩৯: *নয়ন মণি* (১৯৭৬) চলচ্চিত্রে 'কোন কিতাবে লিখা আছে গো হারাম বাজনা গান '
গানের একটি স্থিরচিত্রে হাসান ইমাম ও ফারুক ।

চলচ্চিত্রে দেখা যায় ফারুক আর টেলিসামাদ দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে। টেলিসামাদ বলে: 'অই নয়ন হগগলই তো অইলো। এই বার হ্যাজাক বাতি জ্বালাইয়া এক রাইত একটু ফূর্তি করতে চাই। একদিন যাত্রা করছিলাম বইলা ওই মোড়ল আমাগো কি মাইরটাই মারলো। অহন একটু পতিশোধ নিতে চাই। তুই কি কস হ্যা?' নয়ন (ফারুক) বলে: 'তুই যা হ্যাজাক জ্বালানোর ব্যবস্থা কর। আমি আছি।' তুই আছস ? তাইলে আমি হগগল ব্যবস্থা করি গা।' বলে দৌড়ে যায় টেলিসামাদ।

মঞ্চ তৈরি হয়, হ্যাজাক বাতি জ্বলে। শুরু হবে গান। ঠিক সেই মুহূর্তে মোড়ল এবং তার দল নারায়ণ তাকবির শ্লোগান দিয়ে লাঠি সোডা নিয়ে হাজির। হাসান ইমাম সবাইকে অনুরোধ করে তার একটি কথা শোনার জন্য। কিন্তু মোড়ল বলে: 'আমি বাইচা থাকতে এই গেরামে গান বাজনা হইতে দিমুনা।' হাসান ইমাম বলে: 'যা কিছু করার করেন কিন্তু গ্রামটারে রক্তে ভাসাইয়েন না।' মঞ্চ থেকে নয়ন বলে: 'আমার কথা অইলো মোড়লের মতে গান বাজনা যদি হারাম হয়। আমার কিছু সওয়াল জওয়াব আছে। মোড়লেরা এর উত্তর যদি দিতে পারে চিরকাল তাগো পায়ের তলায় থাকুম। আর যদি দিতে না পারে ওই বুইড়া পাট্টি চিরকাল আমাগো পায়ের নিচে থাকব। টু শব্দ করতে পারব না।' মোড়ল বলে: 'হু ওই মিয়ারা ঐ ছেরা কয় কি? কর দেহি সওয়াল জওয়াব।' নয়ন বলে: 'আপনারা বসেন।' লোকজন কোলাহল বন্ধ করে বসে। নয়ন তখন দোতরা বাজিয়ে শুরু করে উপরোক্ত গান। হাসান ইমাম দোতারা বাজিয়ে গান ধরে। গান শেষ না হতেই মোড়ল তার দলবল নিয়ে সকলের অগোচরে পালিয়ে যায়। গান শেষে একজন দৌড়ে এসে খবর দেয় যে নয়নের দোকানে চুরি হয়েছে। একটা মালামালও নাই।

গান করা হারাম নয় যদি তাই হত তাহলে সুরে সুরে কোরআন তেলাওয়াত কিংবা আযান হতো না। তার উল্লেখ উপরোক্ত গানটিতে ব্যক্ত হয়েছে: 'সুর যদি হারাম হতো, বেলালে কি আজান দিত, পড়তো কি কেউ মধুর তানে পবিত্র কোরান।' গীতিকার ফজলুর রহমান মোক্তার, কণ্ঠশিল্পী ইন্দ্রমোহন রাজবংশী এবং সৈয়দ আবদুল হাদী, ফারুক এবং হাসান ইমামের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়।

২. শিশুকণ্ঠে মুক্তি ও দেশাত্মবোধের গান

বাবা-মা'র শাসন অতঃপর পাঠশালার কঠোর নিয়ম কানুন থেকে শিশুরা প্রতিনিয়ত মুক্তি পেতে চায়। এমনতর বাসনার রূপায়ণ গানেও লক্ষ করা যায়। আজিজুর রহমানের *ছুটির ঘন্টা* (১৯৮০) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি তারই রূপবাহী। চলচ্চিত্রে দেখা যায় খোকনের মা চেয়ারে বসে বই খাতা নাড়ছে। পাশের রুমে খোকন হামিং দিয়ে নিম্নোক্ত গানটি চর্চা করে। খোকনের মা হামিং শুনে ছেলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। খোকন জিজ্ঞেস করে: 'কখন এলে মা। এইত তোর গান শুনছিলাম। গানটা তো ভারি মিষ্টি।' খোকন ভীষণ খুশি হয় এবং বলে: 'সত্যি? এই গানটাই তো আমার স্কুলের ফাংশনে গাইব।' মা বলে: 'আরেকবার গা না? তখন গিটারের রিদম দিয়ে শুরু করে গান। এরপর নীলগিরি উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরো গানটি শিশু-কিশোরদের সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হতে দেখা যায়–

একদিন ছুটি হবে অনেক দূরে যাব
নীল আকাশে সবুজ ঘাসে খুশিতে হারাবো ॥

ছুটির আকাঙ্ক্ষায় তারা দিকবিদিক ভুলে গিয়ে খুশির আকাশে মুক্ত বিহঙ্গ হতে চায়। নিম্নোক্ত গানটিতে সে কথারই রূপায়ণ ঘটে। ছুটির সংবাদে শিশুরা পাখা মেলে দূর দিগন্তে পাড়ি জমাতে চায় যেন–'যেখানে থাকবে না কোন বাঁধন, থাকবে না নিয়মের কোন শাসন। এরূপের আরেক প্রকাশ *এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী* (১৯৮০) চলচ্চিত্রেও দেখা যায়–'সে তো কেউ জানে না কখন কবে, আলোর ভুবন জাগলো এলো প্রাণ, সেই থেকে সব কিছুই বন্ধহীন মুক্ত।' আবার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের দেশকে স্বপ্নপুরীতে পরিণত করতে চাওয়ার আশা আপাত দৃষ্টিতে দৃশ্যমান হলেও *ছুটির ঘন্টা* (১৯৮০) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটির প্রায়োগিক কৌশল ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে–

আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরি সাথী মোদের ফুলপরি
ফুলপরি লালপরি লালপরি নীলপরি
সবার সাথে ভাব করি সবার সাথে ভাব করি ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় খোকন বাথরুমে আটকে আছে তার প্রাণ বায়ু প্রায় যায় যায়। অন্তিম মুর্হূত। কিন্তু মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত বেঁচে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা করা। ইতোমধ্যে তা প্রতীয়মান হয়েছে তার চরিত্রে। কে, কিভাবে তাকে উদ্ধার করতে পারে তার কত রকমের কল্পনার আশ্রয় সে নিয়েছে। কিন্তু কোনোটাই শেষ পর্যন্ত বাস্তবে ধরা দেয়নি। কিন্তু তবু তার মনে বাঁচবার আশা দমেনি বরং জুয়েল আইচের জাদুকরী কৌশলের কথা মনে পড়ে তার। কল্পনার চোখে আনমনে বলে: 'ইস্ সেই বাক্স থেকে বেরুনোর ম্যাজিকটা যদি শিখতে পারতাম? তাহলে তো আমি এতক্ষণে বেরিয়ে যেতে পারতাম।' তৎক্ষণাৎ জুয়েল আইচ তার সামনে এসে হাজির। খোকন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে: 'আরে জাদুকর আপনি?' জুয়েল আইচ বলে: 'হ্যাঁ! আমি তো জাদুকর। জাদুকররা সব জানতে পারে।' খোকন: 'আপনি এখানে থেকে আমাকে নিয়ে চলুন না! জুয়েল আইচ বলে: 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো। আমি তো তোমাকে নিতেই এসেছি।'

খোকন শুনে অবাক হয় এবং বলে: 'সত্যি!' তারপর উপরোক্ত গানটি পরিবেশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে জাদুকরের সাথে খোকনকে বিভিন্ন আনন্দঘন পরিবেশে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। যদিও গানের কথা এবং চলচ্চিত্রে ব্যবহারিক বাস্তবতা এক নয়। তবুও নানাবিধ কল্পপরির মাধ্যমে এমনতর উপলব্ধির সঞ্চার হয়, তা যেন কিশোর-কিশোরীদের ভাবী জীবনে পরস্পরের মাঝে সদ্ভাব সম্প্রীতির বন্ধন তৈরিতেও বিশেষ ভূমিকা রাখে। কেননা প্রথম অন্তরায় যেখানে বলা হয়েছে–'এইখানে মিথ্যে কথা কেউ বলে না, এই খানে অসৎ পথে কেউ চলে না, পড়ার সময় পড়ালেখা, কাজের সময় কাজ করা, খেলার সময় হলে খেলা করি।' একটি শিশুকণ্ঠের মাধ্যমে এমন এক স্বপ্ন-দেশের কথা ব্যক্ত হয়েছে গানে গানে তা যেন আর এটি একটি শিশুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, শত শত বাঙালির কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নদেশের কথা ব্যক্ত হয়েছে; বাস্তবে রূপান্তরের আশায় অপেক্ষমান দেশ-জাতি। সি বি জামান-এর *পুরস্কার* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রেও একই বিষয়ের গান ব্যবহৃত হয়েছে। বনভোজনের যাত্রারম্ভে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা মিলে নিম্নোক্ত গানটি গেয়ে আনন্দ-উৎসব করে–

আজ আমাদের কোনো কাজ নেই, আজ আমাদের ছুটি
মুক্ত স্বাধীন কাটাব দিন সকলে ছেলে জুটি ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় পিকনিকে যাওয়ার কথা শুনে ছাত্র-ছাত্রীরা পিকনিক পিকনিক বলে হলরুমে হই হুল্লোড় করতে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তেজনার মধ্যে মাসুদ (বুলবুল আহমেদ) স্যার এসে ঘোষণা দেন যে, এ পিকনিকে সবাই যেতে পারবে না। কেবল যাদের রেকর্ড ভালো তারাই যেতে পারবে। বাদশার দিকে তাকিয়ে বলেন: 'বাদশা যদি সেদিনের জন্যে ক্ষমা চায় আজ, তাহলে ভেবে দেখা যেতে পারে। প্রথম দলে বাদশাকে নেয়া যায় কি না ?' এ কথা শুনে বাদশার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে দৌড়ে এসে স্যারের পা ধরে ক্ষমা চায়। বলে: 'স্যার আমারে মাফ কইরা দেন। আমি অন্যায় করছি, আমার বহুত শাস্তি হইছে। আমি মাফ চাই, স্যার, আমি মাফ চাই। আমি পিকনিকে যেতে চাই।' স্যারের পর বাদশা রতনের কাছেও ক্ষমা চায়। তারপর গানে গানে আনন্দময় পিকনিকের যাত্রা শুরু হয়। রওশন ম্যাডামের নেতৃত্বে সকলের কণ্ঠে গীত হয় উপরোক্ত গানটি। এই গানটি সদ্ভাব সম্প্রীতির পরিচয়বাহী। যেখানে বলা হয়েছে–'আজকে সবাই বন্ধু হলাম নেই কোনো বিবাদ, শপথ নিলাম করবো না আর কোনো অপরাধ।'

এরপর জয়-পরাজয়ের চিরায়ত নিয়মকে স্বাগত জানিয়ে আগামীর পথ আলোকিত করার দৃঢ় প্রত্যয়ে সি বি জামান পরিচালিত *পুরস্কার* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে শিশুকণ্ঠের নিম্নোক্ত গান। চলচ্চিত্রে দেখা যায় অহংকারী মনের বাদশা দৌড় প্রতিযোগিতায় রতনের সঙ্গে হেরে যায় এবং বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। 'নতুন স্যার' (বুলবুল আহমেদ) বাদশার কাছে এগিয়ে যায় এবং বলে: 'কি বাদশা রতনের কাছে হেরে গেছো বলে মন খারাপ? তাতে কি হয়েছে? আজ সে ফার্স্ট হয়েছে, কাল তুমি হবে। যাও বন্ধুদের কাছে যাও।' রতন বাদশার হাত ধরে কাছে টেনে নেয় তারপর শুরু হয় নিম্নোক্ত গান–

হারজিৎ চিরদিন থাকবে তবুও এগিয়ে যেতে হবে
বাঁধাবিঘ্ন না পেরিয়ে বড় হয়েছে কে কবে ॥

উপরোক্ত গানের মূল বক্তব্যে শিশু-কিশোরদের মনে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা তৈরি করার প্রয়াস পাওয়া যায়। জীবনে প্রথম এবং দ্বিতীয় হওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং সামনে এগিয়ে যাওয়াই বড় বিষয়। সে কথার সূত্রধরে গানের প্রথম অন্তরাতে বলা হয়েছে–'কে প্রথম আর কে দ্বিতীয় ভাবছো কেন মিছে, আসল কথা সামনে যাবো রইব না কেউ পিছে।' আবার সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মনোবল তৈরির প্রয়াসে মনটাকে বড় করার কথা বলা হয়েছে–'জীবনটা তো অনেক বড় মনটা কেন ছোট করো, দুনিয়াতে একই সাথে ক'দিন বলো কে রবে।'

শিশুরা আগামীর ভবিষ্যৎ। তাদের সুকুমারবৃত্তির পরিচর্যার্র জন্য মনোরম সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল প্রয়োজন যেখানে তারা মুক্তবুদ্ধির চর্চা করবে। জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা পথ পরিভ্রমণ করবে। চলচ্চিত্র সেই জানবার প্রয়াসকে বিশেষভাবে সহায়তা করে। স্বাধীনতাত্তোর চলচ্চিত্রে শিশু চরিত্র নানাভাবে ॥

চিত্রায়িত হয়েছে এবং তাদের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়েছে বিচিত্র বিষয়ের গান। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, পরিপূর্ণভাবে শিশু-মনকে প্রাধান্য দিয়ে খুব বেশি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়নি এবং যা হয়েছে তা অপ্রতুল।

৩ .আত্মোৎসর্গের গান

সাধারণ অর্থে নিজের জীবনকে অন্যের জন্য উৎসর্গ করার লক্ষ্যে যে গান রচিত হয় তাকে আত্মোৎসর্গের গান বলা যায়। চলচ্চিত্র গণযোগাযোগের অন্যতম শিল্পমাধ্যম; বিনোদনের পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মানুষ মানুষের জন্য এরূপ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্মাতাগণ প্রতিনিয়ত কাহিনিতে মহানুভবতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করে। বেলাল আহমেদ পরিচালিত *নয়নের আলো* (১৯৮৪) চলচ্চিত্রে সেই প্রচেষ্টার প্রয়াস লক্ষণীয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় যে, আলো (কাজরী) শহরে আসে তার প্রেমিক জীবনের (জাফর ইকবাল) খোঁজে। এখানে এসে পপ শিল্পী রাসেলের (আসাদ) ফাঁদে পড়ে সে। রাসেল রুনা খানকে ভালোবাসে। এক সময় সংগীত পরিচালক রুনা খান জীবনের (জাফর ইকবাল) গানের প্রশংসা করে এবং তার সাথে আলিঙ্গন করে। এই দৃশ্য দূর থেকে আলোকে দেখতে সাহায্য করে রাসেল (আসাদ)। আলোর মনে জীবন সম্পর্কে ভুল ধারণা জন্ম নেয়। ক্ষোভে দুঃখে সে আবার তার গ্রামে ফিরে যেতে চায়। আসাদ তাকে জোর করে গাড়িতে তোলে এবং বলে: 'যে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছো সেখানো তোমার যাওয়া উচিত হবে না। তুমি বরং শহরের আনন্দ ফূর্তির জীবন বেছে নাও।' বিভিন্নভাবে আলোকে প্ররোচিত করে। অবশেষে আলো বারে ডান্স পরিবেশন করে। একই দিনে সেই বারে জীবনও গান করে। সেখানে আলোকে দেখে চমকে ওঠে জীবন। মঞ্চ থেকে আলো জীবনকে দেখে গান শুরু–'হিম হিম এসো এসো আহা আহা কাম অন ডান্স উইথ মি। বড় চেনা চেনা লাগছে তোমায় কোথায় যেন দেখেছি।'

গান শেষে দেখা যায় জীবন 'আলো আলো' বলে তার পিছু নেয়। কিন্তু আলো তার পরিচয় গোপন করে। নিজের পরিচয় দেয় রোমেলা নামে। জীবন সরি বলে নিজেকে সামলে নেয়। মনে মনে বলে 'একেবারে আলোর মত দেখতে।' রুনা খান যখন জীবনের কাছ থেকে জানতে পারে আলোর কথা, তার ভালোবাসার মানুষের কথা। তখন রাসেলকে ভুল ভাঙ্গাতে বলে। রাসেল যখন রুনাকে ফিরে পায়। তখন ক্ষমা চেয়ে ভুল স্বীকার করে রাসেল এবং বলে যে আমি রুনাকে পাওয়ার জন্য এ অভিনয় করেছি। রুনা জীবনের কাছে ফিরে যেতে বলে আলোকে। আলো বলে: 'না জীবন আমাকে কখনো ক্ষমা করবে না। ওকে আমি অনেক অপমান করেছি।' এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারালে দুর্ঘটনায় দুটি চোখ নষ্ট হয়ে যায় আলোর।

একই হসপিটালে ভর্তি থাকে নয়ন (সুর্বণা)। কিন্তু তার কোন অসুখ ধরা পরে না। এমতাবস্থায় হসপিটালে ভর্তি রোগীদের সেবা করে নয়ন। দিনে দিনে সমস্ত রোগীদের কাছে সে প্রিয় হয়ে ওঠে। ঘটনাচক্রে গ্রাম থেকে আসা যে জীবনকে নয়নের ভাই মন্টু (প্রবীর মিত্র) আশ্রয় দিয়েছিল। তার বোন নয়নও ভালবাসে জীবনকে। আলো তার কেবিনে বসে আছে একা। নয়ন কাছে এসে বলে: 'চলো বাইরে যাই সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকতে তোমার ভালো লাগে? আমি তো একদম পারি না।' আলো বলে: 'আমার ঘরেও যা বাইরেও তাই।' নয়ন বলে: 'তাই বলে চুপচাপ ঘরে বসে থাকবে?

আমার চোখ দিয়ে দেখবে। আমি তোমাকে সব দেখিয়ে দেব। এসো।' তারপর নিম্নোক্ত গানটি শুরু করে নয়ন–

আমি তোমার দুটি চোখে দুটি তারা হয়ে থাকব
ছায়ার মত তোমার পাশে তোমার কাছে থাকব ॥

নয়ন আলোকে পথ দেখিয়ে চলে। তাকে চলার পথে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। গান শেষে তা-ই দেখা যায় আলোকে সাবধানে কেবিনে ধরে নিয়ে যায়। নয়নের ভাই মন্টু উপস্থিত হয় এবং জিজ্ঞেস করে: 'আলো কেমন আছো, আলো বলেঃ 'ভালো, আমার তো কোন অসুবিধা হচ্ছে না। নয়নের চোখ দিয়ে আমি সব দেখতে পাচ্ছি।' এ যেন আলোর চোখে আলো ফিরে পাওয়ার ইঙ্গিত বা ইশারা। এক সময় জানা যায় নয়ন দুরারোগ্য ব্যধি ক্যান্সারে আক্রান্ত। নয়ন তার চোখ দুটি আলোকে দান করেছে। নয়ন তার ভাই মন্টুকে বলেঃ 'আমার চোখ দুটো আলো 'বু' কে (আলো) দিয়ে গেলাম।...আমার চোখ দিয়ে আলো দেখবে তার জীবনকে। আর আলোর চোখের তারায় তুই খুঁজে পাবি তোর নয়নকে।' নয়নের জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে জীবনের কাছে–'আমার সারা দেহ খেওগো মাটি' গানটি শুনতে চায় নয়ন। জীবন তাকে শোনায় গানটি করুণ সুরে বৈতালিকভাবে। এ ছবির শেষ সংলাপ জীবন এবং আলোকে জড়িয়ে ধরে মন্টু বলেঃ 'তোর দুটি চোখের তারায় আমার নয়নের আলো।' গানটি বেজে উঠে আমি তোমার দুটি চোখে দুটি তারা হয়ে থাকব। গান একটি বিশেষ মুহূর্তকে স্মরণ করিয়ে দেয় তা দু'ভাবেই কখনো আনন্দের কখনো বা বেদনার বার্তা হয়ে। এখানে বেদনার চরম বার্তা হয়ে পরিবেশিত হয়।

৪. কল্পনার চোখে স্বপ্নপূরণের গান

কল্পনার চোখে যে গান স্বপ্নপূরণের দিকে নিয়ে যায়, পরিবেশিত এমন কোন গানকে সাধারণ অর্থে কল্পনার চোখে স্বপ্নপূরণের গান বলা যেতে পারে। লেখাপড়া না জানা লাইলী (অঞ্জনা) এবং রহমতের (রাজ্জাক) অভিনয়ে পরিবেশিত *অশিক্ষিত* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটি বর্ণিত গানেরই রূপবাহী। চলচ্চিত্রে দেখা যায় একদিন ঢাকা থেকে কালোর (টেলিসামাদ) চিঠি আসে রহমতের (রাজ্জাক) কাছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে রহমত দৌড়ে যায় তার ওস্তাদ মানিকের (মাস্টার সুমন) বাড়ি। তাকে চিঠি পড়ে শোনাতে বলে। মানিক বলে না এ চিঠি তুমি পড়বে। মানিকের মায়ের সামনে চিঠি পড়ে রহমত। তারপর তারা দুজনে সিদ্ধান্ত নেয় ঢাকা যাবে। কালোর সহযোগিতায় সাত তলা ভবনে চাকরি করবে। কাজ ঠিকমত পেলে চাচিকেও অর্থাৎ মানিকের মাকে (রোজি সামাদ) সাথে নেবে। এরপর দেখা যায় রহমতের শহরে যাওয়ার কথা শুনে লাইলীর (অঞ্জনা) ভীষণ মন খারাপ হয়। তার দুঃখ শহরের সুন্দরীদের দেখে সে চমকে যাবে, লাইলীকে ভুলে যাবে। রহমত সান্ত্বনা দেয় এবং বলেঃ 'নারে লাইলী তুই ছাড়া আমার চক্ষু কেউ চমকাইতে পারব না। কালা (টেলিসামাদ) আমার জন্যে সাত তলা দালানে চাকরি ঠিক করছে। শহরে যাইয়া আমি একখান ঘর লমু। তুই থাকবি আমার ওস্তাদ থাকব।'...তুই ঘরের কাম করবি আর আমি চাকরি করুম। সন্ধ্যার পর আমরা তিনজনে মিলা যেহানে খুশি ঘুইরা বেড়ামু। পাখির মত উইড়া বেড়ামু।...কল্পনার চোখে ল্যাম্পপোস্টের ক্লোজ শট আরো ক্লোজ হয়। নড়ে চড়ে মিউজিকের তালে তালে। শাড়ি পরিহিতা লাইলী তার ঘোমটা সরিয়ে নববধূর ঢঙে নিম্নোক্ত গানটি গায়–

ঢাকা শহর আইসা আমার আশা ফুরাইছে
কত লাল নীল লাল নীল বাত্তি দেইখা নয়ন জুড়াইছে ॥

এক সময় গ্রামের মানুষের কাছে শহর যাত্রা ছিল বড়ই আনন্দ এবং কৌতুহলের বিষয়। তা ইতোমধ্যে গ্রাম থেকে আসা লাইলী এবং রহমত চরিত্র দুটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে এক সময়ের সমাজ ব্যবস্থার চিত্র, শিক্ষা-দীক্ষা, ইত্যাদির স্বরূপ নির্ণয় করা যায়। কল্পনার চোখে শহরে এসে সব কিছু যেন তাদের কাছে অবাক আর বিস্ময়ের বস্তু। শহরের যান্ত্রিক কোলাহলে যেন তারা গোলক ধাঁধায় পড়ে গেছে, কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছে না। গাজী মাজহারুল আনোয়ার কথায় এবং সত্য সাহা সুরে, উপরোক্ত গানটি শাম্মী আকতারের কণ্ঠে অঞ্জনা এবং রাজ্জাকের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়।

সত্তর দশকের *পীচ ঢালা পথ* (১৯৭০) চলচ্চিত্রে 'পিচ ঢালা এই পথ টাকে ভালোবেসেছি আর গোলক ধাঁধার চক্করে যতই পড়েছি' গানটির দিকে লক্ষ করলেও তখনকার মানুষের কৌতুহল আর আগ্রহের বিষয়টি চোখে পড়ে। পিচ ঢালায়কৃত পথঘাট সচরাচর না দেখতে পেয়ে কোন এক তরুণ যেন বিমোহিত এবং এই পথটিকে ঘিরে দিনে দিনে নানা রকমের ফন্দি-ফিকিরি গড়ে উঠেছে তার একটি বাস্তব চিত্রও লক্ষ করা যায়। আয়-রোজগারের কত রকম কৌশল গড়ে উঠে তার চিত্র পাওয়া যায়। এই চিত্র বর্তমানেও চলমান এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্ধ্যার পর ঢাকাসহ অন্যান্য শহর, উপ-শহর ভীষণ অনিরাপদ। যেখানে দিনে দুপুরে ছিনতাই, রাহাজানির মত ঘটনা অহরহই ঘটে থাকে। এর সূচনা হয়তো এদেশে অনেক আগে থেকেই। তারই ইশারা চলচ্চিত্রের গানেও ব্যক্ত হয়েছে।

৫. বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের গান

একে নাটকীয় গান বলা যেতে পারে। খলনায়ক যেমন তার বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নাটকীয়তার আশ্রয় নেয়। অপরদিকে খলনায়ক কর্তৃক সৃষ্ট সেই নাট্য ঘটনা থেকে উত্তরণ বা রেহাই পাওয়ার ঘটনাটিও নায়ক কিংবা নায়িকা অথবা অন্য কোন মহান চরিত্র নাটকীয়ভাবে ঘটিয়ে থাকে এবং তা গানের মাধ্যমে। যেমন নায়িকাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়া কিংবা নায়ক-নায়িকাকে আটকে রাখা, সহায় সম্পত্তি জোর জবরদস্তি করে লিখে নেয়া ইত্যাদি নানাবিধ ঘটনা। গানের মাধ্যমে সেই সব ঘটনা থেকে উদ্ধার করাকেই বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের গান বলা যেতে পারে। সাপুড়ে, বাউল, ক্লাব বা পার্টিতে বাইজি ইত্যাদি নানা রূপ ধারণ করে নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্য হাসিল করার বিষয়টি লক্ষ করা যায়।

অশোক ঘোষের *মতিমহল* (১৯৭৭) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি ফিরোজা বানু (কবরী) এবং টেলিসামাদের অভিনয়ে পরিবেশিত যা ইমরানকে (রাজ্জাক) উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের অর্থে ব্যবহৃত হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায় ফিরোজার সাথে বিয়ে ঠিক হয়

ইমরানের। ইমরানের আরেক নাম শমসের। এদিকে ইমরানের সৎ ভাই জামশেদ প্রচার করা হয় শমসেরকে মেরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু দেখা যায় শমসের একদিন রাতের অন্ধকারে ফিরোজার ঘরে প্রবেশ করে। ফিরোজা তাকে চলে যেতে বলে, তা না হলে সে চিৎকার করবে। কিন্তু শমসের চলে যাওয়ার আগ মুহূর্তে জামশেদের চরিত্র সম্পর্কে অবগত করে এবং সে যে ইমরানের বাগদত্তা সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। মিথ্যে ধর্ষণ এবং হত্যার অপবাদ দিয়ে যে তাকে অর্থাৎ ইমরানকে মতিমহল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে সে কথাও বলে যায়।

এরই বদলা নিতে এবং নিরীহ গ্রামবাসীকে তার সৎ ভাই জামশেদের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে গিয়ে ইমরান যে শমসের ডাকু হয়েছে সে কথাও জানিয়ে যায়। কিন্তু ঘর থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় সে ধরা পড়ে এবং তাকে মতিমহলে বন্দি করা হয়। ফিরোজা বুঝতে পারে এসব চক্রান্তের কথা এবং তা দৃষ্ট হয় টেলিসামাদ যখন ফিরোজাকে বলে: 'তোমার হুঁশ ফিরেছে? ফিরোজা বলে: 'হ্যা, কিন্তু এবার ওদের বেহুঁশ হবার পালা।' তারপর কানে কানে বুদ্ধি পরামর্শ করে দুজন। এরপর শুরু হয় নিম্নোক্ত গান–

ফিরোজা: নাম আমার গোলাপী এনেছি জিলাপী
ও জামাল দার্জি ও হাবিল দার্জি
গরম গরম নরম নরম খেয়ে দেখ না
টেলিসামাদ: নাম আমার আমিনা
সাত পাকে থাকিনা
ও জামাল দার্জি ও হাবিল দার্জি
মিঠা মিঠা ঠাণ্ডা লাচ্ছি খেয়ে দেখ না

দুজনে নর্তকীর বেশে প্রবেশ করে এবং নাচে-গানে সবাইকে মাতিয়ে তোলার মধ্য এটা-সেটা খাবার খাওয়াতে দেখা যায়। এক সময় সকলে চেতনা হারিয়ে ফেললে ইমরানকে উদ্ধার করে আনে। এফ কবীর চৌধুরীর *আলিফ লাইলা* (১৯৮০) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃপা প্রার্থনাপূর্বক বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়া এবং শত্রুকে সাবধান করে দেয়ার নিমিত্তে শাহজাদি লায়লার (শাবানা) অভিনয়ে পরিবেশিত হয়–

যে জীবন দেনেওয়ালা সে জীবন লেনেওয়ালা
তুই করবি কি খুন
আরে নীল দরিয়ায় মরবি ডুবে পাষাণ ফেরাউন
আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু

চলচ্চিত্রে দেখা যায় হাসান এবং তার বাবা কবর খুড়ার কাজ করে। হাসান (ওয়াসিম) ঘুমুচ্ছে। তার বাবা তাকে বলে: 'ওঠো বাবা একটা লাশ এসেছে।' হাসান লাশের মুখ থেকে কাপড় সরাতেই আঁতকে উঠে বলে: 'একি বাদশা হুজুরের (আনোয়ার হোসেন) লাশ! বাদশা হুজুরের গায়ে অনেক আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়ে হাসান হতবাক হয়ে তার বাবাকে বলে: 'এমন নিষ্পাপ লোক তাদের হাতে নিহত হয়েছে লায়লাও বোধহয় এই ষড়যন্ত্রের শিকার। সৎ, নির্ভীক অন্যায়ের প্রতিবাদী যুবক

হাসান। তার মনে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে। সে তার বাবাকে বলে: 'আমি মহলে যাব।' হাসানের বাবা তাকে সর্তক করে দিয়ে বলে: 'ওরা হাজার জন তোমার একার পক্ষে ওদের সাথে লড়াই করা সম্ভ নয়।' পিতার উত্তরে বলে: 'লক্ষ বেইমানের বিরুদ্ধে একজন ইমানদারই যথেষ্ট। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন।'

হাসান ঘোড়া নিয়ে রওয়ানা হয়। তার বাবা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। এদিকে দেখা যায় লায়লার দু হাত বেঁধে রাখা হয়েছে। তার সামনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে শত্রুপক্ষ। লায়লা বলে: 'আমার মা কে তুই হত্যা করেছিস। আমার বাবাকেও...আমাকে করতে হয় কর। আমি প্রতিশোধ নিতে না পারলে আল্লাহ তোর জন্যে জম পাঠাবে।' লায়লার চিবুক ধরে মৃত্যুর হুমকি দিয়ে বলে: 'বিয়ে করবি নতুবা মৃত্যু। আজ একটাতো বেছে নিতেই হবে। হা হা হা।' অবিরল চাবুকের আঘাত করতে থাকে লায়লার গায়ে। প্রতিটি আঘাতের সাথে লায়লা আল্লাহ বলতে থাকে।

এবং শুরু করে উপরোক্ত গান। এমন পরিস্থিতিতে লায়লার সৃষ্টিকর্তার কাছে বিচার প্রার্থনা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। ক্ষমতার চেয়েও বড় ক্ষমতামান রয়েছে। সে শক্তি বা ক্ষমতার কাছে অপরাধের শাস্তি পেতেই হবে। সে কথাই ব্যক্ত হয় এভাবে–'বাদশার প'রে আছে বাদশাহ যার, তার কাছে সাজা পাবে নিঠুর সিমার।' অবশেষে হাসান মহলে প্রবেশ করে এবং পিতৃ-মাতৃহীন লায়লাকে উদ্ধার করে। অতঃপর শত্রু দলকে পরাজিত করে লায়লাকে গ্রহণ করে এবং রাজ্যের বাদশাহ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে।

এক সৎ এবং নীতিবান পুলিশ অফিসারের জীবন কাহিনিকে নিয়ে নির্মিত হয় শিবলি সাদিকের *নীতিবান* (১৯৮৮) চলচ্চিত্র। এ কাহিনিচিত্রের নিম্নোক্ত গানটি আপাত দৃষ্টিতে নায়িকার মন জয় করার বিষয় মনে হলেও আসলে তা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হয়। পাচারকারী জন (খলিল) তার বিশেষ স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য জয়কে (ইলিয়াস কাঞ্চন) লিজার (চম্পা) পেছনে লেলিয়ে দেয়। তা ওঠে আসে নীতিভ্রষ্ট, পাচারকারী মাফিয়া জন এবং তার পার্টনার টমির (এটি এম শামসুজ্জামান) সংলাপে। টমি বলে: 'ওকে যত তাড়াতাড়ি পারো মি. আজিমের পরিবারে পাঠিয়ে দাও। সেখানে লিজা আছে ছোট বেলার সাথী। তারপর সুযোগ বুঝে কামটা ফতে করতে হবে।'

এরপর দেখা যায় জন, জয়ের কাছে যায় এবং বলে: 'লুক মাই সান। তোমার এতদিনের অপারেশনগুলো ছিল মারাত্মক, ঝুঁকিপূর্ণ লোমহর্ষক...।' এবার তাকে দিয়ে একটা মুডি এবং রোমান্টিক অপারেশন করাতে চায়। জয় অবাক হয়ে বলে: 'অ্যা মুডি অপারেশন? তারপর এই শহরের বিখ্যাত ধনী বাঙালি ব্যবসায়ী মি. খালেদ আজিমের সাথে পুরনো শত্রুতার জের ধরে তার মেয়ে লিজাকে কিডনাপ করতে বলা হয়। তার সাথে ভালবাসা এবং প্রেমের অভিনয়ে চব্বিশ ঘন্টা আটকে রাখার কথা বলে। জয়ের হাতে লিজার ছবি দিয়ে চলে যায় জন। লিজার ছবি দেখে জয় বলে: 'কিড নাপ আবার প্রেম প্রেম খেলা ইম্পসিবল।' তারপর তার সহযোগী বরকতউল্লাহ অপারেশন পদ্ধতিনামা বের করে দেখে নেয় কিভাবে এগুতো হবে। দুজনে মিলে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লিজার গতিবিধি লক্ষ করে অতঃপর লুঙ্গি, পাঞ্জাবী, মাথায় টুপি পড়ে প্রথমত জয় তার পিছু পিছু নিম্নোক্ত গানটি গায়–

তুমিও বাঙালি আমিও বাঙালি
এসো দুজনে মিলে মনের কথাটি বলি ॥

গান শেষে দেখা যায় জয় নিরাশ হয়ে বলে: 'একে বোধহয় পটানো যাবে না' বরকতউল্লাহ ডায়েরি দেখে আবার নতুন ফন্দি আটে।

৬. পাশ্চাত্য বা মাইকেল জ্যাকসন প্রভাবিত গান

প্রতিটি দেশ তার নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠে এবং তা নিয়ে গৌরববোধ করে। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির আবির্ভাবে ভিনদেশি সংস্কৃতির প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য সংগীত বা সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে নিজস্ব সংস্কৃতি টানাপোড়েনে পড়ে। সেই ভাবনা কিংবা তারই দুঃখবোধের প্রকাশ ঘটে নিম্নোক্ত গানে। একটি দেশের বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে মিশে থাকে সে দেশের মানুষের হাজার বছরের জীবন-যুদ্ধ-সংগ্রামের অতীত ইতিহাস। কিন্তু তাতে ভিনদেশি বাদ্যযন্ত্র অধিক জায়গা দখল করে নিলে জাতি তার অস্তিত্ব নিরূপণে অনেকখানি শংকিত হয়ে পড়ে। শফিকুর রহমানের *ঢাকা '৮৬* (১৯৮৮) চলচ্চিত্রে সেই শঙ্কারই প্রতিফলন লক্ষণীয়–

আউল বাউল লালনের দেশে
মাইকেল জ্যাকসন আইলো রে
আরে সবার মাথা খাইল রে
আমার প্রাণের দোতরা কান্দে রে
আমার সাধের সারিন্দা কান্দেরে ॥

পাশ্চাত্য সংগীত বিশেষত মাইকেল জ্যাকসনের গান এদেশের তরুণ সমাজের নিকট ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আজ অবধি তা কমেনি। এক সময় পার্টি বা ক্লাবে তরুণদের মাঝে আনন্দ ফুর্তির অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল জ্যাকসনের জমকালো নাচ-গানের পরিবেশনা। চলচ্চিত্রের গানেও তার চিত্র লক্ষণীয়। বর্ণিত চলচ্চিত্রে দেখা যায় একদিন সোহানের (বাপ্পারাজ) জন্মদিনকে ঘিরে তার সকল বন্ধুরা মাইকেল জ্যাকসনের নাচ-গানের অঙ্গভঙ্গিমায় আনন্দ উৎসব করে। এসব দেখে সোহানের মামা শরীফ (রাজ্জাক) যে শিক্ষিত চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান রসিক ব্যক্তি। তরুণদের এমন সব অঙ্গভঙ্গি দেখে তার কাছে অদ্ভুত এবং খুব হাস্যকর মনে হয়। অবশেষে সোহান এবং তার বন্ধুদের অনুরোধে শরীফ নিম্নোক্ত গানটি পরিবেশন করে। গানটিতে বাঙালির চিরায়ত রূপ বিধৃত হয়। শান বাঁধানো পুকুর ঘাট, চতুর্দোলা, পুথিপাঠের আসর এবং ঐতিহ্যিক বাদ্যযন্ত্র একতারা, দোতারা, ঢাক-ঢোল, বাঁশি প্রভৃতি। পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র–ড্রামস, গিটার, কিবোর্ড প্রভৃতির প্রভাবে ঐতিহ্যিক বাদ্যযন্ত্র এসব হারিয়ে যাচ্ছে। শরীফ (রাজ্জাক) নতুন প্রজন্মের কাছে বাঙালির দীর্ঘদিনের লালিত হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির নানা কথকতা উপস্থাপন করে উপরোক্ত গানের মাধ্যমে।

৭. দ্রোহ ও মৌন প্রতিবাদের গান

আমজাদ হোসেনের *জন্ম থেকে জ্বলছি* (১৯৮১) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি দ্রোহ, ক্ষোভ, প্রতিবাদের অন্যতম ভাষা হিসেবে প্রতিভাত হয়। গানটির প্রয়োগ ভাবনায় লক্ষ করা যায় যে, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গান গাইতে গিয়ে একজন সংগীতশিল্পীর গলায় গুলি লাগে। যে গানটি গেয়ে সে আহত হয়েছিল সেই গানটি সে গাইতে এবং তার ছাত্রীকে শেখাতে রাজি নয়। তার মনে কেবল একটি আতঙ্ক সর্বদা বিরাজ করে যে এই গানটি গাইলে গুলি খেতে হয়। তা দৃষ্ট হয় ছাত্রী রানু (ববিতা) এবং শিক্ষক (বুলবুল আহমেদ) দুজনের কথোপকথনে। ছাত্রী যখন শিক্ষককে কাঁদতে দেখে অবাক হয়ে বলে: 'আপনি কাঁদছেন! কেন? কি হয়েছে আপনার? কি হয়েছে? বলবেন না আমাকে?' উত্তরে শিক্ষক বলে: 'একটা গান আমি একসময় রাস্তার মোড়ে মোড়ে গাইতাম। সেই গান শুনে মানুষের চোখে জল আসত। একদিন একাত্তরে একটা গুলি এসে লাগে আমার গলায়। রানু সেই থেকে আমি আর সেই গানটা গাইতে পারি না, আমি আর আগের মত পারি না, রানু আগের মত পারি না।'

ছাত্রী বলে: 'যে গান আপনি গাইতে পারেন না। সেই গান আমাকে শিখিয়ে দিন।' ছাত্রীর ইচ্ছা শিক্ষক যে গান গাইতে গিয়ে আহত হয়েছেন সে গানটি সে নিজে গাইবে এবং তার বেদনা দূর হবে। তাই সে বলে: 'হ্যা আমিও আপনার মত রাস্তার মোড়ে মোড়ে সে গান গাইব।' কিন্তু শিক্ষক ভয়ে বলে: 'রানু রানু এই সব গান গাইলে গুলি খেতে হয়।' ছাত্রীর সাহসী উদ্যোগ: 'তবু সেই গান আমি শিখব, সেই গান গাইব।' ছাত্রীর বিশেষ অনুরোধে গানটি শেখাতে শুরু করে–

জন্ম থেকে জ্বলছি মাগো
আর কতদিন বলো সইব
এবার আদেশ করো তুমি
আদেশ করো
ভাঙ্গনের খেলা খেলব ॥

নির্যাতিত নিপীড়িত হৃদয়ের যে ক্ষত যা তিলে তিলে জমে গভীর বেদনায় পুঞ্জিভূত। সেখানে আনন্দ আহলাদের কোন অবকাশ নেই। কেবলই বেদনার দীর্ঘ নিশ্বাসেরা গগন বিদারী সুরে আকাশ চুম্বী হয়। তাই বলা হয়–'আমিতো দেখিনি আলো, জীবনে কোনদিন, ও ও ও কত আশা ভালোবাসা, আঁধারে হলো যে মলিন দিন, চলে যায় দাও বিদায়, সময় হলেই ফিরে আসব।' পরিচালক কণ্ঠাহত বিষয়টিকে সমগ্র দেশবাসীর কণ্ঠরোধকেই বুঝিয়েছেন বলে ধারণা অনুভূত হয়। স্বাধীনতার পয়তাল্লিশ বছরেও এই কণ্ঠরোধের বিষয়টি অর্থবহ হয়ে ওঠে।

৮. সৃষ্টিকর্তার কৃপা লাভ ও নীরবতা ভঙ্গের গান

কোন একটি চরিত্র জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অবস্থান করলে কিংবা চরম বিপদগ্রস্ত হলে, প্রাণ ফিরে পাওয়ার আশায় কিংবা বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য অথবা স্বপ্ন পূরণের আকাঙ্ক্ষায় সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা বিষয়ক গানকে বর্ণিত শিরোনামের গান বলা যেতে পারে। বাস্তবিক জীবনেও এর প্রচলন রয়েছে তবে তা প্রেক্ষাপট ভেদে ভিন্ন। চলচ্চিত্রের কাহিনিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপরোক্ত ভাবনার প্রতিফলন গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। মোস্তাফা মেহমুদের *জয় পরাজয়*

(১৯৭৬) চলচ্চিত্রে সৃষ্টিকর্তার কৃপা লাভের আশায় নিম্নোক্ত গানটি জীবনের (আলমগীর) অভিনয়ে পরিবেশিত হয়–

দোহাজানের মালিক তুমি
হে পরওয়ারদিগার
আমার গুনাহ মাফ করে দাও
মনের কালি সাফ করে দাও ॥

চিত্র-৪০: *জয় পরাজয়* (১৯৭৬) চলচ্চিত্রে 'দোহাজানের মালিক তুমি' গানের একটি স্থিরচিত্রে আলমগীর।

চলচ্চিত্রে দেখা যায় নানাবিধ কৌশলের আশ্রয়ে জীবন মানুষকে ঠকায়। এক সময় বলি হয় আলোর (শাবানা) মা। আলোর মা তার হাতের বালা চোরকে ধরতে গিয়ে বাস অ্যাকসিডেন্টে চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে যায়। ঘটনাচক্রে দেখা যায় এর জন্য দায়ী জীবন। তার মনে অনুশোচনার জন্ম নেয়। তাই সে আল্লাহর দরবারে মার্জনা স্বরূপ তথা আলোর মায়ের দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার জন্য ফরিয়াদ করে। সেই সাথে নিজের যত পাপকর্ম আছে তার জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করে সে।

শেখ নজরুল ইসলামের *নাগিন* (১৯৮০) চলচ্চিত্রে–'ইয়া মালিক দিবানিশি কত অসহায় বান্দা যে রয়, তবু যা তুমি চাও মাবুদ, তাই শুধু হয়, জীবন তোমার হাতে মওলা, মরণ তোমার হাতে, সাজা তোমার হাতে মওলা, মাফ-ই তোমার হাতে।' গানটিও মাজার বা দরগা শরীফের কাছে কাজল দিঘি জমিদারের পুত্র সেলিম চৌধুরীর (রাজ্জাক) প্রাণ ভিক্ষার জন্যে পরিবেশিত হয়। পাখি শিকার করতে এসে সাপ কাটে তাকে। তখন বেদে সর্দার এবং তার নিজ কন্যা এবং পালিত জমিদার কন্যা সকলে মিলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে উপরোক্ত গানের মাধ্যমে। একই রকম ভাবাবেগের প্রকাশ সাঈদুর রহমান সাঈদের *আলোমতি প্রেম কুমার* (১৯৮৯) চলচ্চিত্রেও লক্ষ করা যায়–'রহম করো হে খোদা চাই তোমার বিচার।'

কোথাও যখন কিছু নেই তখন মানুষই তো মানুষের নিয়ন্তা। তাই প্রচলিত প্রথার বাইরে যাওয়া সম্ভব হয়। ষাট দশকের সমাজে প্রতি সংস্কৃতি বা কাউন্টার কালচার জন্ম নিয়েছিল।[৬৭] রফিক আজাদের 'ভাত দে' কবিতা সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ধরনের প্রভাব শিল্পের বিবিধ শাখায় পড়েছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি সমাজে যখন প্রকট মানুষ যখন অসহায়, ক্ষুর্ধাত, সমাজপতি কিংবা মোড়ল দ্বারা নিপীড়িত, নির্যাতিত। আবার সৃষ্টিকর্তাও যখন নীরব নিস্তব্ধ, তার কাছে নালিশ দেয়াও অবান্তর

মনে হয়। তখন ক্ষোভ আর আক্ষেপে নানাবিধ প্রশ্নের উদয় হয়। আমজাদ হোসেনের *সুন্দরী* (১৯৭৯) চলচ্চিত্রের অন্যতম চরিত্র 'সুন্দরী' (ববিতা) বর্ণিত পরিস্থিতির শিকার। চারপাশের মানুষ দ্বারা নির্যাতিত নিপীড়িত, সহায় সম্বলহীন, বন্ধু হারা এবং ক্ষুধা, দারিদ্রতায় প্রাণবায়ু যখন নিভু নিভু ঠিক তখনই প্রচণ্ড ক্ষোভ আর দুঃখের প্রকাশ ঘটে এভাবেই–

তোমারও দুনিয়া দেখিয়া শুনিয়া
মনের আগুন দ্বিগুণ হইলো জ্বলিয়া পুড়িয়া
কি হবে নালিশ করিয়া
কি হবে বিচার চাহিয়া ॥

আবার সৃষ্টিকর্তাকে সরাসরি প্রশ্ন ছুড়ে দেয়া হয়–

সবই তো জানো সবই তো শোনো
তবুও কেন ভেঙ্গে চুরে সমান করো না
তুমি দেখিয়া না দ্যাখো চক্ষু বুইজা থাকো
কি হবে তোমার প্রেমে অন্তর জ্বালাইয়া ॥

চিত্র-৪১: *সুন্দরী* (১৯৭৯) চলচ্চিত্রে 'তোমারও দুনিয়া দেখিয়া শুনিয়া' গানের একটি স্থিরচিত্রে ববিতা ।

চলচ্চিত্রে দেখা যায় সুন্দরী (ববিতা) জন্ম হওয়ার সময় তার মা মারা যায়। একমাত্র লাঠিয়াল বাবা জসিম উদ্দিন তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করে। সে পিতাকেও একদিন তালুকদার মেরে ফেলে। ঘটনাচক্রে নিঃস্ব, রিক্ত, সহায় সম্বলহীন, সুন্দরী তালুকদারের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সারাদিন কান্নাকাটি করে। ঘরে স্ত্রী থাকার সত্ত্বেও সুন্দরীকে বিয়ে করার নানা প্রলোভন দেখায়; পরকালের কথা বলে তাকে দুর্বল করার চেষ্টা করে এবং বলে: 'একদিন সবাইকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। কান্নাকাটি কইরা লাভ কি? তুমি কাইন্দনা। তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে সুন্দরীর চোখের জল মুছে দেয়।' সুন্দরীকে স্বপ্ন দেখায় নানাভাবে: 'সুন্দরী আমি তোমারে নিকা করুম। তুমি রাজি হইয়া যাও। সহায় সম্পত্তি লেইকখা দিমু। দু'তালা একখানা বাড়ি বানাইয়া দিমু। তুমি যা চাও তাই পাইবা। রাজি হইয়া যাও।' এসব বলে তাকে জড়িয়ে ধরে সতীত্ব হরণ করতে চায়। তালুকদারকে ধাক্কা মেরে ফেলে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করে দৌড়ে পালিয়ে যায় সুন্দরী। নিজের বাড়িতে গিয়ে আছড়ে পড়ে। বলে: 'আমি গরীব ম্যানসের মাইয়া বইলা আমার কথা তোমরা কেউ বিশ্বাস করবা না।'

তালুকদারের অসৎ উদ্দেশ্য গ্রামের লোকদের নিকট বিশ্বাস করানোর জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টা বলে: 'আল্লাহ তায়ালার কুরআন সাক্ষী, মসজিদ সাক্ষী, আমার মরা বাপের কব্বর সাক্ষী।...তালুকদার

বড়লোক হইছে বইলা তার বিচার তোমরা করবা না? ক্যান করবানা।... কি জন্যে করবানা। আল্লাগো...।' সুন্দরীর গগন বিদারী কান্নায় চারপাশে মানুষ জড়ো হয়। কেউ কোনো কথা বলে না চুপ হয়ে থাকে। তারপর বলে: 'আমার বাবারে মাইরা ফালাইল তার কোন বিচার অইলো না। তালুকদার আমারে জড়াইয়া ধরছে তারও কোন বিচার তোমরা করলা না। ক্যান ক্যান?' তখনো মানুষ চুপ হয়ে আছে। তখন সুন্দরী বড় নিরুপায় হয়ে বলে: 'আমি এখন কার কাছে যামু। কার কাছে নালিশ করমু।... আল্লা আল্লারে।'

অসহায়ের মত ধীর পায়ে আসে তার প্রেমিক কাঞ্চন (ইলিয়াস কাঞ্চন)। সুন্দরীর সামনে এসে দাঁড়ায়। সুন্দরী তার দিকে ইঙ্গিত করে বাবার হত্যার প্রসঙ্গে বলে: 'আমার বাবার তো কেউ নাই। জলজ্যান্ত একটা মানুষরে এইভাবে মাইরা ফালাইলো। এতবড় একটা গেরামের মধ্যে টু শব্দ পর্যন্ত কেউ করল না।' অসহায়ের কণ্ঠে বলে: 'তোমার তো কেউ নাই বাবা। আমি আমি তো একটা মাইয়া মানুষ। আমি কি করমু বাবা। তোমার প্রতিশোধ নেওয়ার শক্তি তো আমার নাই বাবা। কাঞ্চনের নিশ্চুপ আচরণ দেখে তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে: 'একটা ছেলেরে নিজের ছেলে মনে কইরা তারে লাঠি খেলা শিখাইছিলা। এইটাও ভুল করছো বাবা। এইটাও ভুল করছো।... সেও পাড়া পড়শির মত পর।' প্রেমিক কাঞ্চন সে নিজেও সৎ ভাইয়ের সংসারে নির্যাতিত। তাকে তার ভাইয়েরা পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। তার প্রতিবাদ করতে গেলে ভাইয়েরা তাকে মেরে রক্তাক্ত করে দেয়। ফলে সে নিশ্চুপ, কোন কথা বলে না। বোবার মত ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে সুন্দরীর সামনে।

তাকে উদ্দেশ্য করে আবারও বলে: 'দ্যাখোনা ক্যামনে দাঁড়াইয়া থাকে। ...বোবা কথা কয় না। তারপর হাতের সামনে যা পায় তা ছুড়ে মারে কাঞ্চনের দিকে। মাথা ফেটে রক্ত পড়ে। কাঞ্চন চলে যেতে পা বাড়ায়। তা দেখে আবার বলে: 'ঐ দ্যাখো ঐ দ্যাখো আবার চইলা যাইতাছে। এই রকম পুরুষের আমার দরকার নাই।' কাঞ্চন তবুও কোন সাড়া শব্দ করে না চলে যায়। উন্মাদিনীর হাসি হাসে সুন্দরী আর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলে: 'আমার আমার এই রকম পুরুষের দরকার নাই। আমার দরকার নাই। আমার এই রকম ম্যানসের দরকার নাই। হাহা হাহা দরকার নাই হা হা হা। দরকার নাই হা হা হা।

পরের দৃশ্যায়নে দেখা যায় সুন্দরী মানসিকভাবে একটু শক্তি সঞ্চয় করেছে। স্বভাব সুলভ ভঙ্গীমায় তার হাতে চিকন গাছের ডাল। নাড়তে নাড়তে আসে আর সুরে সুরে বলে: 'হগ্‌গলরেই চিনছি গো... হগ্‌গলরেই চিনেছি গো... আর কাউকে বিশ্বাস করি না।' এক সময় দেখে তার এক চাচা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। তাকে বলে: 'ও চাচা, চাচা গো কার জন্যে নামাজ পড়ো?...খালি নিজের আয় উন্নতির জন্যে।...খালি নিজের জন্য নামাজ...লাভ নাইগো চাচা লাভ নাই। যতই নামাজ পড়ো, কান্নাকাটি করো, ঐ মিয়ার ব্যাটা শুনবে নাগো। শুনবে না।' চাচা বলে: 'পাগলামি করিস না মা। পাগলামি করিস না। এই দুনিয়াই থাকতে অইলে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়।' সুন্দরী হি হি করে হাসে বলে: 'তোমার দুনিয়া।' তার হাতে থাকা লাঠিটা ঘুরিয়ে বলে এই দুনিয়াই...। তারপর উপরোক্ত গানটি গায়।

তাঁর পরিচালিত আরেকটি *ভাত দে* (১৯৮৪) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানেও একই রূপের প্রকাশ লক্ষ যায়। এটি সম-সাময়িককালের সামাজিক-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে নির্মিত। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে একটি দেশ-ক্ষুধা দারিদ্রতায় বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। *ভাত দে* চলচ্চিত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে তা-ই দৃষ্ট হয় এবং অন্যান্য পরিবেশনা শিল্পমাধ্যমগুলোতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'একমুঠো ভাত দাও' 'অন্ন চাই' ইত্যাদি নাটক কিংবা যাত্রাপালা গ্রামে-গঞ্জে মঞ্চায়িত

হতে দেখা যেত। সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম কবিতাতেও উঠে এসেছে তার চিত্র। কবি রফিক আজাদের 'ভাত দে' কবিতার 'ভাত দে হারামজাদা তা না হলে মানচিত্র খাব' পঙ্‌ক্তিটি সে কথাই বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়' পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' কবিতার পঙ্‌ক্তিটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *ভাত দে* চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিও সেই সাক্ষ্য বহন করে। শাবানা যখন ক্ষুধা দারিদ্রতায় নানা শ্রেণির মানুষের কাছে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত। তখন গানে গানে তারই প্রকাশ–

তিলে তিলে মইরা যামু তবু তোরে ডাকব না
দুখে দুখে সব হারাব তোর কাছে সুখ চাইব না ॥

চিত্র-৪২: *ভাত দে* (১৯৮৪) চলচ্চিত্রে 'তিলে তিলে মইরা যামু তবু তোরে ডাকব না' গানের একটি স্থিরচিত্রে শাবানা।

চলচ্চিত্রে দেখা যায় জরির (শাবানা) বিয়ে হয় তার বাবার শিষ্য গহর আলীর (আলমগীর) সাথে।গহর আলী সহজ সরল বাউলশিল্পী। সারা দিন দোতারা বাজিয়ে গান করে বেড়ায়। গহর আলী

বিয়ের পর মহাজন এজিদের (রাজিব) কাছে কাজের জন্য যায়। এজিদ কৌশলে গহর আলীকে চালের নৌকায় চাকরি দেয় এবং মাস দেড়েকের জন্য মোকামে পাঠায়। এদিকে জরিকে ভোগ করার জন্য নানা রকম ফন্দি করে এজিদ। একদিন জরির বাড়ি এসে জানালা দিয়ে তাকে ইশারা দেয়। জরি রাজি হয় না। এদিকে নৌকায় ডাকাতির ঘটনা ঘটায় লোকবল দিয়ে। আসামি করা হয় গহর আলীকে যাতে জরির কাছে সে আসতে না পারে। অবশেষে জেলবন্দি হয় গহর।

এদিকে এজিদ দলবল নিয়ে জরির বাড়িতে যায়। এ খবর জানতে পারে হরবলা। যে ভাতের জন্য এজিদের ভোগ্যপণ্য হয়েছে। তা হরবলার কথায়ও উঠে আসে: 'চারটা ভাতের জন্য খারাপ হইয়া গেছি।' আমি চাই না তোর ইজ্জত সে হরণ করুক।' সে জরির বাড়িতে দৌড়ে এসে জানায় এজিদের কথা এবং তাড়াতাড়ি পালাতে বলে। জরি দৌড়ে পালায় ঠিকই কিন্তু প্রাণে বাঁচে না হরবলা। জরির কথা গোপন করার অপরাধে এজিদের লোকেরা তাকে গলায় গামছা চেপে মেরে ফেলে। জরি দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে ভয়ে কুঁকড়ে যায় অবশেষে দৌড়ে পালায়। মানুষের দ্বারে দ্বারে ভাত চায় কিন্তু কেউ তাকে এক মুঠো ভাতও দেয় না। সে ভাত চুরি করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু তার ছোট বেলার কথা মনে পড়ে। তার মাও ভাত চুরির অপরাধে মানুষের হাতে মার খেয়েছে অনেক। মায়ের কথা ভেবে চুরি করতে দ্বিধাবোধ করে। কিন্তু পেটের দায় এড়াতে পারে না। ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে

শরীরের সমস্ত শক্তি খাটিয়ে ডাব ভেঙ্গে তার পানি খায়। এবং মসজিদ, মন্দির, বাজারের দোকানে ঝুলিয়ে রাখা কলা এমনকি মানুষের খাওয়া খাবার সামনে থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে খায় জরি। হঠাৎ একদিন ধরা পড়ে এবং ভাত চুরির অপরাধে তার হাত বেঁধে রাখা হয়। কেন চুরি করে তা জিজ্ঞেস করলে সে প্রায় ম্রিয়মাণ তখন। উত্তরে বলে: 'ভাত চুরি করি নাতো ক্ষিধা লাগে তাই খাই।' কষ্ট আর ক্ষুধার জ্বালায় জরি তখন শ্রান্ত,অসহায়। সকলের সামনে তাকে চুল কেটে দেয়া হয়।

অপরদিকে তার মায়ের মৃত্যু হয় ভাত চুরির অপরাধে। মৃত দেহ সাদা কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়। লাশ দাফনের টাকা সংগ্রহের জন্য। এমন পরিস্থিতিতে জরি উপরোক্ত গানটি গায়। গানে বলা হয়েছে প্রেমিককে উদ্দেশ্য করে–'প্রেম করেছি পাপ করেছি এই পথে কেউ আইসো না, জীবন মৃত্যুর সমান্তরালে দাঁড়িয়ে বলে–'বাঁইচা থাকতে জীয়ন মরা আমার মত মইর না, প্রেম আগুনে পুইড়না।' রিক্ত, নিস্ব জরি মা হারানোর বেদনা, স্বামীর ডাকাতির ঘটনা এবং এজিদের কুকর্ম তাকে নানাভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে। চরম অপমান আর ক্ষুধা দারিদ্রতা, লাঞ্ছনার জ্বালা সইতে না পেরে সৃষ্টিকর্তার নীরবতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি জরি।

৯. স্মৃতি বা স্বজনকে ফিরে পাওয়ার গান

ঘটনাচক্রে হারিয়ে যাওয়া কোন স্মৃতি বা স্বজনকে যে গানের মাধ্যমে ফিরে পাওয়া যায় সাধারণ অর্থে পরিবেশিত সেই বিষয়ক গানকে বর্ণিত বিষয়ের গান বলা যেতে পারে। চলচ্চিত্রের কাহিনি নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নানা কলহবিবাদকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্নতার ঘটনা ঘটে। কখনো সহায় সম্পত্তি আত্মসাৎমূলক ঘটনাকে কেন্দ্র করে অথবা চারিত্রিক ত্রুটি কিংবা প্রেম-ভালবাসা জনিত কারণে। বাবা-মা, ভাই-বোন, সৎ-মা-ভাই-বোন নানাবিধ সম্পর্কের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এমন পরিস্থিতিতে কোন সদস্যকে পরিবার থেকে বিতাড়িত করার ঘটনাও ঘটে থাকে। তবে অনেক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের কাহিনিতে গানের মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝির অবসানকল্পে হারিয়ে যাওয়া স্বজনকে ফিরে পাওয়ার রীতির প্রচলন রয়েছে। মোস্তাফা মেহ্মুদ পরিচালিত *মধুমিতা* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি তারই রূপবাহী–

ওগো মোর মধুমিতা
গহন স্বপন পথে তুমি এলে
তুমি এলে মোর জীবনে
জীবনে প্রদীপ জ্বেলে ॥

চলচ্চিত্রে বাসর ঘরে অন্ধ স্বামী মাসুদ (আলমগীর) তার স্ত্রীর প্রতি গভীর অনুরাগ অনুভব করে। ফলে নববধূ হাবিবার (শাবানা) মনে তার স্বামীর প্রতিও গভীর ভালবাসা তৈরি হয়। বাসর ঘর থেকে কল্পনায় চন্দ্রালোকিত রাতের দৃশ্যায়নে শুরু হয় উপরোক্ত গান; ফেরদৌসী রহমানের কণ্ঠে। চলচ্চিত্রের শেষের দিকে এই গান আবার মাসুদের অভিনয়ে স্মৃতি রোমন্থনে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। যখন জহুরা নামের এক মেয়ের কথায়, আচরণে তার হারানো স্ত্রী হাবিবার সঙ্গে মিল খুঁজে পায়। যাকে একদিন ভুল বুঝে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ঘটনাক্রমে হাবিবা, জহুরা নাম নিয়ে উপস্থিত হয় মাসুদের কাছে। মাসুদের চোখে আলো ফিরে এলে অর্থাৎ সে দেখতে পায় কিন্তু সে

জানে না যে, এই জহুরা আসলে তার স্ত্রী হাবিবা। তা ব্যক্ত হয় মাসুদ যখন জহুরাকে বলে: 'তার রূপ দেখার সৌভাগ্য কোনদিন আমার হয়নি। আমি যে অন্ধ ছিলাম। তবে তার গুণ ছিল অনেক। কথা ছিল তোমার মত মিষ্টি। শুনবে তার কথা?' জহুরা বলে: 'বলো।' মাহমুদুন্নবীর কণ্ঠে পরিবেশিত গানের মাধ্যমে তার স্মৃতিচারণ করে মাসুদ।

শিবলি সাদিকের *নীতিবান* (১৯৮৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটিও প্রিয়জনকে ফিরে পাওয়া কিংবা চেনার অন্যতম পরিচয়বাহী। চলচ্চিত্রে দেখা যায় নীতিবান পুলিশ অফিসার আফজাল (রাজ্জাক) আমন্ত্রণ পেয়ে সপরিবারে অর্থাৎ একমাত্র ছোট ছেলে জয় এবং স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে যায় ব্যাংককে। সেখানে তার পুরনো বন্ধু বড় ব্যবসায়ী খালেদ আজিম (আজিম) এবং তার স্ত্রী ও একমাত্র ছোট মেয়ে লিজার সাথে দেখা হয়। একদিন সবাই মিলে বেড়াতে গেলে বন্ধুর মেয়ে লিজা জয়কে গিটার বাজিয়ে নিম্নোক্ত গানটি গেয়ে শোনায়–

গুণে গুণে এক দুই তিন
যায় যায় চলে দিন
আয় খেলা করি আছে লুকোচুরি
খেলা খেলা ছলে হারিয়ে যে গেলে
খুঁজে নেব চিনে নেব আমি একদিন ॥

পরবর্তীতে দেখা যায় দুই পরিবারের সবাই গানে অংশগ্রহণ করে। পারিবারিক বন্ধন অতঃপর বন্ধুত্বের সুন্দরতম পরিবেশ রচিত হয় গানে গানে। এমনতর আনন্দের রেশ কাটতে না কাটতেই জয় হারিয়ে যায়। তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কাহিনির শেষের দিকে জানা যায় মাফিয়া জন (খলিল) পূর্ববিরোধের জের ধরে বালক জয়কে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। জনের ছত্র ছায়ায় বড় হয়ে ওঠে জয়। অপরাধ জগতে তার নাম পাল্টে যায়। পরিচিতি পায় লাকি নামে। নানাবিধ পরিস্থিতির শিকারে লাকি (ইলিয়াস কাঞ্চন) এবং লিজার (চম্পা) সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু লিজা তার বাল্য বন্ধু জয়কে ছাড়া আর কাউকে ভাবতে পারে না। সে সর্বত্র জয়কে খুঁজে বেড়ায়। নানাবিধ জটিলতার কারণে দুজনের মাঝে ভালবাসা তৈরি হলেও শেষেমেশ লিজা তাকে ভালবাসার কথা অস্বীকার করে বরং চরম ঘৃণা প্রকাশ করে।

লাকি লিজার কাছ থেকে প্রত্যাখাত হয়ে মদ পার্টি এসবে কিছু সময় মেতে থাকে। নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে কাহিনি এগিয়ে যায়। কিন্তু কেউ কাউকে চিনতে পারে না। লিজার ভালবাসা ফিরে পাওয়ার জন্য লাকি আরো অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। লিজার বাবার ছিনিয়ে নেয়া টাকা উদ্ধার করে দেয়। অবশেষে তার ভালবাসা যে খাঁটি তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয় লাকি এবং এক সময় দুজন দুজনকে চিনতে পারে বিশেষত তা নিশ্চিত হয় উপরোক্ত গানের মাধ্যমে। পরিচয় উৎঘাটনের পর্বটি পূর্বোক্ত গানের মাধ্যমে হতে দেখা যায়।

১০. স্ট্রিট সং বা পথের গান

জীবন-জীবিকার তাগিদে রাস্তায় বসে গান গাওয়ার প্রচলন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। অনেক সময় মানুষকে সচেতন করবার প্রয়াসে কিংবা অন্য কোন অধিকার আদায়ের লক্ষ্যেও শহরের ফুটপাতে কিংবা গ্রামে-গঞ্জের, হাটে-বাজারে, যেখানে লোক সমাগম হয় সে সব স্থানে গান গেয়ে মানুষকে আনন্দ দেয়ার পাশাপাশি অর্থ উপার্জনের বিষয়টিও লক্ষ করা যায়। এ ক্ষেত্রে ফুটপাতের ঔষধ বিক্রেতার কথা বলা যায়। যারা বিভিন্ন সময় নানা রকম তথ্য প্রচার করে এবং ছবি প্রদর্শন করে মানুষকে গান গেয়ে আকৃষ্ট করে। এ সব কিছুর উর্ধ্বে থাকে টাকা উপার্জনের বিষয়টি। তবে শহরে এই ধরনের পরিবেশনা বেশি দেখা যায়। আবার জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে মোকাবেলা করার অন্যতম অনুপ্রেরণার শক্তি হিসেবেও গানকে বেছে নেয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

তারই একটি নিদারুণ চিত্র প্রতিফলিত হয় মোস্তফা মেহমুদ পরিচালিত *মানুষের মন* (১৯৭২) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানে। জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই কতটা হাসিমুখে বরণ করা যায় তার চিত্র উঠে আসে গানটিতে। চলচ্চিত্রে দেখা যায়, মনোয়ার (রাজ্জাক) চাকরির জন্য বিভিন্ন অফিসে ইন্টারভিউ দেয়। কিন্তু কোথাও তার কোন চাকরি হয় না। সব অফিসে বড় ভাইয়ের রিকমেন্ডেশন চায়। রাজ্জাক কোন মতেই ভাইয়ের রিকমেন্ডেশনে চাকরি করতে রাজি নয়। অবশেষে মনোয়ারের প্রবল অস্বীকৃতির মুখে তার ভাবি তার হাতের বালাদুটো খুলে দেয়। কিছু একটা করবার আশায়। মনোয়ার হাতের বালা দুটো নেয়ার পর দেখা যায়, প্রসাধনীর ভ্যান ঠেলে গানে গানে বিক্রির কথা প্রচার করে–

এই শহরে আমি যে এক নতুন ফেরিওয়ালা
হরেক রকম সওদা নিয়ে ঘুরি সারাবেলা ॥

একই রূপ প্রতিফলিত হয় আজিজুর রহমানের *অমর প্রেম* (১৯৭৭) চলচ্চিত্রে। সেখানে দেখা যায় মাসুম (রাজ্জাক) এম এ পাশ করে চাকরির জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কোথাও কোনো চাকরি হয় না। টাকার অভাবে সে তার মায়ের চিকিৎসা করাতে পারে না। চোখের সামনে মায়ের মৃত্যু হয়। গ্রামের সহজ সরল ছেলে ঢাকায় চলে আসে। কোথাও কোন থাকার জায়গা নেই অবশেষে চারআনা ভাড়া দিয়ে ফুটপাতে আশ্রয় নেয়। দিনে চাকরির খোঁজ করে আর রাতে এসে ফুটপাতে ঘুমায়।

মাসুমের এই অবস্থা দেখে এক বুট পালিশওয়ালা (হাসমত) বলে: ‘একটা কাজ করবে?’ মাসুম বলে: ‘কি কাজ?’ পালিশওয়ালা বলে: ‘এই যে আমার মত পালিশ পালিশ।’ মাসুম বলে: ‘আমিতো পালিশ জানি না।’ পালিশওয়ালা বলে: ‘আরে আমি শিখিয়ে দেব। আমার কাছে একটা পুরনো বাক্স আছে। কাল থেকে তুমি কাজে লেগে যাও কেমন? আজ থেকে তুমি আমার আমার সঙ্গেই থাকবে।’ তারপর দেখা যায় বুট পালিশওয়ালা একবার বুট পালিশ, আরো নিচু স্বরে জুতা পালিশ বলে নিম্নোক্ত গান শুরু করে। পাশে মাসুম জুতা পালিশটা তার মত করে নিচু এবং মোটা স্বরের ভঙ্গিমায় নিম্নোক্ত গানটা গাওয়ার চেষ্টা করে–

বুট পালিশ জুতা পালিশ

আমার কাছে আছে ভাই
হরেক রকম বুট পালিশ
সাদা ঝক ঝক লাল টকটক
যেমন খুশি করতে পারো
ময়লা জুতোয় রঙ মালিশ ॥

উপরোক্ত গানে জীবন বাস্তবতার এক নির্মম চিত্র প্রতিফলিত হয়। বর্ণিত চলচ্চিত্র নির্মিত সময়কালের কর্মসংস্থানের একটি নিদারূণ চিত্র ওঠে আসে। শিক্ষিত মানুষের জীবন কতটা সংকটাপূর্ণ ছিল কিংবা ভয়বহ বিপন্নতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে তা উপলব্ধ হয়। যদিও স্বাধীনতার ৪৭ বছরেও এই রূপের তেমন কোন পরির্বতন হয়নি বললেই চলে। এখনো অনেক শিক্ষিত যুবক চাকরি না পেয়ে হতাশা আর নানা বঞ্চনার শিকার হচ্ছে এবং নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছে। উপরোক্ত গানটির ন্যায় নারায়ণ ঘোষ মিতার *সুখের সংসার* (১৯৮১) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গানটিও একজন হকারের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। একজন অনার্স পাশ করা ছাত্র জীবন বাস্তবতার কঠিন যুদ্ধে রোজ সকালে হকারী করে। ‘চাই পেপার’ বলে বলে এবং প্রকাশিত নানা ধরনের খবর বর্ণনা করে নিম্নোক্তভাবে গানের মাধ্যমে–

রোজ সকালে দুয়ার খুলে মুখ দেখেন যার
যে আসলে বেকার আমি সেই সে বেকার ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় ভোর সকালে ফারুক তার পরিবারের অগোচরে সাইকেল নিয়ে বের হয়ে যায় খবরের কাগজ বিক্রি করতে। প্রকাশিত সব খবরের আকর্ষণীয় বর্ণনা করে গানের মাধ্যমে। যাতে করে পাঠক তা শুনে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় এবং পত্রিকাটি কিনে। গানে ব্যক্ত হয় এভাবে–‘পাত্র চাই পাত্রী চাই, কাজের কোন খবর নাই, খবর কিছু পেতে পারেন ফাইটিং সিনেমার।’এদেশের মানুষের মাঝে টাকা রোজগার কিংবা উন্নত জীবন মানের জন্য বিদেশ যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বরাবরই ছিল। এখনও তা কমেনি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার চিত্রও পাওয়া যায় গানটির নিম্নোক্ত অন্তরায়–

আবধাবি সৌদি আরব কুয়েত আর কাতার
চাকরি পেয়ে যাবেন যতো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার

নানা কথার ফুলঝুরি সাজিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়ার রীতি সব সময়ই ছিল এখনও তা অব্যহত রয়েছে। এক সময় আদম ব্যবসার অবস্থা ছিল বেশ রমরমা। শুধুমাত্র শিক্ষিত লোকই নয় নিম্নআয়ের মানুষেরও সুযোগ আছে বিদেশ যাওয়ার, সে কথাও বর্ণিত হয়–

এর সাথে চালান হবে ঝাড়ুদার আর লেবার
দেখুন ভাই পড়ুন ভাই কাজের কোন চিন্তা নেই
আদমের ব্যাপারী আজ দিয়াছে টেণ্ডার

গানটি সৈয়দ আবদুল হাদীর কণ্ঠে ফারুকের অভিনয়ে পরিবেশিত হয়। যার মাধ্যমে আশির দশকের সমাজ চিত্র পাওয়া যায়। এবং গানে ঝলমলে বিজ্ঞাপনের বাস্তব মূল্য কতটুকু তারও ইঙ্গিত রয়েছে। তবে গানটিতে একটি চরম বাস্তবতা লক্ষণীয়, তা হলো ফারুকের বোন (অঞ্জনা) আর ভাই (আনোয়ার হোসেন) ভাবিকে (রোজি সামাদ) নিয়ে সংসার। তারমধ্যে বড় ভাই (আনোয়ার হোসেন) অসুস্থ। এবং মোজো ভাইয়ের অর্থ সচ্ছলতা থাকলেও তা ভাবির কারণে পরিবারের উপকারে আসে না। কারণ ভাই তার বউয়ের কথায় উঠ-বস করে। ফলে ফারুক অনার্স পাস করেও জীবন-জীবিকার বিশেষ তাগিদে ঘরে বসে না থেকে সে পেপার বিক্রি করে।

জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অনেক কিছুই বেছে নিতে হয় এবং সততা রক্ষার জন্য নিজের পরিবারকে ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। চলচ্চিত্রের গানেও সেই রূপের প্রতিফলন ঘটে। শহিদ (প্রবীর মিত্র) খুব ভাল ছাত্র। সব সময় সততার পক্ষে কথা বলে। কিন্তু তার পিতা ঘুষ, দুর্নীতিগ্রস্ত। যা সে কখনোই মেনে নিতে পারে না। এক সময় বাসা থেকে বেরিয়ে যায়। সবখানে যখন অনিয়ম তখন জীবনের কঠিন বাস্তবতায় সে নাচনেওয়ালীর সাথে ঢোল বাজায় এবং তার দলের লোকেরা পকেট মারে। মোস্তাফা মেহমুদের *জয় পরাজয়* (১৯৭৬) চলচ্চিত্রে তা লক্ষ করা যায় নিম্নোক্ত স্ট্রিট সং বা পথের গানে–

পয়সা দিলে দুনিয়া মিলে
দিল মিলে না দিল না দিলে
শোন শোন যত দিলদার
এই দুনিয়া প্রেমের হাটবাজার

চলচ্চিত্রে দেখা যায় চরম দুর্নীতি, ঘুষ, চাঁদাবাজির সমাজে শহিদ কোন ভাবেই খাপ খাওয়াতে পারে না। কোথাও কোন কাজের সংস্থান হয় না তার। নানাবিধ ঘটনায় সে হতাশ হয়ে পড়ে। এক সময় চরম হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং বলে: 'আমি পারলাম না আমি কিছুই পারলাম না...আশ্রয়দাতা পিতার মেয়ে ঝরনা বলে: 'তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝি শহিদ। কিন্তু কি করবে?' তারপর ঝরনা এবং তার বাবা টিকে থাকার পথ দেখায় শহিদকে। দলের মাস্তানকে দিয়ে শিখিয়ে নেয় পকেট মারার নানা কারসাজি। এবং বলে বেঁচে থাকার জন্য তোমাকে সব কিছু করতে হবে। তারপর দেখা যায় ঢোলের তালে খোলা আকাশের নিচে সবুজ ঘাসের উপর ঝরনার নাচ শুরু হয়। এবং ধীরে ধীরে লোকের সমাগম হলে নাচনেওয়ালী উপস্থিত দর্শকের মন জয় করার জন্য গান ধরে। গানের আসর জমে গেলে দেখা যায় ঝরনার বাবা কৌশলে পকেট মারে।

১১. মদ্যপায়ীর গান

জীবন যুদ্ধের কঠিন বাস্তবতায় কেউ কেউ পরাজিত হয়ে কিংবা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে নিজের দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকার জন্য নানাবিধ আসক্তির আশ্রয় নেয়। আবার এও সত্যি যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কারো কারো গান শোনা বা গেয়ে উঠার প্রবণতাও লক্ষণীয়। তারই ফলস্বরূপ জহিরুল হকের *রংবাজ* (১৯৭৩) চলচ্চিত্রে রাজা (রাজ্জাক) নামক কেন্দ্রীয় রংবাজ চরিত্রে পরিবেশিত হয় নিম্নোক্ত গানটি।

দেখা যায় রংবাজ মদ খেয়ে হুঁশ হারিয়ে ফেলে লাম্পপোস্টে গিয়ে পড়ে এবং তার সাথে কথা বলে: 'আরে শালা, কে বাবা। পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছো। কী বললে ফাইট করবে? আমি লাম্পপোস্ট বাবা। আমাকে মাফ করে দাও।' তারপর নিম্নোক্ত গানটি গায়–

এই পথে পথে আমি একা চলি
ভাবি নাকি মরি বাঁচি
দেখে শুনে খেতে গেছি
যাই মুখে তাই বলি ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় নানা শ্রেণির মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে পকেট মারে রাজা। একদিন এক দরিদ্র লোকের পকেট মারে এবং ম্যানিব্যাগে থাকা চিঠি পড়ে তার ভীষণ খারাপ লাগে। রংবাজদের দৈনন্দিন জীবনে নানা ধরনের আসক্তি একটা সাধারণ বিষয়। আবার এটাও সত্যি গানে গানে তারা সত্য কথাটি বলতে দ্বিধাবোধ করে না। মদ্যপায়ীর এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাই উক্ত গানের মধ্যে মুখোশ পড়া মানুষের মুখোশ খুলে দেয় এভাবে–'প্রেয়সী প্রেমিক খোঁজে লাইট পোস্ট, তুমি খোঁজো কারে, দিনের আলোয় যে অতি সাধু লোক, মুখোশ খুলে তার এই আঁধারে।' আবার আজিজুর রহমানের *অশিক্ষিত* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গানটি ফেরদৌস ওয়াহিদের কণ্ঠে এবং পাহাড়াদার রহমতের (রাজ্জাক) অভিনয়ে পরিবেশিত হয়–

আমি এক পাহাড়াদার
সাধ্য আছে কার বাবার ॥
আমার চোখে ধূলা দিয়া হইয়া যাবি পার ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় সুন্দর আলী (রবিউল) মাতবরের বাড়ির কাজের লোক। দুটো হাঁড়ি কাঁধে নিয়ে হেঁটে যায়। হঠাৎ পাহাড়াদার রহমতকে দেখে সালাম দেয়। রহমত আঁতকে ওঠে। নানা বিষয় নিয়ে দুজনে কথা কাটাকাটি করে। এরপর রহমত গাছের নিচে বসে গালে গুল লাগায়। পাশে হাঁড়ি নামিয়ে সুন্দর আলীও বসে। দুজনের মাঝে নানা রকম কথাবার্তা হয়। সুন্দর আলী মাতবরের স্পেশাল শরবত নিয়ে চলে যেতে চায়। কিন্তু রহমত বলে : 'মাতবর সাব একাই খাইব ক্যান ? আমরা খাইতে পারি না? বলে একটু খায় আবার বলে আর একটু খাই। এভাবে পুরো শরবত শেষ করে ফেলে। তারপর হাঁড়ির গলা জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভেঙ্গে গেলে আশে পাশে তাকিয়ে বলে: 'আরে সন্ধ্যারাতেই সবাই ঘুমিয়ে পড়ছে?' যাহ্ শালা দেশটার হলো কি অ্যা?' পাহাড়া দেয়ার সময় হয়ে গেছে। সুন্দর আলীর শরবত কি মিঠা?' এই বলে তার লাঠির মাথায় গুজে নেয় হাঁড়ি দুটি। প্রতিদিনের মত করে জোরে জোরে ডেকে উঠে রহমত: 'বস্তিওয়ালারা জাগো'। কিন্তু আজকের ডাক বেশি দূর পৌঁছায় না। তার শরীর নিয়ন্ত্রণে নেই। ভারসাম্যহীন চলনে বলনে ঢুলু ঢুলু নিদ্রালু ভাব। এমতাবস্থায় শুরু করে উপরোক্ত গান। *দিন যায় কথা থাকে* (১৯৭৯) চলচ্চিত্রে সুবীর নন্দীর কণ্ঠে জীবনের নানা দুঃখ যন্ত্রণার জ্বালা নিবারণে নিম্নোক্ত গানটি পরিবেশিত হয়–

নেশার লাটিম ঝিম ধরেছে
চোখের তারায় রং জমেছে ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় জেল থেকে বের হয় খোকা। স্মাগলিং এর ট্রাক ড্রাইভারের সাথে পরিচিত হয়। তার হেলপারি করতে করতে নিজেও একদিন স্মাগলিং এর ট্রাক চালায়। খোকা থেকে হয় রাজা (ফারুক) রাজা নামে পরিচিত। ওস্তাদের কাছে গিয়ে বলেঃ 'মাল পৌঁছে গেছে', ওস্তাদ বলেঃ 'সাব্বাস রাজা, রাজা বলেঃ 'ওস্তাদ আমারটা?' ওস্তাদ একটা টাকার বাণ্ডিল এগিয়ে দিলে বলেঃ এই নে। তারপর বলেঃ 'বাতাসি রাজাকে একটা স্পেশাল বতল দে।' এরপর দেখা যায় রাতের অন্ধকারে নেশাগ্রস্ত রাজা উপরোক্ত গানটি গায়। ব্যক্তিগত জীবনের চরম দুঃখ আর বেদনা পশমিত করতে আসক্তির আশ্রয় নেয় রাজা।

আপন বলতে তার এই পৃথিবীতে কেউ নেই। একমাত্র বিধবা মাকে গ্রামে ফেলে শহরে এসেছিল ভাগ্য পরিবর্তনের আশায়। তার মাও চেয়েছিল তার একমাত্র ছোট্ট খোকা শহরে গিয়ে লেখাপড়া শিখে সুন্দর জীবন গড়ে তুলবে। কিন্তু তার কিছুই হয়নি বরং মিথ্যে চুরির অপরাধে তাকে জেলে যেতে হয়েছে। মাকে হারাতে হয়েছে। অপরদিকে রিতার কাছে পাওয়া অল্পদিনের ভালবাসা তা এখন কেবলই স্মৃদু। সব কিছু হারিয়ে সে এখন রিক্ত, নিঃস্ব জীবন যুদ্ধে পরাজিত সৈনিক। তার এই দুঃবোধ থেকে এই গানের অবতারণা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস *চাপা ডাঙ্গার বউ* (১৯৮৬) এর চলচ্চিত্রায়ণ করেন নায়ক রাজ রাজ্জাক এই চলচ্চিত্রে গ্রাম বাংলার তৈরি তারি খেয়ে মাতাল হয়ে পুরো দুনিয়াটাকেই গিলে ফেলতে চাই নায়ক বাপ্পারাজ। তারই মাতাল বয়ানে–'খাব খার দুনিয়া খাব, ও সাধু জি হলো কি একি।' চাষী নজরুল ইসলামের *শুভদা* (১৯৮৬) চলচ্চিত্রে নিম্নোক্ত গান–

এক দমেতে সাধু
দুই দমে সন্ন্যাসী
তিন দমে দেখ চোখ বুঝে দেখ
ভগবানের হাসি
এ নেশা এমন নেশা
পরান ধরে টান মারে যে
অমনি ছুটে আসি ॥

চলচ্চিত্রে দেখা যায় মদ, গাঁজা, জুয়া, বাইজির নাচ-গান ইত্যাদিতে প্রচণ্ড আসক্তি হারানের (গোলাম মোস্তাফা)। ঘর সংসারের প্রতি কোন খেয়াল নেই। সকলে খুব কষ্টে জীবন অতিবাহিত করে। ঘরে রোগ্ন ছেলে মাধব, দুই মেয়ে বড় মেয়ে ললনা (জিনাত) বিধবা হয়ে ঘরে বসে আছে। চরম হতাশা আর বেদনা তার জীবন সঙ্গী। আরেক মেয়ে ছলনা, হারানের দিদি (রানি সরকার) এবং স্ত্রী শুভদাকে (আনোয়ার) নিয়ে সংসার। নেশার কারণে চাকরিটা চলে যায়। অর্থের অভাবে ভিক্ষে পর্যন্ত করে হারান। কিন্তু হারানের সংসারের দিকে কোন খেয়াল নেই। কেবল গাঁজার আসর ছাড়া।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ঢাকার গ্রীণ রোডের বাসায় (তারিখ: ১৪.০৬.২০১৫)

২. টীকা: এই বক্তব্যের সাক্ষ্য মেলে সুভাষ দত্তের *সুতরাং* (১৯৬৪) চলচ্চিত্রে। চরিত্রানুযায়ী দুটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। নায়ক (সুভাষ দত্ত) এবং গাড়িয়ালের অভিনয়ে পরিবেশিত–'এই যে আকাশ এই যে বাতাস' গানটিতে। চলচ্চিত্রে দেখা যায়, বিয়ের প্রযোজনীয় অর্থ জোগার করে নায়ক শহর থেকে গ্রামে ফিরে। বাড়ি ফেরার বাহন হিসেবে বেছে নেয় গরুর গাড়ি। প্রিয়জনকে কাছে পাওয়ার তীব্র আকাঙক্ষায় অধীর আগ্রহে মনের আনন্দে গেয়ে চলে উল্লেখিত গানটি। গাড়োয়ানও গায় আপন ভঙ্গিতে–'তোমার লাগি হইলাম দেশান্তর, আমি পরকে করলাম আপন, আমার আপন হইল পর বন্ধুরে।' গাড়োয়ানের সঙ্গে তাল মেলানোর সময়ও নায়ক জানে না যে, তার মনের মানুষের বিয়ে হয়েছে। কেবল এর ইঙ্গিত মেলে গাড়িয়ালের গানের অংশে। তা যেন বিবেককে স্মরণ করিয়ে দেয়। যা বিবেকের গানে আলোচিত হয়েছে। গানটিতে যেমন প্রেম-বিরহ দুটি বিষয় বিদ্যমান আবার সুরের ক্ষেত্রেও আধুনিক এবং লোক সুরের প্রয়োগ লক্ষণীয়। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন যথাক্রমে কাজী আনোয়ার হোসেন এবং আব্দুল আলীম। উল্লেখ্য সুভাষ দত্তের সুতরাং আমাদের চলচ্চিত্রের জন্মলগ্নে উর্দু এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রতাপের মধ্যে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করে এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট এশীয় চলচ্চিত্র উৎসবে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে। (অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, ১৯৮৭, ঢাকা, পৃ. ৭৭।)

৩. অনুপম হায়াৎ, *মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১২৭, উদ্ধৃত।

৪.হারুনর রশিদ, *চলচ্চিত্রকার সালাহ্উদ্দিন*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১১৩।

৫. খন্দকার মাহমুদুল হাসান, *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৫০।

৬. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫০।

৭. আবদুল্লাহ জেয়াদ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : পাঁচ দশকের ইতিহাস*, জ্যোতি প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৫৮৫।

৮. ড. বাসুদেব রায়, *মনসামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ*, পাঠক বন্ধু লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৮।

৯. প্রাগুপ্ত, ভূমিকাংশ পৃ.২।

১০. মুস্তাফা জামান আব্বাসী, *ভাওয়াইয়ার জন্মভূমি*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৯।

১১. https://bn.wikipedia.org/wiki/ দুই_পয়সার_আলতা (১৬/১১/২০১৮)

১২. মির্জা তারেকুল কাদের, চলচ্চিত্র মাধ্যম, ইসরাফিল (সম্পা.) *পরিবেশনা শিল্পকলা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৬০২। উদ্ধৃত।

১৩. প্রাগুপ্ত।

১৪. আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮,পৃ. ২৩৭।

১৫. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি*, অবকাশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২০৮।

১৬. তপন বাগচী, *চলচ্চিত্রের গানে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৫৮।

১৭. ওয়াকিল আহমদ, *লোকসংস্কৃতি*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩২২, উদ্ধৃত।

১৮. প্রবীর সেনগুপ্ত, *বাংলার গান বাংলা গান*, ড. অরুণ সরকার (সম্পা.), পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ২০০৬, পৃ . ৪৮।

১৯. মিলন কান্তি দে, *যাত্রাশিল্পের সেকাল একাল*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১০৭।

২০. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০৮।

২১. অনুপম হায়াৎ, সোনালি যুগের সিনেমার স্মরণীয় গান, তাসমিমা হোসেন (সম্পা.), *অনন্যা*, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১০৬।

২২. আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ.৩৩।

২৩. আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৫৫।

২৪. https://bn.wikipedia.org/wiki/ ইসলাম#ফেরেশতা

২৫. কবির বকুল, আমি কখনো গান লিখতে চাইনি, *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫।

২৬. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্যের রূপ-রীতি, ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৪২০।
২৭. (https://bn.wikipedia.org/wiki/রোমান্টিকতা) (১০/০৫/২০১৫)
২৮. https://en.wikipedia.org/wiki/Romantic_music) (১২/০৫/২০১৫)
২৯. গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে রোম্যান্টিসিজম*, মিত্র এন্ড ঘোষ প্রকাশন, কলকাতা, আশ্বিন ১৪০২, ভূমিকাংশ।
৩০. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩।
৩১. Zillur Rahman Siddiqui (Edited) Bangla Academy English-Bangla Dictionary, Bangla Academy Dhaka, 2010, P.659.
৩২. গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে রোম্যান্টিসিজম*, মিত্র এন্ড ঘোষ প্রকাশন, কলকাতা, আশ্বিন ১৪০২, পৃ.৭।
৩৩. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্যের রূপ-রীতি, ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৪২১।
৩৪. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪২১।
৩৫. (http://www.slideshare.net/StephWebb/history-of-romance-films (১১/০৭/২০১৫)
৩৬. (https://en.wikipedia.org/wiki/Romance_film (১০/০৬/২০১৫)
৩৭. টীকা: যেখানে দুঃখী মায়ের এক নিদারুণ কষ্ট উঠে আসে। শাবানা শিশু সন্তানটিকে দোলনায় দুলিয়ে, কখনো কোলে নিয়ে ঘুম পাড়ানোর উদ্দেশ্যে গানটি গেয়ে থাকে–'ও দুটি হাত চিরদিন থাক, হয়ে মোর গয়না, সাত রাজার ধনেও তো, তুলনা হয় না।'
৩৮. (https://bn.wikipedia.org/wiki/চন্দ্রনাথ_(১৯৮৪-এর_চলচ্চিত্র) (০৫/১০/২০১৮)
৩৯. বুলবুল আহমেদ পরিচালিত *রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত* (১৯৮৭) চলচ্চিত্রে তা দৃষ্ট হয়। 'স্বামীর নাম মুখে নিতে নেই।'
৪০. হুমায়ূন আজাদ, *নারী*, তৃতীয় সংস্করণ, আগামী প্রাকাশনী, ঢাকা, এপ্রিল ২০০২ (অবতরণিকা পৃ. ১৫।)
৪১. প্রাগুপ্ত।
৪২. অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের রূপরেখা*, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৫।
৪৩. সুমন চৌধুরী, *চলচ্চিত্রের গান*, (ইসরাফিল শাহীন সম্পা.) *পরিবেশনা শিল্পকলা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৮২।
৪৪. শফিউদ্দিন শিকদার প্রযোজিত, বাংলাদেশ টেলিভিশনের পুরানো দিনের বাংলা গানের অনুষ্ঠান,*গান চিরদিন*, থেকে সংগৃহিত।
৪৫. ইউটিউবে পাওয়া সাক্ষাৎকার থেকে সংগৃহিত (https://www.youtube.com/watch?v=nt7WOSbOeNE)
৪৬. অনুপম হায়াৎ, সোনালি যুগের সিনেমার স্মরণীয় গান, তাসমিমা হোসেন (সম্পা.), *অনন্যা*, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১০৬।
৪৭. এনটিভিতে প্রচারিত 'গীতিময়' সংগীতানুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত।
৪৮. মির্জা তারেকুল কাদের, চলচ্চিত্র মাধ্যম, ইসরাফিল (সম্পা.) *পরিবেশনা শিল্পকলা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৬০২।
৪৯. https://bn.wikipedia.org/wiki/দুই_জীবন (০৫/১০/২০১৮)
৫০. https://bn.wikipedia.org/wiki/শুভদা_(চলচ্চিত্র) (০৫/১১/২০১৮)
৫১. সাক্ষাৎকার আমি কখনো গান লিখতে চাইনি, কবির বকুল, *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫ ।
৫২. অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন, ঢাকা, ১৯৮৭ পৃ. ৫।
৫৩. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৬।
৫৪. সাইম রানা, আধুনিক গান, ইসরাফিল (সম্পা.) *পরিবেশনা শিল্পকলা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৭৫।
৫৫. কারিনার নাচ-গানে শাবানার আপত্তি, *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ১২ মার্চ ২০১৬।

৫৬. তপন বাগচী, *চলচ্চিত্রের গানে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩১। উদ্ধৃত
৫৭. আবদুল্লাহ জেয়াদ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : পাঁচ দশকের ইতিহাস*, জ্যোতি প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৫৭৮।
৫৮. শামসুজ্জামান খান, বাঙালির বাড়ি ফেরা, মতিউর রহমান (সম্পা.) *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ১০ জুলাই, ২০১৫।
৫৯. (https://www.youtube.com/watch?v=cJcunkJSqC8&t=3357s) (২৫/১২/২০১৮/)
৬০. কবির বকুল, রথীন্দ্রনাথ রায়ের জনপ্রিয় কিছু গান, *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, (৮ অক্টোবর ২০১৫)
৬১. অনুপম হায়াৎ, *রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১২৫।
৬২. সাইম রানা, *বাংলাদেশের গণসংগীতের বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৪৯।
৬৩. শেখ লুতফর রহমান, আমাকে দাদা বলে ডাকত, মতিউর রহমান (সম্পা.), *এক ঝড়ের পাখি, আলতাফ মাহমুদ*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩৩।
৬৪. সাইম রানা, *বাংলাদেশের গণসংগীতের বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৫।
৬৫. আহসান হাবিব আসলাম (সংকলন ও সম্পাদনা) *সুরের ইন্দ্রধণু, শতবর্ষের কালজয়ী বাংলা গান* (১৯০০-২০১১), রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৯৮।
৬৬. চলচ্চিত্রকার আজিজুর রহমান'র *চলচ্চিত্রে আমার কথা*, আলপনা প্রকাশনী ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৮২।
৬৭. আহমেদ মুনির, রফিক আজাদের কবিতাবিশ্ব, *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ২০ জানুয়ারি, ২০১৭।

ইউটিউব থেকে সংগৃহিত চলচ্চিত্রের লিঙ্কসহ নাম ও ব্যবহারের তারিখ নিম্নরূপভাবে দেয়া হলো:

১. (https://www.youtube.com/watch?v=D0oKslsZKNc&t=2624s) (০৫/১০/২০১৮/*মধুমিতা*)
২. (https://www.youtube.com/watch?v=FZhkQGovkmU) (০২/০৯/২০১৮/*সোনা বৌ*)
৩. (https://www.youtube.com/watch?v=GDox1J3VbQg&t=4s) (০৫/১০/২০১৮/*সোহাগ*)
৪. (https://www.youtube.com/watch?v=ujphanZTsfs)) (০২/১১/২০১৮/*মতিমহল*)
৫. (https://www.youtube.com/watch?v=fY3q2FkP1RQ) (০২/১১/২০১৮/ *বাদল*)
৬. (https://www.youtube.com/watch?v=aHADTgdAaC0&t=81s) (০৫/১০/২০১৮/*দুই জীবন*)
৭. (https://www.youtube.com/watch?v=nR2DhqtDiLA) (১৬/১০/২০১৮/ *নেপালী মেয়ে*)
৮. (https://www.youtube.com/watch?v=LNjhIjLxKaY&t=7254sj) (০৫/১০/২০১৮/ *অলঙ্কার)*
৯. (https://www.youtube.com/watch?v=0bH3gIM3R14) (০৬/১১/২০১৮-/*বদনাম*)
১০. (https://www.youtube.com/watch?v=eXyvOiueq4g&t=3026s) (০২/১০/২০১৮/*দেবদাস)*
১১. https://www.youtube.com/watch?v=SgiSf1vhqws&t=1253s (০৭/১০/২০১৮/*রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত)*
১২. (https://www.youtube.com/watch?v=VVfKI5kwdw8) (০২/১০/২০১৮)/*লাইলী মজনু)*
১৩. (https://www.youtube.com/watch?v=ft7C8uOtHb4&t=3435s) (১১/১০/২০১৮/*নরম গরম*)
১৪. (https://www.youtube.com/watch?v=nKxrnQNjbiI&t=2580s) (০১/১০/২০১৮/*শুভদা*)
১৫. (https://www.youtube.com/watch?v=VCrtSqu7q2U) (২৫/১০/২০১৮)/*স্যারেন্ডার)*
১৬. (https://www.youtube.com/watch?v=ZSoc-DQe6HU) (১০/১০/২০১৮/*মাসুদ রানা)*
১৭. (https://www.youtube.com/watch?v=z4Wn0w-yZ-E&t=1064s) (২৬/১০/২০১৮/*জয় পরাজয়-পার্ট-১)*
১৮. (https://www.youtube.com/watch?v=ryW7kMSXHaw) (০২/০৯/২০১৮/*নয়ন মণি)*
১৯. (https://www.youtube.com/watch?v=eEnYrA5ktto&t=5249s) (২৯/০৮/২০১৮/*অশিক্ষিত)*
২০. (https://www.youtube.com/watch?v=l8tKbAYv1tc) (১৬/১০/২০১৮/ *নিষ্পাপ)*
২১. (https://www.youtube.com/watch?v=y2_2-X912Hw&t=3011s) (১৬/১০/২০১৮/*উজান ভাটি)*
২২. (https://www.youtube.com/watch?v=g6gA9cwpp8I&t=5101s) (১৭/১০/২০১৮/*আঁখি মিলন)*
২৩. (https://www.youtube.com/watch?v=0VyiPchtGBc) (১৭/১০/২০১৮/*প্রাণ সজনী)*
২৪. (https://www.youtube.com/watch?v=PgkmS56r_5c (০২/০৯/২০১৮/*সুজন সখী)*

২৫. (https://www.youtube.com/watch?v=_cIDMn2wodQ&t=2136s) (৩০/০৯/২০১৮/ *ছুটির ঘন্টা)*
২৬. (https://www.youtube.com/watch?v=Mg-kgGcKqWA&t=628s) (১৬/১০/২০১৮/*সুন্দরী)*
২৭. (https://www.youtube.com/watch?v=ZMLhihPqITw&t=1510s) (০৩/১০/২০১৮/ *আর্শীবাদ)*
২৮. (https://www.youtube.com/watch?v=FrxMOSi-gDg) ১০/০৫/২০১৮/ *সিকান্দার)*
২৯. (https://www.youtube.com/watch?v=XdjU5LP7D1k) (০৭/১০/২০১৮/*সৎভাই)*
৩০. (https://www.youtube.com/watch?v=2IYQpuYPpqA) (০২/১০/২০১৮/*নাগিন)*
৩১. (https://www.youtube.com/watch?v=x_4SDvh5bwY) (০২/১০/২০১৮/*বেদের মেয়ে জোস্‌না)*
৩২. (https://www.youtube.com/watch?v=0I3YPMDaiwk) (০৯/০৮/২০১৮/*আলিফ লাইলা)*
৩৩. (https://www.youtube.com/watch?v=UPAhKFhCP1I&t=3856s) (২৯/০৯/২০১৮/ *দিন যায় কথা থাকে)*
৩৪. (https://www.youtube.com/watch?v=fyBW_FCTdhc) (০৯/১০/২০১৮/*সুখের সংসার)*
৩৫. (https://www.youtube.com/watch?v=dGHzuNCXQ4I) (০৯/১১/২০১৮/*জয় পরাজয়-পার্ট-২)*

ষষ্ঠ অধ্যায়
চলচ্চিত্রের গান : একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

যে কোন শিল্পের উপাদান সমাজ এবং তার সংস্কৃতি থেকে আহরিত। সময়ের সাথে সমকালীন বিষয় আশয়ও এর অন্যতম অনুষঙ্গ। সেদিক থেকে চলচ্চিত্র মাধ্যমও একই ধারায় প্রবাহিত। চলচ্চিত্রের গানের বৃহৎ অংশ জুড়ে যে সব বিষয় ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করেছে তার একটি বিশেষ পর্যালোচনা দাবী রাখে; যদিও বিষবৈচিত্র্যের সামগ্রিক আলোচনায় এটি বিভিন্নভাবে এসেছে। এ সমাজে পারিবারিক জীবনে বহুকাল ধরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের চিত্র বিদ্যমান। সতীন বিদ্বেষ, সৎ মার ঈর্ষাকাতরতা, বাল্য বিবাহ, জন্মান্তরবাদ, জাতি-ধর্মভেদ, দুর্বল ও দরিদ্রের দুর্ভোগ, ধনী-গরীবের বৈষম্য, দাম্পত্য প্রেম-কলহ, ভ্রাতৃপ্রেম, গুরুভক্তি, আতিথেয়তা, বিচিত্র বিষয় কাহিনিচিত্রে ক্রিয়াশীল। প্রাচীনকাল থেকে সভ্যতার সঙ্গী হয়ে চলেছে এসব বিষয় আশয়। ফলত দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত এসব ঘটনা পরিচালকও তার ব্যবসায়িক লাভের আশায় কাহিনিচিত্রের বিষয় নির্বাচনে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতির বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। সমাজ জীবনে এর একটা প্রভাব লক্ষণীয়। নানা যুদ্ধ সংঘাতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এদেশের মানুষ। স্বজন হারানোর বেদনা, কিংবা দীর্ঘ অপেক্ষার পর প্রিয়জন, সন্তান-সন্ততিকে ফিরে পাওয়ার যে ব্যাকুলতা ইত্যাদি পারিবারিক জীবনের মধুর সম্পর্ক পুনঃনির্মাণের একটা প্রচেষ্টাও অব্যহত রয়েছে বলে উপলব্ধ হয়। ফলত পারিবারিক জীবনের নানা সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার চিত্রায়ণ ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে আরো আলোচনা রয়েছে বিষয়বৈচিত্র্যের অধ্যায়ে পারিবারিক বন্ধনের গানে।

প্রেম-বিরহ-বেদনা

বর্ণিত আলোচনার অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো প্রেম। নর-নারীর সম্পর্ক বা প্রেম এটি স্বাভাবিক চাহিদার মধ্যে পড়ে এবং তা প্রাকৃতিকও বটে। কিন্তু মুসলিম অধ্যুষিত এ অঞ্চলে প্রেম বা বিবাহ বহির্ভূত নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিষিদ্ধ এবং অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়। নিম্নোক্ত গানগুলো বেশ জনপ্রিয় এবং লক্ষ করলে দেখা যায় যে, গানগুলোর বিষয় নর-নারীর প্রেম-ভালবাসা যা তাদের স্বাভাবিক চাওয়াকে ঘিরে আবর্তিত। ফলে বাস্তবে সম্ভব নয় এমন কোনো বিষয়ের ভিন্ন কোনো উপায়ে বা শিল্পমাধ্যমের সাহায্যে দেখা বা শোনা যায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে তার প্রসার বাড়ে এবং সর্বস্তরের জনগণ তা সাদরে গ্রহণ করে। ফলে চলচ্চিত্রে গানের প্রেম-ভালবাসার সম্পর্কের প্রকাশ আধুনিক এবং লোকজ দুটো ধারার গানে নানাভাবে পরিবেশিত এবং ব্যাপকভাবে বিকশিত। এছাড়াও নর-নারীর এই ভালবাসাকে কেন্দ্র করে নারী হৃদয়ের শাশ্বত প্রেম যা বিরহ-বেদনার মধ্য দিয়ে চিত্রায়িত এবং তা করুণ আর্তিতে পরিণত। সুখ-দুঃখ, আনন্দানুভূতির নানাবিধ প্রকাশ নিম্নোক্ত গানসমূহে তা লক্ষ করা যায়–

সারণি–১

ক্রম	গানের শিরোনাম	চলচ্চিত্র
১.	পরানে দোলা দিল এ কোন ভ্রমরা	(*সুতরাং*- ১৯৬৪)
২.	নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা	*নীল আকাশের নীচে* (১৯৬৯)
৩.	ফুলের কানে ভ্রমর এসে চুপি চুপি বলে যায়	*পীচ ঢালা পথ* (১৯৭০)
৪.	তুমি যে আমার কবিতা আমার বাঁশির রাগিণী	*দর্পচূর্ণ* (১৯৭০)
৫.	এ আকাশকে সাক্ষী রেখে এ বাতাসকে সাক্ষী রেখে	*সোহাগ* (১৯৭৮)
৬.	আমি তোমারই প্রেম ভিখারি ভালবেসে ঠাঁই দিও পরানে গো	*চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা* (১৯৮৪)
৭.	সব সখীরে পার করিতে নেব আনা আনা	*সুজন সখী* (১৯৭৫)
৮.	আমার মন বলে তুমি আসবে	*আনারকলি* (১৯৮০)
৯.	সবাইতো ভালবাসা চায় কেউ পায় কেউ বা হারায়	*স্যারেন্ডার* (১৯৮৭)
১০.	আমার বুকের মধ্যেখানে মন যেখানে হৃদয় যেখানে	*নয়নের আলো* (১৯৮৪)
১১.	আমি একদিন তোমায় না দেখিলে	*নয়নের আলো* (১৯৮৪)
১২.	তুমি ছাড়া আমি একা পৃথিবীটা মেঘে ঢাকা	*দুই জীবন* (১৯৮৮)
১৩.	আজ রাত সারা রাত জেগে থাকব দু'চোখের ইশারাতে কাছে ডাকব	*নীতিবান* (১৯৮৮)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর চিন্তা চেতনার পরিসর তা পুরুষের ধ্যান ধারণা দ্বারা পরিপুষ্ট এবং গানের মাধ্যমেও তার প্রকাশ–'আমি তোমার বধূ তুমি আমার স্বামী খোদার প'রে তোমায় আমি বড় বলে জানি' (*আরাধনা*-১৯৭৮) 'অথবা আমি ধন্য হয়েছি ওগো ধন্য তোমারই প্রেমেরও জন্য, তোমারই চরণে ওগো দিও মোরে ঠাঁই, যদিও আমি যে নগণ্য' (*সোনা বৌ*-১৯৮৫) প্রভৃতি। উপরোক্ত দুটো গানেই নারীর অবস্থান স্পষ্ট। স্বামীর ভালো মন্দ কিংবা আয় উন্নতির উপর নির্ভর করে তাদের অর্থাৎ স্ত্রীদের ভূত ভবিষ্যৎ। এক সময়ের নারীদের অবস্থান এমন হলেও বর্তমানে শিক্ষা-দীক্ষা, কর্মদক্ষতার কারণে এই রূপ অনেকখানি বদলে গেছে। আবার স্বামী বা প্রেমিককে জীবন-জীবিকার সন্ধানে বিদেশ বিভুঁইয়ে পাঠিয়ে স্ত্রীর বিরহ জ্বালা–'বিদেশ গিয়া বন্ধু তুমি আমায় ভুইল না, চিঠি দিও পত্র দিও জানাইও ঠিকানারে।' আবার নারীর হৃদয়ের ন্যায় পুরুষেরও মন কাঁদে কখনো কখনো তার উপস্থাপন–'ওরে নীল দরিয়া আমায় দেরে দে ছাড়িয়া' গানে। বর্ণিত গানগুলোতে যে চিত্র পাওয়া যায় তা এই পরিবার, সমাজ-সংস্কৃতিরই রূপ।

গানে গানে সমাজ ও পারিবারিক জীবন চিত্রায়ণ

সমাজ ও দেশের সংস্কৃতিতে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরিবারের মধ্য দিয়ে কতগুলো মূল্যবোধ তৈরি হয় ; যা প্রথমত পরিবার থেকেই শিখতে হয়। গুরুজনদের প্রতি ব্যবহার, পরিবারে মহিলা এবং পুরুষের মর্যাদা, ঘরে-বাইরের কাজ কে কতটা করবে ইত্যাদি। বাঙালি সমাজে পারিবারিক জীবনে যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার কাঠামোর সংস্কৃতি বিদ্যমান। এই ধরনের পরিবার কাঠামো ঠিক কবে থেকে আরম্ভ হয়েছিল সে সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না তবে ধারণা করা হয় মধ্যযুগে একান্নবর্তীতা গড়ে ওঠার কোন সুযোগ ছিল না এবং আঠার শতকের আগেও নয়।[১] জানা যায় প্রতিষ্ঠিত জমিদারি ভেঙ্গে যাওয়ার পরিবর্তে অনেকেই এক পরিবারে বসবাস করার কথা ভেবেছিল। ফলত সেই ভাবনার প্রভাবে অল্পকালের মধ্যে একান্নবর্তী পরিবার গড়ে ওঠতে থাকে। তাদের দেখাদেখি উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত লোকেরা তা অনুসরণ করতে থাকে। উনিশ শতকের শেষ দিকে একান্নবর্তীতা হিন্দু নিম্নমধ্যবিত্তদেরও আদর্শে পরিণত হয়। বিশ শতকেও এই রীতি এমনভাবে প্রচলিত ছিল যে কেউ তা লঙ্ঘন করলে সমাজে তার সুনাম ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন হতো।[২]

একান্নবর্তী পরিবার ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হওয়ার পেছনে পরোক্ষ কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় প্রখ্যাত লেখকদের সাহিত্যকর্ম থেকে। বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে লেখা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত উপন্যাস থেকে। পরোক্ষ কিছু ইতিবাচক দিক ছিল। সন্তান পারস্পারিক সহযোগিতার মনোভাব এবং ত্যাগের আদর্শ নিয়ে বেড়ে ওঠত। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হতো। এই ভালো দিকগুলো তিনি তুলে ধরেছিলেন বলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে লেখক হিসেবে জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছিল। একান্নবর্তী পরিবারের নিয়ম এতো কঠোর ছিল যে পরিবারের কোন সদস্য যদি চাকরির সুবাদে দূরে থাকতেন সেখান থেকে টাকা পাঠাতেন ছুটিতে মাঝে মাঝে স্ত্রী সন্তানদের সাথে এসে থাকতেন। কিন্তু স্ত্রী সন্তানদের কর্মস্থলে নেয়ার অনুমতি পেতেন না।

ফলে এই ধরনের পরিবারে ব্যক্তি স্বাধীনতা লজ্মিত হতো। তার চিত্রও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পে পারিবারিক জাঁতাকলে পড়ে মৃণালের বিষণ্নতা তার ব্যক্তিত্ব বিসর্জনের মধ্য দিয়ে। ‘হৈমন্তী’ গল্পেও নানা অসঙ্গতির চিত্র উঠে এসেছে। তবে আর্থিকভাবে অসচ্চল পরিবারে লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ দেখা দিত এবং নানা ধরনের কলহ বিবাদ লেগে থাকত। নানাবিধ কারণে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে যখন একক পরিবার বা বর্ধিত পরিবার গড়ে ওঠে তখন দীর্ঘকালের পারিবারিক মূল্যবোধগুলো টানাপোড়েনে পড়ে। এ ধারণা অমূলক নয় যে, পারিবারিক মূল্যবোধগুলো ধরে রাখার প্রয়াসে চলচ্চিত্রের কাহিনি কিংবা এর গান–মা-বাবা, ভাই-বোন,স্বামী-স্ত্রী, দাদা-দাদি,নানা-নানি, ননদ-ভাবি, দেবর ভাবি প্রভৃতি সম্পর্কের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

পরিবারের শীর্ষমণি হলো ‘মা’ পৃথিবীর সব ধর্মে মায়ের অবস্থান রয়েছে সবার শীর্ষে। ধর্মীয় বা পুরাণে মায়ের রূপ বর্ণিত হয়েছে নানা মহীমায়। সনাতন ধর্মে মনসাদেবীর পূজা অর্চণাসহ বিভিন্ন দেব-দেবীর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এর প্রচলন রয়েছে। সুতরাং পূজা-ভক্তি এদেশের মানুষের বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে আবহমান কাল ধরে বিদ্যমান। দেশে-বিদেশে শিল্প সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখায় মায়ের

উপস্থাপন বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ। ম্যাক্সিম গোর্কির বিশ্ববিখ্যাত 'মা' উপন্যাসটি সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া পঞ্চকবির গানের ভেতর দিয়ে বাঙালির 'মাতৃরূপকে' অনেক ক্ষেত্রে আবিষ্কার করা যায়। পঞ্চকবির গানের আলোকে-রামপ্রসাদী গানে মাতৃভক্তি এছাড়া রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের গানে দেশরূপে 'মা' এসেছে বিভিন্ন ভাবে।

এছাড়া ফকির আলমগীরের কণ্ঠে জনপ্রিয়–'মায়ের একধার দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম, পাপোশ বানাইলে ঋণের শোধ হবে না।' বর্তমান সময়ে মমতাজের কণ্ঠে একটি জনপ্রিয় গান শাহ্ আলম রচিত 'মায়ের কান্দন যাবত জীবন, দু'চার মাস বোনের কান্দন রে, ঘরের পরিবারের কান্দন কয়েক দিন পর থাকে না, এমন দরদি আমার জনম দুঃখী মা।' এ গানটিও তার সাক্ষ্য দেয়।

দেশ-জাতি, সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদির ভেতর দিয়ে চলচ্চিত্রের অবগাহন। ফলে এ গান তারই ধারাবাহিক চেতনার ফসল। আবার এ কথাও সত্য যে, মায়ের প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা-ভক্তির গল্প গানে বা অন্যান্য শিল্প সংস্কৃতির শাখা-প্রশাখায় যে রূপে বাহিত, বাস্তবিক অর্থে তার রূপ কতটা বলিয়ান। তার প্রশ্নও রয়ে যায়। ফলে এ ধারণাও অমূলক নয় যে, তথ্য প্রযুক্তির আবির্ভাবে বাঙালি সমাজে যৌথ পরিবার কাঠামোয় ব্যাপক আঘাত হানে। তারই ক্ষয়রোধকল্পে দীর্ঘ দিনের লালিত পারিবারিক মূল্যবোধ তথা বন্ধনকে ধরে রাখার প্রয়াস নির্মাণে বর্ণিত গানের অবতারণা। এবং চলচ্চিত্রে মাতৃত্ববোধ, মাতৃভক্তি বা মাতৃবন্দনাসহ আরো অনেক সম্পর্কের গানে গানে নানাভাবে চিত্রায়িত হয়েছে–

সারণি–২

ক্রম	গানের শিরোনাম	চলচ্চিত্র	বিষয়
১.	সাতটি রঙের মাঝে আমি মিল খুঁজে না পাই, জানি না সে কেমন করে কি দিয়ে সাজাই	*আবির্ভাব* (১৯৬৮)	মাতৃত্ববোধ
২.	মাগো তোর চরণ তলে বেহেশত আমার মাগো তুই খোদাতালার সেরা উপহার	*মতিমহল* (১৯৭৭)	মাতৃভক্তি
৩.	মায়ের মতন আপন কেহ নাই মা জননী নাই রে যাহার	*দিন যায় কথা থাকে* (১৯৭৯)	মাতৃবন্দনা
৪.	একটা দোলনা যদি কাছে পেতাম, তারে মনের মত করে সাজাতাম	*এখনই সময়* (১৯৮০)	মাতৃত্ববোধ

চলচ্চিত্রের কাহিনি সমাজের চলমান সেন্টিমেন্টকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে নির্মিত হয়। সমাজে প্রচলিত রয়েছে–'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত'। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ধর্মীয় অনুভূতি। চলচ্চিত্র নির্মাতা এই সমাজের লোক। চলচ্চিত্রেও তার রূপায়ণ–'মাগো তোর চরণ তলে বেহেশত আমার মাগো তুই খোদাতালার সেরা উপহার'। পরিচালক তাঁর দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্লোকের দৃষ্টি দিয়ে গভীরভাবে উপলব্দি করেন সমাজের নানাবিধ অসঙ্গতি। যদিও এর সঙ্গে থাকে ব্যবসায় সফলতার ভাবনা, থাকে জনগণকে হলমুখী করবার নানা কৌশল। ফলে এর সঙ্গে যুক্ত হয় নানা ধরনের ফ্যান্টাসিও। এটিও চলচ্চিত্রের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পরিবারের বাইরের আরেকটি সম্পর্ক সই কিংবা সখী, দোস্ত অথবা বন্ধুর চিত্রায়ণ রয়েছে গানে। এক সময়ের তরুণ-তরুণীরা তাদের একান্ত মনের কথা এই সম্পর্কের মাধ্যমে আদান প্রদান করতো ‘সইলো সই তোরে কই, ক্যামনে একা ঘরে রই, পরান আমার বাইরাম বাইরাম করে কেন রে’(*ঝিনুকমালা*-১৯৮৫), ‘সখী কারে ডাকে ঐ বাঁশি নাম ধরিয়া তুই দেনা বলিয়া’(*প্রাণ সজনী*-১৯৮৩) অথবা ‘বন্ধু তোর বারাত নিয়া আমি যাব’ (*বন্ধু*-১৯৭৮) প্রভৃতি গানে দৃষ্ট হয়। যদিও তথ্যপ্রযুক্তির আবির্ভাবে বর্তমানে এর সম্পর্কের রূপ বদলে গেছে। সই/সখীর সখ্যতা এখন আর নেই তবে চলচ্চিত্রে এই সব গান তার পরিচায়বাহী।

বিবেকবোধ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রচেষ্টা

পরিবারে-সমাজে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের বিবেক বর্জিত হয়েছে নানাভাবে। ফলে বিবেকবোধ প্রতিষ্ঠা এবং তা আধ্যাত্মিক প্রেম চেতনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে; প্রথমত বিবেকের গানকে কেন্দ্র করে। এবং দ্বিতীয়ত, এরই আরেক রূপ লক্ষ করা যায় সত্তর দশকের শেষের দিকে এবং আশির দশকে ব্যাপক পরিসর তৈরি করে যা আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে প্রকাশমান–‘তোর চোখ থেকে তুই অন্ধ কেন ডাকিস অবেলায়’ (*অবাঞ্ছিত*-১৯৬৯)‘পৃথিবী তোমার কোমল মাটিতে কেন এত’ (দীপ *নেভে নাই*-১৯৭০)‘নকল ভেবে আসল যে জন তারে দিলি ফেলে’ (*সুজন সখী*-১৯৭৫) অথবা আত্মোপলব্ধির পরিচর্যায়–‘সবাই বলে বয়স বাড়ে আমি বলি কমেরে’ (*ফকির মজনু শাহ*-১৯৭৮),‘হায় রে মানুষ রঙিন ফানুস দম ফুরাইলে ঠুস্, তবু তো ভাই কারোর-ই নাই একটুখানি হুঁশ্’ (*ভাল লোক ছিল*-১৯৮২), ‘মায়ায় গড়া এই সংসারে, কেউ আসে কেউ যায় রে ফিরে মিছে কেন কাঁদিস রে তুই নদীর কিনারায়’ (*বেদের মেয়ে জোসনা*-১৯৮৯) প্রভৃতি।

এদেশের মানুষ জন্মলগ্ন থেকেই নানা ষড়যন্ত্রের শিকার। ফলে তাদের অধিকার এবং অস্তিত্ব রক্ষার্থে জন্ম নিয়েছে স্বদেশী আন্দোলন। দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে রচিত হয়েছে দেশমাতৃকার নানা প্রসঙ্গ নিয়ে গান। এই চেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে দেশকে মাতৃরূপেও উপস্থাপিত হয়েছে শিল্প সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা প্রশাখায়। ১৯৭১ সালের মহান বিজয় চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পেছনে অপরিসীম শক্তি হিসেবে মাতৃরূপ স্বদেশ চেতনা গভীরভাবে কাজ করেছিল বলেই, এত বড় অর্জন সম্ভব হয়েছিল। যদিও এর সূচনা হয়েছে অনেক আগে থেকেই। উল্লেখ্য যে, দৃশ্যত না হলেও ব্রিটিশীয় জীবনাচরণে মনোনিবেশ রয়েছে এদেশের অধিকাংশ মানুষের; হয়তো ব্রিটিশ দৃশ্যত এ সমাজে নেই কিন্তু বীজ বপন করে গেছে তাদের শাসনামল থেকেই। উপলব্ধ হয় যে, তারই ধারাবাহিকতায় আকাশ সংস্কৃতির বদৌলতে যুক্ত হয়েছে অন্যান্য দেশের নানা সংস্কৃতি। এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে এদেশের মানুষের জীবনাচরণকে। আশির দশকের শেষের দিকে *ঢাকা ’৮৬* (১৯৮৮) চলচ্চিত্রের নিম্নোক্ত গান তার অন্যতম দৃষ্টান্ত–

আউল বাউল লালনের দেশে
মাইকেল জ্যাকশন আইলোরে
সবার মাথা খাইলোরে

আমার সাধের দোতারা কান্দেরে
আমার সাধের সারিন্দা কান্দেরে ॥

এবং আসরকেন্দ্রীক মনোরঞ্জনের গান–'বেদরদী তুমি রসিকের কদর জানো না' (*নবাব সিরাজদ্দৌলা*-১৯৬৭) অথবা 'মন তুমি কেড়ে নিলে একি বিষম দায়রে, কুল বধূর মান বুঝি যায়রে' (*অবাঞ্ছিত*–১৯৬৯) ক্রমশ আসর থেকে গান পার্টিতে স্থান করে নিয়েছে–'ও ডার্লি ফুল তো ঝরে যাবে রাত তো চলে যাবে' (*মাসুদ রানা*-১৯৭৪) অথবা 'জলসা ঘরে মাতাল হাওয়ার তুফান জেগেছে, তাই তো আমার বুকের মাঝে আগুন লেগেছে, এই রূপ আছে প্রেমে আছে, নেবে কি বলো? আরে নাচ নাচ নাচ সখী প্রাণ খুলে নাচ, আরে বাহ্ বাহ্ বাহ্ সখী চুকু চুকু নাচ।' (*নরম গরম*-১৯৮৪) প্রভৃতি। যদিও এ গানের বর্তমান পরিচিতি আইটেম সং বা গান নামে। এবং উল্লেখ্য যে, এ গানের কারণে গানের বাণী এবং সুরও আজ প্রশ্নবিদ্ধ।

গানের বাণী ও সুর

বাণী হলো একটি গানের প্রধান উপাদান বা অঙ্গ এবং প্রথম পদক্ষেপ। প্রতিটি কাজের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া থাকে। তা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভেতর দিয়ে সম্পন্ন করতে হয়। চলচ্চিত্রের গানের ক্ষেত্রেও বেশ কয়েকটি পর্যায় রয়েছে যা গুরুত্বের সাথে বিবেচনাপূর্বক সম্পন্ন করতে হয়। কারণ এই গানের একটি প্রেক্ষাপট থাকে যা বিশেষভাবে কাহিনি বা বিষয় কিংবা চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। যার উপর ভিত্তি করে রচিত এবং সুরারোপিত হয়ে থাকে। প্রতিটি পর্যায়ে যোগ্যতার পরিচয় দিতে হয়। একটির দুর্বলতা অপরটি দিয়ে কাটিয়ে উঠা যায় না বরং এর প্রভাব অন্যান্য সহযোগী শিল্পকেও বহন করতে হয়। বাংলা গানের বাণী রচনার শুদ্ধতা নিয়ে ইতোমধ্যে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গীতিকবি মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান বলেন–'আমার বিচারে নির্দ্ধারিত কাঠামোর মধ্যে নির্ভুল ছন্দ শোভন অন্তমিল, ভাব ও ভাবনা অনুযায়ী সুরারোপ যোগ্য শব্দ চয়ন, এবং সব মিলিয়ে কাব্য সৃষ্টি করতে পারলেই তা সার্থক গানের কবিতা হয়ে ওঠে। নির্দ্ধারিত কাঠামো বলতে বোঝায় স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগের বন্ধন।'[৩] গানের কবিতা নিয়ে তিনি আরো বলেন–'গান তো লেখা যায় না। গান মানুষ শোনে। এমন কবিতা লিখতে হবে যার প্রতিটি শব্দ সুরের জন্য অপেক্ষা করছে, পঙক্তিটি সুরের জন্য অপেক্ষা করছে। সব বাদ দিয়েও সেটি একটি কবিতা।[৪] বাংলা গানের কথা ও সুর সম্পর্কে কমলকুমার মজুমদারের লেখায় পাওয়া যায়–'রবীন্দ্রনাথকে উপলব্দি করা হয় তাঁর কথার মাধ্যমে গভীর সুরকে ছুটি দিয়ে, ছোট সুরকে ধরে দাঁড়িয়েছে। তাই তাঁর কথা সুরের এমন সঙ্গম আর কোথাও দেখা যায় না। তাঁর গানে কথা ও সুরের মাঝে শত্রুতা নেই। স্বামী স্ত্রীর মতো তারা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন।[৫]

তবে চলচ্চিত্রের গান বাংলা গানের একটা বিশেষ ধারা হলেও এর একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে; যা দিয়ে একে সহজেই চেনা যায়। কারণ এই গানে রয়েছে নাটকীয়তা এবং এর সঙ্গে যুক্ত ভাব, রস, বিশেষ ছন্দবোধ ইত্যাদি। ফলে বাংলা গানের প্রতিষ্ঠিত কাঠামো থেকে সরে এসে এ গান মুক্ত কিংবা স্বাধীন হলেও শুদ্ধতার বিষয়টি একেবারে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। বাংলা গানের একটি আদর্শিক

কাঠামোয় চারটি অংশ থাকে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ। এরমধ্যে সঞ্চারী হলো অন্তরার পরবর্তী পদক্ষেপ। এই অংশে মূলত সম্পূর্ণ গানটির মূলভাব কিংবা সারাংশ বিবৃত করা হয়। চলচ্চিত্রে গানের ইতিহাসে প্রথম দিকের কিছু গানে সঞ্চারী লক্ষ করা গেলেও এরপর আর দেখা যায় না। যেমন–*আয়না ও অবশিষ্ট* (১৯৬৭) চলচ্চিত্রে–'আকাশের হাতে আছে একরাশ নীল।' গানটিতে সঞ্চারীর সন্ধান পাওয়া যায়–'ভেবে তো পায়নি আমি কি হলো আমার।' গানের বাণীর উপর নির্ভর করে সুর রচিত হয়। বাণীতে যেহেতু সঞ্চারীর স্থান নেই, তাই সুরেরও নেই, সেই অভাব পূরণের সক্ষমতা। স্থায়ীসহ দুটি বা তিনটি অন্তরা দিয়ে গান রচনা করার প্রবণতা অধিক মাত্রায় লক্ষ করা যায়। তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিকায়নের ফলে আশির দশকের শেষের দিকে গান ধারণের ব্যবস্থা সুপ্রশস্ত এবং বিস্তৃত হয়েছে বটে। তবে শর্টকাট প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় সঞ্চারী একেবারে উধাও হয়ে যায়। গানের সঞ্চারী সম্পর্কে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পীর খুরশীদ আলম বলেন–

> এক সময় রেডিওতে একটা সীমাবদ্ধতা ছিল তা হলো সে সময় বেঁধে দেয়া হতো ডিস্কের কারণে। আধুনিক গান হলে সাড়ে তিন মিনিট। দেশের গান হলে সর্বোচ্চ সাড়ে চার মিনিট। কিন্তু চলচ্চিত্রে সেটা ছিল না। আসলে এখানে যেটা হয় একটা স্থায়ী এবং দুটো অন্তরা নিয়ে অধিকাংশ গান। তবে ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে রচিত অধিকাংশ গানের সঞ্চারী ছিল। পরে দেখা গেলো সঞ্চারী আলাদাভাবে লিখতে হয় এবং সুরও আলাদা হয়, অর্কেস্ট্রেশনও। এসব শক্ত কাজ করার জন্য যেমন দক্ষ লোকের প্রয়োজন, তেমনি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই এসব ঝামেলা এড়াতে ধীরে ধীরে সঞ্চারী বাদ যেতে থাকে।[৬]

গান রচনার পর আসে সুরারোপের প্রসঙ্গ। কথা যত প্রাসঙ্গিক এবং কাব্যময় সুর ততোটাই। একটির সাথে অপরটির গভীর যোগসূত্র রয়েছে। চলচ্চিত্রের গানে এ সব কিছু কাহিনি বা চরিত্রের উপর নির্ভর করে রচিত হয়। সুতরাং প্রতিটি বিষয়কে সাথে নিয়ে চলতে হয়। প্রতিটি পর্যায়ে যথোপযুক্ততার প্রশ্ন থাকে। এর কোনটিকে এড়িয়ে গেলে ছন্দ পতন ঘটে এবং ব্যবহার উপযোগিতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এ সম্পর্কে কমলকুমার মজুমদারের লেখা থেকে জানা যায়-'ভালো গানে ভালো কথা বা ভালো সুর তো থাকবেই, আরও কিছু থাকতে হবে সে হচ্ছে কথা ও সুর দুইয়ের মিলন অর্থাৎ কথা ও সুরের সাযুজ্য। মনে হবে না এ গানে সুর আছে কথা নেই'।[৭] সুর প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গীতিকবি মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান বলেন–

> গানের ক্ষেত্রে সুর একটি অতি অপরিহার্য বিষয়। সুর এতোটাই অপিহার্য এবং স্বাধীন যে, কথা ছাড়াও সে গান হয়ে উঠতে পারে। আলাপ-তান-বিস্তার-সরগম এমন কি অর্থহীন শব্দের তারানাও গান হয়ে ওঠে। তবে, রাগসংগীতে সুরের এই স্বাধীনতা থাকলেও বাংলা আধুনিক গানের ক্ষেত্রে তা আর সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে না। এখানে তার যত খেলা তা কথাকে নিয়েই।[৮]

গান ব্যবহারের অধিকতর প্রাবাল্য দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এদেশের মানুষ অতি আবেগপ্রবণ ফলে এখানে সুর-বাদ্যের চেয়ে কথার গুরুত্ব অধিক এবং অন্যান্য বিষয়কে গুরুত্বের সাথে প্রাধান্য দিতে হয়। বর্তমান গানের প্রসঙ্গ টেনে সংগীতশিল্পী খুরশীদ আলম বলেন–'আগে একটা গান তুলতে কয়েক মাসও লেগে যেত। কথা, সুর, গায়কি নিয়ে রীতিমত গবেষণা হতো। আর এখন এক মুহূর্তে লেখা থেকে শুরু করে এক বসাতেই গেয়ে ফেলা হচ্ছে। তাই এসব গান আর প্রাণ

ছুঁতে পারছে না। মানে আঁতুর ঘরেই গানের মৃত্যু হচ্ছে। এক সময় চলচ্চিত্রে গল্পের প্রয়োজনে গান হতো। আর এখন গানের প্রয়োজনে চলচ্চিত্র হয়।' [৯]

গানে উপমা কিংবা রূপকের ব্যবহার

উপমা হলো অর্থালঙ্কার। অর্থের কল্পিত রূপ নির্মাণ অর্থাৎ তুলনা বোঝাতে এর ব্যবহার হয়। এবং তা নায়ক-নায়িকার একান্ত মনের কথা প্রকাশের জন্য নানা উপমা বা প্রতীকীর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে। শুধু গানে নয় বাংলা সাহিত্যের বিবিধ শাখা প্রশাখাও তার দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। ষাট-সত্তর দশকের চলচ্চিত্রের বিশেষত রোমান্টিক গানে উপমা বা রূপকের ব্যবহার রয়েছে। যেমন–*নাচের পুতুল* (১৯৭১) চলচ্চিত্রে–'আয়নাতে ঐ মুখ দেখবে যখন' *স্বরলিপি* (১৯৭০) চলচ্চিত্রে ইশারা বা ইঙ্গিতে প্রকাশ–'গানের খাতায় স্বরলিপি লিখে বলো কি হবে।' গ্রামীণ কাহিনি নির্ভর সামাজিক চলচ্চিত্র *সুতরাং*–এ 'পরানে দোলা দিল এ কোন ভ্রমরা', *পীচ ঢালা পথ* (১৯৭০) চলচ্চিত্রে–'ফুলের কানে ভ্রমর এসে চুপি চুপি বলে যায়' ইত্যাদি রূপকের ব্যবহার রয়েছে। আবার কিছু গানে সাধু-চলিত ভাষার মিশ্রণ লক্ষণীয়। এছাড়া 'মোরে', 'তাহার' ইত্যাদি এ জাতীয় শব্দ লক্ষ করা যায়। *সুতরাং* (১৯৬৪) চলচ্চিত্রে–'নদী বাঁকা জানি চাঁদ বাঁকা জানি (তাহার) চাইতে'...এছাড়া তুমি আসবে বলে ...ভালোবাসবে ওগো শুধু (মোরে) প্রভৃতি।

কিন্তু রূপকের ব্যবহার ক্রমশ লোপ পেতে দেখা যায়। তুমি, আমি, তোমার, আমার, তুই ইত্যাদি শব্দের প্রাবাল্য বেশি। নায়ক-নায়িকার মাঝে তুই সম্বোধনের বিষয়টিও লক্ষণীয়। যদিও কাহিনি বা চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তা ব্যবহৃত। তবে অনেকের ক্ষেত্রে তা নেতিবাচক লেগেছে। তুই শব্দটি ধীরে ধীরে চলচ্চিত্রের গানে এবং সংলাপে বেড়ে যেতে দেখা যায়। *আঁখি মিলন* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে–'তুই কেমন পুরুষরে আমার কথা..।' *নিষ্পাপ* (১৯৮৬) চলচ্চিত্রে–'তুই যে আমার মিলন মালারে বন্ধু পিরিতের... ।' ধীরে ধীরে রোমান্টিকতার প্রকাশ ক্রমশ খোলামেলার দিকে অগ্রসর হয়। *আশীর্বাদ* (১৯৮৩) চলচ্চিত্রে–'চাঁদের সাথে আমি দেব না তোমার তুলনা।' এছাড়া 'এই মন তোমাকে দিলাম, এই প্রেম তোমাকে দিলাম।' তুমি যেখানে আমি সেখানে, সে কি জান না।' আজ রাত সারা রাত জেগে থাকব/ছোঁয়া দিয়ে হৃদয়ের দ্বার খুলবো প্রভৃতি।

তবে কাব্য সমৃদ্ধ ভাবাবেগের গানও রয়েছে এবং এর সংখ্যাও কম নয়। 'ওগো মোর মধুমিতা, মন আমার ছোট্ট তরী, এই হৃদয়ে কথার কাঁপন, এত সুখ সইব কেমন করে, আমি রজনিগন্ধা ফুলের মত গন্ধ বিলিয়ে যাই প্রভৃতি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লোকজ গান 'গুন গুন গুন গান গাহিয়া নীল ভ্রমরা যাই।' উল্লেখ্য যে, কামনার কথা সেকালেও ছিল সর্তক শব্দ চয়ন এবং এতটাই সংযত এবং শৈল্পিক যে, তা কখনো অশ্লীলতার দিকে অঙ্গলি নির্দেশ করেনি। যেমন–'ইশারায় শিষ দিয়ে আমাকে ডেকো না/কামনার চোখ দিয়ে আমাকে দেখো না'। বর্তমানে গানের কথা এতটাই অশ্লীল এবং খোলামেলা যে তা মুখে উচ্চারণ করাও লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়–'যা করবি এখনই কর/এই অঙ্গে প্রেমেরই ঝড়।'

সাধারণত আসরকেন্দ্রীক গানগুলোতে নিছক আনন্দ লাভের জন্য হালকা এবং খোলামেলা কথায় রচিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু না সেগুলোও ছিল কাব্যময় এবং ইশারা বা ইঙ্গিতপূর্ণ। যেমন–'মন

তুমি কেড়ে নিলে, এ কি বিষম দায় রে, কুল বধূর মান বুঝি যায় যায় রে' (*অবাঞ্ছিত*-১৯৬৯),'জনম জনম ধরে প্রেম পিয়াসী, দুটি আঁখি নিশি জাগে, দূরের চাঁদের পরশ লাগি, কাঁদে চকরী অনুরাগে' (*দেবদাস*-১৯৮২), 'আমি বাজুবন্ধ হলাম না, ঝুমকা চুড়ি হলাম না, হলাম না তো কারো গলার হার' (*শুভদা*-১৯৮৬) প্রভৃতি। কিন্তু ধীরে ধীরে ইশারা বা ইঙ্গিত থেকে সরে যেতে থাকে। রচিত হতে থাকে–'জলসা ঘরে মাতাল হাওয়ার তুফান জেগেছে, তাই তো আমার বুকের মাঝে আগুন লেগেছে, এই রূপ আছে প্রেমে আছে, নেবে কি বলো ? আরে নাচ নাচ নাচ সখী প্রাণ খুলে নাচ, আরে বাহ্ বাহ্ বাহ্ সখী চুকু চুকু নাচ' *নরম গরম* (১৯৮৪)।

গানের বাণী, সুর, অনুকরণ প্রবণতা ও অবক্ষয়

চলচ্চিত্র একটি প্রাযুক্তিক এবং ব্যয়বহুল মাধ্যম। ফলে শিল্পের আদর্শ কিংবা নন্দনতাত্ত্বিক বিষয় আশয়ের পাশাপাশি বাণিজ্যিক মনোভাব প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-দীক্ষার অভাব, কারিগরিতে অদক্ষ, অনগ্রসর জনবল প্রযোজক, পরিচালক বিভ্রান্ত হয়ে কখনো কখনো বিচার বিশ্লেষণ না করে বিদেশি চলচ্চিত্র দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এমনকি কোন কোন নির্মাতারা নকল করা, কাটপিস সংযোজন, অশ্লীলতা ইত্যাদির দিকে ঝুঁকে পড়ে। যেমন এফডিসি প্রতিষ্ঠার উত্তরকালে পাকিস্তানি উর্দু ছবির কাছে বাংলা ছবি ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে পারেনি বলে উর্দু চলচ্চিত্র নির্মাণের হিড়িক পড়েছিল।

উর্দু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা এবং বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে এক সময় নির্মাতারা আবিষ্কার করেছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের চাহিদা। ফলত বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলায় শুরু হয়েছিল অনুকরণের প্রচেষ্টা তদুপরি নকলের প্রবণতাও এড়াতে পারেনি। হিন্দি গানের সুরের ছাঁচে ফেলে কথা বসানোর কাজ হয়েছে এদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে সুরশৈলীর অধ্যায়ের ভিনদেশি সুর ও গায়কি প্রসঙ্গের অংশে। চলচ্চিত্রে একটি গান তার বিশেষ প্রেক্ষাপট নিয়ে আবির্ভূত এবং তদুপরি কাহিনির বিশেষ অংশ হিসেবে অগ্রগণ্য। একে বাদ দিলে কাহিনির অঙ্গহানী ঘটে। ফলে গানের বাণী এবং সুরের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

কিন্তু ধীরে ধীরে তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তার লাভ বিনোদনের দুয়ার প্রসারিত হওয়ার কারণে দর্শক হলবিমুখ হয়ে পড়ে। বিদেশি চলচ্চিত্রের কাছে এদেশীয় চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। এ সময় একদল প্রযোজক, পরিচালক নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখার উপায় হিসেবে কাটপিস, অশ্লীল দৃশ্য নির্মাণ ইত্যাদির আশ্রয় নেয় এবং এসব কিছু গানের মাধ্যমেই বেশি হয়। যেমন–'মনে মনে যৌবনে লাগল আগুন/ জল দিলে নেভে না জ্বলেরে দ্বিগুণ' (*দি রেইন*-১৯৭৬), 'চাঁদনি রাতে তোমারই সাথে মিলন হবে গো আজ' (*চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা*-১৯৮৪), 'ঢেউ খেলেরে ঢেউ খেলেরে/ মন দরিয়ায় পিরিতের ঢেউ খেলে' (*আমানত*-১৯৮৫), 'নয়া গাঙ্গে নয়া পানি/নাও বাইও না এই গাঙেতে/ আছে অনেক উচা নিচা ঢেউ/ সেই গাঙেতে কুমির আছে জানে না তো কেউ' (*গুনাই বিবি*-১৯৮৫),'ধান ছিটাইলে কাক যে আসে, ফুল ছিটাইলে আসে ভ্রমর' (*স্যারেন্ডার*-১৯৮৭) প্রভৃতি।

এ সময়কালে বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির অভিনয় শিল্পীদের দেখা যায় এসব গানে। অন্য এক ধরনের শিল্পীরও উত্থান ঘটে। যারা যৌন আবেদন তৈরি করে স্বল্প বসনের পোশাক পড়ে। প্রায় চলচ্চিত্রেই এই ধরনের গান আইটেম গান হিসাবে চালিয়ে দেয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। এ সম্পর্কে সংগীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনের কাছ থেকে জানা যায়–ভারতীয় গান, ভিডিও এদেশে খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করছে। ফলে গান তার নিজস্বতা হারিয়ে অধঃপতনের সামিল।[১০] বর্তমান সময়ের গান নিয়ে গীতিকার কে জি মোস্তফা বলেন–

> গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাব্যময়তা ও মেলোডি। এখন তা কোথায়? আগে গান লিখতে পড়া লেখা করতে হতো। যারা সাহিত্যচর্চা করত তারাই গান, গল্প লিখত। এখন ইচ্ছা করলেই যে কেউ গীতিকার, গল্পকার হয়ে যেতে পারছে। বিষয়টি যেন একেবারেই সহজ হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে এখন সাহিত্যনির্ভরতাকে বাদ দিয়ে বাণিজ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এখনকার গানে মেলোডি, কাব্যময়তা, জীবনবোধ, শিক্ষা এবং গভীরতা বলতে কিছু নেই। তাই এখনকার গান সহজে হারিয়ে যাচ্ছে। [১১]

গীতিকার ও চলচ্চিত্র পরিচালক আমজাদ হোসেন বলেন–‘বর্তমানে গানের মৌলিকত্ব দুঃখজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তাই এখনকার গান আর শ্রোতাদের মনে স্থায়ী আসন গড়ে নিতে পারছে না। এর অনেক কারণ রয়েছে। যোগ্য গীতিকার ও সুরকারের অভাব। গানের কথা ও সুরে এখন মেলোডি এবং জীবনবোধের অভাব, কথা ও সুরে গভীরতা নেই’। [১২] এক সময় গান লিখতেন কবি, সাহিত্যিক, কলেজ, বিশ্বদ্যিালয়ের শিক্ষকেরা। কিন্ত বর্তমানে গানের হাল দশা প্রশ্নবিদ্ধ করে আসলে কারা গান লিখছে ? এ সম্পর্কে বিশিষ্ট গীতিকবি মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান বলেন–‘আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জিয়া হায়দার জীবনের শেষ পর্যন্ত সবাই গান লিখে গেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে কারা গান লিখছে ?’ [১৩]

তবে আশার কথা হলো বর্তমানে একদল শিল্পী, কলাকুশলী, প্রযোজক, পরিচালক সকলে চলচ্চিত্রের সুদিন ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলচ্চিত্র বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয়েছে। তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতারা পরিচ্ছন্ন চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন। ফলে চলচ্চিত্রের পালে সম্ভাবনার হাওয়া লাগছে এবং এর ছোঁয়া গানেও লেগেছে।

উল্লেখযোগ্য গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালকবৃন্দের উল্লেখযোগ্য গান প্রসঙ্গ এবং সাক্ষাৎকার:

একটি গান সৃষ্টির পেছনে বিশেষত চলচ্চিত্রে গানের ক্ষেত্রে বেশ ক’জন ব্যক্তিবর্গের অবদান বিশেষভাবে স্বীকার্য। যেমন: গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক, নেপথ্যকণ্ঠশিল্পী এবং সর্বোপরি চলচ্চিত্র পরিচালক। তার পরামর্শ, পর্যবেক্ষণ এবং বিশেষ তত্ত্বাবধানে গান রচিত তদুপরি চিত্রায়িত হয়। অতঃপর গান তার বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থে সক্ষমতা অর্জন করে। চলচ্চিত্রের গানের বিশেষত্ব এখানেই। কাহিনির উপর ভিত্তি করে রচনা পরবর্তী আসে সুর করার প্রসঙ্গ। অতএব সুরকার তার নানা অভিজ্ঞতা এবং সৃষ্টিশীলতার মধ্য দিয়ে শিল্পনৈপুণ্যের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। যে সব গানের শক্তিতে এদেশের চলচ্চিত্রের গান বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত। সেই সব গীতিকবিদের উল্লেখযোগ্য গান তুলে ধরা প্রয়োজন। নিম্নরূপভাবে তা আলোচনা করা হলো:

উল্লেখযোগ্য গীতিকার :

আবদুল গফুর (১৯০৭-১৯৯৯)

তিনি এদেশের সবাক চলচ্চিত্র মাধ্যমের ইতিহাসে অর্থাৎ (*মুখ ও মুখোশ*-১৯৫৬) চলচ্চিত্রের প্রথম গীতিকার। তাঁর সুরারোপিত এ চলচ্চিত্রের গান–মাহবুবা রহমানের কণ্ঠে এবং পিয়ারী বেগমের অভিনয়ে পরিবেশিত–'মনের বনে দোলা লাগে আসলো দখিন হাওয়া, হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর হলো ফিরে পাওয়া।' আরেকটি গান রয়েছে আবদুল আলীমের কণ্ঠে–'আমি ভিন গেরামের নাইয়া।'

আজিজুর রহমান (১৯১৪-১৯৭৮)

সাহিত্যচর্চা দিয়ে তাঁর জীবন শুরু। ছাত্র অবস্থাতেই কাব্য এবং সংগীতে মনোযোগী ছিলেন। চলচ্চিত্রে তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে–'এই সুন্দর পৃথিবীতে এই রাত বলে ওগো তুমি'(*রাজধানীর বুকে*-১৯৬০), 'আমি রূপনগরের রাজ কন্যা রূপের যাদু এনেছি','প্রজাপতি ওড়না ছড়িয়ে, ফুলের ঐ কানে কানে ভ্রমর এসে গুনগুনিয়ে' (*হারানো দিন*-১৯৬১) প্রভৃতি।

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৮)

মূলত তিনি কবি কিন্তু গানেও রয়েছে তাঁর সুখ্যাতি। 'আমার আকাশে তারার মত জ্বলে' (*মাটির পাহাড়*-১৯৫৯), 'আমি হাজার বছর ধরে/তোমারই পথ চেয়ে আছি' (*রাজবাড়ী*) প্রভৃতি।

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬)

বাংলা ভাষার অন্যতম কবি সৈয়দ শামসুল হক, যিনি কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, অনুবাদ এবং চলচ্চিত্রের পরিপূর্ণ একজন মানুষ। শিল্পসাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় সাবলীল পদচারণার জন্য তাঁকে সব্যসাচী লেখক বলা হয়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গান–'তুমি আসবে বলে কাছে ডাকবে বলে', পরানে দোলা দিল এ কোন ভ্রমরা' (*সুতরাং*-১৯৬৪), 'ফুলের মালা পরিয়ে দিলে আমায় আপন হাতে' (*ময়নামতি*-১৯৬৯),'চোখ ফেরানো যায় গো, তবু মন ফেরানো যায় না', 'মনতুমি কেড়ে নিলে এ কি বিষম দায় রে' (*অবাঞ্ছিত*-১৯৬৯),'হায় রে মানুষ রঙিন ফানুস দম ফুরাইলে *ঠুস্*'(*বড় ভালো লোক ছিল*-১৯৮২), 'চাঁদের সাথে আমি দেব না তোমার তুলনা' (*আর্শীবাদ*-১৯৮৩) প্রভৃতি।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮)

কবি, সাহিত্যিক ও ভাষা বিজ্ঞানী, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫৬ সালে গান লেখা শুরু করেন। তাঁর অধিকাংশ গানে বিশেষত চলচ্চিত্রে দেশপ্রেম, গ্রাম বাংলার চিরায়ত রূপ, প্রকৃতি, সমাজ-সংস্কৃতি, নর-নারীর প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদির প্রকাশ ঘটেছে এবং তা রোমান্টিক ভাবালোকে বিশেষ কাব্যময়তার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে–'হলুদ বাটো মেন্দি বাটো, বাটো ফুলের মৌ', 'চাতুরী জানে না মোর বধুয়া' (*ডাকবাবু*-১৯৬৬), 'আমার এ গান তুমি শুনবে' (*দীপ নেভে নাই*-১৯৭০), 'অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান' (*অশ্রু দিয়ে লেখা*-১৯৭২), 'আরে ও প্রাণের রাজা তুমি যে আমার' (*বাদশা*-১৯৭৫), 'এ আকাশকে সাক্ষী রেখে', 'দাও গায়ে হলুদ পায়ে আলতা হাতে মেন্দি'(*সোহাগ*-১৯৭৮),'তুমি কি দেখছো কভু জীবনের পরাজয়' (*এতটুকু আশা*-১৯৬৮) প্রভৃতি অন্যতম। তিনি চলচ্চিত্রে অধিকাংশ গান লিখেছেন সাইফুল

আজম কাশেম পরিচালিত চলচ্চিত্রসমূহে এবং তাঁর অধিকাংশ গানের সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন আলী হোসেন। তাঁর গান ওপার বাংলার অনেক জনপ্রিয় শিল্পীর কণ্ঠে পরিবেশিত হয়েছে। যেমন–হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকাসহ আরও অনেক শিল্পী।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-১৯৮৯)

একাধারে তিনি কবি গীতিকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি কবিতা লিখতেন। চলচ্চিত্রে তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে–'মুখের হাসি নয় গো শুধু/মনের দিশা মেলে আয়না পেলে' এবং 'মনে হলো যেন এই নিশি লগনে/চাঁদ হয়ে এলে তুমি মোর গগনে' (*তোমার আমার*-১৯৬১),'কালো রূপ কত অপরূপ/আমি দেখেছি নয়ন মেলে' (*আগুন নিয়ে খেলা*-১৯৬৭),'তুমি যে আমার কবিতা' (*দর্পচূর্ণ*-১৯৭০),'এই পৃথিবীর পান্থশালায়' (*যোগবিয়োগ*-১৯৭০), আলাউদ্দিন আলীর সুর এবং সাবিনা ইয়াসমিনের নেপথ্যকণ্ঠে–'শত জনমের স্বপ্ন তুমি আমার জীবনে এলে' (*রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত*-১৯৮৭) প্রভৃতি বিশেষভাবে অন্যতম।

কে জি মোস্তফা (১৯৩৭-)

তাঁর গানের মূল প্রেরণা হলো রোমান্টিসিজম। এদেশের চলচ্চিত্রে রোমান্টিক গান রচনার সূচনা তিনিই করেন। তালাত মাহমুদের গাওয়া–'তোমারে লেগেছে এত যে ভাল চাঁদ বুঝি তাই জানে' (*রাজধানীর* (*বুকে*-১৯৬০), এছাড়া মাহমুদুন্নবীর কণ্ঠে, রাজ্জাকের অভিনয়ে পরিবেশিত 'আয়নাতে ঐ মুখ দেখবে যখন' (*নাচের পুতুল*-১৯৭১) চলচ্চিত্রের গানটি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

আহমদ জামান চৌধুরী (১৯৪৭-১৯১৩)

চলচ্চিত্র সাংবাদিক, কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ রচয়িতা ও গীতিকার। প্রেম-বিরহ এবং জীবনবোধ তাঁর গানের অন্যতম অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর রচিত গানের মধ্যে–'নতুন নামে ডাকো আমায় এই তো ছিল কামনা' (*নতুন নামে ডাকো*-১৯৬৯), 'পিচ ঢালা এই পথটারে ভালোবেসেছি' সাবিনা ইয়াসমিনের গাওয়া–'ঝড়ের পাখি হয়ে উড়ে যেতে হবে বহুদূরে'(*পীচ ঢালা পথ*-১৯৭০), 'যেওনা সাথী চলেছো একেলা কোথায়' (*দূর দেশ*-১৯৮৩), 'এই বৃষ্টি ভেজা রাতে চলে যেওনা' (*নরম গরম*-১৯৮৪) প্রভৃতি গান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মাসুদ করিম (১৯৪০-১৯৯৬)

পাঁচশরো'র অধিক চলচ্চিত্রে তিনি গান লিখেছেন। তারমধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয়– সৈয়দ আবদুল হাদীর কণ্ঠে–'চলে যায় যদি কেউ বাঁধন ছেড়ে' এবং বশীর আহমেদের কণ্ঠে–'সজনী গো ভালবেসে এত জ্বালা' (*ভাঙা গড়া*-১৯৮১), সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে 'আমি রজনিগন্ধা ফুলের মত গন্ধ বিলিয়ে যাই' (*রজনীগন্ধা*-১৯৮২),'একি বাঁধনে বলো জড়ালে আমায়' (*তালুকদার*-১৯৮৬) প্রভৃতি গান বিশেষভাবে সমাদৃত।

আমজাদ হোসেন (১৯৪২-২০১৮)

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তিনি। সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখা–গল্প, উপন্যাস, নাটক মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস, জীবনী, কিশোর উপন্যাস, চলচ্চিত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য অবদান রয়েছে। তবে তাঁকে বিশেষভাবে চেনা যায় চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। এদেশের জনগণের মাঝে তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয় বরণীয় তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। এ মাধ্যমেরও প্রায় প্রতিটি শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। অভিনেতা, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ রচয়িতা, কাহিনিকার, গীতিকার। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রের বেশিরভাগ গানের সুরকার এবং সংগীত পরিচালক আলাউদ্দিন আলী।

বিশেষভাবে দেশপ্রেম, নর-নারীর প্রেম, আত্মোপলব্ধি এবং আধ্যাত্মিক চেতনা তাঁর গানের অন্যতম বিষয়। 'কেউ কোন দিন আমারে তা কথা দিল না', 'তোমারও দুনিয়া দেখিয়া শুনিয়া মনের আগুন দিগুণ হইল'(*সুন্দরী*-১৯৭৯),'জন্ম থেকে জ্বলছি মাগো' (*জন্ম থেকে জ্বলছি*-১৯৮১), বিরহ প্রেমের মেলোডিয়াস গান–'এমন তো প্রেম হয় চোখের জলে কথা কয়' *(দুই পয়সার আলতা*-১৯৮২), 'তিলে তিলে মইরা যামু তবু তোরে ডাকব না', 'কত কাঁদলাম কত গো সাধলাম আইলানা' (*ভাত দে*-১৯৮৪) প্রভৃতি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান (১৯৪৩-)

আধুনিক বাংলা গানের অন্যতম গীতিকবি। দীর্ঘ সময় ধরে যিনি গানের বাণী, শব্দ চয়ন, কাব্যময়তা ইত্যাদি নিয়ে সগৌরবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে–'সাথী আমার হলো না তো কেউ' (*স্মাগলার*-১৯৭৬), 'জনম জনম ধরে প্রেম পিয়াসি', 'সুখ পাখি তোর হইল না আপন' (*দেবদাস*-১৯৮২),'ফুলের বাসর ভাঙ্গল যখন', 'এই হৃদয়ে এত যে কথার কাঁপন' (*চন্দ্রনাথ*-১৯৮৪),'তুমি এমনই জাল পেতেছো সংসারে', 'হায়রে অবুঝ নদীর দুই কিনার', নীলুফার ইয়াসমিনের কণ্ঠে–'এত সুখ সইব কেমন করে' (*শুভদা*-১৯৮৬) প্রভৃতি বিশেষভাবে জনপ্রিয়।

গাজী মাজহারুল আনোয়ার (১৯৪৪)

তিনি একাধারে গীতিকার, কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকার, প্রযোজক ও পরিচালক। তবে তিনি গীতিকার হিসেবেই বেশি খ্যাত। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা বিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে–'আকাশের হাতে আছে একরাশ নীল' (*আয়না ও অবশিষ্ট*-১৯৬৭), 'তুমি কখন এসে দাঁড়িয়ে আছো', ভাবি যেন লাজুকলতা, সাতটি রঙের মাঝে আমি মিল খুঁজে নাই পাই' (*আবির্ভাব*-১৯৬৮), 'ও মেয়ের নাম দেব কি ভাবি শুধু তাই আমি', 'গানেরই খাতায় স্বরলিপি কি হবে' (*স্বরলিপি*-১৯৭০),'গীতিময় সেই দিন চিরদিন বুঝি আর রলোনা' (*ছন্দ হারিয়ে গেলো*-১৯৭২), 'আমি সাত সাগর পাড়ি দিয়ে'(*আলো তুমি আলেয়া*-১৯৭৫), 'যদি আমাকে জানতে সাধ হয় বাংলার মুখ তুমি দেখে নিও' (*হারজিৎ*-১৯৭৫), 'শুধু গান গেয়ে পরিচয়' (*অবুঝ মন*-১৯৭৬), 'গান নয় জীবন কাহিনি'(*বন্দিনী*-১৯৭৬), 'তুমি বড় ভাগ্যবতী' (*প্রতিনিধি*-১৯৭৬), 'মা গো মা ওগো মা' (*সমাধি*-১৯৭৬), 'চক্ষের নজর এমনি কইরা' (*ফকির মজনু শাহ*-১৯৭৮), সুবীর নন্দীর গাওয়া 'বন্ধু তোর বারাত নিয়া আমি যাব' (*বন্ধু*-১৯৭৮) প্রভৃতি অন্যতম।

মুকুল চোধুরী (১৯৪৫-২০০২)

তাঁর রচিত অধিকাংশ গান সুর করেছেন আলম খান। উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে–‘জলতরঙ্গ মন আমার’ (*কাঁচ কাটা হীরে*-১৯৭০),‘ওরে নীল দরিয়া, আমায় দেরে দে ছাড়িয়া’ (*সারেং বৌ*-১৯৭৮), ‘আজকে না হয় ভালবাসো আর কোনদিন’ (*মিন্টু আমার নাম*-১৯৭৮), ‘আমি না জানিলাম না চিনিলাম রে’ (*আরাধনা*-১৯৭৯), ‘তুমি আছো সবই আছে, তুমি নাই কিছু নাই’ (*সখী তুমি কার*-১৯৮০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নজরুল ইসলাম বাবু (১৯৪৯-১৯৯০)

অকাল প্রয়াত গীতিকবি তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে–‘আমার গরুর গাড়িতে বউ সাজিয়ে’ (*আঁখি মিলন*-১৯৮৩), খোন্দকার নূরুল আলমের সুরে হৈমন্তী শুক্লার কণ্ঠে–‘ডাকে পাখি খোলো আঁখি দেখো সোনালী আকাশ’ (*প্রতিরোধ*-১৯৮৭) প্রভৃতি সমাদৃত।

মনিরুজ্জামান মনির (১৯৫২-)

তাঁর অধিকাংশ গান সুর করেছেন আলম খান। উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে–‘একটা দোলনা যদি কাছে পেতাম’ (*এখনই সময়*-১৯৮০) ‘এই জীবন তো একদিন’ (*মানেনা মানা*-১৯৮২),‘আমি চিরকাল প্রেমের কাঙাল, (*প্রিন্সেস টিনা খান*-১৯৮৪), ‘সখী কারে ডাকে ঐ বাঁশি নাম ধরিয়া’ (*প্রাণ সজনী*-১৯৮৩), ‘তুমি যেখানে আমি সেখানে’ (*নাগপূর্ণিমা*), ‘আজ রাত সারারাত জেগে থাকব’ (*নীতিবান*-১৯৮৮), ‘জীবনের গল্প আছে বাকি অল্প’ (*ভেজা চোখ*-১৯৮৮) প্রভৃতি অন্যতম।

ফজল এ খোদা (১৯৪১-)

তাঁর চলচ্চিত্রে স্মরণীয় গানগুলোর মধ্যে–ইসমত আরার কণ্ঠে–‘জীবনের আঙিনায় মন ভ্রমরা’ (*প্রতিকার*-১৯৬৯),‘ভালবাসার মূল্য কত’ (*এপার ওপার*-১৯৭৫), ‘মানুষের গান আমি শুনিয়ে যাব’ (*মনের মানুষ*-১৯৭৭) প্রভৃতি বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল (১৯৫৬-২০১৯)

গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক। তবে এর মধ্যে সুরকার এবং সংগীত পরিচালক হিসেবেই তিনি বেশি সমাদৃত। তাঁর রচনা এবং সুরে উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে–‘কথা বলব না বলেছি’(*আঁখি মিলন*-১৯৮৩), ‘আমার সারা দেহ খেওগো মাটি’, ‘আমার বুকের মধ্যেখানে মন যেখানে হৃদয় যেখানে’ ‘আমি তোমার দুটি চোখে দুটি তারা হয়ে থাকব’, ‘আমার বাবার মুখে প্রথম যেদিন শুনেছিলাম গান’ (*নয়নের আলো*-১৯৮৪), ‘আমি তোমারই প্রেম ভিখারি’, ‘মনটা যদি খোলা যেত সিন্দুকের মত’, ‘আইলো দারুণ ফাগুন রে’ (*চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা*-১৯৮৪) প্রভৃতি বেশ জনপ্রিয়।

সুরকার ও সংগীত পরিচালক :

সুরারোপে ও সংগীত পরিচালনায় যাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম–

সমর দাস (১৯২৫-২০০১)

তিনি এদেশের চলচ্চিত্রেরশিল্পের ইতিহাসে প্রথম সবাক *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬) চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালক। সহকারী সংগীত পরিচালক ছিলেন ধীর আলী মিয়া। তিনি চলচ্চিত্রের চেয়ে আধুনিক এবং দেশাত্ববোধক গানের সুরই বেশি করেছেন। খুব বেশি চলচ্চিত্রে তিনি কাজ করেননি। *মুখ ও মুখোশ* ছাড়াও *মাটির পাহাড়* (১৯৫৯), *আসিয়া* (১৯৬০), *রাজা এলো শহরে* (১৯৬৪), *ধীরে বহে মেঘনা* (১৯৭৩) প্রভৃতি চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করেন। বেশক'টি বাদ্যযন্ত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন। বেহলা, গিটার, বাঁশি, পিয়ানো। আরেকটি বিশেষ অবদান রয়েছে তাঁর–বাংলাদেশে জাতীয় সংগীতের অর্কেস্ট্রেশন করেন তিনি।

আবদুল আহাদ (১৯১৮-১৯৯৪)

গজল ও ঠুমরি গাওয়ার পাশাপাশি তিনি রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। তিনি ছিলেন শান্তি নিকেতেনের রবীন্দ্রসংগীত শাখায় প্রথম ও একমাত্র মুসলমান শিক্ষার্থী। চলচ্চিত্রের চেয়ে আধুনিক এবং দেশাত্ববোধক গানের সুরই তিনি বেশি করেছেন। *আসিয়া* (১৯৬০) চলচ্চিত্রে তিনি এবং সমর দাস যৌথভাবে সংগীত পরিচালনা করেন।[১৪]

সুবল দাস (১৯২৭-২০০৫)

চার দশকের সংগীত জীবনে প্রায় তিন শতাধিক চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালন করেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য গান ও চলচ্চিত্র–'গানেরই খাতায় স্বরলিপি কি হবে' (*স্বরলিপি*-১৯৭০), 'তুমি যে আমার কবিতা' (*দর্পচূর্ণ*-১৯৭০),'এই পৃথিবীর পান্থশালায়' (*যোগবিয়োগ*-১৯৭০),'আমি সাত সাগর পাড়ি দিয়ে' (*আলো তুমি আলেয়া*-১৯৭৫), 'চন্দ্র তারায় মিছে খুঁজেছি তোমায়' (*রাজকন্যা*-১৯৮০) প্রভৃতি।

খান আতাউর রহমান (১৯২৮-১৯৯৭)

একাধারে গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, সংগীত পরিচালক চলচ্চিত্র পরিচালক এবং অভিনেতা। *এদেশ তোমার আমার* চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তিনি সংগীত পরিচালনা শুরু করেন। উল্লেখযোগ্য সুরারোপিত গান–'একি সোনার আলোয় জীবন ভরিয়ে দিলে', 'আমাকে পোড়াতে যদি', 'আহা কী যে সুন্দর হারিয়েছি অন্তর' (*মনের মত বউ*-১৯৬৯), 'তুমি চেয়েছিলে ওগো জানতে', 'এক নদী রক্ত পেরিয়ে' (*আবার তোরা মানুষ হ*-১৯৭৩), 'মন যদি ভেঙ্গে যায় যাক কিছু বলব না' (*জোয়ার ভাটা*-১৯৬৯), 'দিন যায় কথা থাকে' (*দিন যায় কথা থাকে*-১৯৭৯), 'হায়রে আমার মন মাতানো দেশ' (*ডানপিটে ছেলে*-১৯৮০) প্রভৃতি অন্যতম।

আলতাফ মাহমুদ (১৯৩০-১৯৭১)

তাঁর সুর করা উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে–'নাচে মন ধিনা ধিনা প্রাণেতে বাজে বীণা বাজেরে' (*বেহুলা*-১৯৬৬), 'আমায় ঝুমকো লতার বাজুবন্ধে কে জড়ালো' (*ক খ গ ঘ ঙ*-১৯৭০),'অনুরাগের গানে গানে আরও কাছে এলেই যদি' (*আঁকা বাঁকা*-১৯৭০), 'কালো রূপ কত অপরূপ/আমি দেখেছি নয়ন মেলে'(*আগুন নিয়ে খেলা*-১৯৬৭), 'একটি ছোট্ট আশা, একটি ছোট্ট বাসা' (*প্রতিশোধ*-১৯৭২), 'শুধু গান গেয়ে পরিচয়' (*অবুঝ মন*-১৯৭২) প্রভৃতি।

সত্য সাহা (১৯৩৪-১৯৯৯)

উল্লেখযোগ্য সুরারোপিত গান–'পরানে দোলা দিল এ কোন ভ্রমরা' এবং 'তুমি আসবে বলে কাছে ডাকবে বলে' (*সুতরাং*-১৯৬৪), 'আকাশের হাতে আছে একরাশ নীল' (*আয়না ও অবশিষ্ট*-১৯৬৭), 'তুমি কখন এসে দাঁড়িয়ে আছো' (*আবির্ভাব*-১৯৬৮), 'তুমি কি দেখেছো কভু জীবনের পরাজয়' (*এতটুকু আশা*-১৯৬৮), 'গান হয়ে এলে মন যেন বলে', 'প্রেমের নাম বেদনা' এবং 'নীল আকাশের নিচে আমি'(*নীল আকাশের নীচে*-১৯৬৯),'এই পৃথিবীর প'রে' (*আলোর মিছিল*-১৯৭৪), সুবীর নন্দীর গাওয়া–'বন্ধু তোর বারাত নিয়া আমি যাব' (*বন্ধু*-১৯৭৮) প্রভৃতি। এছাড়া তাঁর গানে পাশ্চাত্য সুরভঙ্গিমার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়–'ঐ দূর দূর দূরান্তে' (*দীপ নেভে নাই*-১৯৭০) চলচ্চিত্রের গানটিতে।

খোন্দকার নূরুল আলম (১৯৩৬-২০১৬)

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে গানের ইতিহাসে মৌলিক সুরস্রষ্টা হিসেবে খ্যাত। তিনি উপন্যাসের চিত্রায়িত চলচ্চিত্রে সুরারোপিত গানগুলোর জন্য বেশ জনপ্রিয় হোন। এর কারণ হিসেবে ত্রয়ী শিল্পীর মেলবন্ধনের এক প্রচেষ্টারই ফল বলে গণ্য করা যায়। চাষী নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ রফিকউজ্জমান এবং খোন্দকার নূরুল আলম। সেই সাথে শরৎ সাহিত্য। এই প্রচেষ্টার অন্যতম ফসল–'জনম জনম ধরে প্রেম পিয়াসি', 'সুখ পাখি তোর হইল না আপন' (*দেবদাস*-১৯৮২),'ফুলের বাসর ভাঙ্গল যখন', এই হৃদয়ে এত যে কথার কাঁপন, মুখে কেন বলা হয় না' (*চন্দ্রনাথ*-১৯৮৪),'তুমি এমনই জাল পেতেছো সংসারে', 'হায়রে অবুঝ নদীর দুই কিনার','এত সুখ সইব কেমন করে' (*শুভদা*-১৯৮৬) প্রভৃতি অন্যতম। শুধু সুর কিংবা সংগীত পরিচালনাই করেননি, চলচ্চিত্রের গান গেয়েও তিনি বেশ জনপ্রিয়–'চোখ যে মনের কথা বলে' (*যে আগুনে পুড়ি*-১৯৭০) অথবা উদ্দীপনামূলক গান–'আমায় একটা ক্ষুদিরাম দাও' (*ওরা এগার জন*-১৯৭২) প্রভৃতি বেশ সমাদৃত।

রবীন ঘোষ (১৯৩৯-২০১৬)

এদেশের চলচ্চিত্রে পরিচ্ছন্ন রোমান্টিক গানের সুর সূচনা তিনিই করেন। তালাত মাহমুদের গাওয়া–'তোমারে লেগেছে এত যে ভাল, চাঁদ বুঝি তাই জানে' (*রাজধানীর বুকে* (১৯৬০), মাহমুদুন্নবীর কণ্ঠে, রাজ্জাকের অভিনয়ে পরিবেশিত–'আয়নাতে ঐ মুখ দেখবে যখন' (*নাচের পুতুল*-১৯৭১) চলচ্চিত্রের গানটি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এছাড়া পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা তাঁর সুরারোপিত গানে লক্ষ করা যায়; 'আমি রপনগরের রাজকন্যা রূপের যাদু এনেছি' (*হারানো দিন*-১৯৬১) গানটিতে। চলচ্চিত্রে পাশ্চাত্য সুরভঙ্গিমা আনারও প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। সাবিনা ইয়াসমিনের গাওয়া–'ঝড়ের পাখি হয়ে উড়ে যেতে হবে বহুদূরে'(*পীচঢালা পথ*-১৯৭০) গানটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

আলী হোসেন (১৯৪০-)

তিনি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের গীত এবং সাইফুল আজম কাশেম পরিচালিত চলচ্চিত্রে বেশি সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য–'অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান' (*অশ্রু দিয়ে লেখা-*

১৯৭২), 'এ আকাশকে সাক্ষী রেখে' (*সোহাগ*-১৯৭৮),'আরে ও প্রাণের রাজা তুমি যে আমার' (*বাদশা*-১৯৭৫) প্রভৃতি। এছাড়া 'হলুদ বাটো মেন্দি বাটো, বাটো ফুলের মৌ' (*ডাকবাবু*-১৯৬৬) এবং 'দাও গায়ে হলুদ পায়ে আলতা হাতে মেন্দি' *সোহাগ* চলচ্চিত্রের এই গানটি বাঙালি সমাজ জীবনে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে বিয়ের অন্যতম আনুষ্ঠানিকতায় না বাজলে গায়ে হলুদের আসরটি যেন অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

আনোয়ার পারভেজ (১৯৪২-২০০৬)

তাঁর সুরারোপিত গানের মধ্যে–'তুমি সাত সাগরের ওপার থেকে আমায় দেখেছো' (*কত যে মিনতী*-১৯৭০), 'গীতিময় সেই দিন চিরদিন বুঝি র'লোনা' (*ছন্দ হারিয়ে গেলো*-১৯৭২), 'চঞ্চল হাওয়ারে' (*দি রেইন*-১৯৭৬),'আমার মন বলে তুমি আসবে' (*আনার কলি*-১৯৮০),'হয় যদি বদনাম' (*বদনাম*-১৯৮৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দেবু ভট্টাচার্য (১৯৩০-১৯৯৪)

তিনি একাধারে কণ্ঠশিল্পী, সুরকার, চিত্রকর বাদ্যযন্ত্রশিল্পী। বাঁশি বাজানো শিখেছিলেন নিজে নিজেই। তাঁর উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে–সাবিনা ইয়াসমিনের গাওয়া–'এটুস্‌খানি দেখো একখান কথা রাখো'(*বধূ বিদায়*-১৯৭৮), রুনা লায়লার কণ্ঠে–'পাহাড়ি ফুল আমি' (*দম মারো দম*-১৯৭৭) প্রভৃতি।

আজাদ রহমান (১৯৪৪-)

তিনি সুরকার, সংগীত পরিচালক, কণ্ঠশিল্পী ও গীতিকার। টপ্পা, ঠুমরি, গজল, কাওয়ালী, ধ্রুপদ, খেয়াল, আধুনিক সংগীতের প্রায় সবখানে তাঁর অবাধ বিচরণ। তাঁর সুরারোপিত গানের মধ্যে–আবদুল জব্বারের গাওয়া 'এক বুক জ্বালা নিয়ে বন্ধু তুমি কেন একা বয়ে বেড়াও' (*মাস্তান*-১৯৭৫), সাবিনা ইয়াসমিন এবং খুরশীদ আলমের দ্বৈতকণ্ঠে–'ও চোখে চোখ পড়েছে যখনই' (*অনন্ত প্রেম*-১৯৭৭), 'আকাশ বিনা চাঁদ হাসিতে পারে না' (*যাদুর বাঁশি*-১৯৭৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনা এবং সুরারোপিত সেলিনা আজাদের কণ্ঠে–'মনের রঙে রাঙাবো বনের ঘুম ভাঙ্গাব'(*মাসুদ রানা*-১৯৭৪)। এছাড়া তাঁর স্বকণ্ঠে পরিবেশিত গান–'ভালবাসার মূল্য কত'(*এপার ওপার*-১৯৭৫),'ডোরা কাটা দাগ দেখে বাঘ চেনা যায়' (*দস্যু বনহুর*-১৯৭৬) প্রভৃতি।

আলম খান (১৯৪৪-)

চলচ্চিত্রে গানের উপস্থাপনা ভঙ্গিমায় এনেছিলেন বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে– রুনা লায়লার কণ্ঠে–'কতদূরে ভালবাসার ঠিকানা' (*সখী তুমি কার*-১৯৮০), 'তুমি তো এখন আমারই কথা ভাবছো' (*জীবন নৌকা*-১৯৮১), 'আমি রজনিগন্ধা ফুলের মত গন্ধ বিলিয়ে যাই' (*রজনীগন্ধা*-১৯৮২), 'হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস' (*বড় ভালো লোক ছিল*-১৯৮২) 'চোখ বুজিলে দুনিয়া আন্ধার' (*প্রাণ সজনী*-১৯৮৩),'আবার দুজনে দেখা হলো কথা হলো' (*দুই জীবন*-১৯৮৮)প্রভৃতি। তাঁর সুরের অন্যতম বিষয় হলো লোক সুরের আধুনিক উপস্থাপন; যা এদেশের চলচ্চিত্রের গানের বিশেষমাত্রা যোগ করেছে। তারমধ্যে অন্যতম হলো–'ওরে নীল দরিয়া (*সারেং*

বৌ-১৯৭৮) এবং এ চলচ্চিত্রে আরেকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা–'হিরামতি হিরামতি ও হিরামতি'। এছাড়া পাশ্চাত্য সুরের প্রচেষ্টায়–'তুমি যেখানে আমি সেখানে' (*নাগপূর্ণিমা*-১৯৮৩) চলচ্চিত্রের এই গানটির কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শেখ সাদী খান (১৯৪৮-)

তাঁর সুরারোপিত গানের মধ্যে–সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে–'জীবন মানে যন্ত্রণা', 'একটা দোলনা যদি কাছে পেতাম'(*এখনই সময়*-১৯৮০),'ডাকে পাখি খোলো আঁখি' (*প্রতিরোধ*-১৯৮৭), 'হাজার মনের কাছের প্রশ্ন রেখে' (*মহানায়ক*-১৯৮৪) প্রভৃতি।

আলাউদ্দিন আলী (১৯৫২-)

তাঁর বেশিরভাগ সুরারোপিত গানের গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার এবং পরিচালক আমজাদ হোসেন। তিনি সত্তর এবং আশির দশকে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয় বিশেষত নর-নারীর প্রেম এবং আধ্যাত্মিক চেতনা প্রসূত গানের জন্য। তাঁর সুরারোপিত উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে–'আছেন আমার মুক্তার আছেন' (*গোলাপী এখন ট্রেনে*-১৯৭৮), 'সবাই বলে বয়স বাড়ে আমি বলি কমেরে' (*ফকির মজনু শাহ*-১৯৭৮), 'কেউ কোন দিন আমারে তা কথা দিল না' (*সুন্দরী*-১৯৭৯), 'তুমি আরেকবার আসিয়া' (*নাগর দোলা*-১৯৭৯), 'জন্ম থেকে জ্বলছি মাগো' (*জন্ম থেকে জ্বলছি*-১৯৮১), 'খোদার ঘরে নালিশ করতে দিল না আমারে' (*নালিশ*-১৯৮২), বিরহ প্রেমের মেলোডিয়াস গান–'এমন তো প্রেম হয় চোখের জলে কথা কয়'(*দুই পয়সার আলতা*-১৯৮২), 'ও যার অন্তরে বাহিরে কোন তফাৎ নাই' (*অন্ধবধূ*-১৯৮৩), 'তিলে তিলে মইরা যাব তবু তোরে ডাকব না' (*ভাত দে*-১৯৮৪),'শত জনমের স্বপ্ন তুমি আমার জীবনে এলে' (*রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত*-১৯৮৭), প্রভৃতি বেশ জনপ্রিয়। মূলত তিনি সুরকার ও সংগীত পরিচালক, তবে তিনি গানও লিখেছেন এবং গেয়েছেন–*দুই পয়সার আলতা* চলচ্চিত্রে মিতালী মুখার্জীর গাওয়া–'এই দুনিয়া এখন তো আর সেই দুনিয়া নাই' গানটি তাঁর লেখা এবং একই চলচ্চিত্রে তাঁর স্বকণ্ঠের গান–'কিবা জাদু জানো মনের মানুষ তৈরি কইরা দুঃখ দিয়া মারো রে'। [১৫]

সাক্ষাৎকার

আজাদ রহমান

বাংলা খেয়ালের জনক, সুরকার, সংগীতশিল্পী এবং সংগীত পরিচালক

প্রশ্ন: সাধারত কি ধরনের বিষয় নিয়ে চলচ্চিত্রের গান রচিত হয়ে থাকে ?

আজাদ রহমান : গানতো সর্ব বিষয়ে হতে পারে। আমাদের বাঙালি জীবনে এবং এই উপমহাদেশের মানুষের জীবনে এবং এখানে সংগ্রামও গানের মাধ্যমে হয়েছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কি রকম গান অংশ নিয়েছে সেখানে তো বন্ধুক, কামান হেরে গেছে। আমাদের ঐ মায়ের ভাষা এবং প্রাণের সুরের কাছে। সে জন্যে আমি বলি যে, গান কিন্তু কোনো বিশেষ বিষয়ে আবদ্ধ নয় এটা নানাভাবে হতে

পারে। নানান বিষয় নিয়ে হতে পারে। দর্শন নিয়ে হতে পারে, মাটি নিয়ে এবং জীবনের সবার্বস্থায় গান হয়েছে।

প্রশ্ন: চলচ্চিত্রে গানের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোকে বেশি প্রাধান্য দিতে হয় ?
আজাদ রহমান : অবস্থান, প্রকৃতি, সময় এসব কিছুকে সামনে রেখে চলচ্চিত্রে গান তৈরি করতে হয়। বানাতে হয়, আমরা চলচ্চিত্রে গান বানাতাম। এটা শুধু সুর করা নয়, এটা শুধু গানের কথা লেখাও নয়। সব মিলিয়ে-চরিত্র উপযোগী দর্শক-শ্রোতাদের আগ্রহে এবং বিনোদনের একটি সর্বোতকৃষ্ট সুর কথার সম্মিলিত যে শৈল্পিক রূপ সেটাই আমরা সচেষ্ট হয়ে করবার চেষ্টা করতাম। প্রথমত, দর্শক-শ্রোতা এবং কাহিনি, কাহিনির সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে নতুনভাবে নতুন শৈল্পিক চিন্তায় সেটাকে উপস্থাপন না করলে সেটা দর্শক তেমনভাবে গ্রহণ করে না। চলচ্চিত্রের কাহিনি যেন আবদ্ধ না হয়ে যায়। কাহিনি গতিশীল থাকতে হবে গানের মাধ্যমে। গানের মাধ্যমে যেন কাহিনি এগিয়ে যায় সেটাই লক্ষ করার বিষয় তা না হলে চলচ্চিত্র সেভাবে সফল হবে না।

প্রশ্ন: আমাদের চলচ্চিত্রে গানের সুরের ধরন কেমন ছিল ? ভিনদেশি চলচ্চিত্র সুরের প্রভাব পড়েছে কিনা?
আজাদ রহমান: আমাদের চলচ্চিত্রে গানের সুর প্রথম দিকে নিজের মতো করে করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ভারতের গানের প্রভাব অনেকেই এড়াতে পারেন নি। প্রভাবতো কিছু থাকতেই পারে কিন্তু ভারতের কোনো গানের সুরে হুবহু গান করাটা এটা বোধ হয় না হলেই ভালো। এটা সংগীত পরিচালকের জন্যে ভালো কিছু নিয়ে আসে না। ভারতের সুরের প্রভাব অনেকের সুরেই পড়েছে। তবে আমার মনে হয়, আমি বার বার চেষ্টা করেছি যে, আমার মাটি, আমার দেশ, আমার ভাষা, আমাদের গানের প্রাণ হয়ে উঠে আসুক। গান যেমন আন্তর্জাতিক তেমনি আঞ্চলিকও। সে জন্য আমি কিন্তু চেষ্টা করেছি, আমাদের উচ্চাঙ্গ সংগীতে, লোকসংগীত এবং আধুনিক গানের একটা সমন্বয় ঘটাতে। এবং নিজস্ব ভঙ্গিতে সেটা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। সেটা দর্শক-শ্রোতা নিয়েছেন। এমনকি আমার ছবি হয়তো ফ্লপ করেছে কিন্তু গান সুপার হিট হয়ে গেছে। সেটাও আমি মনে করি এই সচেতনতার জন্যেই হয়েছে। এবং আমি বলিষ্ঠভাবে চেষ্টা করতাম দর্শক–শ্রোতাদের খুশি রাখতে।

প্রশ্ন: পরিচালক, সংগীত পরিচালক, কণ্ঠশিল্পী, গীতিকার, সুরকারদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক কেমন ছিল ?
আজাদ রহমান: ভালো গান কিংবা দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবার জন্য প্রয়োজন একাত্মতা। যিনি গান বানাতেন তিনি একাত্মভাবেই চিন্তা করতেন। তিনি নিজেকে তৈরি করতেন। জানার চেষ্টা করতেন। শেখার চেষ্টা করতেন এবং সমাজকে বুঝতে চেষ্টা করতেন। পড়াশুনা করতেন এবং গানেরও অনেক দখল তিনি নিতে চেষ্টা করতেন। সেটা এখন চলে গেছে। এখন, এখানকার-ওখানকার গান শুনে কোনভাবে কথা বসিয়ে গানটা গেয়ে ফেলতে পারলেই হলো এবং একটা উচ্চৃঙ্খল ভঙ্গি হলে তো আর কিছুই লাগে না। এভাবেই চালিয়ে যাওয়া যায়।

প্রশ্ন: চলচ্চিত্র গানের সাথে সাধারণ গানের পার্থক্য কোথায় ?

আজাদ রহমান: সাধারণ গান কেবল গানটাকেই প্রধান করে চিন্তা করা হয়। কিন্তু চলচ্চিত্রে, যে চরিত্রে গান হচ্ছে যে নায়ক বা নায়িকার কণ্ঠে গান হবে তার চরিত্র তার আবেগ, তার অনুভূতি সবকিছু প্রকাশ করতে হয়। গান বানাতেই হবে ওভাবে এবং সেখানেও চলচ্চিত্রায়ণ কিভাবে হবে সেখানে গানের মাঝে কি দেখানো হবে, কেমন করে তিনি গাইবেন এই সবকিছুই পরিচালকের মনে রাখতে হবে। সেই ভঙ্গি যাতে ব্যবহার করা যায় তার জন্য গানের রিদম, গানের কথা, গানের যন্ত্রানুষঙ্গ সব কিছু কিন্তু সংগীত পরিচালকের চিন্তা করে প্রকাশ করতে হয়। শুধু চিন্তা করলে হবেনা। রেকর্ডিং সেভাবে করতে হবে। গায়ক-গায়িকার সেভাবে গাওয়াতে হবে এবং সর্বোপরি সবকিছু মিলিয়ে দর্শক যেন আনন্দ পায় সেটাই হলো বড় কথা।

প্রশ্ন: ঐ সময়ে গানে সাধারণত কি ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হতো ?

আজাদ রহমান : নানান ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হতো। আমার নিজের কথাই বলি। আবার '*মাসুদ রানার*' কথায় আসছি। 'মাসুদ রানা' চলচ্চিত্রে মনেরও রং এ রাঙাবো। কবরীর লিপসিং এ সেটা চিত্রায়িত হয়েছে। তো কবরীর চরিত্রানুযায়ী আমি কিন্তু সেই প্রকৃতি, সেই পরিবেশ, সেই সাগর, পাহাড় এটা মনে রেখেই যন্ত্র ব্যবহার করেছি। আমাদের সেতার, বেহালা, বাঁশি, কিন্তু একই গান যখন আমাদের নায়ক রাজ রাজ্জাক তিনি গাইছেন হোটেলে বলরুমে তখন কিন্তু অন্য বাদ্যযন্ত্র গিটার, ড্রামস একই গান কিন্তু তাতে গানের ভাবও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সেটা খুরশীদ আলমের গাওয়া এবং যেটা কবরীর লিপে শোনা যায়, সেটা আমার সহধর্মিনী সেলিনা আজাদের গাওয়া। গানটা আমার লেখা এবং সুর করা। এই গান দর্শক–শ্রোতার একেবারে প্রাণের কাছে পৌঁছে গেছে। এবং এখনো এই গানের এত অনুরোধ এবং গানটি অনেকেই গেয়েছেন। এখনকার অনেক শিল্পী আমার মনে হয় আমি দেখেছি প্রায় পঁচিশ জন শিল্পী এই একই গান তারা তাদের ক্যাসেটে বাণীবদ্ধ করেছেন নতুনভাবে ।

প্রশ্ন: ভাল গান তৈরির জন্য কি করা প্রয়োজন বলে মনে করেন ?

আজাদ রহমান: একেবারেই এক রক্তের ধারা বইতে হবে। তা না যদি বয় তাহলে তো হারমনি ঐভাবে থাকবে না। বিবাদ-বিষমবাদ হবে। রাজনৈতিক দলাদলির মত আরম্ভ হয়ে যাবে। গানও দেশের মত হয়ে যাবে। দেশও যেমন বিভ্রান্ত হয়। দেশের মানুষও তেমন বিপর্যস্ত হয়। আমাদের জীবন যেমন একেবারে মানে নরকীয় হয়ে যায় সেই একই ঘটনা ঘটবে। অতএব এখানে কিন্তু প্রযোজক, পরিচালক, সংগীত পরিচালক কিন্তু একটা বড় ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন: বর্তমান সময়ের গান নিয়ে আপনার মন্তব্য ?

আজাদ রহমান: চলচ্চিত্রে গানের সব কিছুই সংগীত পরিচালকের একটা বড় ভূমিকা ছিল সেখানে এবং সংগীত পরিচালককে গুরুত্ব দেয়া হতো। সমাজে, প্রযোজনায়, পরিচালকরাও গুরুত্ব দিতেন এবং সংগীতশিল্পীরা একদম গুরুর মত ভাবতেন। এমনকি অন্যান্য কলাকুশলীরাও। সেই যুগ কিন্তু

বদলে গেছে। এখন কোনোভাবে ওয়ান টাইম গান একবার গেয়ে কোনভাবে হাততালি পেলেই সার্থক হলো। কিন্তু ভুলভ্রান্তি থেকে যায় সেদিকে কোন নজর নাই। পরিশীলিত যে গান সেই গান তারা শুনেও না বা শোনা বা শেখার মত কোন আগ্রহও নেই। সব থেকে এখানেই আমার কাছে অবাক লাগে।

তারিখ: ১৪ জুন ২০১৫
বিকেল: ৬.৩০-৮৩০ মি.
গ্রীণ রোড, ঢাকা।

খুরশীদ আলম

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী

প্রশ্ন: চলচ্চিত্রে আপনার গান গাওয়ার শুরুটা কবে থেকে হলো এবং কোন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ?
খুরশীদ আলম: ষাটের দশকে বাবুল চৌধুরী পরিচালিত *আগন্তুত* (১৯৬৯) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। একই সালে বেতারে আজাদ রহমান সাহেবের হাতে পড়লাম। কাদা দিয়ে যেভাবে পুতুল বানানো হয় উনি আমাকে সেভাবে গড়ে তুললেন। উনার সুরে দুটো গান করলাম–'তোমার দুহাত নিয়ে শপথ নিলাম' এবং জেবুন্নেছা জামালের কথায়–'চঞ্চল দুয়ন' গান দুটো সে সময়ে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।' তারপর থেকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি।

প্রশ্ন: মূলধারা বা বাণিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্রের গানে এক ধরনের গায়কি রয়েছে, যা সাধারণ গান থেকে আলাদা এই গানের গায়কি সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন?
খুরশীদ আলম: ফিল্মে একটা আলাদা ভয়েস লাগে। যেমন কিশোর কুমার। তাঁর আনপ্যারালাল গলা। আমাদের রুনা লায়লা 'ও সাগর কন্যারে রাঙা দুটি পায় আ হা'। এই যে 'আ হা' এই ভঙ্গিমায় করতে হবে গলাটা। সুবল দা রুনাকে এটা বলে নি। এটা কিন্তু রুনার ক্রিয়েশন। তদ্রুপ আমারও অনেক আছে।

প্রশ্ন: চলচ্চিত্রের গান সঞ্চারী নেই বললেই চলে কেন?
খুরশীদ আলম: এক সময় রেডিওতে একটা সীমাবদ্ধতা ছিল তা হলো সে সময় বেঁধে দেয়া হতো ডিস্কের কারণে। আধুনিক গান হলে সাড়ে তিন মিনিট। দেশের গান হলে সর্বোচ্চ সাড়ে চার মিনিট। কিন্তু চলচ্চিত্রে সেটা ছিল না। আসলে এখানে যেটা হয় একটা স্থায়ী এবং দুটো অন্তরা নিয়ে অধিকাংশ গান। তবে ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে রচিত অধিকাংশ গানের সঞ্চারী ছিল। পরে দেখা গেলো সঞ্চারী আলাদাভাবে লিখতে হয় এবং সুরও আলাদা হয়, অর্কেস্ট্রেশনও। এসব শক্ত কাজ করা জন্য যেমন দক্ষ লোকের প্রয়োজন, তেমনি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই এসব ঝামেলা এড়াতে ধীরে ধীরে সঞ্চারী ওঠে যেতে থাকে। তবে এখনো যারা ভাল গান লিখেন তারা কিন্ত সঞ্চারী ছাড়া লিখতে চান না।

প্রশ্ন: **বর্তমান সময়ের গান নিয়ে আপনার মন্তব্য?**
খুরশীদ আলম: আগে একটা গান তুলতে কয়েক মাসও লেগে যেত। কথা, সুর, গায়কি নিয়ে রীতিমত গবেষণা হতো। আর এখন এক মুহূর্তে লেখা থেকে শুরু করে এক বসাতেই গেয়ে ফেলা হচ্ছে। তাই এসব গান আর প্রাণ ছুঁতে পারছে না। মানে আঁতুর ঘরেই গানের মৃত্যু হচ্ছে। এক সময় চলচ্চিত্রে গল্পের প্রয়োজনে গান হতো। আর এখন গানের প্রয়োজনে চলচ্চিত্র হয়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ তারিখ: ২৭ মার্চ ২০১৭
বিকেল: ৪-৪.৩০ মি.
মাহিবা মঞ্জিল, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

সাক্ষাৎকার

(সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের চলচ্চিত্র এবং এর গান শোনার অভিজ্ঞতামূলক)

বাংলা গানের এক সময় পৃষ্ঠপোষক ছিল সমাজের উঁচু শ্রেণি, রাজন্যবর্গ। তখন গান ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। কিন্তু সময়ের আবর্তনে, তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে বিশেষত গ্রামোফোন, রেডিও, টেলিভিশন এমনকি সর্বোপরি চলচ্চিত্রের আবির্ভাবে গানের আসরে শ্রোতা নয় বরং গানই শ্রোতার ঘরে চলে এসেছে। গণমাধ্যমগুলোর বিস্তারে পৃষ্ঠপোষক এবং শ্রোতার ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। চলচ্চিত্র একটি বৃহৎ গণমাধ্যম এবং প্রযোজিত প্রতিষ্ঠান যাকে ইন্ডাস্ট্রি বলা হয়। এক্ষেত্রে ব্যবসায়িক সাফল্য বিশেষভাবে বিচার্য এবং তা দর্শক-শ্রোতার উপর নির্ভরশীল। আগের ন্যায় হল ভিত্তিক সিনেমা প্রদর্শনী নেই অধিকাংশ শহর কিংবা উপ-শহরগুলোতে সিনেমা হল উঠে গেছে। তবে তার স্থান বদলে অল্প পরিসরে শপিংমলে সিনেপ্লেক্স হয়েছে। এবং নিয়ে সরকার কিংবা বেসরকারীভাবে নতুন নতুন পরিকল্পনা রয়েছে এবং তা অব্যহত রয়েছে। তবে এই মাধ্যমটির বর্তমান দর্শক-শ্রোতার একটি চিত্র নিরূপণ করা প্রয়োজন। নিম্নরূপভাবে তা দেখানো যায়।

চলচ্চিত্রে গানের শ্রোতা

সারণি–৩

আর্থসামাজিক শ্রেণী / মাধ্যম			
বয়স/লিঙ্গ	উচ্চবিত্ত	মধ্যবিত্ত	নিম্নবিত্ত
তরুণ-তরুণী স্কুল কলেজ পড়ুয়া	সিনে প্লেক্স/ ল্যাপটপ/ মোবাইল ফোন নির্ভর	ল্যাপটপ/ মোবাইল ফোন নির্ভর	সাধারণ সিনেমা হল/ টেলিভিশন
বয়স্ক / অবসরপ্রাপ্ত	সিনে প্লেক্স/ ল্যাপটপ/ মোবাইল ফোন নির্ভর	টেলিভিশন	টেলিভিশন

সাক্ষাৎকার-১

সামিয়া শরীফ শুচি (২২)
শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাক্ষাৎকার গ্রহণ তারিখ: ২৭/০৪/২০১৯
স্থান: সাভার, ঢাকা।

সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখার সুযোগ আমাদের হয়নি। যেভাবে মা বাবা উনাদের সময়ে ছিল। আমাদের সময়ে সিনেপ্লেক্স-এর যাত্রা শুরু হয়েছে। আয়নাবাজি মা-ভাই সবাই মিলে দেখেছি। ভাল লেগেছে। তবে টিভিতে ছবি বেশি দেখা হয়। পুরনো দিনের ছবির মধ্যে *সুন্দরী*, *অশিক্ষিত*, *সুজন সখী* এবং এই ছবিগুলোর গান খুব ভাল লেগেছে। 'সব সখীরে পার করিতে নেব আনা আনা, 'আমার গরুর গাড়িতে বউ সাজিয়ে' আরো অনেক আছে। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। বর্তমান সময়ের *মনপুরা* দেখেছি। গানগুলো বেশ ভাল লেগেছে। এছাড়া হিন্দি, ভারতীয় বাংলা, ইংলিশ মুভি দেখি যেমন– *থ্রি ইডিয়ট*, ইংলিশ ছবি *টাইটানিক* অনেকবার দেখা হয়েছে। বিদেশিরা নানা বিষয় নিয়ে ছবি তৈরি করে আমাদের দেশে শুধু এক রকমের ছবি। কোন ভ্যারিয়েশন নেই। এনিমেশন আমার খুব পছন্দ, প্রায়ই দেখি। আগের অনেক ছবি আমার ভাল লাগে এবং টিভিতে দেখেছি। মা গল্প করতে করতে যে সব ছবির নাম বলে এবং সেগুলো বিভিন্ন সময়ে দেখা হয়ে যায়। প্রিয় শিল্পী রুনা লায়লা। প্রিয় নায়ক-নায়িকা রাজ্জাক, ববিতা, আলমগীর, সালমান শাহ। হিন্দি ছবির নায়িকা ঐশ্বরিয়া রায় এবং শাহরুখ খানের অভিনয় আমার খুব ভাল লাগে।

সাক্ষাৎকার-২

নাম: রওশন আরা
বয়স: ৫৫
পেশা: গৃহিণী
গ্রামের বাড়ি: টাঙ্গাইল
সাক্ষাৎকার গ্রহণ তারিখ: ২৭/০৪/২০১৯
স্থান: সাভার

আমার প্রিয় ছবি *ভাত দে*, *সুজন সখী*, *আরাধনা*, *নদের চাঁদ*, *বেদের মেয়ে জোস্না* আরো অনেক। প্রিয় গান 'আমি রজনিগন্ধা ফুলের মত গন্ধ বিলিয়ে যাই', বিদেশ গিয়া বন্ধু তুমি আমায় ভুইলনা' আরো অনেক। প্রিয় শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন, রুনা লায়লা, শাম্মী আখতার, শাহনাজ রহমতউল্লাহ। বর্তমানে সিনেমা দেখা হয় না। তবে বাসায় যেহেতু টিভি দেখা হয়। মাঝে মাঝে এই সময়ের ছবিও দেখি। তবে আগের ছবি খুব ভাল ছিল। বিশেষ করে ছবির কহিনি, অভিনয়, গানগুলো শুনলে মন ভরে যেতো। এখনো শুনলে যেন পুরনো স্মৃতিতে ফিরে যায়। খুব দরদ, বেদনা ছিল গানে, মনে রাখার মত। এখন তো কোন গান মনে থাকে না। শুনি আর ভুলি। এখনকার গানের কথা এবং সুর ভালো লাগে না। শাবানা, রাজ্জাক আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ জুটি ছিল। আমরা পরিবারের সবাই

যেমন–বাবা-মা, ভাই বোন, বোন জামাই, মিলে হলে যেতাম। তবে অনেকদিন পর আয়নাবাজি সিনেমা দেখেছি। কিন্তু ছবির কাহিনি বুঝতে অসুবিধা হয়। জটিল মনে হয় আমার কাছে। এখন পরিবারের সকলকে নিয়ে সিনেমা দেখা যায় না এমনকি তার পরিবেশও নেই। তাছাড়া হল-ই তো নাই। তবে বাসায় বসে পুরনো দিনের সিনেমা এখনো সুযোগ পেলেই দেখি।

সাক্ষাৎকার-৩

মাহবুব আলম (৪২)

পেশাঃ চাকুরি (সাব ইন্সপেক্টর)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ তারিখ : ২৪/০৪/২০১৯

স্থানঃ বনলতা সোসাইটি, বালুর মাঠ, সাভার, ঢাকা।

একশোরও বেশি সিনেমা দেখেছি। আমার প্রিয় গান ‘ওরে নীল দরিয়া’, ‘ঢাকা শহর আইসা আমার আশা ফুরাইছে’। আগেকার ছবির কাহিনি ভাল ছিল, সবাইকে নিয়ে দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানের ছবির কাহিনি ভাল না এবং এমন ধরনের নাচ-গান থাকে যা পরিবারের সবাইকে নিয়ে দেখা যায় না। লজ্জা লাগে। অ্যাকশনধর্মী সিনেমা এবং জাঁকজমকপূর্ণ গান দেখতে বেশি ভাল লাগে। বেদনার গান ভাল লাগে না। আমার প্রিয় নায়ক এবং নায়িকা অ্যাকশন হিরো রুবেল এবং রোজিনা, পপি, অপু বিশ্বাস, প্রিয় খল নায়ক–রাজীব, আহমেদ শরীফ, মিশা সওদাগর প্রমুখ। অ্যাকশনধর্মী কার্যক্রম, মারপিট, ইত্যাদি ভাল লাগে। আমার শেষ দেখা সিনেমা ২০১৫ সালে *ছুঁয়ে দিলে মন,* সেনা অডিটোরিয়াম, নবীনগর, সাভার। এই ছবির একটি গান ‘ছুঁয়ে দিলে মন’ বেশ ভালো লেগেছিল।

সাক্ষাৎকার-৪

অশোক কুমার নাথ (৫৫)

ব্যবসায়ী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

রংপুর

সাক্ষাৎকার গ্রহণ তারিখ : ৩০/০৪/২০১৯

স্থানঃ ছায়াবীথি, সাভার, ঢাকা।

এক সময় হলে গিয়ে বেশ ছবি দেখতাম; কলেজে পড়াকালীন সময়ে। বর্তমানে বাসায় কাজের ফাঁকে প্রিয় ছবিগুলো টিভিতে দেখি। আমার প্রিয় রোমান্টিক গান–‘তোমারে লেগেছে এতো যে ভালো’, ‘আয়নাতে ঐ মুখ দেখবে যখন, *সুজন সখী* ছবির–‘সব সখীরে পার করিতে নেব আনা আনা, *সারেং বৌ* ছবির–‘ওরে নীল দরিয়া, *বাদশা* ছবির–‘আরে ও প্রাণের রাজা তুমি যে আমার’ এই গানগুলো আসলে কালজয়ী এই গানগুলোর আবেদন কোনদিন শেষ হবে না। আরো অনেক গান আছে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। আমার প্রিয় নায়ক-নায়িকা রাজ্জাক, শাবানা, ফারুক। আগের ছবির সব কিছু ভাল ছিল। কাহিনি, অভিনয়, গানের কথা, সুর সংলাপ পরিবারের সবাইকে নিয়ে দেখার মত ছিল। চিত্ত জুড়িয়ে যেত এবং ছবি থেকে অনেক কিছু শেখা যেত। বর্তমানে অধিকাংশ ছবির কাহিনি এবং

গানের কথা, সুর কথা ভাল না। মারপিট আর গৎ বাঁধা কাহিনি এবং ছবির নাচে-গানে অশ্লীলতা ঢুকে পড়েছে। কোন আবেগ নেই, মহব্বত নেই। কাজের প্রতি কোন দরদ নেই। আগের গানের সাথে নায়কের লিপ এতোটাই মিলে যেত যে, মনে হতো যেন নায়ক নিজেই গাইছে। কিন্তু এখন তেমন আর দেখি না। বর্তমানে দেখা যায় সোনালী দিনের গানগুলো রিমেক্স করে গাইছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুর ঠিক না রেখে গাইছে। এটা আমার খুব অপছন্দ। সামাজিক এবং পারিবারিক জীবন কাহিনি নিয়ে ছবিগুলো আমার ভাল লাগে। হলে গিয়ে শেষ দেখা ছবি ১৯৮৫ সালের দিকে হবে। ছবির নাম মনে নাই।

সাক্ষাৎকার-৫

আনোয়ার হোসেন (৪৫)

পল্লী চিকিৎসক

মাদারীপুর

সাক্ষাৎকার গ্রহণ তারিখ: ২৯/০৪/২০১৯

স্থানঃ সোবহানবাগ, সাভার, ঢাকা।

স্কুলে পড়াকালীন সময়ে হলে গিয়ে প্রচুর সিনেমা দেখতাম। তখনো ভি.সি.আর আমরা পাইনি। এরপর কলেজে পড়ার সময় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম ছাত্র রাজনীতিতে। তখন দেখার সময় হয়ে ওঠেনি। সামাজিক নিটোল প্রেমের কাহিনির যেখানে গভীর প্রেম-ভালবাসার গল্প রয়েছে, সে সব ছবি দেখতে ভাল লাগে। ছবিতে অনেক কিছু শেখার আছে কিন্তু গভীরভাবে দেখতে হবে। তাহলে অনেক কিছুই শেখা যাবে। পুরনো দিনের গানের মধ্যে–বেদনার গান ‘এমনো তো প্রেম হয় চোখের জলে কথা কয়’, ‘তারপর ভালোবেসে গেলাম শুধু ভালবাসা পেলাম না’, ‘আমি চিরকাল প্রেমেরও কাঙাল’, ‘আমার বুকের মধ্যেখানে মন যেখানে হৃদয় যেখানে’। বর্তমান সময়ের গানের মধ্যে রিয়াজ-শাবনুরের ছবির গান–‘এই বুকে বইছে যমুনা, মনে অথৈ প্রেমের জল, তারই তিরে গড়র আমি আমার প্রেমের তাজমহল’ প্রিয় নায়ক-নায়িকা আলমগীর-শাবানা, বর্তমানে রিয়াজ-শাবনুর। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ছবির কাহিনি এগিয়ে যায় এবং সব শেষে মা কিংবা বাবা তার সন্তানকে, স্বামী অথবা স্ত্রী একে অপরকে চিনতে পারে সেই মুহূর্ত আমার খুব ভাল লাগে। অশ্লীল নাচ গান আমার অপছন্দ। ভাল ছবি এখনো দেখার ইচ্ছে হয়। রোমান্টিক, নাচ-গান, গভীর প্রেম-ভালবাসা এবং প্রেমের জন্য বড় ধরনের ত্যাগ আমার প্রিয় বিষয়। স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকার শ্যামলী হলে ছবি দেখেছিলাম। *বউ শাশুড়ির যুদ্ধ*, ওটা ছিল হলে গিয়ে দেখা শেষ ছবি। এর আগে ডিপজলের *ক্ষ্যাপাবাসু* দেখেছিলাম অবশ্য।

সাক্ষাৎকার-৬

মো. হুমায়ুন (৩৮)

পেশাঃ বিদেশ ফেরত, বর্তমানে কনস্ট্রাকশনের কাজ

গ্রামের বাড়িঃ ফরিদপুর।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ তারিখ: ২৪/০৪/২০১৯
স্থান: বনলতা সোসাইটি, বালুর মাঠ, সাভার, ঢাকা।

আমার প্রিয় ছবি সালমান শাহ অভিনীত *সত্যের মৃত্যু নাই*। পুরানো সিনেমার গান 'ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে' বর্তমানে কোন গান তেমন ভাল লাগে না। আগেকার ছবির কাহিনি খুব ভাল লাগত। এখন তো কোন কাহিনি নাই। তাছাড়া হলে গিয়ে ছবি দেখিনা বহুদিন হয়। মাঝে মাঝে মোবাইলেই দেখি। বেদনার গান, দুঃখ কষ্টের গান বেশি পছন্দ। প্রিয় নায়ক-নায়িকা: সালমান শাহ, মান্না, শাবানা, ববিতা, বর্তমানে শাবনুর। কৌতুক অভিনেতা আমার দিলদারকে খুব ভাল লাগত। কথাবার্তা, নাচ, আমি আসলে গান খুব ভালবাসি, মোবাইলে সারাদিন বাউল গান, পালাগান শুনি। অনেকদিন ধরে সিনেমা দেখি না। এ সিনেমাগুলো দেখতাম তাও ভিসি.আর এর যুগে। এখন তো আর নাই ভি.সি.আর।

মাঠ পর্যায়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের এবং জরিপে প্রায় সকলের একই কথা আগের সিনেমার কাহিনি, সংলাপ, গানের কথা, সুর খুব ভাল ছিল। বর্তমান সময়ের গানের কথা এবং সুর কোনোটাই মনে থাকে না। পরক্ষণেই ভুলে যায় তারা। তার কারণ হিসেবে অভিমত যে, বর্তমানের যে সিনেমা তার কাহিনি ভাল না এবং অশ্লীল নাচ-গান সর্বস্ব। এছাড়া আরেকটি বিষয় হলো সিনেমা হল নেই। যা আছে তাতে দেখার মত পরিবেশ নেই। ফলে তারা সময় সুযোগ হলে সাধারণত মোবাইল কিংবা টিভিতে দেখে নেয়। এছাড়া সিনেপ্লেক্সে অনেক টাকা লাগে। সবার পক্ষে তা ব্যয় করা সম্ভব নয় এবং হল আবার সব জায়গায় নেই।
সাক্ষাৎকারের সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন তুলে ধরা হলো–নাম/বয়স/পেশা/গ্রামের বাড়ি ? প্রিয় ছবি ও গান–একাল-সেকাল? /কোন ধরনের গান বেশি পছন্দ?/ ভাল লাগার কারণ?/প্রিয় নায়ক-নায়িকা ও খল নায়ক? এছাড়া আর কি কি ভাল লাগে?/শেষ দেখা ছবি কোনটি ?

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. টীকা : বন্যা, মহামারি, ম্যালেরিয়া, কলেরা, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ শোকে আচ্ছন্ন ছিল সমাজের মানুষ। তখন মৃত্যুর হার বিশেষত শিশু মৃত্যুর হার বেশি ছিল। এসব রোগের টীকা আবিষ্কারের পর মৃত্যুর হার কমে যায়। তখন জন্মহার এবং মানুষের গড় আয়ু বাড়তে থাকে। গ্রামভিত্তিক জীবনে কৃষি জমির উপর চাপ বাড়ে। কৃষি জমির উপর চাপ কমানোর জন্যে মানুষ শহরমুখী হয়। (গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২২৮।)
২. প্রাগুপ্ত, পৃ. ২২৮।
৩. মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, *বাংলা গান বিবিধ প্রসঙ্গ*, হাওলাদার প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১০।
৪. (https://www.youtube.com/watch?v=cJcunkJSqC8&t=3357s) (২৫/১২/২০১৮)
৫. উৎপল সরকার (সম্পা.) *চলচ্চিত্রে সংগীতের প্রয়োগ*, প্রতিভাস কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩১।
৬. (সাক্ষাৎকার গ্রহণ তারিখ : ২৭.০২.২০১৭ মাহিবা মঞ্জিল, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।)
৭. উৎপল সরকার (সম্পা.) *চলচ্চিত্রে সংগীতের প্রয়োগ*, প্রতিভাস কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩১।
৮. মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, *বাংলা গান বিবিধ প্রসঙ্গ*, হাওলাদার প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১১।

৯. আলাউদ্দীন মাজিদ, প্রাণ নেই, মান নেই চলচ্চিত্রের গানে, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৫ এপ্রিল ২০১৭।

১০. রুখসানা করিম (কানন), *বিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৮০।

১১. আলাউদ্দীন মাজিদ, প্রাণ নেই, মান নেই চলচ্চিত্রের গানে, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৫ এপ্রিল ২০১৭।

১২. প্রাগুপ্ত।

১৩. (https://www.youtube.com/watch?v=cJcunkJSqC8&t=3357s) (২৫/১২/২০১৮)

১৪. আসলাম আহসান, *বাংলাদেশের সিনেমার স্মরণীয় গান*, প্রথমা ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৬৫।

১৫. প্রাগুপ্ত পৃ, ৩৪-৩৫।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও অন্যান্য

বাংলা গ্রন্থ

১. অপূর্ব কুমার কুন্ডু, *অস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৩, ঢাকা।

২. অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, দিব্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ২০০৭, ঢাকা।

৩. অনুপম হায়াৎ, চলচ্চিত্রবিদ্যা, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র অধ্যয়ন কেন্দ্র, ২০০৪, ঢাকা।

৪. অনুপম হায়াৎ, *চলচ্চিত্র সমালোচনা, সম্পাদনা*, কলি প্রকাশনী, ২০১১, ঢাকা।

৫. অনুপম হায়াৎ, *রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র*, দিব্য প্রকাশ, ২০১২, ঢাকা।

৬. অনুপম হায়াৎ, *মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক প্রকাশিত, ২০১১, ঢাকা।

৭. অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের রূপরেখা*, পলল প্রকাশনী, ২০০৯, ঢাকা।

৮. অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন, ১৯৮৭ ঢাকা।

৯. অনুপম হায়াৎ, *পুরানো ঢাকায় চলচ্চিত্র*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৯, ঢাকা।

১০. অনুপম হায়াৎ, *আলমগীর কবিরের চলচ্চিত্র পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, বঙ্গজ, প্রকাশন, ২০১৬, ঢাকা।

১১. অনুপম হায়াৎ, (সম্পা.দ্বিতীয় সংস্করণ) *চিত্রনাট্য*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১০, ঢাকা।

১২. আবদুল লতিফ, *ভাষার গান দেশের গান*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, ঢাকা।

১৩. আবদুল্লাহ জেয়াদ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র: পাঁচ দশকের ইতিহাস*, জ্যোতি প্রকাশ, ২০১০, ঢাকা।

১৪. আবুল হাসান চৌধুরী, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতে প্রেমচেতনা*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০১, ঢাকা।

১৫. আবদুল আহাদ, *আসা যাওয়ার পথের ধারে*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০১৪, ঢাকা।

১৬. আসলাম আহসান, *বাংলাদেশের সিনেমার স্মৃতি জাগানিয়া গান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১৬, ঢাকা।

১৭. আসলাম আহসান, *বাংলাদেশের সিনেমার স্মরণীয় গান* (১৯৫৯-২০১৬), প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭, ঢাকা।

১৮. আসাদ চৌধুরী, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, বাংলা একাডেমি, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ ২০১৩, ঢাকা।

১৯. আসাদুল হক, *নজরুল যখন বেতারে*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৯, ঢাকা।

২০. আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩, ঢাকা।

২১. আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩, ঢাকা।

২২. আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, বাংলা একাডেমি, ২০০৮, ঢাকা।

২৩. আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রে বাংলাদেশ*, ভাষাচিত্র, ২০১৪, ঢাকা।

২৪. আহসান হাবিব আসলাম (সংকলন ও সম্পাদনা) *সুরের ইন্দ্রধণু, শতবর্ষের কালজয়ী বাংলা গান* (১৯০০-২০১১), রোদেলা প্রকাশনী, ২০১২, ঢাকা।

২৫. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন* (দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ২০০৮, ঢাকা।

২৬. ওয়াকিল আহমদ, *লোকসংস্কৃতি*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, ঢাকা।

২৭. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি, ১৯৭৪, ঢাকা।

২৮. ওয়াকিল আহমদ, *বাউল গানের ধারা*, গতিধারা, ২০১০, ঢাকা।

২৯. উৎপল সরকার (সম্পা.) *চলচ্চিত্রে সংগীতের প্রয়োগ*, প্রতিভাস কলকাতা, ২০১১, কলকাতা।

৩০. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গান স্বরলিপি-ইতিহাস*, অনুপম প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, ঢাকা।

৩১. ক্যাথরিন মাসুদ (সম্পা,) *চলচ্চিত্রলেখা চিত্রনাট্য* ও গান, তারেক মাসুদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩, ঢাকা।

৩২. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি, ২০১১, ঢাকা।

৩৩. করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমি, ২০০৪, ঢাকা।

৩৪. কাজী মাহমুদুর রহমান, *বেতার কথা, মল্লিক* ব্রাদার্স, ২০০৫, ঢাকা।

৩৫. কালিশ মুখোপাধ্যায়, *বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাস (১৮৯৭-১৯৪৮)*, পত্র ভারতী, সংস্করণ ২০১২ ঢাকা।

৩৬. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্যের রূপ-রীতি, ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, রত্নাবলী, ২০১২, কলকাতা।

৩৭. খন্দকার মাহমুদুল হাসান, *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র*, কথা প্রকাশ, ২০১১, ঢাকা।
৩৮. গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়, *বাংলাসাহিত্যে রোম্যান্টিসিজম*, মিত্র এন্ড ঘোষ প্রকাশন, আশ্বিন ১৪০২, কলকাতা।
৩৯. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর, ২০০৬, ঢাকা।
৪০. গীতি আরা নাসরিন ও ফাহমিদুল হক, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্প সংকটে জনসংস্কৃতি*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৮, ঢাকা।
৪১. চলচ্চিত্রকার আজিজুর রহমান'র *চলচ্চিত্রে আমার কথা*, আলপনা প্রকাশনী, ২০১৬, ঢাকা।
৪২. ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ*, রোদেলা, ২০১৩, ঢাকা।
৪৩. ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিশুর উপস্থাপন, শিশুতোষ মনোভঙ্গির নৈতিক ও শৈল্পিক পটভূমি*,
৪৪. ড. বাসুদেব রায়, *মনসামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ*, পাঠক বন্ধু লাইব্রেরি, ২০০৪, ঢাকা।
৪৫. ড. কাবেরী গায়েন, মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১২, ঢাকা।
৪৬. ড. তপন বাগচী, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পঞ্চাশ বছর, লোকজীবনের উপস্থাপনা*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১১, ঢাকা।
৪৭. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা হাজার বছরের বাংলা গান*, প্যাপিরাস, (সংস্করণ-২০০৭), ঢাকা।
৪৮. ড. মৃদুলকান্তিচক্রবর্তী, *হারানো দিনের গান*, অনুপম প্রকাশনী, ২০০৭, ঢাকা।
৪৯. ড. মৃদুলকান্তিচক্রবর্তী, *ভাষা ও দেশের গান* (স্বরলিপিসহ) অনুপম প্রকাশনী, ২০০৫, ঢাকা।
৫০. ডক্টর এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ২০০৮, ঢাকা।
৫১. ড. প্রদীপ রায়, *বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে গ্রাম*, উচ্চতর মানব বিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়।
৫২. তপতী বর্মন ও ইমরান ফিরদাউস, *বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্র (একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা)*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০০৯, ঢাকা।
৫৩. তপন বাগচী, *চলচ্চিত্রের গানে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১০, ঢাকা।
৫৪. তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান*, বাংলা একাডেমি, ২০০৭, ঢাকা।
৫৫. ধীমান দাশগুপ্ত, *সিনেমার অ আ ক খ*, সুজন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, ঢাকা।
৫৬. *নির্বাচিত গান মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, ঢাকা।
৫৭. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব*, এবং মুশায়েরা,২০১৪, কলকাতা।
৫৮. প্রবীর সেনগুপ্ত, *বাংলার গান বাংলা গান*, ড. অরুণ সরকার (সম্পা.), পুস্তক বিপনি, ২০০৬, কলকাতা।
৫৯. পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা ছবির গান, প্রসঙ্গ কথা ; দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়*, সূত্রধর, ২০১৩, কলকাতা।
৬০. ফজল-এ-খোদা, *সংগীত ভাবনা*, বাংলা একাডেমি, ২০১২, ঢাকা।
৬১. *ফজল-এ-খোদা গান*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৭, ঢাকা।
৬২. ফাহমিদুল হক ও শাখাওয়াত মুন, *চলচ্চিত্রের সময় সময়ের চলচ্চিত্র*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০০৬ ঢাকা।
৬৩. ফকির আলমগীর,*গণসঙ্গীত ও মুক্তিযুদ্ধ*, অনন্যা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, ঢাকা।
৬৪. বেলাল মোহাম্মদ, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, অনুপম প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩, ঢাকা।
৬৫. মোবারক হোসেন খান (সম্পা.) *সংগীত সাধক অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ২০০৩, ঢাকা।
৬৬. মোবারক হোসেন খান, *মুক্তিযুদ্ধের গান*, শোভা প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯, ঢাকা।
৬৭. মোবারক হোসেন খান, *ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ জীবনী ও পত্রসম্ভার*, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১, ঢাকা।
৬৮. মোবারক হোসেন খান, (সম্পা.) *নজরুল সঙ্গীতের বিচিত্রধারা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০৫, ঢাকা।
৬৯. মোবারক হোসেন খান, *সংগীত মালিকা*, বাংলা একাডেমি, প্রথম পুনমুদ্রণ, ২০০৩, ঢাকা।
৭০. মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, *বাংলাগানের রচনা কৌশল ও শুদ্ধতা*, হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩, ঢাকা।
৭১. মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, *বাংলা গান বিবিধ প্রসঙ্গ*, হাওলাদার প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১১, ঢাকা।
৭২. মো ঃ আরিফু রহমান খান, *বাংলদেশের যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১৬, ঢাকা।
৭৩. মাহবুব আজাদ, *জীবনী গ্রন্থমালা, খান আতাউর রহমান* ,বাংলা একাডেমি, ২০০০, ঢাকা।

৭৪. মাহমুদুল বাসার, *আবদুল গাফফার চোধুরী, এক জীবন্ত কিংবদন্তী*, জ্যোস্না পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ২০১০ ঢাকা।
৭৫. মতিউর রহমান (সম্পা.) *এক ঝড়ের পাখি, আলতাফ মাহমুদ*, ঐতিহ্য, ২০০৫, ঢাকা।
৭৬. মুস্তাফা জামান আব্বাসী, *ভাওয়াইয়ার জন্মভূমি*, অনন্যা, ২০০৯, ঢাকা।
৭৭. মুম রহমান, *বিশ্বসেরা ৫০ চলচ্চিত্র*, ভাষাচিত্র, প্রথম প্রকাশ ২০১০, ঢাকা।
৭৮. মুহম্মদ জাকারিয়া, *গান রচনার কলাকৌশল*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০১৪, ঢাকা।
৭৯. মিলন কান্তি দে, *যাত্রাশিল্পের সেকাল একাল*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৫, ঢাকা।
৮০. যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবি গান*, বিভাস, প্রথম সংস্করণ, ২০১০, ঢাকা।
৮১. রহমান হাবিব, *বাংলা গানের ভাবসম্পদ*,বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, ঢাকা।
৮২. রুখসানা করিম (কানন), *বিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১৭ ঢাকা।
৮৩. লীনা তাপসী খান, *নজরুল-সংগীতে রাগের ব্যবহার*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১১, ঢাকা।
৮৪. শরাফুল ইসলাম, *মুখ ও মুখোশের ছেঁড়াপাতা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৫, ঢাকা।
৮৫. শামসুজ্জামান খান, *বাংলার গণসঙ্গীত*- কল্যাণী ঘোষ, বিজয় প্রকাশ, ২০০৮, ঢাকা।
৮৬. সাজেদুল আউয়াল, *চলচ্চিত্র কলার রূপ-রূপান্তর*, দিব্য প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৪, ঢাকা।
৮৭. সাইম রানা, *বাংলাদেশের গণসংগীতের বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমি, ২০০৯, ঢাকা।
৮৮. সাইম রানা, *চলচ্চিত্রসংগীত ও শব্দযোগের ভাষা*, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, ২০১৭, ঢাকা।
৮৯. সত্যজিৎরায়, *বিষয় চলচ্চিত্র*, আনন্দ, ২০০৯, কলকাতা।
৯০. সুচীত্রা সরকার, *অভিনয় শিল্পী সুলতানা জামান, জীবন ও কর্ম*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১৪, ঢাকা।
৯১. সাজেদুল আউয়াল (সম্পা.) সুবর্ণজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের ইতিবৃত্ত*, সুবর্ণজয়ন্তী উৎযাপন পরিষদ কর্তৃক প্রথম প্রকাশ ২০১৪, ঢাকা।
৯২. হারুনর রশীদ, *চলচ্চিত্রকার সালাহ্উদ্দিন*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১১, ঢাকা।
৯৩. হাসান অনুপম, *সাহিত্যনির্ভর বাংলাদেশের চলচ্চিত্র, নারীর অবস্থান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১৬, ঢাকা।
৯৪. হায়াৎ মাহমুদ, *বাংলা লেখার নিয়ম কানুন*, ২০০০ প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা।
৯৫. হুমায়ূন আজাদ, *নারী*, তৃতীয় সংস্করণ, আগামী প্রাকাশনী, ২০০২, ঢাকা।
৯৬. *জহির রায়হান রচনাসমগ্র*, অনুপম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, ঢাকা।

গবেষণা বিষয়ক গ্রন্থ

১. সফিকুন্নবী সামাদী, গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মোঃ মেহেদী হাসান, *সাহিত্য-গবেষণা : বিষয় ও রচনা কৌশল*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১৪, ঢাকা।
২. ড. সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, *গবেষণাঃ প্রকরণ ও পদ্ধতি*, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯০, কলকাতা।
৩. রাগিব হাসান, *গবেষণায় হাতেখড়ি*, আদর্শ, ২০১৫, ঢাকা।
৪. এস এম তানভীর আহমদ, *ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি*, (সম্পা.আহমেদ কামাল), সংহতি, ২০১৪, ঢাকা।
৫. জয়ন্ত গোস্বামী, *সম্পাদনা- ভিত্তিক গবেষণা, পদ্ধতি ও প্রয়োগ*, পুস্তক বিপণি, ১৯৯১, কলিকাতা।

ইংরেজি গ্রন্থ

১. PAUL C. COZBY, *Methods in Behavioral Research,* (Ninth edition), 2007, America New York.
২. Donna lee Kwon, *Music in Korea,* Oxford University Press, 2012, New York.
৩. *Educational Research Methodology*, Training Manual, National academy for Educational Management (NAEM), 2006, Dhaka.
৪. *KOREAN MUSIC,* Its History and Its Performance, KEITH PRATT, JUNGEUMSA, First published in 1987.
৫. *Essays on Korean Traditional Musi*c, by Lee, Hye-Ku, Translated by Robert C. Provine, Second Edition 1983.

বাংলা ও ইংরেজি অভিধান

১. জামিল চৌধুরী (সম্পা.) *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, ২০১৬, ঢাকা।

২. জামিল চৌধুরী (সংকলন ও সম্পাদনা) *বাংলা একাডেমি বাংলা বানান-অ ভিধান*, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ ২০১৫, ঢাকা।

৩. Zillur Rahman Siddiqui (Edited) Bangla Academy English-Bangla Dictionary, Bangla Academy, 2010, Dhaka.

৪. Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Third Editoin Cambridge University Press 2008, (South Asian Editoin) Reprinted 2010.

সাময়িকী, পত্র-পত্রিকা, সাক্ষাৎকার, ওয়েবসাইট প্রভৃতি

১. তাসমিমা হোসেন (সম্পা.), *অনন্যা*, ২০১৩, ঢাকা।

২. সাজেদুল আউয়াল (সম্পা.সুবর্ণজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ), *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের ইতিবৃত্ত*, ২০১৪, ঢাকা।

৩. আল মাহমুদ (সম্পা.), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জুন ১৯৯৫, ঢাকা।

৪. খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেন (সম্পা.) পূর্বাণী ঈদ সংখ্যা, ১৯৮৯, ঢাকা।

৫. মতিউর রহমান (সম্পা.) *দৈনিক প্রথম আলো*, ১২ মার্চ ২০১৬, ঢাকা।

৬. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ জানুয়ারি, ২০১৭, ঢাকা।

৭. *দৈনিক প্রথম আলো*, (আনন্দ) ৩ মার্চ, ২০১৬, ঢাকা।

৮. *দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ অক্টোবর ২০১৫, ঢাকা।

৯. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫, ঢাকা।

১০. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১০ জুলাই, ২০১৫, ঢাকা।

১১. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৮ এপ্রিল, ২০১৫, ঢাকা।

১২. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২২ মার্চ, ২০১৬, ঢাকা।

১৩. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৫, ঢাকা ।

১৪. *দৈনিক প্রথম আলো*, (আনন্দ) ২ এপ্রিল ২০১৫, ঢাকা।

১৫. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৫ এপ্রিল ২০১৭, ঢাকা।

টিভি অনুষ্ঠান

১. শফিউদ্দিন শিকদার প্রযোজিত, বাংলাদেশ টেলিভিশনের পুরানো দিনের বাংলা গানের অনুষ্ঠান, *গান চিরদিন*।

২. এনটিভিতে প্রচারিত 'গীতিময়' সংগীতানুষ্ঠান।

৩. চ্যানেল আইয়ে পরিবেশিত '*পালকি*' গানের অনুষ্ঠান।

একাডেমিক জার্নাল

১. মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পা.), *লোকসঙ্গীত*, এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, ঢাকা।

২. ইসরাফিল শাহীন (সম্পা.) *পরিবেশনা শিল্পকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি*, ২০০৭, ঢাকা

৩. ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন (সম্পা.) *ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক প্রকাশিত ষান্মাসিক জার্নাল (সংখ্যা-৯) ২০১৫, ঢাকা।

৪. ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন (সম্পা.) *ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক প্রকাশিত ষান্মাসিক জার্নাল (সংখ্যা-১০) ২০১৬, ঢাকা।

৫. মো. জাহাঙ্গীর হোসেন (সম্পা.) *ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক প্রকাশিত ষান্মাসিক জার্নাল (সংখ্যা-১১) ২০১৬, ঢাকা।

৬. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পত্রিকা, (সংখ্যা-৩), ২০১৬, ঢাকা।

৭. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পত্রিকা, (সংখ্যা-৪), ২০১৬, ঢাকা।

৮. ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন (সম্পা.), *চলচ্চিত্র অধ্যায়ণ ও প্রশিক্ষণ* বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পত্রিকা, ঢাকা।
৯. লিয়াকত আলী লাকি (সম্পা.) *শিল্পকলা ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা* ১ম ও ২য় যুক্ত সংখ্যা,বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১৫, ঢাকা।
১০. মোঃ ফকরউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.) *শিল্পকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, (একত্রিংশবর্ষ, ১ম সংখ্যা) ২০১২, ঢাকা।
১১. এ. আর. মোল্লা (সম্পা.) *শিল্পকলা ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা*, (দ্বিত্রিংশ বর্ষ ১ম সংখ্যা) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১৩, ঢাকা।

সাক্ষাৎকার

১. সংগীত পরিচালক ও বাংলা খেয়ালের জনক আজাদ রহমান, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ঢাকার গ্রীণ রোডের বাসায় (তারিখঃ ১৪.০৬.২০১৫)
২. সংগীত পরিচালক আলী হোসেন, (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান : ১৬.০৬.২০১৫,জাপান সিটি গার্ডেন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।)
৩. সংগীত শিল্পী খুরশীদ আলম, (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ?)
৪. সংগীত শিল্পী উমা খান (সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ ২২.০২.২০১৭, ইস্টার্ন টাউয়ারস, বাংলা মটর, ঢাকা।)

অন্যান্য বিষয়-উৎসের লিঙ্কসমূহঃ

১. (http://www.slideshare.net/StephWebb/history-of-romance-films (১১/০৭/২০১৫)
২. (https://en.wikipedia.org/wiki/Romance_film (১০/০৬/২০১৫)
৩. (https://bn.wikipedia.org/wiki/রোমান্টিকতা)(১০/০৫/২০১৫)
৪. (https://en.wikipedia.org/wiki/Romantic_music) (১২/০৫/২০১৫)
৫. (https://bn.wikipedia.org/wiki/চন্দ্রনাথ_(১৯৮৪-এর_চলচ্চিত্র) (০৫/১০/২০১৮)
৬. (https://bn.wikipedia.org/wiki/দুই_জীবন (০৫/১০/২০১৮)
৭. (https://bn.wikipedia.org/wiki/শুভদা_(চলচ্চিত্র) (০৫/১১/২০১৮)
৮. (https://www.youtube.com/watch?v=cJcunkJSqC8&t=3357s) (২৫/১২/২০১৮/)
৯. (https://bn.wikipedia.org/wiki/ ইসলাম#ফেরেশতা (১৬/১১/২০১৮)
১০. (https://bn.wikipedia.org/wiki/ দুই_পয়সার_আলতা (১৬/১১/২০১৮)
ইউটিউব থেকে সংগৃহিত চলচ্চিত্রের লিঙ্কসহ নাম ও ব্যবহারের তারিখ নিম্নরূপভাবে দেয়া হলোঃ
১১. (https://www.youtube.com/watch?v=_M63fg2-0Oc) (১৬/০৬/২০১৫/*মুখ ও মুখোশ*)
১২. (https://www.youtube.com/watch?v=SqiNF1zBDas) (০৩/০৪/২০১৬)/*রূপবান*)
১৩. (https://www.youtube.com/watch?v=oSEezQ0xsu8&t=740s) (০৩/০৫/২০১৬) *বেহুলা*)
১৪. (https://www.youtube.com/watch?v=OuVvj9DxoKI) (১৮/৬/২০১৫/*এদেশ তোমার আমার*)
১৫. (https://www.youtube.com/watch?v=8FRxPVLjdaM) (২০/১২/২০১৮/*নীল আকাশের নীচে*)
১৬. (https://www.youtube.com/watch?v=R6C-gXoCMmM) (২০/১১/২০১৮/ *নাচের পুতুল*)
১৭. (https://www.youtube.com/watch?v=N15F5vJxN4M) (২০/১২/২০১৮/*আবির্ভাব*)
১৮. (https://www.youtube.com/watch?v=D0oKslsZKNc&t=2624s) (০৫/১০/২০১৮/*মধুমিতা*)
১৯. (https://www.youtube.com/watch?v=FZhkQGovkmU) (০২/০৯/২০১৮/*সোনা বৌ*)
২০. (https://www.youtube.com/watch?v=GDox1J3VbQg&t=4s) (০৫/১০/২০১৮/*সোহাগ*)
২১. (https://www.youtube.com/watch?v=ujphanZTsfs)) (০২/১১/২০১৮/*মতিমহল*)

২২. (https://www.youtube.com/watch?v=fY3q2FkP1RQ) (০২/১১/২০১৮/ *বাদল*)
২৩. (https://www.youtube.com/watch?v=aHADTgdAaC0&t=81s) (০৫/১০/২০১৮/*দুই জীবন*)
২৪. (https://www.youtube.com/watch?v=nR2DhqtDiLA) (১৬/১০/২০১৮/ *নেপালী মেয়ে*)
২৫. (https://www.youtube.com/watch?v=LNjhIjLxKaY&t=7254sj) (০৫/১০/২০১৮/*অলঙ্কার*)
২৬. (https://www.youtube.com/watch?v=0bH3gIM3R14) (০৬/১১/২০১৮-/*বদনাম*)
২৭. (https://www.youtube.com/watch?v=eXyvOiueq4g&t=3026s) (০২/১০/২০১৮/*দেবদাস)*
২৮. (https://www.youtube.com/watch?v=SgiSf1vhqws&t=1253s) (০৭/১০/২০১৮/*রাজলক্ষী শ্রীকান্ত)*
২৯. (https://www.youtube.com/watch?v=VVfKI5kwdw8) (০২/১০/২০১৮)/*লাইলী মজনু)*
৩০. (https://www.youtube.com/watch?v=ft7C8uOtHb4&t=3435s) (১১/১০/২০১৮/*নরম গরম*)
৩১. (https://www.youtube.com/watch?v=nKxrnQNjbiI&t=2580s) (০১/১০/২০১৮/*শুভদা*)
৩২. (https://www.youtube.com/watch?v=VCrtSqu7q2U) (২৫/১০/২০১৮)/*স্যারেন্ডার)*
৩৩. (https://www.youtube.com/watch?v=ZSoc-DQe6HU) (১০/১০/২০১৮/*মাসুদ রানা)*
৩৪. (https://www.youtube.com/watch?v=z4Wn0w-yZ-E&t=1064s) (২৬/১০/২০১৮/*জয় পরাজয়-পার্ট-১)*
৩৫. (https://www.youtube.com/watch?v=ryW7kMSXHaw) (০২/০৯/২০১৮/*নয়ন মণি)*
৩৬. (https://www.youtube.com/watch?v=eEnYrA5ktto&t=5249s) (২৯/০৮/২০১৮/*অশিক্ষিত)*
৩৭. (https://www.youtube.com/watch?v=l8tKbAYv1tc) (১৬/১০/২০১৮/ *নিস্পাপ)*
৩৮. (https://www.youtube.com/watch?v=y2_2-X912Hw&t=3011s) (১৬/১০/২০১৮/*উজান ভাটি)*
৩৯. (https://www.youtube.com/watch?v=g6gA9cwpp8I&t=5101s) (১৭/১০/২০১৮/*আঁখি মিলন)*
৪০. (https://www.youtube.com/watch?v=0VyiPchtGBc) (১৭/১০/২০১৮/*প্রাণ সজনী)*
৪১. (https://www.youtube.com/watch?v=PgkmS56r_5c (০২/০৯/২০১৮/*সুজন সখী)*
৪২. (https://www.youtube.com/watch?v=_cIDMn2wodQ&t=2136s) (৩০/০৯/২০১৮/ *ছুটির ঘন্টা)*
৪৩. (https://www.youtube.com/watch?v=Mg-kgGcKqWA&t=628s) (১৬/১০/২০১৮/*সুন্দরী)*
৪৪. (https://www.youtube.com/watch?v=ZMLhihPqITw&t=1510s) (০৩/১০/২০১৮/ *আর্শীবাদ)*
৪৫. (https://www.youtube.com/watch?v=FrxMOSi-gDg) (১০/০৫/২০১৮/ *সিকান্দার)*
৪৬. (https://www.youtube.com/watch?v=XdjU5LP7D1k) (০৭/১০/২০১৮/*সৎভাই)*
৪৭. (https://www.youtube.com/watch?v=2IYQpuYPpqA) (০২/১০/২০১৮/*নাগিন)*
৪৮. (https://www.youtube.com/watch?v=x_4SDvh5bwY) (০২/১০/২০১৮/*বেদের মেয়ে জোস্না)*
৪৯. (https://www.youtube.com/watch?v=0I3YPMDaiwk) (০৯/০৮/২০১৮/*আলিফ লাইলা)*
৫০. (https://www.youtube.com/watch?v=UPAhKFhCP1I&t=3856s) (২৯/০৯/২০১৮/ *দিন যায় কথা থাকে)*
৫১. (https://www.youtube.com/watch?v=fyBW_FCTdhc) (০৯/১০/২০১৮/*সুখের সংসার)*
৫২. (https://www.youtube.com/watch?v=dGHzuNCXQ4I) (০৯/১১/২০১৮/*জয় পরাজয়-পার্ট-২)*

এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক বাজারে প্রাপ্ত সিডি থেকে তথ্য সংগ্রহপূর্বক ব্যবহার করা হয়েছে। অনুপম সিডি, লেজার ভিশন, জি সিরিজ প্রভৃতি।

উপসংহার

বাংলা গানের পৃষ্ঠপোষক ছিল এক সময় সমাজের উঁচু শ্রেণি, রাজন্যবর্গ। সে সময়ে গান ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। কিন্তু সময়ের আবর্তনে, তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে বিশেষত গ্রামোফোন, রেডিও, টেলিভিশন এমনকি সর্বোপরি চলচ্চিত্রের বদৌলতে গানের আসরের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। গান তার নানা পরিসরে আবির্ভূত, বিবিধ বিষয় আর সুর সহযোগে সৃষ্ট হতে থাকে। এবং তা বাংলা গানের ইতিহাসে মহীমার সাক্ষরবাহী। দর্শক তা প্রাণ ভরে গ্রহণ করে এবং পরিচালকগণ অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মাণে আগ্রহী হয়। স্বাধীনতাপূর্ব এদেশে ভালো মানের চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, চলচ্চিত্র ইতিহাসে যা স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত। গবেষণায় চলচ্চিত্রের ধারা বা জাতি বিচারপূর্বক গানের বিষয় ও সুরশৈলী গায়কি প্রাসঙ্গিক আলোচনায় একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ত্রিমুখী প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে স্বাধীনতাপূর্ব চলচ্চিত্রের গান বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত। রোমান্টিক গান যা নর-নারীর প্রেম ভালবাসা, বিরহ, বেদনা, অভিমান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পরিবেশিত। তবে স্বাধীনতার পর অর্থাৎ সত্তর-আশির দর্শকেও রয়েছে অনেক গান যা বিশেষভাবে সমাদৃত। স্বাধীনতাত্তোর চলচ্চিত্রের গানে মুক্তিযুদ্ধ বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কাহিনির প্রয়োজনে স্থান পেয়েছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান। তুলে ধরা হয়েছে যুদ্ধ পূর্বাপরের বাস্তব চিত্র। সুরে এসেছে উত্তাল তরঙ্গ, বিপ্লব-বিদ্রোহ প্রভৃতি। দেশ মাতৃকা রক্ষার দাবীতে মুখরিত জনতা তথা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা ও অন্যতম শক্তি হিসেবে প্রচারিত হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ। আবার স্বাধীনতা অর্জনের গৌরবও প্রতিফলিত হয়েছে অনেক গানে।

গীতিকা বা পালা কিংবা লোকজ কাহিনিনির্ভর চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। তবে তা কখনো কখনো প্রচলিত বা জনপ্রিয় কাহিনিকে আশ্রয় করে ভিন্ন দিকে অর্থাৎ নানাবিধ কল্পনার আশ্রয়ে নির্মিত হয়েছে। তবে তাতে চিরায়ত গ্রাম বাংলার সমাজ ও পারিবারিক জীবন চিত্র তুলে ধরার প্রচেষ্টাও লক্ষ করা গেছে। উল্লেখ্য যে, পারিবারিক বন্ধনের গান বৃহৎ পরিসর জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং এর অনেকাংশ জুড়ে রয়েছে 'মা'। মাতৃভক্তি, মাতৃত্ববোধ ইত্যাদি। একান্নবর্তী পরিবার ধরে রাখার অন্যতম প্রচেষ্টা বলা যায়। এছাড়া নারী পুরুষের মধ্যে যে দীর্ঘকালের বিরোধ, তা বাদ-প্রতিবাদের গানে দেখা যায় কখনো ব্যঙ্গাত্মক বা হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিমায়। জীবন-জীবিকার কঠিন প্রয়োজনে অর্থ রোজগারের আশায় পুরুষের শহরমুখী অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পাড়ি জমানোর নজির রয়েছে এবং তা অব্যহত আছে। ফলে গানের মধ্যেও নারীর অন্তর বেদনার রূপ নির্ণিত হয়েছে। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির আবির্ভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবও এ সমাজ এড়াতে পারেনি। ফলে আসরকেন্দ্রীক মনোরঞ্জনের গানের পরিবেশনায় এসেছে পরিবর্তন। ক্রমশ এ গান রূপ বদল করে পার্টি বা ক্লাবে জায়গা করে নিয়েছে এবং তা পরিবেশিত হতে থাকে পাশ্চাত্যের বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে।

গানের প্রয়োগ ভাবনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রথম দিকে বিবিধ বিষয়ের গান দেখা গেলেও ধীরে ধীরে তা ফর্মুলাভিত্তিক ব্যবহারে পরিণত হয়। ফলে ফর্মুলাভিত্তিক চলচ্চিত্রের কাহিনি বা গল্পের সাথে সাথে গানের বিষয় কিংবা ব্যবহারও একই দিকে ধাবিত হয়। একটি দুটি প্রেমের গান, বিরহ-বেদনা অথবা অভিমানের গান এবং মনোরঞ্জনের গান বা আইটেম সং ইত্যাদির

মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মিত হতে দেখা যায়। বিবেকের গান, সই কিংবা সখীর গান, পারিবারিক বন্ধনের গান ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের গান ক্রমশ লোপ পেতে থাকে। বিবেকবোধ জাগ্রত করার প্রয়াসে যাত্রাপালার বিবেকের গানও বিশেষ স্থান তৈরি করে নিয়েছে। তবে ক্রমশ এই গান উপস্থাপনা ভঙ্গিমায় পরিবর্তন এবং রূপ বদল করে আত্মোপলব্ধির দিকে যাত্রা করে। তবে তা বিবেকের গানেরই অনুরূপ বলা যায়।

চলচ্চিত্রের বিষয় কিংবা কাহিনি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিষয়ের প্রভাবে গড়ে ওঠে। তাই কখনো মনের তাগিদে কখনো অস্তিত্ব সংকটের নিরসণকল্পে, টিকে থাকার লড়াইয়ের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে আবার কখনো ব্যবসায়িক সাফল্য লাভের আশায় প্রচলিত জনপ্রিয় উপাদানও চলচ্চিত্রের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কারণ চলচ্চিত্র নির্মাণের পেছনে শিল্পের তাগিদ থাকলেও ব্যবসায়িক দিকটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারণ এখানে বড় অংকের অর্থ লগ্নির প্রয়োজন হয় যা শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়িক দিকে গড়ায়। তাই চলচ্চিত্রের কাহিনি, গানের বিষয়, সুর ইত্যাদি নির্বাচন এবং রচনার ক্ষেত্রেও উক্ত বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে ভিনদেশি কিংবা ওপার বাংলার চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় কাহিনি বা বিষয় কিংবা গান এদেশের চলচ্চিত্র তার প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেনি। এমনকি ফর্মূলাভিত্তিক গান প্রয়োগ ভাবনা থেকে বের হতে পারেনি। সেই সাথে গানে অনুকরণ প্রবণতা ও অক্ষয়ের নানাদিক লক্ষ করা যায়। যে কারণে প্রচুর সমালোচনার শিকার হয়েছে এদেশের চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী-কলাকুশলী প্রমূখ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে।

এই ভূ-খণ্ডের মানুষ সূচনা লগ্ন থেকেই নানাবিধ রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দু'শো বছরের বৃটিশ শাসনের অবসান হয় এরপর শুরু হয় পাকিস্তানি শাসন। ১৯৫২ সালে ভাষার জন্য প্রাণ দেয়ার এক মর্মান্তিক ইতিহাস তৈরি করে পাকহানাদার বাহিনী। এর পরও ক্ষান্ত হয়নি পাকিস্তানি চক্রান্ত। নয় মাস আত্মক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে এদেশ স্বীকৃতি লাভ করে। এই দীর্ঘ সময়ের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ফলে শিক্ষা-দীক্ষাসহ নানা বিষয়ে বঞ্চিত হয়েছে এ দেশের মানুষ। এবং অভাব অনটনে জর্জরিত হয়ে ধর্মীয় কুসংস্কারে জড়িয়ে পড়েছে। তার প্রভাব শিল্পসংস্কৃতির নানাবিধ শাখা-প্রশাখাও পড়েছে। এমনকি চলচ্চিত্রের গানেও পড়েছে বিস্তৃতভাবে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ কলকাতায় ১৯৩৫ সালে *ভাগ্যচক্র* চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্লেব্যাকগীতি শুরু হয়েছে আর আমাদের এই বঙ্গে *মুখ ও মুখোশ* সবাক চলচ্চিত্র শুরু হয় ১৯৫৬ সালে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের কথা তো অনেক পরে পশ্চিমবঙ্গ থেকেও এদেশ অনেক পিছিয়ে।

তবুও নানা প্রতিবন্ধকতার ভেতর দিয়ে নির্মিত হয়েছে এদেশের চলচ্চিত্র। ফলে কারিগরি দক্ষতার অভাব তো আছেই, সাথে বিভিন্ন রকমের অসংগতি রয়েছে চলচ্চিত্র নির্মাণ কলায়। আবার সেগুলোকে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে মধুর ভুল বলেও আখ্যায়িত করা যেতে পারে। শিল্পের সমালোচনায় হয়তো এ ধরনের ব্যাক্যালাপের কোন সুযোগ নেই কিন্তু বাস্তবিক অর্থে এর একটা আবেগ মূল্য থাকা উচিত বলে মনে হয়। চলচ্চিত্র হলো প্রযুক্তি নির্ভর একটি গণমাধ্যম। যার পুরোটাই ধারণ করা হয় প্রযুক্তির এক অভিনব কৌশলে। কারিগরি বিবেচনায় উন্নত বিশ্বের চলচ্চিত্রের পাশে আমাদের চলচ্চিত্র হয়তো পরিপুষ্ট নয়। কিন্তু এই চলচ্চিত্রশিল্প এদেশের মানুষের কাছে সান্ত্বনা এবং আর্শীবাদ।

কারণ যে দেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে অস্তিত্ব সংকটে সংগ্রাম করেছে। সে দেশের মানুষের শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে ভাবনার অবকাশ কোথায়? এ ভাবনা এক আশ্চর্য ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার নানা রকমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা শিল্পের অন্যতম অনুপ্রেরণা বা উৎস এ কথাও স্মরণযোগ্য। গানের বিষয় এবং সুরকে সামনে রেখে গবেষণায় বেশ কটি বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। চিরায়ত বাঙালির সমাজ ও পারিবারিক জীবন চিত্রের বাস্তবতা যদিও কখনো বা কল্পনার আশ্রয়ে নির্মিত। এবং তাতে ইতিহাস, রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক দর্শনও বিদ্যমান। সর্বোপরি, চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রযোজক, সুরকার ও সংগীত পরিচালক, নিবেদিত সংগীতশিল্পী, চলচ্চিত্রানুরাগী, গবেষক এবং পাঠকদের যদি কল্যাণে আসে তবেই গবেষণা কর্মটির শ্রম সার্থক।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও অন্যান্য

বাংলা গ্রন্থ

১. অপূর্ব কুমার কুন্ডু, *অস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৩, ঢাকা।
২. অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, দিব্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ২০০৭, ঢাকা।
৩. অনুপম হায়াৎ, চলচ্চিত্রবিদ্যা, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র অধ্যয়ন কেন্দ্র, ২০০৪, ঢাকা।
৪. অনুপম হায়াৎ, *চলচ্চিত্র সমালোচনা, সম্পাদনা*, কলি প্রকাশনী, ২০১১, ঢাকা।
৫. অনুপম হায়াৎ, *রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র*, দিব্য প্রকাশ, ২০১২, ঢাকা।
৬. অনুপম হায়াৎ, *মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক প্রকাশিত, ২০১১, ঢাকা।
৭. অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের রূপরেখা*, পলল প্রকাশনী, ২০০৯, ঢাকা।
৮. অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন, ১৯৮৭ ঢাকা।
৯. অনুপম হায়াৎ, *পুরানো ঢাকায় চলচ্চিত্র*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৯, ঢাকা।
১০. অনুপম হায়াৎ, *আলমগীর কবিরের চলচ্চিত্র পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, বঙ্গজ, প্রকাশন, ২০১৬, ঢাকা।
১১. অনুপম হায়াৎ, (সম্পা.দ্বিতীয় সংস্করণ) *চিত্রনাট্য*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১০, ঢাকা।
১২. আবদুল লতিফ, *ভাষার গান দেশের গান*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, ঢাকা।
১৩. আবদুল্লাহ জেয়াদ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র: পাঁচ দশকের ইতিহাস*, জ্যোতি প্রকাশ, ২০১০, ঢাকা।
১৪. আবুল হাসান চৌধুরী, *বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতে প্রেমচেতনা*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০১, ঢাকা।
১৫. আবদুল আহাদ, *আসা যাওয়ার পথের ধারে*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স লিমিটেড, ২০১৪, ঢাকা।
১৬. আসলাম আহসান, *বাংলাদেশের সিনেমার স্মৃতি জাগানিয়া গান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১৬, ঢাকা।
১৭. আসলাম আহসান, *বাংলাদেশের সিনেমার স্মরণীয় গান* (১৯৫৯-২০১৬), প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭, ঢাকা।
১৮. আসাদ চৌধুরী, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, বাংলা একাডেমি, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ ২০১৩, ঢাকা।
১৯. আসাদুল হক, *নজরুল যখন বেতারে*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৯, ঢাকা।
২০. আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩, ঢাকা।
২১. আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩, ঢাকা।
২২. আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, বাংলা একাডেমি, ২০০৮, ঢাকা।
২৩. আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রে বাংলাদেশ*, ভাষাচিত্র, ২০১৪, ঢাকা।
২৪. আহসান হাবিব আসলাম (সংকলন ও সম্পাদনা) *সুরের ইন্দ্রধণু, শতবর্ষের কালজয়ী বাংলা গান* (১৯০০-২০১১), রোদেলা প্রকাশনী, ২০১২, ঢাকা।
২৫. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন* (দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ২০০৮, ঢাকা।
২৬. ওয়াকিল আহমদ, *লোকসংস্কৃতি*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, ঢাকা।
২৭. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি, ১৯৭৪, ঢাকা।
২৮. ওয়াকিল আহমদ, *বাউল গানের ধারা*, গতিধারা, ২০১০, ঢাকা।

২৯. উৎপল সরকার (সম্পা.) *চলচ্চিত্রে সংগীতের প্রয়োগ*, প্রতিভাস কলকাতা, ২০১১, কলকাতা।
৩০. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গান স্বরলিপি-ইতিহাস*, অনুপম প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, ঢাকা।
৩১. ক্যাথরিন মাসুদ (সম্পা,) *চলচ্চিত্রলেখা চিত্রনাট্য* ও গান, তারেক মাসুদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩, ঢাকা।
৩২. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি, ২০১১, ঢাকা।
৩৩. করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমি, ২০০৪, ঢাকা।
৩৪. কাজী মাহমুদুর রহমান, *বেতার কথা, মল্লিক* ব্রাদার্স, ২০০৫, ঢাকা।
৩৫. কালিশ মুখোপাধ্যায়, *বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাস (১৮৯৭-১৯৪৮)*, পত্র ভারতী, সংস্করণ ২০১২ ঢাকা।
৩৬. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্যের রূপ-রীতি, ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, রত্নাবলী, ২০১২, কলকাতা।
৩৭. খন্দকার মাহমুদুল হাসান, *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র*, কথা প্রকাশ, ২০১১, ঢাকা।
৩৮. গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়, *বাংলাসাহিত্যে রোম্যান্টিসিজম*, মিত্র এন্ড ঘোষ প্রকাশন, আশ্বিন ১৪০২, কলকাতা।
৩৯. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর, ২০০৬, ঢাকা।
৪০. গীতি আরা নাসরিন ও ফাহমিদুল হক, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্প সংকটে জনসংস্কৃতি*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৮, ঢাকা।
৪১. চলচ্চিত্রকার আজিজুর রহমান'র *চলচ্চিত্রে আমার কথা*, আলপনা প্রকাশনী, ২০১৬, ঢাকা।
৪২. ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ*, রোদেলা, ২০১৩, ঢাকা।
৪৩. ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিশুর উপস্থাপন, শিশুতোষ মনোভঙ্গির নৈতিক ও শৈল্পিক পটভূমি*,
৪৪. ড. বাসুদেব রায়, *মনসামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ*, পাঠক বন্ধু লাইব্রেরি, ২০০৪, ঢাকা।
৪৫. ড. কাবেরী গায়েন, মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১২, ঢাকা।
৪৬. ড. তপন বাগচী, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পঞ্চাশ বছর, লোকজীবনের উপস্থাপনা*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১১, ঢাকা।
৪৭. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা হাজার বছরের বাংলা গান*, প্যাপিরাস, (সংস্করণ-২০০৭), ঢাকা।
৪৮. ড. মৃদুলকান্তিচক্রবর্তী, *হারানো দিনের গান*, অনুপম প্রকাশনী, ২০০৭, ঢাকা।
৪৯. ড. মৃদুলকান্তিচক্রবর্তী, *ভাষা ও দেশের গান* (স্বরলিপিসহ) অনুপম প্রকাশনী, ২০০৫, ঢাকা।
৫০. ডক্টর এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ২০০৮, ঢাকা।
৫১. ড. প্রদীপ রায়, *বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে গ্রাম*, উচ্চতর মানব বিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়।
৫২. তপতী বর্মন ও ইমরান ফিরদাউস, *বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্র (একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা)*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০০৯, ঢাকা।
৫৩. তপন বাগচী, *চলচ্চিত্রের গানে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১০, ঢাকা।
৫৪. তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান*, বাংলা একাডেমি, ২০০৭, ঢাকা।
৫৫. ধীমান দাশগুপ্ত, *সিনেমার অ আ ক খ*, সুজন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, ঢাকা।
৫৬. *নির্বাচিত গান মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, ঢাকা।
৫৭. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব*, এবং মুশায়েরা,২০১৪, কলকাতা।
৫৮. প্রবীর সেনগুপ্ত, *বাংলার গান বাংলা গান*, ড. অরুণ সরকার (সম্পা.), পুস্তক বিপনি, ২০০৬, কলকাতা।
৫৯. পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা ছবির গান, প্রসঙ্গ কথা ; দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়*, সূত্রধর, ২০১৩, কলকাতা।
৬০. ফজল-এ-খোদা, *সংগীত ভাবনা*, বাংলা একাডেমি, ২০১২, ঢাকা।
৬১. *ফজল-এ-খোদা গান*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৭, ঢাকা।
৬২. ফাহমিদুল হক ও শাখাওয়াত মুন, *চলচ্চিত্রের সময় সময়ের চলচ্চিত্র*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০০৬ ঢাকা।
৬৩. ফকির আলমগীর,*গণসঙ্গীত ও মুক্তিযুদ্ধ*, অনন্যা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, ঢাকা।
৬৪. বেলাল মোহাম্মদ, *স্বধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, অনুপম প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩, ঢাকা।
৬৫. মোবারক হোসেন খান (সম্পা.) *সংগীত সাধক অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ২০০৩, ঢাকা।
৬৬. মোবারক হোসেন খান, *মুক্তিযুদ্ধের গান*, শোভা প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯, ঢাকা।

৬৭. মোবারক হোসেন খান, *ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ জীবনী ও পত্রসম্ভার*, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১, ঢাকা।
৬৮. মোবারক হোসেন খান, (সম্পা.) *নজরুল সঙ্গীতের বিচিত্রধারা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০৫, ঢাকা।
৬৯. মোবারক হোসেন খান, *সংগীত মালিকা*, বাংলা একাডেমি, প্রথম পুনমুদ্রণ, ২০০৩, ঢাকা।
৭০. মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, *বাংলাগানের রচনা কৌশল ও শুদ্ধতা*, হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩, ঢাকা।
৭১. মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, *বাংলা গান বিবিধ প্রসঙ্গ*, হাওলাদার প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১১, ঢাকা।
৭২. মো ঃ আরিফু রহমান খান, *বাংলদেশের যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১৬, ঢাকা।
৭৩. মাহবুব আজাদ, *জীবনী গ্রন্থমালা, খান আতাউর রহমান* ,বাংলা একাডেমি, ২০০০, ঢাকা।
৭৪. মাহমুদুল বাসার, *আবদুল গাফফার চোধুরী, এক জীবন্ত কিংবদন্তী*, জ্যোস্না পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ২০১০ ঢাকা।
৭৫. মতিউর রহমান (সম্পা.) *এক ঝড়ের পাখি, আলতাফ মাহমুদ*, ঐতিহ্য, ২০০৫, ঢাকা।
৭৬. মুস্তাফা জামান আব্বাসী, *ভাওয়াইয়ার জন্মভূমি*, অনন্যা, ২০০৯, ঢাকা।
৭৭. মুম রহমান, *বিশ্বসেরা ৫০ চলচ্চিত্র*, ভাষাচিত্র, প্রথম প্রকাশ ২০১০, ঢাকা।
৭৮. মুহম্মদ জাকারিয়া, *গান রচনার কলাকৌশল*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০১৪, ঢাকা।
৭৯. মিলন কান্তি দে, *যাত্রাশিল্পের সেকাল একাল*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৫, ঢাকা।
৮০. যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবি গান*, বিভাস, প্রথম সংস্করণ, ২০১০, ঢাকা।
৮১. রহমান হাবিব, *বাংলা গানের ভাবসম্পদ*,বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, ঢাকা।
৮২. রুখসানা করিম (কানন), *বিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১৭ ঢাকা।
৮৩. লীনা তাপসী খান, *নজরুল-সংগীতে রাগের ব্যবহার*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১১, ঢাকা।
৮৪. শরাফুল ইসলাম, *মুখ ও মুখোশের ছেঁড়াপাতা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৫, ঢাকা।
৮৫. শামসুজ্জামান খান, *বাংলার গণসঙ্গীত*- কল্যাণী ঘোষ, বিজয় প্রকাশ, ২০০৮, ঢাকা।
৮৬. সাজেদুল আউয়াল, *চলচ্চিত্র কলার রূপ-রূপান্তর*, দিব্য প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৪, ঢাকা।
৮৭. সাইম রানা, *বাংলাদেশের গণসংগীতের বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমি, ২০০৯, ঢাকা।
৮৮. সাইম রানা, *চলচ্চিত্রসংগীত ও শব্দযোগের ভাষা*, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, ২০১৭, ঢাকা।
৮৯. সত্যজিৎরায়, *বিষয় চলচ্চিত্র*, আনন্দ, ২০০৯, কলকাতা।
৯০. সুচীত্রা সরকার, *অভিনয় শিল্পী সুলতানা জামান, জীবন ও কর্ম*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১৪, ঢাকা।
৯১. সাজেদুল আউয়াল (সম্পা.) সুবর্ণজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের ইতিবৃত্ত*, সুবর্ণজয়ন্তী উৎযাপন পরিষদ কর্তৃক প্রথম প্রকাশ ২০১৪, ঢাকা।
৯২. হারুনর রশীদ, *চলচ্চিত্রকার সালাহ্উদ্দিন*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১১, ঢাকা।
৯৩. হাসান অনুপম, *সাহিত্যনির্ভর বাংলাদেশের চলচ্চিত্র, নারীর অবস্থান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ২০১৬, ঢাকা।
৯৪. হায়াৎ মাহমুদ, *বাংলা লেখার নিয়ম কানুন*, ২০০০ প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা।
৯৫. হুমায়ূন আজাদ, *নারী*, তৃতীয় সংস্করণ, আগামী প্রাকাশনী, ২০০২, ঢাকা।
৯৬. *জহির রায়হান রচনাসমগ্র*, অনুপম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, ঢাকা।

গবেষণা বিষয়ক গ্রন্থ

১. সফিকুন্নবী সামাদী, গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মোঃ মেহেদী হাসান, *সাহিত্য-গবেষণা : বিষয় ও রচনা কৌশল*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১৪, ঢাকা।
২. ড. সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, *গবেষণা: প্রকরণ ও পদ্ধতি*, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯০, কলকাতা।
৩. রাগিব হাসান, *গবেষণায় হাতেখড়ি*, আদর্শ, ২০১৫, ঢাকা।
৪. এস এম তানভীর আহমদ, *ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি*, (সম্পা.আহমেদ কামাল), সংহতি, ২০১৪, ঢাকা।
৫. জয়ন্ত গোস্বামী, *সম্পাদনা- ভিত্তিক গবেষণা, পদ্ধতি ও প্রয়োগ*, পুস্তক বিপণি, ১৯৯১, কলিকাতা।

ইংরেজি গ্রন্থ

১. PAUL C. COZBY, *Methods in Behavioral Research,* (Ninth edition), 2007, America New York.

২. Donna lee Kwon, *Music in Korea*, Oxford University Press, 2012, New York.

৩. *Educational Research Methodology,* Training Manual, National academy for Educational Management (NAEM), 2006, Dhaka.

৪. *KOREAN MUSIC,* Its History and Its Performance, KEITH PRATT, JUNGEUMSA, First published in 1987.

৫. *Essays on Korean Traditional Musi*c, by Lee, Hye-Ku, Translated by Robert C. Provine, Second Edition 1983.

বাংলা ও ইংরেজি অভিধান

১. জামিল চৌধুরী (সম্পা.) *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, ২০১৬, ঢাকা।

২. জামিল চৌধুরী (সংকলন ও সম্পাদনা) *বাংলা একাডেমি বাংলা বানান-অ ভিধান*, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ ২০১৫, ঢাকা।

৩. Zillur Rahman Siddiqui (Edited) Bangla Academy English-Bangla Dictionary, Bangla Academy, 2010, Dhaka.

৪. Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Third Editoin Cambridge University Press 2008, (South Asian Editoin) Reprinted 2010.

সাময়িকী, পত্র-পত্রিকা, সাক্ষাৎকার, ওয়েবসাইট প্রভৃতি

১. তাসমিমা হোসেন (সম্পা.), *অনন্যা*, ২০১৩, ঢাকা।

২. সাজেদুল আউয়াল (সম্পা.সুবর্ণজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ), *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের ইতিবৃত্ত,* ২০১৪, ঢাকা।

৩. আল মাহমুদ (সম্পা.), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জুন ১৯৯৫, ঢাকা।

৪. খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেন (সম্পা.) পূর্বাণী ঈদ সংখ্যা, ১৯৮৯, ঢাকা।

৫. মতিউর রহমান (সম্পা.) *দৈনিক প্রথম আলো*, ১২ মার্চ ২০১৬, ঢাকা।

৬. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ জানুয়ারি, ২০১৭, ঢাকা।

৭. *দৈনিক প্রথম আলো*, (আনন্দ) ৩ মার্চ, ২০১৬, ঢাকা।

৮. *দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ অক্টোবর ২০১৫, ঢাকা।

৯. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫, ঢাকা।

১০. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১০ জুলাই, ২০১৫, ঢাকা।

১১. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৮ এপ্রিল, ২০১৫, ঢাকা।

১২. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২২ মার্চ, ২০১৬, ঢাকা।

১৩. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৫, ঢাকা ।

১৪. *দৈনিক প্রথম আলো*, (আনন্দ) ২ এপ্রিল ২০১৫, ঢাকা।

১৫. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৫ এপ্রিল ২০১৭, ঢাকা।

টিভি অনুষ্ঠান

১. শফিউদ্দিন শিকদার প্রযোজিত, বাংলাদেশ টেলিভিশনের পুরানো দিনের বাংলা গানের অনুষ্ঠান, *গান চিরদিন*।

২. এনটিভিতে প্রচারিত 'গীতিময়' সংগীতানুষ্ঠান।

৩. চ্যানেল আইয়ে পরিবেশিত '*পালকি*' গানের অনুষ্ঠান।

একাডেমিক জার্নাল

১. মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পা.), *লোকসঙ্গীত*, এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, ঢাকা।

২. ইসরাফিল শাহীন (সম্পা.) *পরিবেশনা শিল্পকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি*, ২০০৭, ঢাকা

৩. ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন (সম্পা.) *ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক প্রকাশিত ষান্মাসিক জার্নাল (সংখ্যা-৯) ২০১৫, ঢাকা।
৪. ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন (সম্পা.) *ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক প্রকাশিত ষান্মাসিক জার্নাল (সংখ্যা-১০) ২০১৬, ঢাকা।
৫. মো. জাহাঙ্গীর হোসেন (সম্পা.) *ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক প্রকাশিত ষান্মাসিক জার্নাল (সংখ্যা-১১) ২০১৬, ঢাকা।
৬. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পত্রিকা, (সংখ্যা-৩), ২০১৬, ঢাকা।
৭. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পত্রিকা, (সংখ্যা-৪), ২০১৬, ঢাকা।
৮. ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন (সম্পা.), *চলচ্চিত্র অধ্যায়ণ ও প্রশিক্ষণ* বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পত্রিকা, ঢাকা।
৯. লিয়াকত আলী লাকি (সম্পা.) *শিল্পকলা ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা* ১ম ও ২য় যুক্ত সংখ্যা,বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১৫, ঢাকা।
১০. মোঃ ফকরউদ্দিন আহমেদ (সম্পা.) *শিল্পকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, (একত্রিংশবর্ষ, ১ম সংখ্যা) ২০১২, ঢাকা।
১১. এ. আর. মোল্লা (সম্পা.) *শিল্পকলা ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা*, (দ্বিত্রিংশ বর্ষ ১ম সংখ্যা) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১৩, ঢাকা।

সাক্ষাৎকার

১. সংগীত পরিচালক ও বাংলা খেয়ালের জনক আজাদ রহমান, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ঢাকার গ্রীণ রোডের বাসায় (তারিখঃ ১৪.০৬.২০১৫)
২. সংগীত পরিচালক আলী হোসেন, (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও স্থান : ১৬.০৬.২০১৫,জাপান সিটি গার্ডেন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।)
৩. সংগীত শিল্পী খুরশীদ আলম, (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ?)
৪. সংগীত শিল্পী উমা খান (সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ ২২.০২.২০১৭, ইস্টার্ন টাউয়ারস, বাংলা মটর, ঢাকা।)

অন্যান্য বিষয়-উৎসের লিঙ্কসমূহ:

১. (http://www.slideshare.net/StephWebb/history-of-romance-films (১১/০৭/২০১৫)
২. (https://en.wikipedia.org/wiki/Romance_film (১০/০৬/২০১৫)
৩. (https://bn.wikipedia.org/wiki/রোমান্টিকতা)(১০/০৫/২০১৫)
৪. (https://en.wikipedia.org/wiki/Romantic_music) (১২/০৫/২০১৫)
৫. (https://bn.wikipedia.org/wiki/চন্দ্রনাথ_(১৯৮৪-এর_চলচ্চিত্র) (০৫/১০/২০১৮)
৬. (https://bn.wikipedia.org/wiki/দুই_জীবন (০৫/১০/২০১৮)
৭. (https://bn.wikipedia.org/wiki/শুভদা_(চলচ্চিত্র) (০৫/১১/২০১৮)
৮. (https://www.youtube.com/watch?v=cJcunkJSqC8&t=3357s) (২৫/১২/২০১৮/)
৯. (https://bn.wikipedia.org/wiki/ ইসলাম#ফেরেশতা (১৬/১১/২০১৮)
১০. (https://bn.wikipedia.org/wiki/ দুই_পয়সার_আলতা (১৬/১১/২০১৮)
ইউটিউব থেকে সংগৃহিত চলচ্চিত্রের লিঙ্কসহ নাম ও ব্যবহারের তারিখ নিম্নরূপভাবে দেয়া হলো:
১১. (https://www.youtube.com/watch?v=_M63fg2-0Oc) (১৬/০৬/২০১৫/*মুখ ও মুখোশ*)
১২. (https://www.youtube.com/watch?v=SqiNF1zBDas) (০৩/০৪/২০১৬)/*রূপবান*)
১৩. (https://www.youtube.com/watch?v=oSEezQ0xsu8&t=740s) (০৩/০৫/২০১৬) *বেহুলা*)
১৪. (https://www.youtube.com/watch?v=OuVvj9DxoKI) (১৮/৬/২০১৫/*এদেশ তোমার আমার*)

১৫. (https://www.youtube.com/watch?v=8FRxPVLjdaM) (২০/১২/২০১৮/*নীল আকাশের নীচে*)
১৬. (https://www.youtube.com/watch?v=R6C-gXoCMmM) (২০/১১/২০১৮/ *নাচের পুতুল*)
১৭. (https://www.youtube.com/watch?v=N15F5vJxN4M) (২০/১২/২০১৮/*আবির্ভাব*)
১৮. (https://www.youtube.com/watch?v=D0oKslsZKNc&t=2624s) (০৫/১০/২০১৮/*মধুমিতা*)
১৯. (https://www.youtube.com/watch?v=FZhkQGovkmU) (০২/০৯/২০১৮/*সোনা বৌ*)
২০. (https://www.youtube.com/watch?v=GDox1J3VbQg&t=4s) (০৫/১০/২০১৮/*সোহাগ*)
২১. (https://www.youtube.com/watch?v=ujphanZTsfs)) (০২/১১/২০১৮/*মতিমহল*)
২২. (https://www.youtube.com/watch?v=fY3q2FkP1RQ) (০২/১১/২০১৮/ *বাদল*)
২৩. (https://www.youtube.com/watch?v=aHADTgdAaC0&t=81s) (০৫/১০/২০১৮/*দুই জীবন*)
২৪. (https://www.youtube.com/watch?v=nR2DhqtDiLA) (১৬/১০/২০১৮/ *নেপালী মেয়ে*)
২৫. (https://www.youtube.com/watch?v=LNjhIjLxKaY&t=7254sj) (০৫/১০/২০১৮/*অলঙ্কার*)
২৬. (https://www.youtube.com/watch?v=0bH3gIM3R14) (০৬/১১/২০১৮-/*বদনাম*)
২৭. (https://www.youtube.com/watch?v=eXyvOiueq4g&t=3026s) (০২/১০/২০১৮/*দেবদাস)*
২৮. (https://www.youtube.com/watch?v=SgiSf1vhqws&t=1253s) (০৭/১০/২০১৮/*রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত)*
২৯. (https://www.youtube.com/watch?v=VVfKI5kwdw8) (০২/১০/২০১৮)/*লাইলী মজনু)*
৩০. (https://www.youtube.com/watch?v=ft7C8uOtHb4&t=3435s) (১১/১০/২০১৮/*নরম গরম*)
৩১. (https://www.youtube.com/watch?v=nKxrnQNjbiI&t=2580s) (০১/১০/২০১৮/*শুভদা*)
৩২. (https://www.youtube.com/watch?v=VCrtSqu7q2U) (২৫/১০/২০১৮)/*স্যারেন্ডার)*
৩৩. (https://www.youtube.com/watch?v=ZSoc-DQe6HU) (১০/১০/২০১৮/*মাসুদ রানা)*
৩৪. (https://www.youtube.com/watch?v=z4Wn0w-yZ-E&t=1064s) (২৬/১০/২০১৮/*জয় পরাজয়-পার্ট-১)*
৩৫. (https://www.youtube.com/watch?v=ryW7kMSXHaw) (০২/০৯/২০১৮/*নয়ন মণি)*
৩৬. (https://www.youtube.com/watch?v=eEnYrA5ktto&t=5249s) (২৯/০৮/২০১৮/*অশিক্ষিত)*
৩৭. (https://www.youtube.com/watch?v=l8tKbAYv1tc) (১৬/১০/২০১৮/ *নিষ্পাপ)*
৩৮. (https://www.youtube.com/watch?v=y2_2-X912Hw&t=3011s) (১৬/১০/২০১৮/*উজান ভাটি)*
৩৯. (https://www.youtube.com/watch?v=g6gA9cwpp8I&t=5101s) (১৭/১০/২০১৮/*আঁখি মিলন)*
৪০. (https://www.youtube.com/watch?v=0VyiPchtGBc) (১৭/১০/২০১৮/*প্রাণ সজনী)*
৪১. (https://www.youtube.com/watch?v=PgkmS56r_5c (০২/০৯/২০১৮/*সুজন সখী)*
৪২. (https://www.youtube.com/watch?v=_cIDMn2wodQ&t=2136s) (৩০/০৯/২০১৮/ *ছুটির ঘন্টা)*
৪৩. (https://www.youtube.com/watch?v=Mg-kgGcKqWA&t=628s) (১৬/১০/২০১৮/*সুন্দরী)*
৪৪. (https://www.youtube.com/watch?v=ZMLhihPqITw&t=1510s) (০৩/১০/২০১৮/ *আর্শীবাদ)*
৪৫. (https://www.youtube.com/watch?v=FrxMOSi-gDg) (১০/০৫/২০১৮/ *সিকান্দার)*
৪৬. (https://www.youtube.com/watch?v=XdjU5LP7D1k) (০৭/১০/২০১৮/*সৎভাই)*
৪৭. (https://www.youtube.com/watch?v=2IYQpuYPpqA) (০২/১০/২০১৮/*নাগিন)*
৪৮. (https://www.youtube.com/watch?v=x_4SDvh5bwY) (০২/১০/২০১৮/*বেদের মেয়ে জোস্না)*
৪৯. (https://www.youtube.com/watch?v=0I3YPMDaiwk) (০৯/০৮/২০১৮/*আলিফ লাইলা)*
৫০. (https://www.youtube.com/watch?v=UPAhKFhCP1I&t=3856s) (২৯/০৯/২০১৮/ *দিন যায় কথা থাকে)*
৫১. (https://www.youtube.com/watch?v=fyBW_FCTdhc) (০৯/১০/২০১৮/*সুখের সংসার)*
৫২. (https://www.youtube.com/watch?v=dGHzuNCXQ4I) (০৯/১১/২০১৮/*জয় পরাজয়-পার্ট-২)*

এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক বাজারে প্রাপ্ত সিডি থেকে তথ্য সংগ্রহপূর্বক ব্যবহার করা হয়েছে। অনুপম সিডি, লেজার ভিশন, জি সিরিজ প্রভৃতি।